মুন্না। আমি সব ভাল রকম জানিনা।

রতন। তুমি কতদিন এখানে আছ ?

মুন্না। সেত বহুদিন। যে দিন হইতে দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়াছি।

রতন। দস্যুবৃত্তি ছাড়িলে কেন ?

মুন্না। যে জন্য ডাকাতি করিতাম, আর তার প্রয়োজন হইল না।

রতন। কি জন্য ডাকাতি করিতে, শুনিতে পাই না ?

মুন্না। মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য।

রতন। এইত বলিলে, দস্যুবৃত্তি ছাড়িয়া চাকুরী লইয়াছি।

মুন্না। চিরকালই মনিবের চাকুরি করিতেছি। তবে এখানে থাকিতাম না।

রতন। থাকিতে কোথায় ?

মুন্না। পথে পথে ঘুরিতাম, বনে বনে দিন কাটাইতাম, আর যদি কোনও দিন ডাকাতী করিবার সুবিধা না পাইতাম, কোন গুহায় রাত্রি যাপন করিতাম।

রতন। তোমার ঘর বাড়ী ছিল না ?

মুন্না। কস্মিন কালেও ছিল না, এখনও নাই, শুনিয়াছি বাল্যকালে মনিব আমাকে ব্যাঘ্রমুখ হইতে উদ্ধার করেন। সেইকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত মনিবের আমি ক্রীতদাস। মনিবের ঘরেই মানুষ হইয়াছি; মনিবের কাছেই কুস্তি. লাঠীখেলা, অস্ত্রধরা শিখিয়াছি।

রতন। দস্যুবৃত্তি শিখিলে কোথায় ?

মুন্না। সবইত এক রকম বলিয়াছি ঠাকুর! এই আমার হাত, এই আমার দেহ, এই আমার প্রাণ—হাতের লাঠী সমস্তই মনিবের—আমি শুধু পুতুলের মত, মনিবের হাতের টীপে ঘুরিয়া বেড়াই।

রতন মুন্নাকে পাইয়া, তার সঙ্গে দুই চারিটা কথা কহিয়া ভাবিয়াছিলেন, শৈলজানন্দকে এইবারে হাতে পাইয়াছেন। কিন্তু আসিতে

আসিতে শৈলজানন্দ আবার যেন অতিদূরে সরিয়া গেল, ধরা দিল না। ভাবিলেন, ছোটনাগপুরের বড় বড় জমীদারের ঘর লুটিয়া, দস্যু মুন্না যে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে, তাহার মূলে কি ঐ সৌম্য প্রশান্ত ঋষিমূর্ত্তি বৃদ্ধ? তিনি কি আজ দস্যুর গৃহে অতিথি!

মুন্না মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দিল। বলিল—"ঠাকুর! দেবতা দর্শন করুন।"

রতন বলিলেন, "দেবতাকে পরে দেখিব। তুমি আর একটী কথা বল। আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।"

মুন্না ঈষৎ হাসিয়া বলিল—জিজ্ঞাসা করুন। আমি যা জানি সমস্তই আপনাকে বলিব। আপনাকে কিছু গোপন করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই প্রয়োজনও নাই। আজ দশ বৎসর যে মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হয় নাই, আমিও যা দেখিতে অনুমতি পাই নাই, মনিবের আদেশে আমি আপনাকে তাই দেখাইতে চলিয়াছি, আপনি কি জানিতে চান জিজ্ঞাসা করুন।

রতন জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন; কথায় বাধা দিয়া মুন্না আবার বলিতে লাগিল।—কিন্তু মনিব সম্বন্ধে আমার জ্ঞান অতি অল্প। আপনি যে বিশেষ তৃপ্তি পাইবেন, তাহাত বোধ হয় না।

শেষ কথাটা শুনিয়া রতনের মনে কিছু খট্‌কা লাগিল। শৈলজানন্দ সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত জানিবার জন্যই তাঁর প্রশ্ন। বুঝিতেই যদি না পারিলেন, তাহা হইলে প্রশ্ন করিয়া ফল কি! তাঁহার সন্দেহ হইল, পাছে শৈলজানন্দ বিপন্ন হয়, এই ভয়ে সে প্রভু সম্বন্ধে অনেক কথা ব্যক্ত করিবে না, তিনি সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর পাইবেন না। তাই আগে হইতেই মুন্না মুখবন্ধ করিয়া রাখিতেছে।

মুন্না মুহূর্ত্তমাত্র নীরব থাকিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল। আপনার কথা শুনিয়া বহুবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষ করিয়াছিলাম।

রতন হাসিতে হাসিতে বলিলেন—কি? অস্ত্র লইয়া?

মুন্না। শুধু হাতে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ফল কি? আপনি বঙ্গদেশী ব্রাহ্মণ—পেটফোলা, হাত নলি, বাঙ্গালীর দেশ হইতে আসিয়া নাগপুরের বুকে বসিয়া, আজ প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিতেছেন। আপনার সহিত শুধু হাতে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া কি আমার চতুর্বর্গ লাভ হইত?—ইচ্ছা ছিল, আপনাকে কিছু অস্ত্রঝনঝনার উপঢৌকন দিই। তাহাতে বরং একটা কোল সর্দ্দারের গৌরব হইত।

রতন। গেলেনা কেন?

মুন্না। প্রভুর নিষেধ ছিল।

রতন। কেন? দেখা নাই পরিচয় নাই, কোথা হতে আমার প্রতি তোমার প্রভুর অসম্ভব দয়া হইল?

মুন্না। তা বলিতে পারি না।

রতন। আমার বোধ হইতেছে, তুমি আমাকে কথাটা গোপন করিলে।

দাঁতে জিব কাটিয়া মুন্না বলিল—গোপন করিব কেন? এরূপ কথা আপনার যোগ্য হয় নাই। রতন অপ্রস্তুত হইলেন।—বলিলেন—তুমি কি একটা কারণও অনুমান কর নাই?

মুন্না। বলিয়াছিত ঠাকুর! প্রভুর আঙ্গুলের টীপে আমি পুতুলের মত ফিরিয়াছি। অনুমানে তাঁহার কার্য্যের তত্ত্ব বুঝিতে কখনও চেষ্টা করি নাই।

রতন। তুমি দস্যুতা করিয়া এ জীবনে অবশ্য বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়াছ?

মুন্না। সংগ্রহ করি নাই, লুঠ করিয়া আনিয়াছি এইমাত্র। রাত্রে ডাকাতি করিতাম, দিনমানে এই স্থানে আসিয়া অষ্টভুজার প্রসাদ খাইতাম। বহুদূরে যাইলে, যদি রাত্রের মধ্যে আসা অসম্ভব বোধ

হইত, কিম্বা কোনও কারণে দুই চারি দিন বিলম্ব ঘটিত, মজুরি করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতাম। মজুরি না জুটিলে ফলমূল—তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইলে জলাশয়ের জল। আসল কথা অনাহারে মরিলেও ভিক্ষা করিতাম না।

রতন। কতকাল ডাকাতি করিয়াছ ?

মুন্না। কতকাল, তার কি স্থির আছে, কতস্থান তারও কি ঠিক আছে।

রতন। কালেরও যখন স্থিরতা নাই, স্থানেরও যখন স্থিরতা নাই, তখন আমার বোধ হয়, রাশি রাশি অর্থ দস্যুতায় উপার্জ্জন করিয়াছ ?

মুন্না। রাশি রাশি রাখিলে একটা রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারিত।

রতন। অবশ্য, সমস্ত অর্থ মনিবকেই তোমার দিয়াছ ?

মুন্না। আর কাকে দিব ঠাকুর! শুনিলেত, পথে মজুরি করিয়া দিনপাত করিতাম।

রতন। তা হ'লেত তোমার প্রভু ধনরাশির ঈশ্বর!

মুন্না। তা কেমন করিয়া বলিব।

রতন। সেটা অবশ্য ইচ্ছা করিলেই বলিতে পার।

মুন্না। আজ্ঞে প্রভু! তা বলিতে পারি না। অবশ্য ধনের খবর কখন লই নাই, কিন্তু কখনও ব্যবহার দেখি নাই। মনিব আমার হবিষ্যাশী, আর বেশত তাঁর স্বচক্ষেই দেখিয়াছেন। প্রভুর স্ত্রীকে দেখিলে বাড়ীর দাসী বলিয়াই বোধ হইবে, ঘরের সমস্ত কার্য্যই তাঁহাকে নিজ হাতে করিতে হয়। কন্যাকে দেখিয়াছেন! জামাতা সদাশিব, আপনাদের ওখানেই সামান্য সেপাইয়ের কার্য্য করেন।

রতন। তোমার মনিবের কোন পৈত্রিক সম্পত্তি আছে ?

মুন্না। আছে বিলক্ষণ। কিন্তু তাঁর সমস্ত জমীজমা আমরাই দখল করিয়া বসিয়া আছি।

রতন। তোমরা কে?

মুন্না। আমি আর আমার দল। অবশ্য, আমি এইখানেই থাকি। কিন্তু আমার শিষ্যসম্প্রদায় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সর্দারের। প্রায় পাঁচ হাজার লোক মনিবের জমার উপসত্ত্বে প্রাণধারণ করিয়া আছে।

রতনের অনুমানে শৈলজানন্দকে বুঝা বড় সহজ হইল না। একবার তাঁহাকে দস্যুপতি ভাবিয়া ঘৃণায় ব্রাহ্মণের ভ্রুকুঞ্চিত হইতে লাগিল, আবার পরক্ষণেই দেবতাবোধে তাহার প্রতি বীরজনোচিত শ্রদ্ধায় তাঁহার হৃদয় ভরিয়া যাইতে লাগিল। একবার মনে করিলেন, সরল-চিত্ত কোলগুলাকে ঘৃণিত দস্যুতায় প্রবৃত্ত করিয়া প্রতারণায় তার সমস্ত ফল আপনি উপভোগ করিতেছে। আবার তাঁহার বোধ হইল কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনকল্পে, দেবতাপ্রীত্যর্থ ফলাহরণের ন্যায় এই প্রহেলিকাময় বৃদ্ধ এই গুপ্ত অলকায় ধনসঞ্চয় করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে বড় বিলম্ব ছিল না। মুন্না বিস্ময়াবিষ্ট ব্রাহ্মণকে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিল। বলিল, বেলা যায়। এই সময়ে মন্দিরে প্রবেশ না করিলে কিছুই দেখিতে পাইবেন না।

চতুর্ব্বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

রতন মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; মুন্না প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

আলোক হইতে অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমে রতন কিছুই দেখিতে পাইলেন না। প্রবেশদ্বার ব্যতীত মন্দির মধ্যে আলোক প্রবেশের অন্য পথ ছিল না। উপরে অন্ধকার, চারিধারে অন্ধকার, সম্মুখে দুর্ভেদ্য শৈলের ন্যায় ঘনীভূত অন্ধকার, আগন্তুকের পথরোধ করিয়া, কতকালের কি যেন রত্নরাজি বক্ষপঞ্জরে লুকাইয়া, অবিকম্পিত ভাবে অবস্থিত রহিয়াছে।

রতন ভাবিলেন, এরূপ ঘনতম অন্ধকার সম্মুখে রাখিয়া, আর কতদূরই বা অগ্রসর হইব। কোথায় দেবতা? কিরূপেইবা তাঁর দর্শন পাই? আর এভাবে অন্ধকার নিক্ষিপ্ত করিয়া মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে, কোন উদ্দেশ্যে শৈলজানন্দ লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছে। রতন একবার মনে করিলেন, আর অগ্রসর হইবার প্রয়োজন নাই। শৈলজানন্দের গৃহদেবতা শৈলজানন্দেরই গৃহে বন্দিনী, আমি তাকে অন্বেষণ করিতে যাইয়া, অপঘাতে মরি কেন? আবার ভাবিলেন শৈলজানন্দের হাতে দেবতারই যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন অপঘাত ভিন্ন আমিই বা তাহার নিকটে আর কি প্রত্যাশা করিতে পারি?

রতন অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অন্ধকারে প্রতিপদে তাঁহার পদস্খলন হইতে লাগিল; তথাপি তিনি ফিরিলেন না। একবার মাত্র পশ্চাতে চাহিলেন। ভাবিলেন চক্ষু দুইটা আলোক-স্নাত করিয়া, আর একটু দর্শনের উপযোগী করিয়া লই। কিন্তু একি! মন্দির দ্বার যে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে!

ব্রাহ্মণ প্রথমে ব্যাপারটা ভাল বুঝিতে পারিলেন না। আর কেহ পাছে মন্দির দ্বার উন্মুক্ত দেখে, এই জন্য কি মুন্না বাহির হইতে কবাট বন্ধ করিয়া দিল! সশঙ্কচিত্তে ব্রাহ্মণ ডাকিলেন—"মুন্না!"—উত্তর পাইলেন না।

কেবল কতকগুলা প্রতিধ্বনি মন্দিরগোলকে প্রতিহত ও সমষ্টিবদ্ধ হইয়া তাহার কর্ণে শত গুণ শক্তিতে 'মুন্না' নাম প্রবিষ্ট করাইয়া দিল।

ব্রাহ্মণের সন্দেহ হইল। ভাবিলেন, এতদিন পরে একটা নির্ম্মম [illegible]স্যার আপ্যায়নে মুগ্ধ হইয়া,—তাহারই ছলনা বুঝিতে অসমর্থ। এই তমোময় কারাগৃহে, অনাহারে ভীষণ মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে জন্মের ত কি আবদ্ধ হইলাম! স্মরণেই তাঁহার বাক্যসমূহ [illegible]

একবার ঘন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন কি করিলাম! *নিজেই সচেষ্ট হইয়া নিয়তিকে আলিঙ্গন করিলাম!*

মুহূর্ত্ত মধ্যেই ব্রাহ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, ফিরিব না। যদিই শৈলজানন্দের মনে দুরভিসন্ধি না থাকে! তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্যই যদি বৃদ্ধ এই অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে!

মৃত্যুভয় মাথায় লইয়া রতন সম্মুখের অন্ধকার ভেদ করিতে চলিলেন,—পশ্চাতে ফিরিতে সাহসী হইলেন না।

ক্রমে যেন অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি চলিতে লাগিল; যেন একটী একটী করিয়া কত কি তাঁহার চোখের উপর পড়িতে লাগিল। রতন প্রথমেই দেখিলেন পার্শ্বের একটী প্রকোষ্ঠে ক্ষীণ আলোকে ঈষৎ আলোকিত রহিয়াছে।

এ গবাক্ষহীন মন্দিরমধ্যে এ স্নিগ্ধরূপজ্যোতি কোথা হইতে আসিল। মুগ্ধনেত্রে রতন চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মন্দিরগোলক হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাচীরমূল পর্য্যন্ত মন্দিরের সমস্ত গাত্র, বন্দুক ও তরবারি দ্বারা আচ্ছাদিত! দুই, দশ, সহস্র সহস্র অগণ্য অস্ত্র, মন্দির গাত্রস্থ দুই একটী ছিদ্র মধ্য দিয়া আগত, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত কিরণ রেখায় প্রতিফলিত হইয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে মন্দিরমধ্য আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তরবারির উপর তরবারি, বন্দুকের উপর বন্দুক—রতন দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ আত্মজ্ঞান-বিমোহিত স্থানুর ন্যায় নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্ষু পলকহীন, কেবল শৈলজানন্দের ধ্যানগম্য মূর্ত্তির সহিত এই অগণ্য অস্ত্রগুলির সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু পারিল না—এ সমস্ত জীবনাশী আয়ুধের ভিতরে বৃদ্ধের ভীম-ভৈরব মূর্ত্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না।

আলোক অল্পে অল্পে স্থানচ্যুত হইতেছিল, আবার অন্ধকারে—গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত হইবার ভয়ে ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন।

এখানে তিনি মণিবেদিকার উপরে, রত্নমণ্ডিত আসনে রত্নকমলে অষ্টভুজা নিরীক্ষণ করিলেন। মহাকালের হৃদয়আসন পরিত্যাগ করিয়া, তৎপার্শ্বে অর্দ্ধশায়িতা অষ্টভুজে স্বহৃদয় আবদ্ধ করিয়া দেবী যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন।

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ, নির্নিমেষ-লোচনে, বহুক্ষণ ধরিয়া দেবীকে দেখিলেন, শক্তিময়ীর শ্যামলবরণদেহে রাশি রাশি ধূলি সঞ্চিত হইয়াছে, পার্শ্বে ধূলিধূসরিত কলেবরে মহাকাল নিদ্রালসচক্ষে শক্তিহীনা শক্তির মুখপানে চাহিয়া তার পাদস্পর্শ সুখাভিলাসের ইঙ্গিত করিতেছেন।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার আবির্ভাব হইল। চক্ষে জল আসিল। কম্পিত, অশ্রুগদগদকণ্ঠে ব্রাহ্মণ একবার বলিয়া উঠিলেন—আনন্দময়ী! তোমার এ অবস্থা আজ কে করিল মা! জাগো মা! একবার জাগো! জাগিয়া আর একবার তোমার ভক্তের পূজা গ্রহণ কর। নহিলে বিশ্বনাশিনী নিদ্রা সংক্রামকত্বে ভুবন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। যেন্ মন্ত্রে জগৎ প্রবুদ্ধ হয়, কৃপাময়ী, একটীবার জাগিয়া সেই মূলমন্ত্রের আভাস দাও। তোমার ভক্ত তাহা হইলে তোমার পূজা করিবার অবকাশ পায়।

কৃপাময়ী জাগিলেন না, ব্রাহ্মণের অলক্ষ্যে আঁধার-অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণও অন্ধকারে পথ হারাইবার ভয়ে, প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইতে চলিলেন।

বাহিরে আসিতে দেখিলেন প্রকোষ্ঠের আর একটী দ্বার

একবার ঘন বিকম্পিত হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন কি করিলাম! নিজেই সচেষ্ট হইয়া নিয়তিকে আলিঙ্গন করিলাম!

মুহূর্ত্ত মধ্যেই ব্রাহ্মণ প্রকৃতিস্থ হইলেন। মনে মনে স্থির করিলেন, ফিরিব না। যদিই শৈলজানন্দের মনে দুরভিসন্ধি না থাকে! তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্যই যদি বৃদ্ধ এই অভাবনীয় উপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে!

মৃত্যুভয় মাথায় লইয়া রতন সম্মুখের অন্ধকার ভেদ করিতে চলিলেন,—পশ্চাতে ফিরিতে সাহসী হইলেন না।

ক্রমে যেন অন্ধকারে তাঁহার দৃষ্টি চলিতে লাগিল; যেন একটী একটী করিয়া কত কি তাঁহার চোখের উপর পড়িতে লাগিল। রতন প্রথমেই দেখিলেন পার্শ্বের একটী প্রকোষ্ঠে ক্ষীণ আলোকে ঈষৎ আলোকিত রহিয়াছে।

এ গবাক্ষহীন মন্দিরমধ্যে এ স্নিগ্ধরূপজ্যোতি কোথা হইতে আসিল। মুগ্ধনেত্রে রতন চারিদিক চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মন্দিরগোলক হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রাচীরমূল পর্য্যন্ত মন্দিরের সমস্ত গাত্র, বন্দুক ও তরবারি দ্বারা আচ্ছাদিত! দুই, দশ, সহস্র সহস্র অগণ্য অস্ত্র, মন্দির গাত্রস্থ দুই একটী ছিদ্র মধ্য দিয়া আগত, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের লোহিত কিরণ রেখায় প্রতিফলিত হইয়া, মুহূর্ত্তমধ্যে মন্দিরমধ্য আলোকিত করিয়া তুলিয়াছে। তরবারির উপর তরবারি, বন্দুকের উপর বন্দুক—রতন দেখিয়া বিস্ময়-বিমুগ্ধ আত্মজ্ঞান-বিমোহিত স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াইয়া রহিলেন। চক্ষু পলকহীন, কেবল শৈলজানন্দের ধ্যানগম্য মূর্ত্তির সহিত এই অগণ্য অস্ত্রগুলির সামঞ্জস্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু পারিল না—এ সমস্ত জীবনাশী আয়ুধের ভিতরে বৃদ্ধের ভীম-ভৈরব মূর্ত্তির চিহ্ন পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাইল না।

আলোক ক্রমে ক্রমে স্থানচ্যুত হইতেছিল, আবার অন্ধকারে— গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত হইবার ভয়ে সত্বর দ্রুতপদে সম্মুখস্থ প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন।

এখানে তিনি মণিবেদিকার উপরে, রত্নমণ্ডিত আসনে রত্নকমলে অষ্টভুজা নিরীক্ষণ করিলেন। মহাকালের হৃদয়আসন পরিত্যাগ করিয়া, তৎপার্শ্বে অর্দ্ধশায়িতা অষ্টভুজে স্বহৃদয় আবদ্ধ করিয়া দেবী যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূতা ছিলেন।

পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণ, নির্নিমেষ-লোচনে, বহুক্ষণ ধরিয়া দেবীকে দেখিলেন, শক্তিময়ীর শ্যামলবরণদেহে রাশি রাশি ধূলি সঞ্চিত হইয়াছে, পার্শ্বে ধূলিধূসরিত কলেবরে মহাকাল নিদ্রালসচক্ষে শক্তিহীনা শক্তির মুখপানে চাহিয়া তার পাদস্পর্শ সুখাভিলাসের ইঙ্গিত করিতেছেন।

দেখিয়া ব্রাহ্মণ স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে এক অননুভূতপূর্ব্ব বেদনার আবির্ভাব হইল। চক্ষে জল আসিল। কম্পিত, অশ্রুগদগদকণ্ঠে ব্রাহ্মণ একবার বলিয়া উঠিলেন—আনন্দময়ী! তোমার এ অবস্থা আজ কে করিল মা! জাগো মা! একবার জাগো! জাগিয়া আর একবার তোমার ভক্তের পূজা গ্রহণ কর। নহিলে এ বিশ্বনাশিনী নিদ্রা সংক্রামকত্বে ভুবন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে। কোন্ মন্ত্রে জগৎ প্রবুদ্ধ হয়, কৃপাময়ী, একটীবার জাগিয়া সেই মূলমন্ত্রের আভাস দাও। তোমার ভক্ত তাহা হইলে তোমার পূজা করিবার অবকাশ পায়।

কৃপাময়ী জাগিলেন না, ব্রাহ্মণের অলক্ষ্যে আঁধার-অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণও অন্ধকারে পথ হারাইবার ভয়ে, প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইতে চলিলেন।

বাহিরে আসিতে দেখিলেন প্রকোষ্ঠের আর একটী দ্বার রহিয়াছে।

কোন আলোকময় স্থানে উপস্থিত হইবার আশায়, তিনি সেই দ্বার খুলিলেন। দেখিলেন দ্বারদেশে মুন্না দাঁড়াইয়া।

"এ আমায় কি দেখাইলে মুন্না!"

"কি দেখিলে দেবতা!"

"কেন, তুমি কি দেখ নাই?"

"কেমন করিয়া দেখিব! এ মন্দিরে প্রবেশ করিবার আমার অধিকার কই!"

"কি আছে, মনিবের কাছেও কি কখন শুন নাই!"

"কখন জিজ্ঞাসাও করি নাই। মনিবও উপযাচক হইয়া আমাকে কিছু বলেন নাই।"

"তোমরা কি কি অস্ত্র লইয়া ডাকাতি করিতে?"

"কেবল লাঠী।—তবে, বাঙ্গালায় ডাকাতী করিতে যাইলে, কখন কখন বন্দুক ব্যবহারের অনুমতি পাইতাম।—আমিও আমার দশ জন শিষ্য বন্দুক ব্যবহার করিতাম।"

"সেই সুদূর বাঙ্গালায়ও ডাকাতী করিতে যাইতে?"

"অনেকবার গিয়াছি—ঢাকা, ময়মনসিং, রাজসাহী—আমরা কোথায় না গিয়াছি দেবতা! আমার প্রভু বলিতেন, বাংলার জমীদারের মত অপদার্থ জীব জগতে আর নাই। কোন সৎকার্য্যে স্বেচ্ছায় তাহারা অর্থব্যয় করিতে জানে না। তাহাদের কাছে চোখ রাঙাইয়া অর্থ লইতে হয়, তাহাতেও না পাইলে প্রহার।"

"দেখ, আমার দেশের নিন্দা করিও না।—শুনিলে আমার কষ্ট হয়।"

"মাপ্ করুন দেবতা! আর বলিব না।"

"তোমরা বন্দুক ছুঁড়িতে জান?"

"বন্দুক কি? আমার অধীনে হাজার লোক কামান ছুঁড়িতে শিখিয়াছে।"

"কামান আছে ?"

"আমি পঞ্চাশটা কামানের ব্যবহার করিয়াছি।

"সে কামান কোথায় ?"

"তা জানিনা।"

"এখনও কি তোমরা কামান ছোঁড় ?"

"কামান ছোঁড়া, বন্দুক ছোঁড়া, ডাকাতা—সব এক সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়াছি।"

"কেন পরিত্যাগ করিয়াছ, বলিতে পার না ?"

"কেমন করিয়া বলিব প্রভু;—তবে একবার প্রভুকে কামান বন্দুকের কথা জিজ্ঞসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিয়াছিলেন, আমার জীবনে আর তার প্রয়োজন হইবে না। এখন ইংরাজ আমাদের রাজা। রাজ্যে আইন আসিয়াছে।"

রতন আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। মন্দিরদ্বার হইতে কতকগুলি অপ্রশস্ত সোপান, একটী অনতিবৃহৎ পুষ্পোদ্যানে নামিয়া গিয়াছে। রতন সেই সোপানাবলীর সাহায্যে উদ্যানে উপনীত হইলেন। দেখিলেন উদ্যান, এখন যত্নের অভাবে একটী ক্ষুদ্র অরণ্যে পরিণত।

যাহাকে বুঝিবার নয়, তাহাকে বুঝিতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তোমার পার্শ্বে বসিয়া কেহ আজীবন হাসিয়া চলিয়া গেল; যাতনার তীব্র কষাঘাতে জর্জরিত তুমি চিরদিন ঈর্ষার সহিত তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিলে. কিন্তু হায়! এক দিবসের জন্যও তুমি বুঝিতে পারিলে না যে, সে অভাগা তোমা অপেক্ষা কি গভীরতর যাতনায় জর্জরিত। সাধুতার আদর্শ তোমাকে আত্মীয়তায় বরণ করিতে আসিয়া, কতদিন তোমার নিকট হইতে ঘৃণার সহিত দূরীভূত হইয়াছে; তুমি শতচেষ্টা করিয়াও তাহাতে সাধুতার চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পাও নাই। যে ধরা দিবার নয়, সে তোমাকে কিছুতেই ধরা দিবে না। এইরূপ দর্শনবিজ্ঞানের অভাবে

প্রেমিকে কঠোরতা, অসাধুতে ন্যায়নিষ্ঠা, জ্ঞানীতে মূর্খতা, যে প্রকৃতি যাহার নয়, তাই দেখিয়া কতকাল হইতেই না আমরা প্রবঞ্চিত হইয়া আসিতেছি! রতন মনে মনে স্থির করিলেন, শৈলজানন্দ যা আছে তাই থাক্, আমি আর তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করিব না।

পঞ্চবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দেবীদর্শন করিয়া রতন বরাবর শৈলজানন্দের কাছে উপস্থিত হইলেন, মুন্না তাঁহাকে একটি গোশালায় লইয়া গেল। সন্ধ্যার পর শৈলজানন্দ এই স্থানেই থাকিতেন। থাকিয়া গোসেবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন।

এই স্থানেই তিনি ব্রাহ্মণের সেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোশালার মধ্যে একখানি আটচালা। আটচালার চারিদিক খোলা। মধ্যে বসিয়াই চতুর্দ্দিকের গোগৃহগুলি দেখিতে পাওয়া যায়, এই আটচালাতেই শৈলজানন্দ দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। সর্ব্বদাই এখানে থাকিতেন বলিয়া শৈলজানন্দ স্থানটীকে একটী আশ্রমের ন্যায় করিয়া রাখিয়াছিলেন। আটচালা বেড়িয়া সমশীর্ষ অসংখ্য বকুল বৃক্ষ বৃত্তাকারে অবস্থিত। গ্রীষ্মকালে তাহার তলদেশে গোরুগুলা আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রৌদ্রের তেজ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে, এইজন্য শৈলজানন্দ নিজেই বৃক্ষগুলি রোপন করিয়াছিলেন। এখনও সেগুলি বেশি বড় হয় নাই। তাহারই একটীর তলদেশে দুই খানি চৌকী পাতিয়া শৈলজানন্দ রতনের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়াছিলেন।

রতনকে একখানি চৌকীতে বসাইয়া শৈলজানন্দ নিজে অপর খানিতে উপবিষ্ট হইলেন।

শৈ। তামাকু সেবন করা হয়?

র। বিশেষ রকমই করা হয়। বিশেষতঃ তোমার মন্দির দেখিয়া, তামাকুর পিপাসাটা বড়ই বাড়িয়াছে।

শৈ। একটু ভয় বোধ হয় হইয়াছিল?

র। একটু কেন—প্রথমে বিশেষ রকমই হইয়াছিল।

মুন্না কাছে দাঁড়াইয়াছিল,—শৈলজানন্দ তাহাকে স্থানত্যাগের ইঙ্গিত করিলেন, আর বলিলেন, শীঘ্র তামাকু লইয়া আসিতে বল্। আদেশমাত্র মুন্না স্থান ত্যাগ করিল।

ব্রাহ্মণ বলিতে লাগিলেন—"প্রথমে বিশেষ রকমেরই ভয় হইয়াছিল। মনে হইয়াছিল, বুঝি সেখানে জন্মের মতই থাকিতে হয়।"

শৈ। আপনার ছোটনাগপুরে আর কি ফিরিবার ইচ্ছা আছে?

র। ইচ্ছা নাই। কিন্তু বোধ হয় ফিরিতে হইবে।

শৈ। ফিরিতেই হইবে—আমার বোধ হয় তীর্থ আপনার ভাল লাগিবে না।

র। তুমি কি কখন তীর্থে গিয়াছিলে?

শৈ। কখন না। যাইবার একান্ত কামনা ছিল, কিন্তু ঠাকুর, এ জীবনে তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

র। কেন? মিছামিছি এ আত্ম-নিষ্পীড়নে ফল কি?

শৈ। তীর্থের পথ ত প্রস্তুত করিতে পারিলাম না।

র। তুমি কি তার জন্য আক্ষেপ কর?

শৈ। এক এক সময় আক্ষেপ হয় বই কি। তবে অনেক সময় মনকে প্রবোধ দিই, তাহাকে বুঝাই, আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, তীর্থের পথ আমি প্রস্তুত করিতে পারি, আমার সেরূপ শক্তি কই?

র। আক্ষেপ করিওনা—তোমার অন্ধকারের আয়োজন যদি অন্ধকারেই মিলাইয়া যায়, তাহাতেও আক্ষেপ করিবার কিছুই নাই। কার্য্য কর তুমি, কিন্তু ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণ।

ভৃত্য একটী নূতন হুঁকায় জল করিয়া, নূতন কলিকায় তামাকু সাজিয়া রতনের হাতে দিল। রতন তামাকু টানিতে প্রবৃত্ত হইলে, সে তাঁহার পা ধুইয়া দিল। শৈলজানন্দ বলিলেন "তামাকু সেবন

করিয়া আটচালায় বসিবেন, সেখানে সন্ধ্যাবন্দনাদির আয়োজন করিয়া রাখিয়াছি। আমি একবার বাটীর মধ্য হইতে ঘুরিয়া আসি”—এই বলিয়াই শৈলজানন্দ উঠিলেন। রতন বলিলেন—“আজ রাত্রির মধ্যে আর দেখা হইবে কি ?”—রতন বুঝিয়াছিলেন, গভীর মর্ম্মবেদনায় শৈলজানন্দ স্থানত্যাগ করিতেছে। ‘হয়ত বৃদ্ধ আর ফিরিবেনা।

শৈলজানন্দ হাসিয়া বলিলেন—ফিরিব বইকি ঠাকুর! আজ জীবনে প্রথম অতিথিসৎকার করিতেছি, ফিরিব না!

র। তবে এস। কিছু মনে করিও না, তোমাকে ছাড়িতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। আমি তোমাকে যতক্ষণ না দেখিয়াছি, ততক্ষণ কেবল তোমার উপর রাগ করিয়াছি।

শৈলজানন্দ উত্তর করিলেন না—চলিয়া গেলেন।

ব্রাহ্মণ তামাকু টানিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময় ছেলের হাত ধরিয়া তুলসী আসিল।

র। কি মা তুলসী, এখানে যে ?

তু। নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছি।

র। কতদিন পরে ?

তু। কতদিন, তা মনেই নাই। প্রায় দশবৎসর এখানে আসি নাই। এস্থান পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। কিন্তু কিরূপ ছিল, স্মরণে আসিতেছে না। এই সমস্ত বকুল গাছ তখন দেখি নাই।

র। এই এতকালের মধ্যে মা বাপের সঙ্গেও কি তোমার সাক্ষাৎ হয় নাই ?

তু। মা লুকাইয়া লুকাইয়া আমাকে দেখিয়া আসিতেন। বাবাকে একদিনের জন্যও দেখি নাই। দেখিতে পাব এ আশাও ছিল না। শুধু আপনার কৃপায় তাঁহাকে আবার দেখিতে পাইলাম। কিন্তু প্রভু, আসিয়া কি দেখিলাম! কাঞ্চনমন্দিরের চূড়া হেলিয়া পড়িয়াছে। দু’দিন

পরে আসিলে বুঝি আর দেখিতে পাইতাম না! বলিতে বলিতে তুলসী কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণের আঁখি ভিতিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, শৈলজানন্দ সম্বন্ধে আর কোনও কথা কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিবেন না। কিন্তু এই পিতৃবৎসল রমণীর কথায় তিনি বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইলেন। তাঁহার পিতার সম্বন্ধে দুই একটা কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

র। পিতার কাছে কি এমন অপরাধ করিয়াছিলে তুলসী, যে দশ বৎসর পিতার নিকট হইতে তাড়িতা রহিয়াছ?

তু। অপরাধত কিছুই জানিনা দেবতা।

র। অপরাধ জানিলেনা, তথাপি তুমি তাড়িতা হইলে?

তু। অজ্ঞানে কি অপরাধ করিয়াছিলাম, তাহা কেমন করিয়া বলিব। একদিন প্রভাতে শয্যা হইতে তুলিয়া, পিতা আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলেন। বলিলেন, 'যদি আমার কন্যা হও, তাহা হইলে স্বামীর সঙ্গে এখনি আমার গৃহত্যাগ কর। যতদিন তোমাকে নিজে না আনিতে যাই, ততদিন এগৃহে পদার্পণ করিও না। আমি মরিলেও আসিও না।'

র। পিতা কি তোমাকে ভালবাসিতেন না?

তু। আমাকে একদণ্ড না দেখিলে থাকিতে পারিতেন না।

র। তোমার স্বামীর প্রতি কি তাঁহার ক্রোধ হইয়াছিল?

তু। ক্রোধের কারণত কখন দেখি নাই। স্বামীও আমাকে কখন কিছু বলেন নাই। আর কয়দিনই বা তাঁহার সহিত আমার কথা হইয়াছে। বিবাহের দশদিন পরেই তিনি আমাকে শ্বশুরের ঘর আগলাইতে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এ দশ বৎসরের মধ্যে তাঁহার সহিত আমার আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

র। তোমার শ্বশুর কি তখন জীবিত ছিলেন?

তু। শ্বশুরও ছিলেন, সংশাশুড়ীও ছিলেন। কিন্তু স্বামীর গৃহত্যাগের এক বৎসরের মধ্যে দুইজনেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। মা আমাকে এই শিশুটি দিয়া গিয়াছেন। ভাগ্যে এটীকে পাইয়াছিলাম, তাই আজিও জীবনধারণ করিয়া আছি।

বালক এতক্ষণ কি জানি কেন চুপ করিয়াছিল। আর স্থির থাকিতে পারিল না। মায়ের আঁচল ধরিয়া টানিল—বলিল 'বাড়ী চল্।'

র। আর তুমি বাড়ী যাইতে পাইবে না। এই এখন তোমাদের বাড়ী।

বালক রতনের উপর হাত উঠাইল—বলিল "মার্‌বো।" রতন বলিলেন—"মারই আর যাই কর, তোমাকে আর ছাড়িয়া দিতেছি না। বালক তুলসীকে ছাড়িয়া, ছুটিয়া রতনের হাত ধরিল। তুলসী বলিল—"ছি! উনি আমাদের গুরু। ওঁর গায়ে হাত তুলিতে নাই! উনি ঠিক বলিয়াছেন।

রতন বালককে কোলে টানিয়া লইলেন। আর বলিলেন তোমার যেমন মা আছে, তোমার মায়েরও সেই রকম মা আছে। তুমি মাকে একদণ্ড ছাড়িতে পার না। তোমার মাই বা তার মাকে ছাড়িয়া থাকিবে কেন?—

বালক কথা বুঝিল না। ছল ছল নেত্রে তুলসীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। তুলসী বলিল "না তা কেন? তুমি এখানেও থাকিবে, সেখানেও থাকিবে।"

এই সময় মুন্না আসিয়া তুলসীকে বলিল—"প্রভু তোমাকে ডাকিতেছেন।" তুলসী বালককে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ীর ভিতরে চলিল। রতনও সান্ধ্যকৃত্যসমাপন করিতে উঠিলেন।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

গীতার জ্ঞানযোগ।

ভগবদ্গীতা জ্ঞান-কর্ম্ম-ভক্তি-সমন্বিত একটী সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মচিত্র আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছেন। জ্ঞানযোগ হইতে গীতার আরম্ভ—কর্ম্মযোগ উঁহার শেষ কথা, কেননা অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করাই গীতা শাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে তিনি কাহাকে প্রাধান্য দিতে চাহেন, এ বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ জন্মিতে পারে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের একস্থানে বলা হইয়াছে—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধি যোগাৎ ধনঞ্জয়
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফল হেতবঃ। ৪৯

অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ (জ্ঞানযোগ) হইতে কর্ম্ম অনেক নিকৃষ্ট, অতএব জ্ঞানযোগের শরণাপন্ন হও। যাহারা সকাম কর্ম্মী তাহারা নিকৃষ্ট।

জ্ঞানকর্ম্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভগবদুক্তি যাহা আছে অর্জ্জুনের বুদ্ধিতে তাহা 'ব্যামিশ্র' বলিয়া বোধ হইল, তাই প্রশ্ন করিলেন—

"যদি তোমার মতে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে হে কেশব, আমাকে এই অঘোর কর্ম্মে কেন নিযুক্ত করিতেছ?" $\frac{৩}{১-২}$

এই প্রশ্নের উত্তরে পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে ভগবান জ্ঞান কর্ম্মের তারতম্য ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে মীমাংসা করিয়া দিলেন।

সে সম্বন্ধ এই যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ করাই মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য, কর্ম্ম তাহার সাধন। তত্ত্বজ্ঞান কিনা ব্রহ্মজ্ঞান, "পরা বিদ্যা", যে বিদ্যা দ্বারা সেই অবিনাশী সত্য-স্বরূপকে জানা যায়। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধি-

লাভ করা যায় না। যিনি তাহা লাভ করিয়াছেন তিনি কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্ত হয়েন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী শ্লোক হইতে এ বিষয়ে গীতার উপদেশ সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে ৬

যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণ মুচ্যতে। ৩

যে মুনি (জ্ঞান) যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, কর্ম্মই তাঁহার সহায়, যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, শম অর্থাৎ নিবৃত্তিই তাঁহার সহায়।

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে

তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতে। ৪

ইহলোকে জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র বস্তু আর নাই; যোগসিদ্ধ পুরুষ কালক্রমে সেই জ্ঞান আপনাতে লাভ করেন। জ্ঞানেতেই কর্ম্মের পরিসমাপ্তি—

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ

সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে। ৪৩

দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। হে পার্থ, জ্ঞানেতে সকল কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয়।

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নি র্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন

জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা। ৪৭

যেমন প্রজ্বলিত হুতাশন কাষ্ঠরাশি ভস্মাবশেষ করে, সেইরূপ জ্ঞানাগ্নি সমুদয় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।

এই সমস্ত শ্লোকের ভাবার্থ এই—যে জ্ঞান লক্ষ্য—কর্ম্ম সোপান—নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি করিয়া জ্ঞানমঞ্চে আরোহণ করিতে হইবে। যিনি তথায় আরূঢ় হইয়াছেন তাঁহার আর কর্ম্ম নাই।

কি উপায়ে এই জ্ঞানলাভ করা যায় ? গীতা উপদেশ দিতেছেন—

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ

যিনি শ্রদ্ধাবান্, নিষ্ঠাবান্ ও সংযতেন্দ্রিয় তিনিই এই জ্ঞানলাভ করেন। তৎপর :—কিনা ঈশ্বরপরায়ণ, ভগবদ্ভক্ত। ভক্তি বিনা জ্ঞানের সার্থকতা হয় না, যিনি যথার্থ জ্ঞানী তিনি ভগবদ্ভক্ত না হইয়া থাকিতে পারেন না। সেইজন্য গীতায় ভগবানের ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। জ্ঞানী ভগবান্‌কেই প্রীতি করেন এবং ভগবান্‌ও জ্ঞানীর প্রতি সদাই প্রসন্ন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী ব ভরতর্ষভ
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত এক ভক্তি,র্বিশিষ্যতে
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনো হত্যর্থমহং সচ মম প্রিয়ঃ ৭/১৬-১৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! চতুর্ব্বিধ পুণ্যাত্মা আমাকে ভজনা করেন—দুঃখার্ত্ত, অর্থপ্রার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী; ইহাদের মধ্যে অনন্যভক্তিপরায়ণ যোগযুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীর একান্ত প্রিয়, জ্ঞানীও আমার প্রিয়।

গীতা জ্ঞানমার্গাবলম্বী, সুতরাং বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের পক্ষপাতী নহেন। গীতার মতে কাম্যকর্ম্ম নিকৃষ্ট—কৃপণাঃ ফলহেতবঃ। জ্ঞানবাদীরা কর্ম্মকাণ্ডময় বেদের বিরোধী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্ম বন্ধনকারিতা, জীবহিংসাদি অশেষ দোষের আকর, অতএব কর্ম্মত্যাগই প্রকৃষ্ট পন্থা। গীতা ও কর্ম্মাসক্তির নিন্দা করিয়াছেন এবং কর্ম্মবাদীদিগের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়া কর্ম্মযোগের প্রারম্ভেই বলিতেছেন :—

যা মিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং
ক্রিয়া বিশেষ বহুলাং ভোগৈশ্বর্য্য ফলং প্রতি
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃত চেতসাং
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে। $\frac{২}{৪২-৪৪}$

অবোধ যে বেদবাক্যে দৃঢ় বাঁধি হিয়া,
আর কিছু নাই বলি' রহে আঁকড়িয়া,
স্বর্গ সুখ একমাত্র পুরুষার্থ জ্ঞান,
স্বর্গ গমনায় সব বাহ্য অনুষ্ঠান;
বহুক্রিয়া কর্ম্মকাণ্ড করিয়া সাধন,
ভোগৈশ্বর্য্য প্রলোভনে হয় নিমগন;
কর্ম্মফল জন্মবন্ধ নাহি ঘুচে যার,
নানামতে ভ্রান্তমত করয়ে প্রচার।
তাদের মুখেতে কত পুষ্পিত বচন,
শুনিতে যেমন মিষ্ট বিষাক্ত তেমন,—
এ হেন বচনে ভুলে যেই মূঢ়মতি,
কামনা-আসক্ত-চিত, ভোগৈশ্বর্য্যে রতি,
কাম-কামী এরা সবে অনিশ্চিত বুদ্ধি,
কেমনে লভিবে বল সমাধির সিদ্ধি।

এইরূপ নিন্দাবাদের পর শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন যে, বেদ সকল "ত্রৈগুণ্য বিষয়" অর্থাৎ সংসার প্রতিপাদক; তুমি বেদকে অতিক্রম করিয়া "নিস্ত্রৈগুণ্য" হও অর্থাৎ সংসারাসক্তি পরিত্যাগ কর। যখন "ত্রৈগুণ্য বিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" বলিয়া ভগবান্ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন, তখন বেদ শব্দের অর্থ কর্ম্মকাণ্ড বুঝিতে হইবে। কিপ্রকারে ত্রৈগুণ্য অতিক্রম করিতে পারা যায়—শ্লোকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে তাহা কথিত হইতেছে। "(ভব) নির্দ্বন্দ্বো নিত্য

সত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্”—তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও অর্থাৎ মানাপমান, সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্বভাব রহিত হও। নিত্য সত্ত্বস্থ—সত্ত্বগুণাশ্রিত হও। যোগক্ষেম রহিত অর্থাৎ উপার্জ্জন রক্ষণ ভাবনাদি পরিত্যাগ কর এবং আত্মবান্ কিনা অপ্রমত্ত হও।” কেন না,

যাবানার্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ। ৪৬

এই শ্লোকের নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আছে, তন্মধ্যে বঙ্কিম বাবু তাঁহার গীতাভাষ্যে যেরূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাই আমার সঙ্গত বোধ হয়। সে অর্থ এই যে, সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, ব্রহ্মজ্ঞানীর সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই থাকেনা। যখন সকল স্থানই জলপ্লাবিত, ঘরে বসিয়াও জল পাওয়া যায়, তখন বাপী কূপাদিতে কেন যাইবে? তেমনি যে ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে বেদে অর্থাৎ কর্ম্মকাণ্ড বেদে আর কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে পুনর্ব্বার এই নিস্ত্রৈগুণ্য তত্ত্বের বিচার চলিতেছে। অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে বাসুদেব! মনুষ্য কি আচার সম্পন্ন হইলে ত্রিগুণ অতিক্রম করিতে সমর্থ হন? নিস্ত্রৈগুণ্যের লক্ষণ কি?

তাহার উত্তর—

গুণেই গুণের কার্য্য জানিয়া নিশ্চিত
উদাসীন সুখে দুখে, নহে বিচলিত,
সুখ দুঃখ, লোষ্ট্র খণ্ড; কাঞ্চন পাষাণ,
স্তুতিনিন্দা প্রিয়াপ্রিয় তুল্য যার জ্ঞান,
ভেদাভেদ নাহি জানে শত্রু মিত্র পক্ষে,

সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগী হইবে যখন,
তখন ত্রিগুণাতীত জানিবে সেজন।
অনন্য ভকতি যোগে যেজন সেবে আমায়,
হয়ে সর্ব্বগুণাতীত ব্রহ্মভাব সেই পায়। ২৩—২৬

যে জ্ঞানী সমাধিযোগে ঈশ্বরে স্থির বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাকে স্থিরপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। তিনিই গীতার আদর্শ জ্ঞানী। অর্জ্জুন এই স্থির প্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিলেন। যে কয়েকটী শ্লোকে ভগবান্ তাহার উত্তর দিতেছেন তাহা প্রণিধান যোগ্য।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোরথান্
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞঃ স উচ্যতে।
যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ স্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং
নাতি নন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা
যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ
ইন্দ্রিয়ানীন্দ্রিয়ার্থেভ্য স্তস্যপ্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। ২/৫৫—৫৮

সকল কামনা বিষয়বাসনা
ত্যজে সব তুচ্ছ গণি,
আপনি আপনে রহে তুষ্ট মনে
স্থির বুদ্ধি সিদ্ধ মুনি।
দুঃখে নহে ক্লিষ্ট, নহে সুখে হৃষ্ট,
স্পৃহাশূন্য নিরাময়,
কামনাবিহীন, ভয়ক্রোধহীন,
স্থিরবুদ্ধি তারে কয়।
স্নেহশূন্য ভবে আত্ম পরে সবে,
শুভাশুভ নির্ব্বিশেষ,

নাহি অতি হর্ষ, না হয় বিমর্ষ,
কারো না রাখে বিদ্বেষ।
কূর্ম্ম যথা নিজ অঙ্গ
কোষ মধ্যে করে সংহরণ,
তেমতি বিষয় হতে
ইন্দ্রিয়ে সংহরে প্রাজ্ঞজন।

স্থিরপ্রাজ্ঞ কাহাকে বলে তাহার উত্তর এই। যিনি মনোগত সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, আপনাতে আপনি তুষ্ট, সুখে যিনি স্পৃহাশূন্য, দুঃখে অনুদ্বিগ্নমনা, রাগ, ভয়, ক্রোধ যার নাই, যিনি সর্ব্বস্নেহশূন্য, জীবনাদির শুভাশুভে যাঁহার আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, এক কথায়, যিনি নিষ্কাম ও জিতেন্দ্রিয় তিনিই স্থিরপ্রাজ্ঞ—গীতার আদর্শ জ্ঞানী, সুখে স্পৃহাশূন্য হইবেক, দুঃখে কাতর হইবে না। কূর্ম্মের উপমাটী অতি সুন্দর। কূর্ম্ম যেমন কোষমধ্যে তাহার হস্ত পদাদি সংহরণ করিয়া রাখে, এবং আবশ্যক মতে জীবনের কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে সেইরূপ সংযম অভ্যাস করিয়া জীবনের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। ইন্দ্রিয়সংযম এবং ঈশ্বরে চিত্তার্পণ-পূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান, ইহাই যথার্থ ব্রহ্মনিষ্ঠা—এইরূপ নিষ্ঠাবান্ পুরুষই স্থিরপ্রাজ্ঞ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণ মৃচ্ছতি। ২।৭২

হে পার্থ! ইহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা; যিনি ইহা লাভ করিয়াছেন, তিনি কদাপি মোহে মুগ্ধ হন না। অন্তকালেও ইহাতে অবস্থিতি করিয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়েন।

ব্রহ্মজ্ঞান—

কেননা দ্বৈতাদ্বৈত উভয় তত্ত্বই এই গ্রন্থে পোষকতা লাভ করে। ইহা হইতে এই দ্বিবিধ মতের বচন সকল সংগ্রহ করা কঠিন নহে। আবার শ্লোকের অর্থ লইয়াও অনেক সময় মতভেদ দৃষ্ট হয়। অদ্বৈতবাদী অদ্বৈত পক্ষে, দ্বৈতবাদী দ্বৈত পক্ষে ইহার একই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের পক্ষে উহার সকল উপদেশই অদ্বৈতবাদে পরিণত করা সহজ; আবার শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যেরা অন্যভাবে গীতার অর্থ করিয়া থাকেন। আমার সহজ বুদ্ধিতে যাহা সোজা অর্থ বুঝিব তাহাই গ্রহণ করিব।

দ্বৈত অদ্বৈতবাদের বাদবিতণ্ডা যাহাই হউক, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, গীতা কোন সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। জ্ঞানী অজ্ঞান, পণ্ডিত মূর্খ, শ্রেষ্ঠ কনিষ্ঠ অধিকারী—সকলেই স্ব স্ব বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুসারে তাঁহার অগাধ ভাণ্ডার হইতে আধ্যাত্মিক অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকেন।

দ্বৈতাদ্বৈত সমালোচনা রাখিয়া সাকার উপাসনা সম্বন্ধে গীতার মনোভাব কি দেখা যাউক।

ভগবান্ বলিতেছেন—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং
>
> মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। ৪/১১

যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করি। মনুষ্য সর্ব্বপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ত্তী হয়। অর্থাৎ আমি যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে হইবে, কেননা এক ভিন্ন দেবতা নাই।

হে কৌন্তেয়! যাহারা শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে। আমার পূজার জন্য বহুবিত্তায়াসসাধ্য যাগ যজ্ঞাদির প্রয়োজন নাই,

ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে যে যাহা অর্পণ করে—ফল, জল, পত্র, পুষ্পাঞ্জলি, আমি তাহাই সাদরে গ্রহণ করি। ৯/২৩, ২৬।

ইহলোকে কেহ কর্ম্মসিদ্ধি কামনা করিয়া দেবগণের আরাধনা করে, (৪/১২) অন্য উপাসকেরা স্ব স্ব প্রকৃতির অনুগামী হইয়া অজ্ঞান-বশতঃ অন্য ক্ষুদ্র দেবতাদিগের আরাধনা করিয়া থাকে। (৭/২০)।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতু মিচ্ছতি
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহং। ৭/২১

যে কোন ভক্ত শ্রদ্ধা সহকারে যে কোন দেবতার অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহাকে সেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি।

যে, যে ভাবে আমার উপাসনা করে, তাহাকে সেইরূপ ফল দান করি। যে যাহা কামনা করিয়া আমার উপাসনা করে, আমি তাহার সেই কামনা পূর্ণ করি। কিন্তু যে সকল লোকে ফল কামনা করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে তাহারা অল্পবুদ্ধি—তাহাদের কাম্যফলও অন্তবৎ—ক্ষণস্থায়ী। দেবব্রত ব্যক্তিরা দেবলোকে, পিতৃব্রত ব্যক্তিরা পিতৃলোকে, ভূতসেবকেরা প্রেতলোকে গমন করে। আর যাহার অন্য কোন কামনা নাই, যে নিষ্কাম ভাবে আমাকে ভজনা করে, সে আমার পরমানন্দরূপ অক্ষয় পদ প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত (অতীন্দ্রিয়) যে আমি, নির্ব্বোধ মনুষ্যেরা আমার অব্যয় অনুত্তম স্বরূপ অবগত না হইয়া আমাকে ব্যক্ত ভাবাপন্ন মনে করে। আমি যোগমায়া অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হইয়া আছি, সকলের সমক্ষে প্রকাশমান হই না, এই নিমিত্ত মূঢ়েরা আমাকে জন্মহীন অব্যয় বলিয়া অবগত নয়। ৭/২১—২৫, ৯/২৫

অবক্তোঽক্ষর ইত্যুক্ত স্তমাহুঃ পরমাং গতিং
যং প্রাপ্য ননিবর্ত্তন্তে তদ্ধামপরমং মম। ৮/২১

অব্যক্ত অক্ষর সেই, জীবের পরম গতি,
পেলে যাঁরে একবার নাহি হয় অবনতি,

লভি যোগী পুণ্যস্থান সে মম পরম ধাম,
ফিরে নাহি আসে পুন, পুরে সর্ব্ব মনস্কাম।

এই সমস্ত অলোচনা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গীতার মতে সাকার উপাসনা নিন্দনীয় নহে। তবে কি গীতা সাকারবাদী? তাহাই বা কেমন করিয়া বলিব। তিনি যখন ঈশ্বরকে 'অব্যক্ত, অক্ষর' বলিয়া, 'সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন, যখন স্পষ্টই বলিতেছেন "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" (৯) আমি অতীন্দ্রিয়রূপে এই সমুদয় জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া আছি, তখন ঈশ্বর সাকার নহেন, গীতার মত ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে।

দ্বাদশাধ্যায়ে অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন—'নির্গুণোপাসক ও সগুণোপাসক ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোগী কে?'

উত্তরে ভগবান্ কহিলেন—

যাঁহারা আমাতে নিবিষ্টমনা ও নিত্যযুক্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক আমার উপাসনা করেন, তাঁহারাই যোগিশ্রেষ্ঠ। আবার যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন, সর্ব্বভূতহিতে রত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, ধ্রুব, সত্য সনাতন, অক্ষর পরব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হয়েন।

দেহাভিমানীরা অতিকষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত, তাহাদের অধিকতর দুঃখ ভোগ করিতে হয়। (১২)। এই সমস্ত উপাসকেরা কিরূপ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, তার সোপানপরম্পরা পরে বলিয়া দিতেছেন।

প্রথম, স্থিরতররূপে আমাতে চিত্ত সমাধান ও বুদ্ধি নিবেশ করিবে। যদি আমার প্রতি চিত্ত স্থির রাখিতে না পার, তাহা হইলে অভ্যাস যোগ দ্বারা একাগ্রতা সাধন করিতে হইবে।

যদি তাহাতেও অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির উদ্দেশে

অশক্ত হইলে সকল কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া সংযত চিত্তে আমার শরণাপন্ন হওয়া আবশ্যক। যাহারা আমার একান্ত শরণাপন্ন হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণপূর্ব্বক, অনন্যযোগে আমার ধ্যান ধারণা উপাসনায় নিযুক্ত হয়, আমি তাহাদিগকে অচিরাৎ এই মৃত্যুময় সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করি। $\frac{১২}{৭—১১}$

অতএব সাকার ও নিরাকার উপাসনা সম্বন্ধে গীতার মত এই—তাঁহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসকের উপাসনা তুল্য—ইহাদের মধ্যে কোনটাই নিষ্ফল নহে। ভক্তিই উপাসনার সার—ভক্তিশূন্য উপাসনা ভগবানের নিকট অগ্রাহ্য। ভক্তি-যুক্ত হইলে সাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূন্য হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসনা তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পায় না। যিনি একাগ্রচিত্তে অনন্তের ধ্যান ধারণায় সক্ষম এবং তাহাতে ভক্তিযুক্ত হইতে পারেন, তিনি নিরাকারেরই উপাসনা করুন। যিনি তাহা না পারেন, তাঁহাকে কাজেই সাকারের উপাসনা করিতে হইবে।*

সাকার উপাসনা বিষয়ে গীতার মত যাহা, দ্বৈতবাদ সম্বন্ধেও কতকটা সেইরূপ মনে হয়। গীতার মতে যেমন সাকার উপাসনা কনিষ্ঠ অধি-কারীর জন্য,—সেইরূপ আমার মনে হয় তাঁহার চক্ষে দ্বৈতবাদীও কনিষ্ঠ অধিকারী, অদ্বৈতবাদীই শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, জীবব্রহ্মে অভেদ-জ্ঞান, সাত্ত্বিক জ্ঞান, প্রভেদ-জ্ঞান, রাজসিক জ্ঞান। $\frac{১৮}{২০, ২১}$ জীবব্রহ্মের অভেদভাবই গীতোক্ত উপদেশের সারতত্ত্বরূপে প্রতীয়-মান হয়।

---

* বঙ্কিম চন্দ্র প্রণীত গীতা।

তাদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ
যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহ মেবং যাস্যসি পাণ্ডব
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাত্মন্যথো ময়ি। ৪/৩৪,৩৫

প্রণিপাত, প্রশ্ন ও সেবাদ্বারা জ্ঞান শিক্ষা কর, তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী তোমাকে তাহার উপদেশ দিবেন।

যে জ্ঞানলাভ করিলে তুমি আর এ প্রকার মোহে অভিভূত হইবে না; তুমি আপনাতে সমুদয় ভূতকে (অভিন্ন) এবং পরিশেষে পরমাত্মাতে আত্মাকে (অভিন্ন) দেখিবে।

সর্ব্বভূতস্থ মাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ
যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি সচ মে ন প্রণশ্যতি। ৬/২৯,৩০

যে ব্যক্তি যোগযুক্ত ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া আত্মাকে সর্ব্বভূতে ও সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দর্শন করে;

যে ব্যক্তি আমাতে সকল বস্তু ও সকল বস্তুতে আমাকে দর্শন করে, সে আমাকে হারায় না, আমিও তাহাকে বিস্মৃত হই না।

এই যে অভেদ জ্ঞান তাহা অতি দুর্লভ।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি—স মহাত্মা সুদুর্লভঃ

"বহুজন্ম পরে জ্ঞানবান্ ব্যক্তি "বাসুদেব সর্ব্ব" জ্ঞানলাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হয়েন; কিন্তু তাদৃশ মহাত্মা অত্যন্ত দুর্লভ। "বাসুদেব সর্ব্ব" জ্ঞান কি না জগৎ ব্রহ্মে একাত্ম জ্ঞান—অভেদ জ্ঞান।

সপ্তমাধ্যায় ও বিভূতি যোগাধ্যায়ে ভগবানের যে বিভূতি বর্ণনা

আছে তাহাতেও এই একাত্মভাব অভিব্যক্ত। ভগবান্ নিজ বিভূতি বর্ণনায় কহিতেছেন—

আমা হতে পরতর কোন ঠাঁই নাহি কিছু আর,
সবে আমা ওতঃপ্রোতে গাঁথা যথা সূত্রে মণি হার।
সলিলে আমিই রস, প্রভা আমি রবি শশি করে,
প্রণব বেদেতে, ব্যোমে শব্দ, পৌরুষ আমি নরে;
অনলেতে তেজ আমি, পৃথিবীতে আমি পুণ্যঘ্রাণ,
তপস্বীর তপোবল, সর্ব্বভূতে আমি হই প্রাণ।
আমি সর্ব্বভূত বীজ, সনাতন, জেন তাহা স্থির,
জ্ঞানীর আমিই জ্ঞান, তেজ আমি হই তেজস্বীর।

দশমাধ্যায়ে এই বিভূতি আরও বিস্তারিতরূপে বর্ণিত।

অর্জ্জুন—

পরব্রহ্ম পরম ধাম, আদি দেব পুণ্যনাম,
দিব্য পুরুষ সনাতন।
মহর্ষি দেবর্ষি নরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
স্বয়ং প্রকাশ নারায়ণ।
যাহা শুনি সত্য মানি, প্রভু সত্য তব বাণী,
বাখানিলে আপনি কেশব।
তব ব্যক্তি গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
নাহি জানে দেব কি দানব।
আছ নিজ মহিমায়, জান তুমি আপনায়,
ভূতভাবন মহেশ্বর।
বিভূতি তব অশেষ, কহ দাসে সবিশেষ,
ব্যাপ্ত যাহে বিশ্বচরাচর।

যোগৈশ্বর্য্য যাহা তব. বিভূতি বিচিত্র নব,
কৃপা করি কহ, জনার্দ্দন।
সে অমৃত যত শুনি, ইচ্ছা হয় আরো শুনি,
কিছুতেই তৃপ্ত নহে মন। ১২-১৮

শ্রীকৃষ্ণ—

কহিব বিভূতি মম, নাহি অন্ত, নাহি পরিমাণ,
না পারে বর্ণিতে কেহ, বলিব হে প্রধান প্রধান
পরমাত্মা সর্ব্বগত, আমি হে সবার অন্তর্যামী,
আমি আদি, আমি মধ্য, সকল জীবের অন্ত আমি।
আদিত্যের আমি বিষ্ণু, জ্যোতির্গণে আমি অংশুমান্,
মরীচি মরুতদলে, নক্ষত্রে সুধাংশু কান্তিমান্।
বেদে আমি সামবেদ, দেবগণে আমি হে বাসব,
ইন্দ্রিয় গণেতে মন, জীবকুলে চেতনা পাণ্ডব। ১৯-
মহর্ষির আমি ভৃগু, বচনেতে ওঁকার অক্ষর,
যজ্ঞে আমি জপযজ্ঞ, স্থাবরেতে হিমগিরিবর। ২৫
সাগর মন্থনজাত, উচ্চৈঃশ্রবা আমি হয়েশ্বর,
গজেন্দ্রে ঐরাবত, নরকুলে আমি নৃপবর। ২৭
সকল সৃষ্টির আমি, আদি অন্ত মধ্য, হে অর্জ্জুন,
বিদ্যায় অধ্যাত্মজ্ঞান, বাগ্মিদের বাদ সুনিপুণ।
সমাস সমূহে দ্বন্দ, অক্ষরের আমি হে অকার,
অমিই অক্ষয় কাল, বিশ্বমুখ বিধাতা সবার। ৩২-৩৩
আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভবিষ্যৎ কল্প মহাযোনি,
কীর্ত্তি, বাক্, শ্রী, ক্ষমা, মেধা, স্মৃতি, ধৃতি, দেবী-স্বরূপিনী।
সামবেদে বৃহৎসাম, গায়ত্রী ছন্দের ভিতর,
মাসে আমি মার্গশীর্ষ, ঋতুতে বসন্ত ঋতুবর। ৩৫

বৃষ্ণিবংশে বাসুদেব, পাণ্ডবে গাণ্ডীব ধনুর্ধর,
কবিকুলে শুক্রাচার্য্য, মুনিগণে ব্যাস মুনিবর। ৩৭

এত কথায় কাজ কি?

যা কিছু প্রভাব, বল, শ্রী, ঐশ্বর্য্য যুত,
মম তেজ অংশে তাহা সকলি সম্ভূত।
অথবা বাহুল্যে এতর্কবা প্রয়োজন?
একাংশে ব্যাপিয়া রহি সমগ্র ভুবন। ৪১-৪২

ভগবান্ আপন বিভূতি আপনাতে মিলাইয়া অর্জ্জুনের সমক্ষে প্রকাশিত হইলেন, সেই যে অভূতপূর্ব অপরূপ দৃশ্য তাহা একাদশাধ্যায়ে বর্ণিত।

দেখ পার্থ দেখ চেয়ে শতরূপ সহস্র প্রকার,
নানা বর্ণে বিভূষিত, জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র আকার।
দেখ সূর্য্য, বসু, রুদ্র, দেখ যুগ্ম অশ্বিনী কুমার,
কখন যা দেখ নাই, বহুরূপ, চিত্ত চমৎকার।
একত্রিত এক ঠাঁই সমুদয় বিশ্ব চরাচর,
দেখ যাহা ইচ্ছা তব, মম দেহে রহে স্তরে স্তর।
তোমার এ চর্ম্মচক্ষে এ দৃশ্য না আসিবে কখন,
দিব্য চক্ষু করি দান, হবে তাহে সুলভ দর্শন। ৫-৮

সঞ্জয়—

এত কহি, হে রাজন্, যোগেশ্বর হরি
প্রকাশিলা ধনঞ্জয়ে শ্রীমুর্ত্তি মাধুরী।
বহু মুখ, বহু নেত্র, অদ্ভুত দর্শন,
বহু দিব্য অস্ত্র-সজ্জা, দিব্য আভরণ,

দিব্য মাল্য গলদেশে, দিব্যাম্বরধর,
দিব্য গন্ধে সুবাসিত সর্ব্ব কলেবর।
অত্যাশ্চর্য্যময় দেব, অনন্ত, অব্যয়,
বিশ্বমুখ ব্যাপিয়া রহেন সমুদয়।
একত্রে সহস্র ভানু অমৃত কিরণে,
আলো করি দশদিক্ উদিলে গগনে,
সহস্র সহস্র রশ্মি দীপ্তি নাহি পায়
দেবের সে অতুলন প্রভার ছটায়।
দেব-দেব দেহে দেখে কিরীটি তখন
বহুরূপ ধরি শোভে নিখিল ভুবন। ১৪

অর্জ্জুন যখন এই বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়েন, তখন শ্রীকৃষ্ণ পুনর্ব্বার স্বীয় মানুষীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন।

এই এক চিত্র; আর একদিকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ আপনাকে পুরুষোত্তমরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। পঞ্চদশ অধ্যায়ে 'পুরুষ' তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—ক্ষর, অক্ষর, এবং ক্ষরাক্ষের অতীত, লোকত্রয় ভর্ত্তা, অবিনাশী পরমাত্মা

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষর শ্চাক্ষর এবচ
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে। ১৬

ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ লোকে প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে সমুদায় ভূতই ক্ষর এবং কূটস্থ পুরুষ অক্ষর।

উত্তমঃ পুরুষ স্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ
যো লোক ত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ।

ইহা ভিন্ন অন্য একটী উত্তম পুরুষ আছেন, তাঁহার নাম পরমাত্মা।

সেই অবিনাশী পরমেশ্বর এই লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন।

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং অক্ষরাদপি চোত্তমঃ
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ। ১৮

আমি ক্ষরের অতীত, অক্ষরেরও উত্তম, এই নিমিত্ত বেদ ও লোক-মধ্যে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিত।

এই তিনটী শ্লোক দ্বৈতবাদীদিগের বীজমন্ত্র স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এখানে জীবব্রহ্মের অভেদভাব নাই। ক্ষরাক্ষরের অতীত পরম পুরুষ আছেন, যিনি এই জড় ও চেতনশীল জগৎকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। জড়, জীব ও পরমাত্মা, এখানে এই তিন পৃথক্ সত্তাই স্বীকৃত হইয়াছে।

আর এক দিক্ দিয়া দেখা যায় যে, গীতার ধর্ম্ম ভক্তিপ্রধান ধর্ম্ম; যেখানে ভক্তি, সেখানে উপাস্যউপাসকের পরস্পর সম্বন্ধ—অন্য কথায়, দ্বৈতভাব অপরিহার্য্য। সে হিসাবে গীতাকে দ্বৈতবাদী বলা অসঙ্গত হয় না। গীতায় যেখানে জগৎ আর ঈশ্বর এক বলিয়া উল্লেখ আছে, দ্বৈতবাদীরা বলেন যে সেখানে ঈশ্বরের সহিত জগৎকে একীভূত করা গীতার উদ্দেশ্য নহে। "সাধক যখন ঈশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ও অপরিচ্ছিন্নতা এবং তৎসম্বন্ধে তাঁহার উপর জগতের একান্ত নির্ভর—এত নির্ভর যে ঈশ্বর যদি আপনাকে জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া লয়েন, তাহা হইলে জগতের কিছুই থাকে না—গাঢ়রূপে আলোচনা করেন এবং অত্যন্ত অনুভব করেন, তখন স্বভাবতঃ তাঁহার মুখ হইতে যে সকল বাক্য নিঃসৃত হয়, তাহা কতকটা অদ্বৈতবাদের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।"* দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, এই নামে সাম্প্রদায়িক ভাব আসিয়া পড়ে,

* ভগবদ্গীতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত।

তাই এ দুই নামের কোনটীই গীতার উপযুক্ত নাম নহে। আমার মতে গীতাধর্ম্মকে ঈশ্বরবাদ বলা যোগ্য। আমি সেই মতকে ঈশ্বরবাদ বলি, যাহার বিষয় নির্গুণ ব্রহ্ম নহে কিন্তু পরমপুরুষ পরমেশ্বর। ঈশ্বরের স্বরূপের দুই দিক আছে। এক দিক দিয়া দেখিলে তিনি অনির্দ্দেশ্য, অচিন্ত্য, অনন্তস্বরূপ ; নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা—তিনি বাক্য মনের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগোচর। অন্য দিকে জীব ব্রহ্মে অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। ভূত চরাচর ... 'অপরা প্রকৃতি'— জীবাত্মা 'পরা প্রকৃতি' ... তাহাতে ... বুঝা যাইতেছে যে পরমাত্মার সহিত ভূত চরাচর অপেক্ষা জীবাত্মার এক বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তিনি আমাদের উপাস্য দেবতা, আমাদের প্রীতি, ভক্তি, পূজা, অর্চনা গ্রহণ করিতেছেন ; তিনি আমাদের পিতা, মাতা ও সুহৃৎ ; তিনি পাপীর পরিত্রাতা, মুক্তিদাতা, "মহান্ প্রভুর্বৈ পুরুষঃ সত্ত্বস্যৈষ প্রবর্ত্তকঃ"— ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সকলের প্রভু, মহান্ পুরুষ। এ দুই ভাবই গীতায় অভিব্যক্ত। এই জন্য যদি কোন নাম দিতে হয়, তবে গীতাকে ব্রহ্মবাদী বা ঈশ্বরবাদী বলাই ঠিক। উহাতে এমন অনেক কথা আছে যাহা দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, উভয় পক্ষের লোকেই নিজস্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। এই ভাবের কতিপয় শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

জ্ঞেয় এক পরব্রহ্ম, বিভু বিশ্বাতীত,
সৎ বা অসৎ, যিনি দুয়েরই অতীত ;
সর্ব্বদিকে চক্ষু তাঁর, মস্তক, আনন,
সর্ব্বদিকে বাহু তাঁর, সর্ব্বত চরণ,
সর্ব্বত্র শ্রবণ তাঁর না কিছু লুকায়,
ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর স্বীয় মহিমায়।
যতেক ইন্দ্রিয় আর যাহার যে গুণ,
সবার ভিতরে জ্বলে তাঁহার আগুন ;

সত্ত্ব আদি গুণত্রয় পালিত তাঁ হতে,
অথচ নির্গুণ তিনি, নির্লিপ্ত জগতে।
ব্যাপ্ত বিশ্ব চরাচর, বাহির, অন্তর,
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্মতর, বুদ্ধি অগোচর;
দূর হৈতে দূরে তিনি ছড়ায়ে আকাশ,
তেমনি অন্তরে দেখ তাঁহারই প্রকাশ।
কারণ রূপেতে যেই অভিন্ন বিরাজে,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত জীবগণ মাঝে।
জগত জনন তিনি, জগত পালন,
তিনিই প্রলয়কালে সংহার কারণ;
সব জ্যোতিঃ জ্যোতিষ্মান্ তাঁহার প্রভায়,
তিমির অতীত সে যে অকলঙ্ক ভায়।
তিনি জ্ঞান, জ্ঞেয় তিনি, লভ্য হন জ্ঞানে,
সবার হৃদয় পূর্ণ তাঁর অধিষ্ঠানে। ১৩
১৩—১৮

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

———

আবেগ।

ঘুমঘোরে ছিনু অচেতন ;
সহসা কোকিলকণ্ঠ জানাইয়া দিল মোরে
বসন্তের শুভ আগমন।
নয়ন মেলিয়া দেখি—নভময় নবীনতা,
জগময় জীবন্ত হৃদয় !
উতলা মলয়ানিলে করিলাম অনুভব
যেন কা'র হারানো পরশ !

অতীতের অপক্লেশ—নিমেষের মাঝে যেন—
কোথাদিয়ে গেল মিলাইয়ে
প্রকৃতির পূর্ণতায় কি মদিরা করি' পান
শূন্য প্রাণ উঠিল ভরিয়ে।

হেরি' এ উৎসবে আজি উচ্ছসিত চারিদিকে
প্রীতিপূর্ণ শূন্যে, জলে, স্থলে,—
এ মোর ব্যাকুল হিয়া দিগ্বিদিক হারাইয়া
ডুবে' গেল অজ্ঞাত অতলে !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

———

কুমারজীব।

(খৃঃ ৩৫০—৪১২)।

কুমারজীব প্রাচীন ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক। ইনি অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল অনুবাদ-গ্রন্থ অদ্যাপি চৈনিক বৌদ্ধ ত্রিপিটকে বিদ্যমান আছে অনুবাদ-গ্রন্থ নিচয়ের ভূমিকায় কুমারজীবের সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিপিবদ্ধ আছে।

চীনভাষায় ইহাঁর নাম "থুঙ্-ষয়"। চীনগ্রন্থকারগণ কুমারজীব এই সংস্কৃত নাম "চিউ-মো-লো-ছি-ক" এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ভারতে কুমারায়ণ নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি তদানীন্তন কোন রাজার মন্ত্রী ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়া কুমারায়ণ গোবি মরুভূমির উত্তরে খরচর নামক রাজ্যে গমন করেন। সেই দেশের রাজার ভগিনী জীবার সহ কুমারায়ণের বিবাহ হয়। খরচর দেশে কুমারায়ণের ঔরসে ও জীবার গর্ভে কুমারজীবের জন্ম হয়। সাতবর্ষ বয়সে কুমারজাব বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি স্বীয় জননীর সহ কাবুলে (উদ্যান দেশে) আগমন করেন। তথায় তিনি বন্ধুদত্ত নামক সুবিখ্যাত বৌদ্ধ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন. যখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতা খরচর রাজ্যে প্রতিগমন করেন। কুমারজীবও ঐ সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। পথমধ্যে একজন অর্হতের সহ তাঁহার মাতার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কুমারজীবের মাতাকে বলিয়াছিলেন—"এই সামনের অর্থাৎ নবীন শ্রমণকে সাবধানে [illegible]

আবেগ।

ঘুমঘোরে ছিনু অচেতন ;
সহসা কোকিলকণ্ঠ জানাইয়া দিল মোরে
বসন্তের শুভ আগমন।
নয়ন মেলিয়া দেখি—নভময় নবীনতা,
জগময় জীবন্ত হরষ !
উতলা মলয়ানিলে করিলাম অনুভব
যেন কা'র হারানো পরশ !

অতীতের অপক্লেশ—নিমেষের মাঝে যেন—
কোথাদিয়ে গেল মিলাইয়ে
প্রকৃতির পূর্ণতায় কি মদিরা করি' পান
শূন্য প্রাণ উঠিল ভরিয়ে।

হেরি' এ উৎসবে আজি উচ্ছসিত চারিদিকে
প্রীতিপূর্ণ শূন্যে, জলে, স্থলে,—
এ মোর ব্যাকুল হিয়া দিগ্বিদিক হারাইয়া
ডুবে' গেল অজ্ঞাত অতলে !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

কুমারজীব।

(খৃঃ ৩৫০—৪১২)।

কুমারজীব প্রাচীন ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক। ইনি অনেক সংস্কৃতগ্রন্থ চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল অনুবাদ-গ্রন্থ অদ্যাপি চৈনিক বৌদ্ধ ত্রিপিটকে বিদ্যমান আছে অনুবাদ-গ্রন্থ নিচয়ের ভূমিকায় কুমারজীবের সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিপিবদ্ধ আছে।

চীনভাষায় ইহাঁর নাম "থুঙ্-ষয়"। চীনগ্রন্থকারগণ কুমারজীব এই সংস্কৃত নাম "চিউ-মো-লো-ছি-ক" এইরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন।

ভারতে কুমারায়ণ নামে এক ব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি তদানীন্তন কোন রাজার মন্ত্রী ছিলেন। কিয়ৎকাল পরে মন্ত্রিপদ ত্যাগ করিয়া কুমারায়ণ গোবি মরুভূমির উত্তরে খরচর নামক রাজ্যে গমন করেন। সেই দেশের রাজার ভগিনী জীবার সহ কুমারায়ণের বিবাহ হয়। খরচর দেশে কুমারায়ণের ঔরসে ও জীবার গর্ভে কুমারজীবের জন্ম হয়। সাতবর্ষ বয়সে কুমারজাব বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহার দুই বৎসর পরে তিনি স্বীয় জননীর সহ কাবুলে (উদ্যান দেশে) আগমন করেন। তথায় তিনি বন্ধুদত্ত নামক সুবিখ্যাত বৌদ্ধ গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন. যখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর, তখন তাঁহার মাতা খরচর রাজ্যে প্রতিগমন করেন। কুমারজীবও ঐ সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। পথমধ্যে একজন অর্হতের সহ তাঁহার মাতার সাক্ষাৎ হয়। তিনি কুমারজীবের মাতাকে বলিয়াছিলেন—"এই সামনের অর্থাৎ নবীন শ্রমণকে সাবধানে রাখিবে। যদি ৩৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত

ইনি কোন পাপ না করেন, তাহা হইলে ইনি উপগুপ্তের ন্যায় জগতে ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক অসংখ্য লোককে উদ্ধার করিতে পারিবেন। আর যদি ইনি ৩৫ বৎসর বয়সের মধ্যে কোন সময়ে দশশীলের একটী শীলও ভগ্ন করেন তাহা হইলে ইনি একজন সুনিপুণ ধর্ম্মপ্রচারক মাত্র হইবেন।"

খরচর রাজ্যে গমন করিয়া কুমারজীব বিমলাক্ষ নামক ধর্ম্ম গুরুর নিকট সর্ব্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের বিনয় পিটক শিক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি সূর্য্যসোম নামক গুরুর নিকট মহাযান মত অধ্যয়ন করেন। এই সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন—"যে ব্যক্তি কখনও সুবর্ণ দেখে নাই, তাহার নিকট তাম্রই উৎকৃষ্ট ধাতু; কিন্তু সুবর্ণের উৎকর্ষ নয়নগোচর হইলে তাহার তাম্রাভিমান বিদূরিত হয়। আমিও এতদিন মহাযান মত জানিতাম না, সেই জন্য সর্ব্বাস্তিবাদ প্রভৃতি যে সকল হীনযান সম্প্রদায় বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের মতকেই উৎকৃষ্ট বলিয়া মনে করিতাম; কিন্তু এখন দেখিতেছি, মহাযানের সহ উহাঁদের তুলনা হয় না।" সেই সময় অবধি তিনি মহাযান মতেই বিশেষ অনুরক্ত হন, এবং পরিশেষে তাঁহার পূর্ব্ব গুরু বন্ধুদত্ত প্রভৃতিকে মহাযান মতে আনয়ন করেন।

৩৮৩ খৃঃ অব্দে চীনের চীন্ বংশের রাজত্ব কালে লুই—কোয়াঙ্ নামক চৈনিক সৈন্যাধ্যক্ষ খরচর রাজ্য বিধ্বস্ত করেন। তিনি খরচরের রাজার প্রাণসংহারপূর্ব্বক কুমারজীবকে বন্দীকৃত করিয়া চীনে লইয়া যান। লুই-কোয়াঙের আদেশ অনুসারে কুমারজীব পথমধ্যে কোন এক রাজকন্যার সহ একত্র বাস করিতে বাধ্য হন। এই সময়ে তাঁহার বয়স ৩৫ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং তাঁহার বাধ্য হইয়া দশশীলের একটী শীল (ব্রহ্মচর্য্য) ভগ্ন করিতে হইয়াছিল। তিনি ৩৮৩ খৃঃ অব্দ হইতে ৪০১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লুই-কোয়াঙের সহ চীনের লিয়াঙ্-চু নামক স্থানে বাস করেন। ৪০১ খৃঃ অব্দের শেষ মাসে তিনি চীনের ছাঙ্-আন্ নামক স্থানে গমন করেন এবং সম্রাট যও—হিঙ্ বিশেষ সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। খৃষ্টীয় ৪০২ অব্দের পর হইতে

অনেক বৎসর পর্য্যন্ত তিনি অনেক গ্রন্থ চীন ভাষায় অনুবাদ করেন এবং চীন ভাষায় কয়েকখানি মৌলিক গ্রন্থও বিচরণ করেন। চীন দেশে তাঁহার তিন হাজার প্রধান শিষ্য ছিল। তাহাদের মধ্যে দশ জন অতিশয় প্রসিদ্ধ। এই দশ জন শিষ্যের লিখিত অনেক গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চীনদেশে হুঙ্-ষ বংশের রাজত্ব কালে (খৃঃ ৩৯৯—৪১৫) কুমারজীবের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর প্রকৃত সময় জানা যায় না। সাঙ্-চ্ হাঙ্ গ্রন্থের মতে ৪০৯ খৃঃ অব্দের অষ্টম মাসের বিংশ দিবসে কুমারজীবের মৃত্যু হয়। অন্যের মতে তিনি ৪১২ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। সাঙ্ চ্হাঙ্, সুই-যু, নী-তীন্-লু, থু চি, থাই-যুয়েন্-লু, মিঙ্-ই-চি প্রভৃতি গ্রন্থে কুমারজীবের জীবন-চরিত বর্ণিত আছে।

পুণ্যতর নামক একজন কাবুলের বৌদ্ধ প্রচারক চীনে গমন করেন। ৪০৪ খৃঃ অব্দে চীনে তাঁহার সহ কুমারজীবের সাক্ষাৎ হয়। কুমার-জীবের পূর্ব্ব গুরু বিমলাক্ষ ৪০৬ খৃঃ অব্দে চীনে গমন করেন। কুমারজীব তাঁহাকে বিশেষ সমাদরের সহিত চীনে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

কুমারজীব বসুবন্ধুর জীবন-চরিত চীনভাষায় অনুবাদিত করিয়া-ছিলেন। উহা ৭৩০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কুমার-জীবের অনুবাদিত নিম্নলিখিত গ্রন্থনিচয় (৫২ খানি গ্রন্থ) অদ্যাপি চীনদেশে বর্ত্তমান আছে :—(১) পঞ্চবিংশতি সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, (২) দশ সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, (৩) বজ্রচ্ছেদিকা, (৪) প্রজ্ঞাপারমিতাহৃদয় সূত্র; (৫) পূর্ণপরিপৃচ্ছা, (৬) সুবাহু পরিপৃচ্ছা, (৭) সুমতিদারিকা পরিপৃচ্ছা, (৮) ঈশ্বর রাজ বোধিসত্ত্ব সূত্র, (৯) বোধিহৃদয় ব্যূহ সূত্র, (১০) দশ ভূমিক সূত্র, (১১) সর্ব্ব পুণ্য সমুচ্চয় সমাধি সূত্র, (১২) সদ্ধর্ম্ম পুণ্ডরীক সূত্র, (১৩) বিমলকীর্ত্তি নির্দ্দেশ, (১৪) মহাদ্রুম কিন্নররাজ পরিপৃচ্ছা, (১৫) সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিবৃত্তি নির্দ্দেশ সূত্র, (১৬) বসুধর সূত্র, (১৭) বিশেষ চিন্তা ব্রহ্ম পরিপৃচ্ছা, (১৮) সুখাবতীব্যূহ, (১৯) মৈত্রেয় ব্যাকরণ, (২০) গয়াশীর্ষ, (২১) মহামায়ূরী বিদ্যারাজ্ঞী, (২২) অচিন্ত্য

প্রভাস নির্দ্দেশ সূত্র, (২৩) সূরঙ্গম্ সমাধি, (২৪) কুশল মূল সম্পরিগ্রহ, (২৫) সহস্র বুদ্ধ নিদান সূত্র, (২৬) দীপুঙ্করাবদান সূত্র, (২৭) সর্ব্বাস্তিবাদ প্রাতিমোক্ষ, (২৮) মহাপ্রজ্ঞাপারমিতাশাস্ত্র, (২৯) প্রজ্ঞামূল শাস্ত্র টীকা, (৩০) দশভূমি বিভাষা শাস্ত্র, (৩১) সূত্রালঙ্কার শাস্ত্র, (৩২) দ্বাদশনিকায় শাস্ত্র, (৩৩) শতক শাস্ত্র, (৩৪) সত্যসিদ্ধি শাস্ত্র, (৩৫) সংযুক্তাবদান সূত্র, (৩৬) অশ্বঘোষ চরিত, (৩৭) নাগার্জুন চরিত, (৩৮) আর্য্যদেব চরিত, ইত্যাদি।

কুমারজীব যে খরচর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা গোবি মরুভূমির উত্তরে অবস্থিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে হুয়েন্‌সাঙ্ ঐ রাজ্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া জানা যায় ঐ দেশে নানাবিধ সুস্বাদু ফল জন্মিত। উহাতে স্বর্ণ, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর খনি ছিল ঐ দেশের বাতাস মৃদু এবং লোকের প্রকৃতি সরল। ঐ দেশে কিছু বিকৃত সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইত। ঐ দেশের লোক বংশীবাদনে সুনিপুণ। উহারা মস্তকের সমস্ত কেশ ছেদন করিয়া একটী শিখা রাখে। ঐ দেশের রাজা নির্ব্বোধ, সুতরাং তিনি মন্ত্রীর পরামর্শেই সমস্ত কার্য্য করেন। এই দেশে ১০০ সংঘারাম এবং ৫০০০ অপেক্ষা অধিক বৌদ্ধ শ্রমণ ছিল। এই দেশে কূপ খনন করার প্রথা নাই লোকে সন্নিহিত হ্রদ হইতে জল আনয়ন করে। এক সময়ে এই দেশের লোক রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। রাজা তুরস্কজাতির সাহায্য লইয়া সমস্ত দেশ বিধ্বস্ত করেন। সমস্ত প্রজার প্রাণসংহার ঘটা ৭ম শতাব্দীতে খরচর রাজ্য জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। এখানে বুদ্ধের নানা মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। বুদ্ধ মূর্ত্তির সম্মুখে প্রতি পঞ্চম বর্ষে এক একটী মহা সভা আহূত হইত। এই সভায় ধর্ম্মালোচনা হইত।

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

লক্ষ্মী।*

জানিনা কি শুভক্ষণে বঙ্গীয় জ্যরে
কল্পনা-মন্দিরে কিম্বা বঙ্গীয় কবির,
প্রভুভক্তি-প্রজ্জ্বলিত ভীম বৈশ্বানরে
স্রষ্টা তুমি, অপার্থিব কন্যা পৃথিবীর,

কুসুম কাননে তুমি উন্নত তমাল,
মৃগ-সমাকীর্ণ বনে দৃপ্তা কেশরিণী,
প্রশান্তসাগর-নীরে তরঙ্গ বিশাল,
সুষুপ্তির ক্রোড়ে তুমি চেতনা, ভামিনি!

এক বিন্দু রক্ত অই তপ্ত ধমণার
শত রক্ত বীজে পারে করিতে জনন,
একটী স্ফুলিঙ্গে অই প্রখর দৃষ্টির
কত জড়পিণ্ড লভে প্রদীপ্ত জীবন।

কর্ত্তব্যের সহচরি, রমণি দুর্ব্বার,
প্রেতাত্মার পদে তব কোটী নমস্কার!

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য

* ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য অথবা পৌষমাসের ভারতীতে প্রকাশিত বাবু দীনেশচন্দ্র [সে]নের "ডুমুণী ও তাহার পতিপুত্র" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

চীন প্রবাসীর পত্র।

দ্বিতীয় পত্র।

যে বিষয়টি আলোচনা করিবার জন্য প্রথম পত্রখানির অবতারণা, তাহা উক্ত পত্রে আদৌ স্পর্শ করা হয় নাই; প্রবন্ধের কলেবরবৃদ্ধি ভয়েই, ধারান্তরের আশ্রয় লইতে হইয়াছে;—পাঠকগণ এই পত্রখানিকে প্রথম পত্রের পারিশিষ্ট বলিয়াই গ্রহণ করিবেন।

পূর্ব্ব পত্রে অপরাপর জাতির আলোচনাই করিয়াছি; তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে য়ুনানী ও মার্কিণ দেশীয় স্ত্রীজাতি, পুরুষের যেমন অর্দ্ধাঙ্গিনা তেমনি জাতীয় বলের অর্দ্ধেক শক্তি, এবং তাহাদের সম্পূর্ণ অসহায় ও মুখাপেক্ষী করিয়া রাখিলে সেই সকল দেশের জাতীয় বল ও জাতীয় শ্রী-সম্পদ কখনই এতটা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতনা। শিক্ষা ও শিল্পই পরোক্ষে তাহাদের হৃদয়ে আত্মনির্ভরস্পৃহা পোষণ করে, এবং আত্মনির্ভরই তাহাদিগকে হৃদ্-বলশালিনী তেজঃদৃপ্তা, জ্যোতির্ম্ময়ী করিয়া দেয়। এইরূপে, পুরুষ ও রমণীর সাক্ষাৎ-সাহচর্য্যে, তাহাদের জাতীয় বল দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে ও পাইতেছে।

এক্ষণে, আপনাদের কথার আবশ্যক হইয়াছে। প্রথমটি যত সহজ ছিল দ্বিতীয়টি তত নহে বলিয়াই একটু ইতস্ততঃ করিতে হয়। সমাজ হিসাবে য়ুনানী ও মার্কিন মহিলাগণের সকল পথই উন্মুক্ত ও সুগম,—সুতরাং সহজ-সাধ্য;—আমাদের পন্থাগুলি সহজসীমাবদ্ধ হইলে তাহাদের সমন্বয় ও উদ্ধারের উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা চলিতে পারিত, কিন্তু পরিতাপের বিষয় সেগুলি যেমনি জটিল ও দৃঢ়বদ্ধ তেমনি দুর্গম!

সকল দেশেই সমাজিক ব্যবস্থাগুলি, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে ইহা এক প্রকার প্রামাণিক সত্য। তাহা

হইলে, কেবল কাল হিসাবে ধরিলেও আমাদের দেশে পরিবর্ত্তনের পরিমাণটা কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রায় প্রয়োজন বলিয়াই বোধ হয়। সময় থাকিতে ও সুব্যবস্থিত চিত্তে তাহা না করিলে,—কাল তাহা কষিয়া মাজিয়া আদায় করিবেই! যাহা হউক, সে সব গুরুতর বিষয় গুরুতর লোকের চিন্তার জন্য রহিল; এক্ষণে যাহা সহজ সাধ্য তাহারই প্রসঙ্গ ভাল।

প্রারম্ভে,—একটা বড় কথা সংক্ষেপতঃ সারিয়া রাখি। সহজ-বুদ্ধি ও সামান্য-দর্শনে, এই জাতিসংঘর্ষ মধ্যে থাকিয়া যাহা বুঝিলাম তাহাতে আমাদের পূর্ব্বধারণাধীন গৌরবের বহু বস্তুর মধ্যে একটি যে বাস্তবিকই এখনও সর্ব্বোচ্চ ও স্পর্দ্ধা করিবার বস্তু, তাহাতে অনুমাত্রও সংশয় আনিতে পারে নাই, বরং তাহা হৃদয়ে আরও বদ্ধমূল হইয়াছে। সেটি,—ধর্ম্ম ভারতবর্ষ ধর্ম্মপ্রাণ ও ধর্ম্মপ্রধান দেশ, এবং ধর্ম্মেই তাহা চিরউন্নত ছিল ও থাকিবে। সেটি অন্তর্নিহিত বস্তু বলিয়া বিভিন্ন বৈদেশিক সংঘর্ষে ও কঠিন কটাক্ষপাতেও বিলুপ্ত হয় নাই এবং আজিও আপনার সত্ত্বা সংক্ষরণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। কারণ,—খাঁটীর কাছে ভ্যাজাল ভাসিয়া যায়,—সত্যের স্থান মিথ্যা দিয়া পূরণ করা যায় না, অথচ—"খুব সত্য" বলিয়াও কিছু নাই, যাহা সত্যকে পরাস্ত করিতে পারে। ভারতের ধর্ম্ম যদি সভ্যতরক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক রহস্যময় ফরমাজী ফর্ম্মায় গঠিত লৌকিক আসবাব হইত, তাহা হইলে তাহার উন্নতি অবনতি ভাঙ্গা গড়া চলিতে পারিত। কিন্তু ভারতের আত্মধর্ম্ম সে দিক দিয়াই যায় নাই,—তাহা আদৌ বহির্মুখী নহে; নিবৃত্তিই তাহার মূলমন্ত্র, ত্যাগেই তাহার সুখশান্তি, সমাধিই তাহার সাম্রাজ্য এবং পরমার্থেই তাহার পরিসমাপ্তি। এ মহান ভাব কর্ম্মজগতের উন্নতিশীল কর্ম্মবীরগণের মধ্যে অতি বিরল। তাঁহারা প্রবৃত্তিকে প্রধান করিয়া তাহারই পরিতৃপ্তি-পথে মনপ্রাণ সমর্পণ ক

করিলে, অবনী অঙ্গ আজ নব নব বিভব-বৈচিত্র্যে কখনই বিভূষিত করিতে পারিতেন বলিয়া বোধ হয় না। বহির্জগতের উন্নতিকল্পে ইহাই যে সহজ সাধনা, তাহাতে মতদ্বৈধ না থাকাই সম্ভব।

অন্তর্জগতের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ভারতেই আবহমান আধিপত্য করিতেছে ও করিবে,—কিন্তু কর্ম্ম করিতে কেহ বারণ করিয়াছেন কি? আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার ঘন প্রলেপে সহজ সত্যও প্রচ্ছন্নভাব ধারণ করিতে পারে, আবার কত শত গূঢ় রহস্য প্রকাশ পাইতে পারে; কিন্তু কর্ম্ম জগৎটা যে প্রপঞ্চে পরিচালিত সেই প্রত্যক্ষ লক্ষ্যেই বহির্জগতের উন্নতি। কালধর্ম্মে তাঁহারই প্রাধান্য প্রমাণ করিতেছে, এবং প্রবল প্রতিযোগিতা স্রোত প্রবাহিত হইয়া, উৎসাহ, উদ্যম, অধ্যবসায়, আবিষ্কার প্রভৃতিকে সেই পথেরই প্রাণাপিত-পথিক করিয়া ছুটাইয়াছে। তাই আজ ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান ও অষ্ট্রেলিয়া এত উন্নত হইয়াছে ও হইতেছে। কর্ম্মই তাহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্মেই তাহাদের উন্নতি। আমাদের কি তাহা নহে? আমাদেরও তাহাই। কেবল, অর্থের পার্থক্যেই প্রভেদ রক্ষা করিতেছে।

গীতায়, ভগবান অর্জ্জুনকে উপদেশ দিতেছেন :—

"লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অবস্থালাভ করিতে পারে না। আসক্তিত্যাগ ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাসেই (অর্থাৎ, কর্ম্মত্যাগেই) সিদ্ধি (ইচ্ছারহিত অবস্থা) প্রাপ্ত হয় না।"

"তুমি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম কর, যেহেতু, কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করা ভাল।"

"জনকাদি মহাত্মারা কর্ম্মদ্বারাই জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়াছেন, লোক সকলের স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তনের প্রতিও দৃষ্টি রাখিয়া তোমার কর্ম্ম করা উচিত।"

"কেন না শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা করেন, অন্যান্য লোকেও তাহা তাহা করে——।"

"হে পার্থ, যদি আমি কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তবে নিশ্চয়ই মনুষ্যগণ আমার পথ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিবে।"

"——কর্ম্মে অনাসক্ত জ্ঞানিগণও লোকদিগকে স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক হইয়া কর্ম্ম করিবেন।"

"কিন্তু যিনি আত্মাতেই রত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট থাকেন, তাঁহার কিছু কর্ত্তব্য নাই।"——বাস্তবিক তাহা কোটী মধ্যে কয়জন ?

ভগবান্ অবশ্যই নিষ্কাম ও সাত্ত্বিক কর্ম্মের কথাই উপদেশ দিয়াছেন, কিন্তু অক্ষম যদি করিতে না পারে এবং দুর্ব্বল যদি পড়িয়া মার খায়—তাহাতে নিষ্কাম বা সাত্ত্বিকতার আরোপ করা যায় না,—তাহাকে লোকে "অশক্ত"ই বলিবে। যিনি যথার্থ নিষ্কাম ও সাত্ত্বিক—পার্থিব ঐশ্বর্য্যাধিপ সম্রাট ত তুচ্ছ কথা, ভগবান্ও তাঁহার নিকট অবনত! তিনি, জীর্ণ শীর্ণ ও দুর্ব্বল হউন, নগ্ন হউন বা কৌপীনধারী হউন, অথবা ঐশ্বর্য্য বিভূষিত অপূর্ব্বশ্রী হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না ;—সেটা সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র কথা। যিনি তাহার অধিকারী তিনি পূজ্য, প্রণম্য ও ধন্য। কিন্তু, সাধারণ মানব ত দূরের কথা, অসুরনিগৃহীত ও স্বর্গবিতাড়িত ইন্দ্রাদি দেবগণও বিনা উদ্যম ও আয়াসে স্বর্গরাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হয়েন নাই। ভগবান্ স্বয়ং রামাবতারে কঠিন নির্য্যাতন ভোগ করিয়া, কর্ত্তব্যপালনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিও বিনা উদ্‌যোগে সীতা উদ্ধারে সমর্থ হয়েন নাই। বাহ্যিক হইলেও, নরামর-অনুমোদিত লোক জগতের কর্ত্তব্যগুলি পালন ও দৃষ্টতঃ যে প্রপঞ্চ লইয়া জীবনব্যাপী সমর, তাহার উন্নতি বিধান, পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিতেছে। এই বাহ্যিক উদ্‌যোগের মধ্য দিয়া মানুষকে দেবত্বের অধিকারী হইতে হয়,—তখন স্থূল, সূক্ষ্মে পরিণত হয়।

ভারত যদি আজ প্রতিযোগিতার প্রার্থীরূপে না দাঁড়াইত, তাহা

হইলে কোন কথাই ছিলনা; কিন্তু প্রতিযোগিতায় পার্থিব উন্নতি খুঁজিতে হইলে, কালের অনুপাতে তা বাড়াইতে হইবে। পূর্ব্বে দেশ-কাল-পাত্র-বিবেচনায় সমাজ-বন্ধনগুলি ধর্ম্মের সহিত অনুস্যূত করিয়া এত সুদৃঢ় করা হইয়াছিল যে, তাহা আজিও ধর্ম্মেরই অঙ্গীভূত বলিয়া অনুমোদিত ও প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা সমাজবন্ধন ভিন্ন আর কিছুই নহে,—কারণ সুবিশাল সনাতনধর্ম্ম কোথাও এত সঙ্কোচ পোষণ করিতে সম্মত নহে। সুতরাং প্রতিযোগিতায় উন্নতি খুঁজিতে হইলে,—সমাজবন্ধন গুলি, আবশ্যকমত ও ক্রমশঃ একটু শিথিল করিলে অনেকগুলি পথ সুগম হয়,—অথচ ধর্ম্ম তাহাতে ক্ষুণ্ণ হয় না। সভাসমিতি বা বক্তৃতাদিতে তাহা আজ পর্য্যন্ত হয় নাই। কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হইতে হইলে, ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার উপায়গুলি আপনিই উপস্থিত হইতে থাকে, এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষে ও সাহায্যে অলক্ষ্যে তাহা অনুমোদিত হইয়া যায়। সমাজও তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া লয়। প্রকৃত অভাব উপস্থিত হইলে তাহা অনেক স্থলেই এই ভাবে পূরণ হইয়া যায়। সুবিশাল সনাতন ধর্ম্ম তাহাতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কোচের আশঙ্কা রাখেনা।

মূল প্রবন্ধটির সহায়তাকল্পে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে কয়টি কথা আবশ্যক ছিল তাহা বলা হইয়াছে; এক্ষণে উদ্দিষ্ট প্রবন্ধের অনুসরণ আবশ্যক।

কথাটা স্ত্রীজাতি লইয়া,—অর্থাৎ যাঁহারা সংখ্যায় সার্দ্ধাধিক, তাঁহারা অসহায় ও সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী হইয়া থাকায়, সমাজের সার্দ্ধাধিক শক্তির হানি হইতেছে কিনা! এতদিন এ কথাটার বিশেষ আবশ্যক হয় নাই,—কিন্তু দেশের উন্নতিকল্পে প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে দাঁড়াইতে হইলে এবং জাতীয় বল সঞ্চয় করিতে হইলে,—বিষয়টা নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলে চলে কই? অত বড় কথা ছাড়িয়া যদি কেবল স্ত্রীজাতির দিকে চাহিয়াই

কথা কওয়া যায়, তাহা হইলেও এই একান্নবর্ত্তী পরিবার বিচ্যুতির দিনে স্ত্রীজাতিকে নিতান্ত ভাগ্যহীনা করিয়া রাখাও কি শোভা পায়।

বহুদিন হইতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য বঙ্গের স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয়াদি স্থাপনা করা হইয়াছে। তাহাতে যে কোন ফল হয় নাই এমন কথা বলা যায় না, তবে শিক্ষার সুপ্রকাশ অল্পই পাওয়া গিয়াছে, কারণ, ১০ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যেই বালিকাদিগকে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া অবগুণ্ঠিতা বধূবেশে শ্বশুরালয়ে অবরোধে আশ্রয় লইতে হইয়াছে। আজকাল অনেকেরই অভিলাষ কন্যাটিকে সুশিক্ষা-দান করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, দুই তিন বৎসরের শিক্ষায় তাহা সম্ভব নহে,—এমন কি তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্যটি পর্য্যন্ত উপলব্ধি হইতে পারে না, সুতরাং সে শিক্ষার সার্থকতা কি? যৎকিঞ্চিৎ থাকিলেও তাহাতে বিশেষত্ব কিছুমাত্র নাই। সমাজ যদি সদয় হইয়া স্ত্রীশিক্ষার কালটি একটু বর্দ্ধিত করিয়া অন্ততঃ তাহারা যাহাতে ৭।৮ বৎসর ব্যাপী শিক্ষা পাইতে পারে এমন সুব্যবস্থা করেন এবং বিদ্যোৎসাহিগণ সুপ্রণালী প্রবর্ত্তন দ্বারা ঐ সময়ের মধ্যে জ্ঞানোপযোগী ও অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলি সহজসাধ্যভাবে তাহাদের আয়ত্তাধীন ও ধারণাগত করিয়া দিবার সদুপায় করিয়া দেন—তাহা হইলে এতদুভয়ের সামঞ্জস্যকালে ইহার সুফল আশা করা যাইতে পারে। আপাততঃ কোন আশুফল অনুভূত না হইলেও এই সব বালিকারা যে ভবিষ্যতে নিজ নিজ পুত্রকন্যাদের শিক্ষাসম্বন্ধে উদাসীন হইবেন না, তাঁহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। স্বীকার করি,—সন্তান মূর্খ হউক,—এ ইচ্ছা কোন জননীই করেন না; কিন্তু ইচ্ছা না করা এবং কার্য্যতঃ তাহা না হইতে দেওয়া, দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা! অধিকাংশ স্থলেই জীবিকার্জ্জন-উত্যক্ত ও পরিশ্রান্ত পিতা সন্তানের শিক্ষাসম্বন্ধে কষ্টে ব্যয়ভার বহন করিয়াই নিশ্চিন্ত; দুই দশজন বা শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া

ালাশ হইতে বাধ্য হয়েন ;—কিন্তু মা যদি শিশুদিগের শিক্ষার প্রতি
ষ্টি রাখেন এবং স্বয়ং তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে
িক্ষাটা যে কি পরিমাণে প্রসার প্রায় ও তাহার ফল যে কত অল্প
ময়ের মধ্যে কত অধিক হয় তাহা ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রতি
ষ্টি করিয়াই বুঝিতে পারা যায়। অল্পদিন হইল, ইয়োরোপ হইতে
বাগত একটী একাদশবর্ষীয় বালকের সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম
ালকটি পৃথিবীর সকল সুভ্যজাতি সম্বন্ধে ও ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক
াজনৈতিক প্রভৃতি গভীর ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে, বেশ ধীর ও গম্ভীর ভাবে
ত্যমত পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে! জিজ্ঞাসু হইয়া বুঝিলাম—
িদ্যালয় ব্যতীত, শৈশব হইতে মাতার উপদেশ, শিক্ষা ও পরামর্শই
াহাদিগকে এত দ্রুত উন্নত করিয়া দেয়। শিক্ষিতা মাতা যে সন্তানের
িক্ষা সম্বন্ধে যত্নবতী হইবেন ও স্বয়ং তাহাদের উন্নত করিতে চেষ্টা
াইবেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। শিক্ষিতা মাতার সন্তানগণ একটু বিশিষ্টগুণ
াইবেই পাইবে বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহা হইলে আপনা আপনাই
েশে পুরুষ ও স্ত্রীজাতি মধ্যে শিক্ষা-সম্পদ শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিত হইতে
াকিবে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার কালটা সম্বন্ধে সমাজের আনুকূল্য
াবশ্যক ;—অধিক নহে,—আপাততঃ সমাজ যতটুকু সঙ্গত বিবেচনা
রেন।

অভিনব বোধ হইলেও একটি কাজ করিতে পারিলে ঐ সঙ্গে
েশের আর একটি মহৎ মঙ্গল হয়। বালিকাগণের জন্য আপাততঃ
াট বৎসরব্যাপী শিক্ষার শেষ পরীক্ষার উপযোগী একটি যথাসম্ভব
চ্চশ্রেণীর পাঠ্য নির্ব্বাচন ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে এবং তাহাতে
ারদর্শিতার সহিত যাহারা উত্তীর্ণ হইবে তাহাদের পিতার উপর
মাজ একটু সদয় হইলে—অনেকগুলি শুভ এক সঙ্গে সূচিত হয়।
আজ কাল বঙ্গে যে দূষণীয় প্রথা প্রবল হইয়া কন্যার পিতাকে বাধ্য

ইয়া সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে হইতেছে, ই সূত্রে সমাজ সহজেই তাহার একটু উপায় করিয়া দিতে পারেন। াক্ত উচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণা কন্যার বিবাহে পুত্রের পিতা বা অভিভাবক কটু সানুকূল হইতে ও স্বার্থত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে, এক ক্ষেত্রে (১) শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি (২) স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহদান (৩) কন্যা-য়গ্রস্তকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার এবং (৪) সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের লঙ্কস্বরূপ এই দূষণীয় প্রথার বিলোপ সাধন সিদ্ধ হইতে পারে। াসের" সহিত পুত্রের মূল্যের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে াক্ষিতা কন্যার গৌরব রক্ষার্থ পুত্রপক্ষীয়ের স্বার্থ বিনিময় বোধ হয় শেষ অসঙ্গত প্রার্থনা নহে। স্বীকার করি,—বিদ্বান বরে—কন্যাদান —কন্যার ভবিষ্যৎ সুখই সূচনা করে; শিক্ষিতা স্ত্রীও কি স্বামী সুখ বর্দ্ধনে সমধিক যত্নবতী হইবেন না?—তদতিরিক্ত শিক্ষিতা মাতা াপনার সন্তানগণের শিক্ষা বিধানে ও চরিত্রগঠনে স্বতঃই সুদৃষ্টি াখিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। যিনি দেশকে সুসন্তান দিয়া র্ণ করিতে পারেন সেই সুমাতা অপেক্ষা গরীয়সী কে! তাঁহার গৌরব রক্ষার্থ তাঁহার পিতাকে চিরকাঙাল না করিলে,—বিশেষ ছু মহত্ত্বের পরিচয় নাই—তবে, মনুষ্যত্ব অবশ্যই আছে। অনন্ত ার্যতঃ এই আশার আভাষ ও উৎসাহটুকু পাইলে প্রত্যেকেই নিজ জ কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিতে যত্নবান হইবেন; ফলে—অল্প দিনে দেশে শিক্ষার বিস্তার ও তাহার অবশ্যম্ভাবীফল সুমাতা ও সুসন্তানের াবেশ, পরিলক্ষিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় উন্নতির দিনে, ইহা ল্প প্রার্থনার বিষয় নহে।

সমাজ যদি উপরিউক্ত পদ্ধতির পোষকতা করেন এবং প্রত্যক্ষ হানুভূতি প্রদর্শনদ্বারা সকলের মনে বিশ্বাসের বীজ বপন করিতে সমর্থ রন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয় দুইটি উক্ত শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করিবার

খালাশ হইতে বাধ্য হয়েন ;—কিন্তু মা যদি শিশুদিগের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং স্বয়ং তাহার পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে শিক্ষাটা যে কি পরিমাণে প্রসার প্রাপ্ত ও তাহার ফল যে কত অল্প সময়ের মধ্যে কত অধিক হয় অহা ইয়োরোপ ও আমেরিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়াই বুঝিতে পারা যায়। অল্পদিন হইল, ইয়োরোপ হইতে নবাগত একটী একাদশবর্ষীয় বালকের সহিত কথা কহিয়া দেখিলাম বালকটি পৃথিবীর সকল সুসভ্যজাতি সম্বন্ধে ও ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি গভীর ও জ্ঞাতব্য বিষয়ে, বেশ ধীর ও গম্ভীর ভাবে মতামত পর্য্যন্ত প্রকাশ করিতে পারে! জিজ্ঞাসু হইয়া বুঝিলাম— বিদ্যালয় ব্যতীত, শৈশব হইতে মাতার উপদেশ, শিক্ষা ও পরামর্শই ইহাদিগকে এত দ্রুত উন্নত করিয়া দেয়। শিক্ষিতা মাতা যে সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে যত্নবতী হইবেন ও স্বয়ং তাহাদের উন্নত করিতে চেষ্টা পাইবেন তাহা স্বতঃসিদ্ধ। শিক্ষিতা মাতার সন্তানগণ একটু বিশিষ্টগুণ পাইবেই পাইবে বলিয়া বোধ হয়, এবং তাহা হইলে আপনা আপনাই দেশে পুরুষ ও স্ত্রীজাতি মধ্যে শিক্ষা-সম্পদ শনৈঃ শনৈঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষার কালটা সম্বন্ধে সমাজের আনুকূল্য আবশ্যক ;—অধিক নহে,—আপাততঃ সমাজ যতটুকু সঙ্গত বিবেচনা করেন।

অভিনব বোধ হইলেও একটি কাজ করিতে পারিলে ঐ সঙ্গে দেশের আর একটি মহৎ মঙ্গল হয়। বালিকাগণের জন্য আপাততঃ আট বৎসরব্যাপী শিক্ষার শেষ পরীক্ষার উপযোগী একটি যথাসম্ভব উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য নির্ব্বাচন ও নির্দ্ধারণ করিয়া দিলে এবং তাহাতে পারদর্শিতার সহিত যাহারা উত্তীর্ণ হইবে তাহাদের পিতার উপর সমাজ একটু সদয় হইলে—অনেকগুলি শুভ এক সঙ্গে সূচিত হয়। আজ কাল বঙ্গে যে দূষণীয় প্রথা প্রবল হইয়া কন্যার পিতাকে বাধ্য

হইয়া সর্ব্বস্বান্ত ও ঋণগ্রস্ত হইয়া কন্যাদায় হইতে উদ্ধার হইতে হইতেছে, এই সূত্রে সমাজ সহজেই তাহার একটু উপায় করিয়া দিতে পারেন। প্রোক্ত উচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণা কন্যার বিবাহে পুত্রের পিতা বা অভিভাবক একটু সানুকুল হইতে ও স্বার্থত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলে, এক ক্ষেত্রে (১) শিক্ষার গৌরব বৃদ্ধি (২) স্ত্রীশিক্ষায় উৎসাহদান (৩) কন্যাদায়গ্রস্তকে আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার এবং (৪) সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের কলঙ্কস্বরূপ এই দূষণীয় প্রথার বিলোপ সাধন সিদ্ধ হইতে পারে। "পাসের" সহিত পুত্রের মূল্যের পরিমাণ যদি বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে শিক্ষিতা কন্যার গৌরব রক্ষার্থ পুত্রপক্ষীয়ের স্বার্থ বিনিময় বোধ হয় বিশেষ অসঙ্গত প্রার্থনা নহে। স্বীকার করি,—বিদ্বান বরে—কন্যাদান —কন্যার ভবিষ্যৎ সুখই সূচনা করে; শিক্ষিতা স্ত্রীও কি স্বামী সুখ সম্বর্দ্ধনে সমধিক যত্নবতী হইবেন না?—তদতিরিক্ত শিক্ষিতা মাতা আপনার সন্তানগণের শিক্ষা বিধানে ও চরিত্রগঠনে স্বতঃই সুদৃষ্টি রাখিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। যিনি দেশকে সুসন্তান দিয়া পূর্ণ করিতে পারেন সেই সুমাতা অপেক্ষা গরীয়সী কে! তাঁহার গৌরব রক্ষার্থ তাঁহার পিতাকে চিরকাঙাল না করিলে,—বিশেষ কিছু মহত্ত্বের পরিচয় নাই—তবে, মনুষ্যত্ব অবশ্যই আছে। অনন্ত কার্যতঃ এই আশার আভাষ ও উৎসাহটুকু পাইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ কন্যাকে উচ্চশিক্ষা দিতে যত্নবান হইবেন; ফলে—অল্প দিনে দেশে স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার ও তাহার অবশ্যম্ভাবীফল সুমাতা ও সুসন্তানের সমাবেশ, পরিলক্ষিত হইবে। এই প্রতিযোগিতায় উন্নতির দিনে, ইহা অল্প প্রার্থনার বিষয় নহে।

সমাজ যদি উপরিউক্ত পদ্ধতির পোষকতা করেন এবং প্রত্যক্ষ সহানুভূতি প্রদর্শনদ্বারা সকলের মনে বিশ্বাসের বীজ বপন করিতে সমর্থ হয়েন, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বিষয় দুইটি উক্ত শিক্ষার অন্তর্ভূত করিবার

জন্য প্রার্থনা করিতে সাহসী হই। ইহাতে জাতীয় উন্নতির গৌণ উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন থাকিলেও আপাততঃ প্রত্যক্ষ উপকার যথেষ্টই উপলব্ধি হইবে।

প্রথম কথা,—শিক্ষার প্রণালী ও শ্রেণী বিভাগ মধ্যে বিশেষ প্রয়োজনীয় বৈষয়িক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকা। অর্থাৎ একটু বিষয় কর্ম্ম বুঝিবার মত শিক্ষা (business-like education) দান করা। কথাটা, হঠাৎ যেন কেমন কেমন বোধ হইবে; বাস্তবিকই আমাদের কর্ণে,—কথাটায় পুরুষভাবের প্রাবল্য প্রচুরই রহিয়াছে, কিন্তু একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে স্বীকার করিতে হয় যে স্ত্রীজাতির মধ্যে বিষয় বাটার একটু আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। অতি অল্প বয়সে বিষয় বাটা সম্ভব নহে,—তাহার জন্য একটু পরিণত বয়সেরই আবশ্যক; তবে, তৎসম্বলিত অত্যাবশ্যকীয় পথপ্রদর্শক শিক্ষা ও উপদেশ গুলি ধারণাধীন করিয়া দিলে,—এই সুদীর্ঘ জীবনসংগ্রামে অনেক সময় অনেক অসহায়ত্বমূলক অনিষ্ট ও অনাটন হইতে তাহাদের রক্ষা পাওয়া সম্ভব। আমাদের দেশে যাঁহারা সম্পত্তির অধিকারিণী অথবা যাঁহাদের স্বামী, কিছু অর্থ ও নাবালক সন্তানাদি রাখিয়া গিয়াছেন,—যদি একবার তাঁদের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে, ইহার আবশ্যকতা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে। প্রাত্যহিক জীবনে, ইহার অভাবজনিত অনিষ্টের ভুয়োনিদর্শন পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। সকল বিষয়েই প্রতিকূল মতের অবতারণা করা যইতে পারে, কিন্তু সত্যকে লঙ্ঘন করা স্বতন্ত্র কথা। স্বামী অবর্ত্তমানে কত রমণী, অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও অতি সামান্য বিষয়ে অজ্ঞতা নিবন্ধন, নায়েব, গমস্তা, সরকার বা আত্মীয় স্বজনের করতলস্থ ও মুখাপেক্ষী হইয়া, পরিশেষে অন্নাভাবে পথের ভিখারিণী হইয়াছেন! সম্পত্তিরক্ষা সম্বন্ধীয় মোটামুটি জ্ঞান ত সুদূর কথা, যে অর্থটা ব্যাঙ্কে আছে বা রাখা আবশ্যক হইয়াছে, তাহা রাখা বা মধ্যে মধ্যে প্রয়োজন

মত কিছু কিছু উঠাইয়া লওয়ার প্রণালীটি জানা থাকিলেও, আজ বোধ হয় একমুষ্টি অন্ন বা একখানি লজ্জানিবারণোপযোগী বস্ত্রের জন্ত অনেককে অন্যের দ্বারে ফিরিতে হইত না। বোধ হয় এমন গ্রাম অল্পই আছে, যে গ্রামে এইরূপ ভাগ্যহীনার, অন্ততঃ দু একটি নিদর্শনও বিরল। আজকাল অনেকেই জীবন বীমা সূত্রে, পরিবারকে যথাসাধ্য কিঞ্চিৎ অর্থের অধিকারিণী করিয়া যান, কিন্তু অনেক স্থলে তাহা কি পরিমাণে সেই সব অনাথার হস্তগত হয়, তাহা অনুসন্ধান করিলে কেবল বেদনাই বাড়ে। ফলকথা, পরানুগ্রহে যাহা কিছু তাঁহাদের হস্তগত হয়, পরে তাহাও তাঁহাদের নিকট আত্মীয়ের হস্তেই ন্যস্ত হইয়া কখন কখন অগস্ত্যগমনই জ্ঞাপন করে,—অথবা তাঁহাদিগকে আজীবন তাঁহাদের সেই সব আত্মীয়ের কৃপার পাত্রী হইয়া শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতে হয়! সুতরাং নাবালক সন্তানগুলির কিরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক!

তাই বলিতেছিলাম, কতকটা অবশ্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক শিক্ষা স্ত্রী শিক্ষার অন্তর্গত হইলে বড়ই ভাল হয়। এতদুদ্দেশ্য সাধনকল্লে অতি সরল ও প্রাঞ্জল-প্রণালীসম্মত সহজবোধ্য ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রণয়ন ও তাহা বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে প্রবর্ত্তন করা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হয়। বালিকাগণের বয়ঃক্রম বিবেচনায়, উদ্দেশ্য সাধনোপযোগী সরল ও সুন্দর একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সুলিখিত হইলে, গবর্ণমেণ্টও যে তাহার প্রবর্ত্তনে সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

যে দুইটী বিষয় স্ত্রীশিক্ষার অন্তর্গত করিবার প্রার্থনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহার প্রথমটি যথাযথ কথিত হইল, এক্ষণে দ্বিতীয়টির সংক্ষেপতঃ আলোচনা করিব। এটি কিঞ্চিৎ ব্যয়সাধ্য ও অপেক্ষাকৃত কঠিন; কিন্তু প্রথমটি অপেক্ষা যেন দ্বিতীয়টির আবশ্যকতা অধিক

বলিয়াই বোধ হয়,—কারণ এটি উপায় ও সঙ্গতিহীন সনাথা ও অনাথা উভয়েরই অবলম্বন স্বরূপ। যথাসম্ভব অর্থকরী শিল্পশিক্ষা স্ত্রীশিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়াই দ্বিতীয়টির উদ্দেশ্য। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইহার ব্যক্তিগত উপকারিতা যে কি পরিমাণে অধিক, বোধ হয় তাহার বিবৃতি বাহুল্য অনাবশ্যক। পরোক্ষে ইহা জাতীয় উন্নতির পন্থা যে কতটা পরিষ্কার ও *প্রশস্ত করিয়া দিতে সক্ষম, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রের নিকটেই সুপরিস্ফুট।*

বিশিষ্ট ধনী সম্প্রদায়ের কথা স্বতন্ত্র, তাঁহাদের কন্যাগণ অর্থকরী হিসাবে শিল্পাদি শিক্ষা না করিতে পারেন; কারণ তাহাতে তাঁহাদের সাক্ষাৎস্বার্থ অল্পই আছে; কিন্তু একটু প্রশস্ত ভাবে দেখিতে হইলে—তাহাতে জাতীয় স্বার্থ যথেষ্টই বর্ত্তমান,—কারণ, তাঁহাদের আদর্শই অপরে অনুকরণ করিয়া থাকে।

আপাততঃ ইতর সাধারণের প্রসঙ্গও নিষ্প্রয়োজন,—কারণ, তাহাদের মধ্যে এখনও শিক্ষার সূচনামাত্রই নাই। তদ্ব্যতীত তাহাদের স্ত্রীজাতিরা, অসহায় ও অনাথা অবস্থায় আপনাদের ও সন্তানাদির ভরণপোষণার্থ, শ্রমসাধ্য কর্ম্ম করিতেও কুণ্ঠিতা নহে। সচরাচর তাহারা স্ত্রী পুরুষে সংসার প্রতিপালনার্থ সকল প্রকার কর্ম্মই করিয়া থাকে।

কথাটা হইতেছে মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায় লইয়া; যাঁহাদের ঘরের উপায়হীনা অসহায়া অনাথারা, গৃহগণ্ডির মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া, মৌন-নির্ভর ও অকথ্যনির্য্যাতনের নগণ্যঅস্তিত্ব বহন করতঃ সারা জীবন পরের মুখাপেক্ষায় যাপন করিতে বাধ্য হয়েন! অনেক স্থলেই, তাচ্ছিল্য-স্পৃষ্ট উদরান্নের দাসী বা পাচিকাবৃত্তি,—অনাথজীবনের সাক্ষ্য দেয়! তাঁহাদের সন্তানাদির অশন, বসন ও অধ্যয়নের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। ভবিষ্যতে সেই ভাগ্যহীন ভগ্ন হৃদয়েরা দরিদ্রের সংখ্যা

বৃদ্ধি করে, এবং এইরূপে এক একটি ভদ্রবংশের বিলোপে সমাজ দীন ও দেশ হীন হইতে থাকে। স্মরণীয় ও স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র নিম্নোদ্ধৃত কয় পঙ্ক্তিতে ভারত মহিলার মুখে যে প্রাণস্পর্শী মর্ম্মবেদনা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গের কলঙ্কজ্ঞাপক হইলেও, সুবর্ণাক্ষরে রক্ষিত হইবার সামগ্রী :—

*　　*　　*　　*

"সেই সে দিনান্তে ছুটী পরাণ আহার,
নিশিতে কাঁদিয়া স্বপ্ন দেখি অনিবার।

*　　*　　*　　*

কি জানাব জননী গো হৃদয়ের ব্যথা,
দাসীরও এ হেন ভাগ্য না হয় সর্ব্বথা।
কি ষোড়শীবালা, কিবা প্রবীণা রমণী,
প্রতি দিন কাঁদিছে মা দিন দণ্ড গণি।
কেহ কাঁদে অন্নাভাবে আপনার তরে,
কারো চক্ষে বারিধারা শিশু কোলে ক'রে!
কত পাপ স্রোত মাতা প্রবাহিত হয়!
ভাবিতে রোমাঞ্চ দেহ, বিদরে হৃদয়!

*　　*　　*　　*

ডেকেছি মা বিধাতারে কত শত বার,
পূজেছি কতই দেব সংখ্যা নাহি তার।
তবুও গো ঘুচিল না হৃদয়ের শূল।
অমরাবতীতে বুঝি নাহি দেবকুল!"

*　　*　　*　　*

তাই বলিতেছিলাম, এই দুর্বিসহ দুঃখবিমোচনার্থ রমণীজাতিকে একটু আত্মনির্ভরপরায়ণা করিবার উপযুক্ত শিক্ষা দান আবশ্যক,

এবং অর্থকরী শিল্পশিক্ষাদানই তাঁহার এক মাত্র সহজ উপায় বলিয়া অনুমিত হয়। যে দেশে একটি অনাথা ভদ্রমহিলার ভরণপোষণ তিন বা চারি মুদ্রার মধ্যে সমাধা হইতে পারে,—সমাজ একটু সদয় হইলে, তাঁহাদের এ দুঃখ, অতি অল্প আয়াসে ও অচিরে বিমোচন হওয়া সম্ভব। অর্থকরী শিল্প সাহায্যে, তাঁহারা সাংসারিক কার্য্যে রত থাকিয়াও আপনাদের উপায় আপনারাই করিয়া লইতে পারেন,—কেবল, সমাজের ও সংসারের একটু অনুকূল দৃষ্টি আবশ্যক। প্রচলিত প্রথা অনুসারে আপাততঃ একটু বিসদৃশ বোধ হইলেও, উভয় দিক্‌টার উপকারিতা তুলনায় দেখিতে গেলে সমাজের অনিষ্ট আশঙ্কাটা অমূলক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে।

বালিকাগণকে এতাবৎ যে পশমের কাজ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে—এ প্রবন্ধে তাহার 'আদৌ' পোষকতা নাই, কারণ তদুৎপন্ন বস্তুগুলি—আদরের, সখের বা উপঢৌকনের সামগ্রী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যা খরচ পড়ে, তাহার অর্দ্ধেক ব্যয়ে বাজারে সেই সকল বস্তু অনায়াসে পাওয়া যায়! ইহা অপেক্ষা,—পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও মধ্য প্রদেশে ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা (মিশনরী রমণীগণের নিকট শিক্ষা পাইয়া) দেশী মোটা সুতার মোজা বুনিয়া ও বাজারে তাহা ভালমন্দ অনুসারে, আট হইতে বার পয়সা জোড়া বিক্রয় করিয়া যে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ জীবিকা নির্ব্বাহ করে,—তাহা শতবার প্রশংসনীয়। সামান্য গৃহকার্য্যাদি সমাপনান্তে, শিশুকোলে করিয়া তাহারা এই কার্য্য সমাধা করে এবং কেহ কেহ শয়নের পূর্ব্বে দুই জোড়া মোজাও বুনিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, এক্ষণে ঐরূপ এমন কিছু অর্থকরী শিল্প শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহা বিশেষ ব্যয়সাধ্য নহে, এবং বাজারে যাহার কাটতি সহজেই হইতে পারে, অথচ স্ত্রীজাতি যাহা বিনা সঙ্কোচে ও অনায়াসে, এমন কি সাগ্রহে শিখিতে প্রস্তুত।

সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকা সত্ত্বেও কোন কোন প্রাচীনাকে চরকা কাটিতে, ঘুনসী ভাঙ্গিতে, পৈতা তুলিতে দেখিয়াছি, এবং তদুপার্জ্জিত যৎসামান্য অর্থের অসামান্য আদরও দেখিয়াছি ; তাহাতে বেশ বোধ হইত—স্বোপার্জ্জিত অর্থটি স্ত্রীজাতির নিকট অতীব শ্লাঘার ও যত্নের জিনিস। স্বামী ও পুত্রের উপার্জ্জিত অর্থ তাঁহাদেরই হস্তে প্রদত্ত হইতেছে এবং তাঁহাদের দ্বারাই আবশ্যকমত অকাতরে ব্যয়িত হইতেছে, কিন্তু স্বোপার্জ্জিত অর্থটি তাহাতে মিশিতে পায়না! আত্মবোধে তাহার সঞ্চয়ে, যত্নে ও ব্যয়ে বেশ একটু স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব বর্ত্তমান।

আজ প্রায় ৮।৯ বৎসর পূর্ব্বের কথা, হাওড়া ষ্টেসনে একটি মালাকারের নিকট প্রচুর পরিমাণে যুঁই ও বেলফুলের সুপুষ্ট ও অর্দ্ধপুষ্ট কলিকা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করি—"এত ফুল কি হইবে, কোথায় যাইতেছে, আর এত কুঁড়িই বা নষ্ট করা হইয়াছে কেন?" তাহাতে মালাকার বলিল—"এত আর কোথায় দেখলেন বাবু! আজ বড়ই কম পাওয়া গিয়েছে, ৬।৭ সেরের বেশী হবেনা, ২।৩ বাড়ী দিতে কুলুবেনা—বড়ই মুস্কিলে প'ড়তে হবে।" আমি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কারা এত ফুল লয় যে এই রাশিপ্রমাণ ফুল ২।৩ বাড়ীতে কুলাইবেনা। আর মুস্কিলই বা কি?—তাহাতে ত তোমারই সুবিধা।" মালাকার হাসিয়া উত্তর করিল—"বাবু আপনি বুঝিতে পারেন নি, আমি এ ফুল বেচতে যাচ্চি না,—এর মালা, গহনা, পাখা, এই সব তৈয়ার ক'রতে দিতে যাচ্চি। কলকেতা আর ভবানীপুরের অনেক বাবুদের বাড়ীর বৌঝিরা এই সব তয়ের করেন। সকলেই এই ফুলের জন্যে আশা ক'রে থাকেন, তাই বলছিলুম মুস্কিলে প'ড়তে হবে।" আমার কৌতুহল আরো বৃদ্ধি হইল, জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাঁ'রা এ কাজ কখন করেন, আর তাঁ'দের স্বার্থই বা কি?" মালাকার বলিল—"কাজ পেলে তাঁ'দের আহার নিদ্রা জ্ঞান থাকে না, আমি বেলা ১০টার মধ্যে দিয়ে আসি, ৩।৪টের সময় আন্‌তে যাই, এরি মধ্যে তাঁ'রা গেঁথে রাখেন। আমি সের করা দু আনা দি, ভাল সূক্ষ্ম কাজে বেশীও দি।" আমি উৎসুক হইয়া

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি, এই রেলভাড়া, ট্রামভাড়া দিয়ে ফুল দিতে যাও আর নিয়ে আ'স; নিজের গ্রামের লোককে দিয়ে এ কাজ করাওনা কেন?" মালাকার বলিল "বাবু—কথাটা বলা ভাল দেখায় না—লক্ষ্মীমন্ত ভদ্রঘরের কথাই আলাদা, তাঁদের বৌঝিদের এ সব কাজে যত টান, অন্য কোথাও তা দেখ্‌তে পাইনা; তাঁরা আমার কাছে কাড়া কাড়ি ক'রে ফুল লেন্, আবার কাজও তেমনি পরিষ্কার আর সুন্দর করেন। ভদ্রলোকের আর বড় লোকের বাড়ি যেমন পচন্দসই কাজ পাই তেমন কোথাও পাই না; সে সব জিনিস লোকে পাবার জন্যে হাঁ ক'রে থাকে, আমারও তাতে দুপয়সা বেশী আসে।"

প্রাচীন মালাকারের কথাগুলি বড়ই মিষ্ট লাগিয়াছিল ঐ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা হইল। যাহা হউক এই সকল দেখিয়া শুনিয়া বেশ বোধ হয় যে

(১) অভাব না থাকিলেও স্বকৃত উপার্জ্জনটা বড়ই মধুর।

(২) সুবিধাজনক পন্থা থাকিলে বা করিয়া দিলে স্ত্রীজাতি তাহা আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে সম্মত।

(৩) সুন্দর ও সুরুচিসম্পন্ন শিল্প ভদ্রঘরেই অপেক্ষাকৃত সম্ভব; সুকুমার শিল্পের উৎকর্ষ, উন্নতি ও বিকাশ তাঁহাদের নিকটই অধিক পরিমাণে আশা করা যায়।

(৪) স্বোপার্জ্জিত অর্থের সবিশেষ স্বাতন্ত্র্য রক্ষার ও সঞ্চয় প্রবণতার প্রাবল্য,—অর্থের আদর ও যত্নব্যঞ্জক। প্রায়শঃ এই শেষোক্ত ভাবটি অল্প বিস্তর পরিমাণে সকল জাতীয় স্ত্রীলোকের মধ্যে বর্ত্তমান।

তাই বলিতেছিলাম, স্ত্রীজাতির কর্ম্মপ্রবৃত্তি থাকা সত্বেও বহুকাল-ব্যাপী সংস্কারসংস্পর্শে বা পরমুখাপেক্ষিতার প্রাবল্যহেতু, সেগুলি সঙ্কুচিত বা নির্জ্জীব হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীশিক্ষার সহিত অর্থকরী শিল্পের পরিচয় ও সুযোগ করিয়া এবং এই অভিনব প্রবর্ত্তনটি সুসিদ্ধ করিবার জন্য যথাসম্ভব ত্যাগ স্বীকার করত যত্নবান হইয়া,—সহৃদয় সমাজ যদি সদুপায় করিয়া দিতে বদ্ধপরিকর হয়েন, তাহা হইলে

কেবলমাত্র যে পরমুখাপেক্ষী স্ত্রীজাতিরই প্রত্যক্ষ উপকার করা হয় তাহা নহে, তৎসঙ্গে পরোক্ষে আমাদের দারিদ্র্যনিপীড়িত ও পতিত দেশের অবসন্ন ও হতাশ হৃদয়ে জীবনী সঞ্চার করা হয়। আপাততঃ সার্দ্ধাধিক অসহায় সমষ্টি মধ্যে আত্মনির্ভরতা অল্পাধিক পরিমাণেও অন্তর্নিহিত হইলে, সেই রহস্যময় শক্তির প্রচ্ছন্নসামর্থ্য যে দেশের সর্ব্বাবয়বে বলসঞ্চার করিয়া প্রভূত কল্যাণসাধন করিবে তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। সন্দেহ করিলে, ভগবান স্বয়ং যে কহিয়াছেন—আমি "কীর্ত্তি শ্রীর্ব্বাকঃ চ নারীনাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।" অর্থাৎ নারীগণ মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, এই সপ্ত দেবতারূপা আমিই—তাহার সার্থকতায় সন্দেহ করা হয়, এবং যে আধারে ভগবানের এতগুলি বিভূতির সমাবেশ তাহাকে উপেক্ষা করা হয়, ও তাহার উন্মেষ অভিব্যক্তির অন্তরায় স্বরূপ হইয়া প্রত্যবায়ভাগীও হইতে হয়।

কার্য্যোপলক্ষে আজ জগতের সমগ্র সুসভ্য ও স্বাধীন শক্তি পুঞ্জের সমাবেশ মধ্যে থাকিয়া ও তাঁহাদের অজ্ঞাতপূর্ব্ব সামর্থ্য ও সম্পদ প্রত্যক্ষ করিয়া মন স্বভাবতই তাহার তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া পড়ে এবং তাহার মূলান্বেষণে অভিলাষী হয়। সেই প্রেরণার বশবর্ত্তী হইয়া যতটুকু বুঝিয়াছি তাহাতে স্ত্রীজাতির আত্মনির্ভরতা ও সুহকারিতাই জাতীয় বলের অর্দ্ধেক কার্য্যকারী শক্তি এবং এই স্ত্রী ও পুরুষের শক্তি সম্মিলনে এই সকল জাতি এত উন্নত,—ইহাই প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে। তাই বলিতে হয়—স্ত্রীজাতির আত্মনির্ভরতার অন্তরালে আমাদের দারিদ্র্যবিদলিত দেশের আশার আভাস, বহু উপেক্ষা সহ্য করিয়াও—আজিও যে সতৃষ্ণনেত্রে, আহ্বানের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে,—আরও কি তাহাকে অগ্রাহ্য ও অবহেলা করা, কল্যানপ্রদ হইবে?

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

উর্ব্বশী ও তুকারাম।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

উর্ব্বশী	সদাশিব শ্রেষ্ঠীর কন্যা।
মেনকা	সদাশিব শ্রেষ্ঠীর ভ্রাতুষ্পুত্রী।
সাহাজি	সামন্ত রাজা ও দাক্ষিণাত্য মুসলমানের সেনাপতি।
তুকারাম	সাহাজির শরীর রক্ষক প্রিয় সেনা

নারদ দেবদেবী, দাসদাসী, পুরোহিত, সেনাপতি, ঘটক ও সৈনিকগণ।

প্রথম দৃশ্য।

বোম্বাই প্রদেশে সমুদ্রতীরে অরুণাবতী গ্রাম।

(উপকূলে পাহাড়ের উপরে উর্ব্বশী ও মেনকা আসীন।)

উ। দেখ বোন যতবার আসি উপকূলে,
নেহারি সিন্ধুর এই উর্ম্মিময় খেলা ;
অমনি বিক্ষুব্ধ ভীম মহা আলোড়ন
অনুভবি হৃদিমাঝে। মনে হয় যেন
ধরাতল ডুবাইতে পারি রসাতলে।
সে রুদ্ধ আবেগ যদি শুধু একবার
খুলে যায় অকস্মাৎ নিমেষের তরে।
জলধির লীলা খেলা যত হেরি মেনা,
তত মনে জাগে এই দুরন্ত বাসনা।

মে। লগ্নচাঁদা তুমি দিদি, তাই এত সাধ
খেলাতে জোয়ার ভাঁটা মানবে লইয়ে।
এত খেলা খেলাতেছ অবিরত তবু—
নাহি পুরে আশা—আমি বিস্ময়ে যে সারা!
আমার কি মনে হয় সিন্ধুপানে চাহি
জান উরবাস, আমি যেন মহা ক্ষুদ্র
তরঙ্গ একটি, ধৌত করি দিয়া শুধু
তটভূমি টুকু পুনঃ মিলাব সাগরে।

উ। কে ঐ দাঁড়ায়ে মেনা বটতরু-তলে?
নারায়ণ বুঝি? শ্রান্তি নাহি, ক্লান্তি নাহি
প্রতিদিন স্পন্দহীন রহিবে দাঁড়ায়ে?
বেড়াইতে আসা কূলে হ'ল দেখি দায়!

মে। শুনিয়াছ দিদি এসেছিল দূত এক
নারায়ণ সনে তব সম্বন্ধ লইয়া।

উ। দেখেছ আস্পর্দ্ধা! আমৃত্যু অপেক্ষা করি
দাঁড়ায়ে থাকুক তবে ঐ তরুমূলে!
বুঝি যায় ধনরাজ?

মে।　　　　অরুণা কুবের।
সোনা রূপা মণি মুক্তা হীরা জহরতে
ভাণ্ডার উহার পূর্ণ। যত পিতামাতা
কন্যাদান তরে ওরে করে সাধাসাধি,
সে কিন্তু তোমারে ছাড়া অন্যে নাহি চাহে।

উ। ভাল ভাল! তার তরে আজন্ম বাধিত!
দেখা যদি হয় নাহি ভুলিস বলিতে;
এতই যখন শ্রদ্ধা তার পরে দেখি!

কেও দেখ্ দূরে বসি বালুকার স্তরে
চিন্তায় মগন?

মে। দিদি চিনিতে পার না!
মহাদেব ও যে! যারে বন্দর্প হেথায়
বলে সর্ব্বজনে। অত রূপ সুমলিন!
সত্য বড় মায়া করে দেখিলে উহারে!
যে দিন হইতে আহা হারায়েছে আশা
অমনি পাগল পারা সে দিন হইতে!

উ। দোষ যেন আমাদেরি? ইচ্ছা করি নিজে
আগুনে ঝাঁপিলে অন্যে কি করিতে পারে?

মে। কি আর করিবে শুধু একটু করুণা।

উ। রেখেদে করুণা তোর। শুধু মায়া, মায়া!
বাঁচিনে ত আমি তোর মায়ার জ্বালায়।
লোকে যেন যত প্রেম হৃদয় বেদনা
না প্রকাশে তোর তরে বুঝিতে না পারি!
এত দয়া এত মায়া যেথা উৎসারিত।

মে। তব ভাগ্য নিয়ে দিদি জন্ম কি আমার!
আমি যদি পাইতাম কারো কাছে হেন
আত্মহারা ব্যথাভরা আকুল প্রণয়,
পরিপূর্ণ হৃদি প্রাণ মুহূর্ত্তে তখনি
চিরতরে সমর্পিয়া তাহার চরণে,
হইতাম একেবারে নিঃসম্বল দীনা।
অন্যে বিলাইতে বিন্দু না থাকিত বাকী।
কেমনে কি দিয়ে তবে কোন্ প্রলোভনে
খেলাব শতেক জনে তাহাত না জানি?

উ। এত কেন দুঃখ আহা, ঐ ইন্দ্রজিত
আসে দেখ উপকূলে-মেনকা ভিখারী।
মে। একদিন দেখা শুধু কাননের তলে।
উ। একদিনে হয়েছিল খাণ্ডব দাহন?
মে। তাহা নয় এসেছিল তোমা তরে ওগো!
ভেবেছিল উর্ব্বশী আমারে—
উ। তারপর?
মে। শুধাইল সাভিনয়ে উর্ব্বশী কি আমি
শ্রেষ্ঠীঘরে জ্যেষ্ঠা কন্যা—নারী অসামান্যা?
উ। যারে হেরি এত মোহ সে মেনকা ধন্যা!
তবে নাকি নাহি তোর রূপ আকর্ষণ?
মে। খদ্যোৎও সম্মান লভে চন্দ্রহীন রাতে!
ক্ষণিকের মোহ তার ঘুচেছে তখনি—
যখনি তোমার রূপ হেরেছে উর্ব্বশী।
কি মোহিনী শক্তি দিয়া সৃজিলা বিধাতা
একবার যে নেহারে সেই হৃদিহারা!
কঠোর তপস্যাধারী সাহাজির পণ
তোরে হেরে কতক্ষণ রহে তাই ভাবি।
উ। দেখ বোন পুরুষ সে ততক্ষণ যোগী
যতক্ষণ ভাগ্যদোষে রূপে না নেহারে।
অশ্ব যথা তুষ্ট শুধু না পেয়ে সওয়ার।
মে। বলিয়াছ সত্য দিদি কোন যোগীজনা,
এ সৌন্দর্য্যে না চমকে বুঝিতে পারি না।
উ। রাখ তোর স্তুতি ঐ চির পুরাতন!
ঘরে চল যাই এবে সন্ধ্যা হয়ে এল।

কে দেখ চাহিয়া দেখে নির্নিমেষ আঁখি !
বিদেশীর মত যেন ! আমরা কি যেন
সত্য ছুট জড়কুল—চিত্রিত প্রতিমা ?
বড় রাগ ধরে বোন, চলে আয় ত্বরা।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

অরুণাবতীর নিকটবর্ত্তী পর্জ্জন্য গ্রামের প্রান্তস্থিত বিজন বনে শিবির।
(নিকটে তরুতলে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে সাহাজির গান)।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

এ শুষ্ক জীবন কে ফুটাবে আর
তাহারে কোথায় পাব ?
এ নিরাশ ঘন কুয়াসা আঁধার
কে ঘুচাবে কোথা যাব ?
কাহার নয়ন-তারকার মাঝে
সে প্রেমপুলক নির্ঝর রাজে
এ মরু-প্রাণের অনন্ত পিয়াসা
যে অমৃতে নিভাইব !
বসন্ত-মোদিত মদির হিল্লোল
যে রূপের স্রোতে বয় ;
যে মোহন মন্ত্রে মর্ত্ত্যের মানব—
স্বরগ মাধুরী ময় ;
আমি, স্বপনে জাগ্রতে সেই রূপ খুঁজি,
তৃষা বাসনায় অবিরত যুঝি,
বিরাগের মাঝে একি অনুরাগ
বুঝিনা আপন ভাব।

(তুকারামের প্রবেশ)।

তুকা। জয় হোক মহারাজ, করি নমস্কার।

রাজা। এই যে সৈনিক তুকা কিবা সমাচার ?

তুকা। নিদারুণ শুভ দেব।

রাজা। কি অদ্ভুত কথা !

ভাল করি কহ সব, হেঁয়ালি রাখিয়া।

তুকা। মন্দ করি বলিবারও সাধ্য নাহি মম

একটী রসনা মাত্র দিয়াছেন বিধি।

ক্ষমুন রাজন্।

রাজা। সত্য তবে জনরব !

তুকা। সত্যের অধিক !

রাজা। পরমাসুন্দরী বামা ?

তুকা। তারো চেয়ে বেশী !

রাজা। সখা কোরোনা অধীর।

তুকা। নিরুপমা অতুলনা। ব্রহ্মা পুরাযুগে

শুনিয়াছি আহরিয়া তিল তিল করি

সুন্দর বস্তুর রূপ বিশ্ব জগতের

নিরমিলা তিলোত্তমা। কলিযুগে আজি,

দ্বিতীয়া এ তিলোত্তমা হেরিয়া রাজন্,

বিবাদ ভঞ্জন হলো নেত্র শ্রবণের।

রাজা। একি উপকথা সখা করাও শ্রবণ !

ডুবিছে হৃদয় প্রাণ কৌতূহল স্রোতে !

কেমনে দর্শন লভি কি তার উপায় ?

তুকা। উপায় বর্ত্তিকা ধরি সৌভাগ্য দেবতা

রহেন হাজির নিজে ভাগ্যবান দ্বারে,

পূরাইতে মনোরথ ইচ্ছার সঙ্গেতে।
যাইবেন যত বালা অরুণাবতীর
আহুতির ডালি লয়ে গ্রামপথ দিয়া
বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে পর্জ্জণ্য মন্দিরে
মঙ্গল প্রার্থনা তরে নূতন বৎসরে।

রাজা। হৃদয় পুলকভরে উঠিছে নাচিয়া।
উত্তম সুযোগ্য বটে! আজ কোন্ তিথি?

তুকা। দ্বাদশী রাজন্, দুটা দিন মাঝে শুধু!

রাজা। সুদীর্ঘ সময় তবু! এই দুটা দিনে
বাঁচিব মরিব কিবা থাকিব কোথায়,
সব অনিশ্চিৎ!

তুকা। তবে চলুন, অরুণা
প্রতি সন্ধ্যা উপকূলে আসেন ভ্রমিতে,
অন্তরালে থাকি মোরা লভিব দর্শন।

রাজা। কঠোর সৈনিকব্রতে কোথা স্বাধীনতা?
আপনার সুখ দুঃখ তুচ্ছ অবহেলা।
গুপ্তচর যতক্ষণ নাহি আসে ফিরি
এখানে থাকিতে হবে। ঐ ভেপু বাজে
চল যাই দেখিবারে সৈন্যসমাবেশ।
ভাগ্যে যদি থাকে তবে পূর্ণিমা তিথিতে
লভিব দর্শন তবে পূর্ণিমা চন্দ্রের।
এখন নিরাশা বহি থাকি প্রতীক্ষায়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় দৃশ্য।

সদাশিব শ্রেষ্ঠীর ভবন।—(প্রাঙ্গনে ভৃত্য দামোদরের প্রবেশ)।

ভৃ। দূত আসে স্রোতবৎ! ন ভূত ন ভবিষ্যৎ!
বিয়ে কোথা তার ঠিক নেই!
কোথা যাস্ ওগো সই, আয় দুটো কথা কই,

(বিন্দু দাসীর প্রবেশ।)

বি। কথার সময় বটে এই!
কত পড়ে আছে কাজ, দিদিদের বাকী সাজ,
তোর সাথে গল্প করি মিছে।
যা তুই পোড়ার মুখো, নিশ্চয় রাখিব ভুখো,
ডাকিস্ আবার যদি পিছে।

ভৃ। এত কেন রাগ বিন্দে, করিনিত পতিনিন্দে!
মজার কথাটা ছাই শোন্না,
এসেছে পঞ্চাশ দূত, সমান নাছোড় ভূত,
ভোর থেকে চলিয়াছে ধন্না!

বি। মিছে তাহাদের কষ্ট, শোন তোরে বলি পষ্ট,
বড় দিদি করিয়াছে পণ;
দ্বাপর যুগের পারা, হবে সাধে স্বয়ম্বরা,
মনোমত মিলিলে রতন।

ভৃ। তুই ত বল্লিলি বেশ, এ নহে কলির শেষ,
সে কথা কি পিতা শুনিবেন।
রূপে গুণে কার্ত্তিকেয়, ঠিক নাহি মিলিলেও,
একটীরে ধরিয়া দিবেন।

(একজন ঘটকের প্রবেশ।)

ভূ। এই যে ঘটকবর? কি খবর কি খবর,
আজি কিছু হোল স্থির স্থার?
বি। বুঝি না এ কোন তর', মেলেনা একটা বরও
রূপবতী এমন কন্যার!
ঘ। মিছে হায় দোষ কেন, মত্ত মধুকর হেন,
কত শত সুন্দর সুগুণ—
শুনিয়াই শুধু কাণে, উর্ব্বশীর রূপ গানে,
আত্ম বিকাইতে পদে খুন।
প্রতিদিন অবিরত, ঘটকালী আনি কত,
মনেও থাকে না তাহা ছাই;
কিন্তু হায় কোনটিতে, শ্রেষ্ঠী তুষ্ট নন্ চিতে,
কি করিব ভেবে নাহি পাই।

(দ্বিতীয় ঘটকের প্রবেশ)।

দ্বি-ঘ। আনি যদি রূপবান, রূপ না দেখিতে পান,
গুণে পুনঃ কন তদ্বৎ।
প্র। ইথে কি করিবে দূত!
দ্বি। এযে বড় অদ্ভুত!
প্র। আর যদি আসি নাকে খৎ।
উভয়ে। এই নাকে কাণে খৎ।

(উভয়ের প্রস্থান)।

বি। ঠিক ত বলেছে হায়, কোথা বল পাওয়া যায়—
অমন মেয়ের যোগ্য বর!

ভূ। ভাল হোক হোক মন্দ, বিয়ে ত রবে না বন্ধ,
নারী জন্ম যার ধরা পর।
দেখিছনা অন্য দিক, বড়র না হলে ঠিক,
ছোটরি কেমনে হয় বিয়ে!

বি। বড় আহা মায়া করে, আলোকের পাশে প'ড়ে,
ফুলটি যেতেছে শুকাইয়ে!

(তৃতীয় ঘটকের প্রবেশ।)

ভূ। এই যে ঠাকুর বুড়া—হাসি যে ধরে না খুড়া,
এবার বুঝি বা মিষ্টভোগ,—

ঘ। সুখে থাক বাছাধনা, মিষ্টিছাড়া দিব সোনা,
মোর সাথে যদি দাও যোগ।

ভূ। তা বটে! এমন তর'! কি করিব, আজ্ঞা কর।

ঘ। কর্ত্তা ত হয়েছে নিমরাজি,—
গিন্নি মিলিলেই মতে—

ভূ। কেল্লা বুঝি কর ফতে,—
বিন্দেমণি এ কাজের কাজি।

বি। আগেই লাফাস্ কিরে, বোঝ সব কথা ধীরে,
শোন্ আগে সুপাত্র কেমন?

ঘ। সে কথা কি বলি আর! রূপে গুণে চমৎকার,
রবি শশী যেন দুই জন।

বি। দুজনের দুই বর! মস্ত বটে সুখবর!

ঘ। তুমি যদি এবে দাও আশা—

ভূ। বলিতে হবে না আর, বিন্দেমণি এইবার,
সর্ব্বঘটে লইবেন বাসা।

বি। ঠাট্টা রাখ্ হতভাগ্যা।

ঘ। দেখ বাছা দিব তাগা—
গিন্নিটিকে ব'লো ভাল করে।

বি। তবেই ত বড় দিবে ?

ঘ! শোন বলি নিরিবিলে,
শতনরে কণ্ঠ দিব ভ'রে।

ভৃ। ঠাকুর হবে না তাতে, কাঁকণটি চাই হাতে,
কর্ণে আর চাই স্বর্ণদুল ;
চন্দ্রহার কটিতটে—

বি। বলেছিস ভাল বটে !

ভৃ। শিরে স্বর্ণ কেশবন্ধ ফুল।

ঘ। বেশ বেশ সবি হবে, আশা যদি দাও তবে
এই কার্য্যে করিবে উদ্ধার ;

বি। সে কথা কেন গোঁ কও, নিশ্চিন্ত হইয়া রও
রহিল আমাতে সব ভার।

ভৃ। সবই ত হইল ঠিক, বিন্দে সোণা দানা নিক্,
আমি কি যাইব খুড়ো ফাঁকি ?
কর্ত্তাটি আমার নিজ, সেকথা ভুলোনা দ্বিজ।

ঘ। রাম রাম কভু হয় তাকি !
তোকে আগে দিব শাল,

ভৃ। কে বহিবে যেন জঞ্জাল,
দিও মোরে আধাআধি ভাগ।

ঘ। কি কথা বলিস্ ওরে।

ভৃ। পেট যদি নাহি ভরে—
কেমনে মানিব বল বাগ ?

ঘ। তাই হবে আচ্ছা আচ্ছা ?

তু। বলিছ ত খুড়ো সাঁচ্চা ?

ঘ। তোর দিব্য কারিনু শপথ।

তু। নাচ তবে নাচ খুড়া—

ঘ। তোরা নাচ আমি বুড়া—

তু। তাকি ছাড়ি তুমি ধর পথ।

এত দিবসের পর, মিলিয়াছে ভাল বর,

আনন্দ সুদিন বড় আজ।

সবে মিলে নাচে গানে কাটাইব দিনমানে—

বি। মোর হয়ে কে করিবে কাজ ?

সোহিনী—খেমটা।

ফুটলো ফুল এত দিনে সাধের বিয়ে !

সুখের জোয়ারে মোদের ভাসিল হিয়ে।

আজিকে হোক খেলে, কাজের ভাবনা ফেলে

দিন কাটাব অবহেলে, রঙ্গে মাতিয়ে।

বাজাও সারঙ্গ মন্দিরা মৃদঙ্গ

গাহ গাহ সঙ্গে করতালি দিয়ে।

রুণ ঝুন্ ঝুন্ ঘুঙ্ঘুরে বাজে কি মধুরে

নাচ ঘুরে ঘুরে ফিরে ফিরিয়ে।

আহাহা কি বাহা মন মজিয়ে।

(নৃত্য গীতে পটক্ষেপণ।)

[ক্রমশঃ]।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

কালিকট্ট।

ভারতবর্ষের পশ্চিম-দক্ষিণ ভাগে মালবর উপকূলে যে স
বন্দর আছে, তন্মধ্যে একটির নাম কালিকট্ট বা কালিক
ইহা মান্দ্রাজ বিভাগের মালবর নামক জেলার অন্তর্গত। পশ্চিম সমু
চলোর্ম্মি-প্রহৃত স্থান-সমূহের মধ্যে কালিকট একটি অতি প্রাচীন
প্রখ্যাত সহর। কত যুগ যুগান্তরের প্রাচীন-কাহিনী বক্ষে করিয়া আজি
কালিকট আছে—মুসলমান, পর্টুগীজ, ইংরেজ প্রভৃতি কত জাতি
অত্যাচার ও অবিচার যে অবিরত প্রলয় পবনের মত ইহার অঙ্গপ্রত্য
নিষ্পেষিত এবং গর্ব্ব-গৌরব নিঃশেষিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই
কতবার উঠিয়া পড়িয়া, বাড়িয়া কমিয়া, ক্ষুদ্র সহর কালিকট আজি
আছে এবং চিন্তাশীল পরিদর্শকের তথ্যানুসন্ধিৎসা বর্দ্ধিত করিয়
দিতেছে। যখন পর্টুগীজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকের সহিত কালিকটের
বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল, তখন এই স্থান হইতে একপ্রকার রঙ্গিন সূত্রবস্ত্র
ইয়ুরোপখণ্ডে আমদানী হইত। ঐ প্রকার বস্ত্র প্রথম কালিকট
হইতে পাওয়া যাইত বলিয়া, উহার নাম রাখা হইয়াছিল "কালিক"
(Calico)। যদিও সে প্রকার বস্ত্র এখন আর কালিকট হইতে
প্রেরিত হয় না, তথাপি সে "কালিক" নাম যায় নাই—এবং কখনও
যাইবে না। ইয়ুরোপীয় ভৌগলিক পুস্তক হইতে নগণ্য কালিকটের
সামান্য নাম মুছিয়া গেলেও আভিধানিক পুস্তক হইতে এ নাম কখনও
মুছিবে না।

কালিকট্ট নামের উৎপত্তি রহস্যময়। কালিকট্ট যে মালবরের
অংশমাত্র, তাহা প্রাচীন কেরল-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে,
ক্ষত্রিয়কুল-নিসূদন মহাবীর পরশুরাম এক সময়ে এই স্থানে বাস

করিতেন; তখন মালবর সমুদ্রজল-প্লাবিত ছিল। প্রবাদ এই যে, পরশুরামেরই তপস্যাফলে এস্থান মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত হয়। তিনি আর্য্যাবর্ত্ত হইতে ব্রাহ্মণ আনাইয়া এস্থানে বসতি করাইয়াছিলেন। এই উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ নায়র নামে কথিত হইতেন। "নায়র" বা নায়ক একই অর্থবোধক শব্দ; যাঁহারা সমাজের নেতা বা প্রধান তাঁহারাই এই নামে অভিহিত হন। এখনও মালবর উপকূলে নায়র ও মাদুরা অঞ্চলে নায়কাদগের চিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। নায়রেরা দেশমধ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তবে শাসনকার্য্যের সুশৃঙ্খলার জন্য তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী চের-রাজ্য হইতে পাঁচ বৎসর অন্তর এক একজন শাসনকর্ত্তা আনাইতেন। উহাদিগকে পেরুমল বলিত। কোন কোন ইংরাজ-লেখক উহাকে পারমালু (Permaloo) বলিয়াছেন। একে একে বহুসংখ্যক পেরুমল মালবরে রাজত্ব করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী মুসলমানগণ যখন ধর্ম্ম, বাণিজ্য বা সাম্রাজ্য বিস্তারার্থ চতুর্দ্দিকে বহির্গত হয়, তখন তাহাদের কয়েক দল ক্রমে ক্রমে দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যবহুল পশ্চিমোপকূলে আসিয়া বাস করে। তাহাদের প্ররোচনায় মালবরের শেষ পেরুমল মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তখন শাসন-কর্ত্তার এইরূপ ধর্ম্মহানি হওয়াতে ব্রাহ্মণ-প্রধান মালবরে মহাহুলস্থূল উপস্থিত হয়। অধিকাংশ নায়রেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। সম্ভবতঃ শেষ পেরুমলের নাম চিরুমন ছিল; চিরুমন কিছুদিনের জন্য উক্ত বিদ্রোহীদিগের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। অবশেষে যখন যুদ্ধফল অপ্রীতিকর হইল এবং বিবাদ-বিসম্বাদ কিছু বিষম-অবস্থায় উপস্থিত হইল, তখন তিনি স্বীয় রাজ্য আত্মীয়স্বজনের ভিতর বিভক্ত করিয়া দিয়া, মক্কাবাসী হইলেন। যখন তাঁহার রাজ্য বিভক্ত হইয়া গেল, তখন তাম্বুরী বা সমিরী নামক তাঁহার জনৈক নীচপদস্থ প্রিয় পাত্র অনুগ্রহপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইল। তখন চিরুমন তাহাকে স্বীয়

তরবারি দান করিলেন এবং একটি নির্দ্দিষ্ট মন্দির হইতে কুক্কুট ডাকিতে লাগিলে তাহার শব্দ চতুর্দ্দিকে যতদূর পর্য্যন্ত শ্রুত হয়, ততটুকু মাত্র রাজ্য অর্পণ করিলেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্যের নাম হইল "কালিকত্তু"— কারণ তামীল ভাষায় "কালিকত্তু" শব্দের অর্থ "কুক্কুট-নাদ।" এই "কালিকত্তু" শব্দ হইতেই অবশেষে কালিকট্ট বা কালিকট হইয়াছে। তামুরী রাজার বংশধর বলিয়া কালিকটের রাজগণ সকলেই "তামুরীণ" বলিয়া খ্যাত হইতেন। এই তামুরীণদিগকেই পর্টুগীজগণ "জামরীণ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এক্ষণে জামরীণ নামই প্রচলিত হইয়াছে। ইহা কোনও নৃপতিবিশেষের নাম নহে—কালিকটের রাজগণের সাধারণ উপাধিমাত্র।

জামরীণগণ নীচবংশীয় হইলেও হিন্দু ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কতকগুলি এরূপ প্রথা ছিল যে, তাহা ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের মধ্যে সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ করা যায় না। জামরীণগণ বিবাহ করিতেন না; তাঁহারা উপপত্নী রাখিতেন। একজন জামরীণ দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইতেন না; তাঁহার ভ্রাতাই পরবর্ত্তী জামরীণ হইতেন। যদি ভ্রাতা না থাকিত, তবে ভগিনীর পুত্র সিংহাসনের অধিকারী হইতেন। মৃত্যুকালে জামরীণগণ হিন্দু দেবমন্দিরে গিয়া মরিতেন; তাঁহারা শ্মশ্রু রাখিতেন না। তাঁহারা যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব দেখাইতেন, এবং যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং সৈন্যপরিচালনা করিতেন। যদি কোনও নৃপতি নিহত হইতেন, তাহা হইলে তৃতীয় দিবসে তাঁহার আত্মীয়স্বজনের সম্মুখে চন্দন-কাষ্ঠের চিতায় সেই মৃতদেহ ভস্মীভূত করিয়া, ঐ ভস্ম সমাধিস্থ করা হইত। যে কোনও কারণেই হউক, কোন জামরীণ দেহত্যাগ করিলে, তাঁহার আত্মীয়স্বজনবর্গের মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা শোকচিহ্নস্বরূপ শ্মশ্রুকেশাদি মুণ্ডন করিতেন, এবং এক পক্ষ কালের মধ্যে কেহই তাম্বুলসেবন করিতে

পারিতেন না। যদি কেহ এই রীতি লঙ্ঘন করিতেন, তাহা হইলে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দ্বারা তাঁহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিয়া দেওয়া হইত। এই এক পক্ষ পরে নূতন জামরীণ সিংহাসনলাভ করিতেন। জামরীণদিগের অশৌচব্যবস্থা কতকাংশে ক্ষাত্রিয়দিগের তুল্য ছিল। পূর্ব্ববর্ত্তী জামরীণের মৃত্যুজনিত অশৌচ তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা যেরূপ একপক্ষমাত্র পালন করিতেন, নবনির্ব্বাচিত জামরীণকে সেই অশৌচ পূর্ণ এক বৎসর কাল পালন করিতে হইত। এই সময়ের মধ্যে তিনি তাম্বুল-চর্ব্বণ ও মৎস্যমাংসাদি আহার করিতে পারিতেন না; ক্ষৌরকার্য্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল; এমন কি নখ পর্য্যন্তও কাটিতে পারিতেন না।

নায়রগণ যোদ্ধৃধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জীবনপাত করিতেন। প্রাচীন স্পার্টানদিগের মত তাঁহারা এক যোদ্ধৃজাতি ছিলেন। তাঁহাদিগকে যোদ্ধৃসম্প্রদায়ে পরিণত করিবার জন্য নানক, গুরুগোবিন্দ বা লাইকারগাসের মত কোনও আদি গুরুর আবির্ভাব হইয়াছিল কিনা জানা যায় না। সাতবৎসর বয়স হইতেই তাঁহারা শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতেন; এই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার জন্য বহুসংখ্যক সুনিপুণ গুরু ছিলেন। নায়রগণ চিরজীবন এই গুরুসম্প্রদায়কে অত্যধিক সম্মান করিয়া চলিতেন। শৈশবিক শিক্ষালাভের পর নায়রগণ বীরধর্ম্মে যথারীতি দীক্ষিত হইতেন; দীক্ষাগ্রহণের পর অস্ত্রধারণ করিবার ক্ষমতা পাইতেন, এবং আবশ্যকমত যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পারিতেন। জামরীণই এইরূপ দীক্ষিত করিতেন; ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজা যেরূপে শাস্ত্রপারদর্শী ব্যক্তিকে "নাইট" উপাধি প্রদান করিয়া থাকেন, মালবারেও সেইরূপে জামরীণ নায়রগণকে যোদ্ধৃধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন। নায়রবার রণশিক্ষা সমাপন করিয়া, আত্মীয়স্বজন সহ জামরীণসমীপে উপনীত হইতেন, এবং তাঁহাকে রীত্যনুসারে স্বর্ণমুদ্রা উপঢৌকন দিয়া, স্বীয় অভিপ্রায় জানাইতেন। তখন জামরীণ তাঁহার

উদেশে একখানি তরবারি অর্পিত করিয়া দিতে অনুমতি করিতেন, ং ঈশ্বরের নামে তাঁহাকে দীক্ষিত করা হইত।

নায়রগণ সকলেই প্রায় জামরীণের অর্থে ও যত্নে প্রতিপালিত তেন। মন্ত্রী, ধনাধ্যক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে ইঁহারাই নিযুক্ত হইতেন। প্রধান মন্ত্রীকে "গজীল" বলা হইত। য়রদিগকে কখন কোন অপরাধে কারাগারে যাইতে হইত না; ব যদি তাঁহারা কখনও অন্য কোন নায়র বা গোহত্যা করিতেন, বা জামরীণের কুৎসা প্রচার করিতেন এবং রাজদ্রোহী হইতেন, নই তাঁহাদিগের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইত। কোন নায়র দ্রোহী হইলে, রাজাজ্ঞায় একদল নায়র নিষ্ক্রান্ত হইতেন এবং ানে সেই অপরাধীকে পাইতেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে ্যা করিয়া, তাঁহার মৃতদেহে দণ্ডাজ্ঞা লাগাইয়া দিয়া আসিতেন।

নায়রগণ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। নায়রগণ য পথ দিয়া যাইতেন, তখন উঁহাদিগকে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিতে ত। যদি কেহ এ নিয়ম লঙ্ঘন করিত, নায়র তাহাকে তৎক্ষণাৎ স্থানে নিহত করিতে পারিতেন। নায়রদিগের প্রতাপ এতই ধিক ছিল যে অনেক লোক তাঁহাদের ভয়ে অরণ্যে বা জঙ্গলে য়িত হইত। এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকই পরিণামে মুসলমান দীক্ষিত হইয়াছিল; কারণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, নায়রদিগের হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত।

নায়রগণই দেশমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতেন, কারণ তাঁহারা ন্ত হইলে, জামরীণ তাঁহাদের কিছু করিতে পারিতেন না। প্রস্তাবে জামরীণ স্বয়ং নায়র-সম্প্রদায়ের করাঙ্গুলি-চালিত ন। তবে কালিকটের অধিবাসিগণ যে বহুদিন পর্য্যন্ত মুসলমান র্গীজ প্রভৃতি বৈদেশিকগণের ভীষণ আক্রমণ হইতে

রতে সক্ষম হইয়াছিলেন, নায়রগণের বীরত্ব, সাহস, রণনিপুণতা স্বদেশপ্রেমিকতাই তাহার একমাত্র কারণ। অল্পসংখ্যক সুদক্ষ, সিক এবং উৎসৃষ্টপ্রাণ রণবীর কিরূপে প্রচণ্ড শত্রুর বিরাট নীকিনীর সম্মুখীন হইতে পারে, জগতের ইতিহাসে গ্রীক, রাজপুত বুয়রগণ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কালিকটের নায়র-সম্প্রদায়ের দশপূজাও সেই জাতীয় ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী মুসলমানগণ বাণিজ্যার্থে কালিকটে সিয়া বাস করেন। তাঁহাদের যে সম্প্রদায় বাণিজ্যবলে প্রসিদ্ধিলাভ রিয়া, এই স্থানের অধিবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "মপলা" "মপলাই" বলে। উত্তরকালে তাঁহারা ক্রমে সমস্ত দক্ষিণ ভারতে প্তি হইয়া পড়েন। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগে এখনও মপলার খ্যা প্রায় সাত লক্ষ হইবে। অবশ্য এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোক-গের সংস্রবে উহাদিগের লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অরবীয়দিগের আগমনকালে কালিকট দক্ষিণ ভারতের একটি ধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। তখন কালিকটের সুবিস্তৃত পণ্যবীথিকা নাদিগ্দেশাগত দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ থাকিত। আরবীয়দিগের দ্বারা না দেশ হইতে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য আনীত হইত, তাহাও কালিকট ইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নীত ও বিক্রীত হইত; এবং ভারত-মির নানা স্থানের দ্রব্যজাতও কালিকটে আসিয়া—লোহিত ও রস্য সাগরের বাণিজ্যের জন্য প্রেরিত হইত। এই সময়ে রোমীয়গণ মধ্যসাগরের এবং আরবীয়গণ লোহিতসাগরের বাণিজ্যাধিপতি ছিলেন লনদের মোহানাস্থিত আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরী ভূমধ্যসাগরের াণিজ্য-কেন্দ্র ছিল; তথা হইতে ইয়ুরোপীয় পণ্যভার আরবীয়-গের দ্বারা কালিকটে আনীত হইত। এইরূপে ইয়ুরোপীয় ও এশিয়ার ধ্যবর্ত্তী হইয়া, কালিকট সর্ব্বদেশীয় পণ্যরাজির ভাণ্ডারস্বরূপ হইয়া-

কটিদেশে একখানি তরবারি অর্পিত করিয়া দিতে অনুমতি করিতেন, এবং ঈশ্বরের নামে তাঁহাকে দীক্ষিত করা হইত।

নায়রগণ সকলেই প্রায় জামরীণের অর্থে ও যত্নে প্রতিপালিত হইতেন। মন্ত্রী, ধনাধ্যক্ষ প্রভৃতি যাবতীয় প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে তাঁহারাই নিযুক্ত হইতেন। প্রধান মন্ত্রীকে "গজীল" বলা হইত। নায়রদিগকে কখন কোন অপরাধে কারাগারে যাইতে হইত না; তবে যদি তাঁহারা কখনও অন্য কোন নায়র বা গোহত্যা করিতেন, অথবা জামরীণের কুৎসা প্রচার করিতেন এবং রাজদ্রোহী হইতেন, তখনই তাঁহাদিগের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইত। কোন নায়র রাজদ্রোহী হইলে, রাজাজ্ঞায় একদল নায়র নিষ্ক্রান্ত হইতেন এবং যেখানে সেই অপরাধীকে পাইতেন, সেই স্থানেই তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিয়া, তাঁহার মৃতদেহে দণ্ডাজ্ঞা লাগাইয়া দিয়া আসিতেন।

নায়রগণ নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। নায়রগণ যখন পথ দিয়া যাইতেন, তখন উঁহাদিগকে সসম্মানে পথ ছাড়িয়া দিতে হইত। যদি কেহ এ নিয়ম লঙ্ঘন করিত, নায়র তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে নিহত করিতে পারিতেন। নায়রদিগের প্রতাপ এতই অত্যধিক ছিল যে অনেক লোক তাঁহাদের ভয়ে অরণ্যে বা জঙ্গলে লুক্কায়িত হইত। এই সমস্ত নিম্নশ্রেণীর লোকই পরিণামে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল; কারণ মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, নায়রদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত।

নায়রগণই দেশমধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতেন; কারণ তাঁহারা সম্মিলিত হইলে, জামরীণ তাঁহাদের কিছু করিতে পারিতেন না। প্রকৃত প্রস্তাবে জামরীণ স্বয়ং নায়র-সম্প্রদায়ের করাঙ্গুলি-চালিত হইতেন। তবে কালিকটের অধিবাসিগণ যে বহুদিন পর্য্যন্ত মুসলমান ও পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি বৈদেশিকগণের ভীষণ আক্রমণ হইতে [illegible]

করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, নায়রগণের বীরত্ব, সাহস, রণনিপুণতা ও স্বদেশপ্রেমিকতাই তাহার একমাত্র কারণ। অল্পসংখ্যক সুদক্ষ, সাহসিক এবং উৎসৃষ্টপ্রাণ রণবীর কিরূপে প্রচণ্ড শত্রুর বিরাট অনীকিনীর সম্মুখীন হইতে পারে, জগতের ইতিহাসে গ্রীক, রাজপুত ও বুয়রগণ তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কালিকটের নায়র-সম্প্রদায়ের স্বদেশপূজাও সেই জাতীয় ছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে দিগ্বিজয়ী মুসলমানগণ বাণিজ্যার্থে কালিকটে আসিয়া বাস করেন। তাঁহাদের যে সম্প্রদায় বাণিজ্যবলে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া, এই স্থানের অধিবাসী হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে "মপলা" বা "মপলাই" বলে। উত্তরকালে তাঁহারা ক্রমে সমস্ত দক্ষিণ ভারতে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন। মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিভাগে এখনও মপলার সংখ্যা প্রায় সাত লক্ষ হইবে। অবশ্য এতদ্দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের সংস্রবে উহাদিগের লোক সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

অরবীয়দিগের আগমনকালে কালিকট দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল। তখন কালিকটের সুবিস্তৃত পণ্যবীথিকা নানাদিগ্দেশাগত দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ থাকিত। আরবীয়দিগের দ্বারা নানা দেশ হইতে যে সমস্ত পণ্যদ্রব্য আনীত হইত, তাহাও কালিকট হইতে ভারতবর্ষের নানা স্থানে নীত ও বিক্রীত হইত; এবং ভারতভূমির নানা স্থানের দ্রব্যজাতও কালিকটে আসিয়া—লোহিত ও পারস্য সাগরের বাণিজ্যের জন্য প্রেরিত হইত। এই সময়ে রোমীয়গণ ভূমধ্যসাগরের এবং আরবীয়গণ লোহিতসাগরের বাণিজ্যাধিপতি ছিলেন নীলনদের মোহানাস্থিত আলেকজেণ্ড্রিয়া নগরী ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল; তথা হইতে ইয়ুরোপীয় পণ্যভার আরবীয়দিগের দ্বারা কালিকটে আনীত হইত। এইরূপে ইয়ুরোপীয় ও এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী হইয়া, কালিকট সর্ব্বদেশীয় পণ্যরাজির ভাণ্ডারস্বরূপ হইয়া-

ছিল। এস্থানে নানাদেশীয় স্বর্ণ, তাম্র, পারদ প্রভৃতি ধাতু, গোলকুণ্ডা ও সিংহল প্রভৃতি স্থানের মূল্যবান্ প্রস্তর, বঙ্গদেশের রেশম ও সূত্র-বস্ত্র, গুজরাট প্রভৃতি দেশের গজদন্ত ও কস্তুরী, ইয়ুরোপাঞ্চলের সিন্দূর, ফট্‌কিরি ও প্রবাল, বসোরা প্রভৃতি স্থানের কার্পেট, গোলাপ জল, মোম ও নানাবিধ ফলের মোরব্বা, এবং কালিকট ও তৎসন্নিহিত স্থানের নানাবিধ মসলা, ভেষজ ও শস্য পাওয়া যাইত। ইয়ুরোপীয়গণ ভারতবর্ষে আসিবার বহুপূর্ব্বে কালিকটের বাণিজ্য-বহুলতার সংবাদ অবগত হইয়াছিলেন।

ইউরোপীয়দিগের মধ্যে পর্টুগীজেরাই প্রথম বাণিজ্যার্থ ভারতবর্ষে আসেন; কারণ রাজ্যবিজিগীষু সেকন্দর, গ্রীক্‌দূত মিগাস্থিনিস্ বা পর্য্যটক মার্কো পোলো প্রভৃতি যাঁহারা ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ছিল। ভারতবর্ষে কালিকটেই প্রথম পর্টুগীজেরা অবতরণ করেন। কভিলহান্ (Covilhan) নামক এক দুঃসাহসিক পর্টুগীজ ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে কালিকটে আসেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু নিশ্চয়ই তিনি আরব বা আফ্রিকা হইতে বিপদসঙ্কুল স্থলপথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং হয়ত পারস্য উপসাগরের কোন বিখ্যাত বন্দর হইতে আরবীয় জাহাজে কালিকটে অবতরণ করিতে সমর্থ হন। ইয়ুরোপীয় অর্ণবপোতে ভাস্কো ডা গামাই প্রথম কালিকটে আসেন।

পঞ্চদশশতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে পর্টুগীজগণ সমুদ্রাভিজ্ঞানে সমধিক অভ্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে রোমীয় ও ভিনিসীয় বণিক্‌-গণই আরবীয়দিগের সাহায্যে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে-ছিলেন। তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবার জন্য নবোত্থিত পর্টুগালের নবোৎসাহী নরপতি লোকবল ও অর্থবলের সদ্ব্যবহারে দৃঢ়সঙ্কল্প হন। প্রত্যক্ষভাবে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিতে না পারিলে রোমীয়-

দিগকে পরাজিত করিতে পারা যায় না; প্রত্যক্ষ-বাণিজ্য করিতে হইলে জলপথ আবিষ্কার করা একান্ত প্রয়োজনীয়; এজন্য পর্টুগীজ-গণ প্রাণপণে অর্ণবপথে ভারতবর্ষে পৌঁছিবার জন্য চেষ্টাবান্ হন। পঞ্চদশশতাব্দীর প্রথমভাগেই তাঁহারা আফ্রিকার পশ্চিমভাগের মদিরা প্রভৃতি দ্বীপ হস্তগত করিয়াছিলেন; পরবর্ত্তী অর্দ্ধশতাব্দীকাল তাঁহাদের বাণিজ্য আফ্রিকায় স্বর্ণোপকূলের সহিত মৃদুমন্দভাবে চলিতে-ছিল। কিছুদিন পরে ডিয়াজ্ (Diaz) নামক এক ব্যক্তি ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দক্ষিণ সীমায় উপস্থিত হন। তিনি আর অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। এদিকে যখন ছয় বৎসর পরে স্পেনদেশীয় নাবিক কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন, তখন পর্টুগীজেরা ভারতবর্ষ আবিষ্কার করিয়া, প্রতিবেশীর নবগর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য মহোৎসাহিত হইলেন। নৃপতি এমানুয়েল এই উদ্দেশ্যে তিনখানি জাহাজ সজ্জিত করিয়া যে বিরাট অভিযানের আয়োজন করিলেন, ভাস্কো ডা গামা নামক এক ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাহার অধ্যক্ষ নিয়োজিত হইলেন। তিনি বহুকষ্টে আফ্রিকার দক্ষিণসীমা বেষ্টন করিয়া ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে মে তারিখে কালিকটে অবতরণ করিলেন।

যে আরবীয় মপলাগণ কালিকটের বিপুলবাণিজ্য একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সহিত ভাস্কো ডা গামার প্রথম বিবাদ উপস্থিত হয়; কারণ সমব্যবসায়ী দুইজনের কখনই মিল হয় না। যদিও উপঢৌকন-মাহাত্ম্যে জামরীণের সহিত আংশিক সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া, কর্ম্মচতুর পর্টুগীজ্-নাবিক স্বদেশীয় অথ ও অকিঞ্চিৎকর পণ্য-বিনিময়ে প্রয়োজন মত ভারতবর্ষজাত দ্রব্যসম্ভার প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিলেন, তবুও কিন্তু দুরভিসন্ধিশালী আরবীয়গণ তাঁহাকে কয়েক-দিন যাবৎ কঠোর কারাযন্ত্রণা ভোগ করাইতে নিবৃত্ত হয় নাই। অবশেষে ভাস্কো "বিলধেনালম্" নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া অনুকূল পবনের

অপেক্ষা না করিয়াই ভারাক্রান্ত জাহাজদ্বয়ের পক্ষবিস্তার করিয়াছিলেন।

যখন পথের সন্ধান পর্টুগালে পৌঁছিল, তখন হর্ষোৎফুল্ল মুক্তহস্ত নৃপতির পক্ষে ভাস্কোকে কিছুই অদেয় রহিল না, এবং দিনে দিনে নব নব অভিযানে ভারতাগমনের পথ সহজ ও সংক্ষিপ্ত করিয়া দিতে লাগিল। ভারতের ঐশ্বর্য্যই তাহার অবস্থা বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল; ভারতের পণ্য তাহাকে দৈন্য দশায় আনয়ন করিল। রণক্ষেত্রে বৈদেশিক বণিকের সহিত সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধ করিতে গিয়া, কালিকটকে বারংবার ক্ষত বিক্ষত হইতে হইয়াছিল। সে ক্ষত নাই কিন্তু চিহ্ন আছে।

ভাস্কো ডা গামা প্রত্যাগত হইলে, বৎসর ফিরিতে না ফিরিতে এলভারেজ কেব্রাল (Alvarez Cabral) নামক আর একজন বিখ্যাত পর্টুগীজ বীর ১০।১২ খানি জাহাজ লইয়া ভারতবর্ষে আসিলেন। তিনিও আসিয়া কালিকটেই বাণিজ্যার্থ অবতরণ করিলেন। মপলাগণ পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল; আসিবামাত্রই তাহাদের সহিত সংঘর্ষ হইল। তাহাদের প্ররোচনায় এবার আর জামরীণ পর্টুগীজদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ ভাস্কো যাইবার সময়ে গোয়ার বাণিজ্যতরী গুলির উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ এত দিনে কালিকটে পৌঁছিতে বাকী ছিল না। এদিকে কেব্রালের উপরও রাজকীয় হুকুম ছিল যে, "তিনি ধর্ম্মালোকবিকীরণে বাধা প্রাপ্ত হইলে তরবারিসাহায্যে কার্য্য সংক্ষেপ করিয়া লইতে পারিবেন।" এজন্য জামরীণের ব্যবহারে "অগ্নিশর্ম্মা" হইয়া, কেব্রাল বন্দরের আরব্যজাহাজগুলিকে বিনষ্ট করিলেন, এবং সহরের উপর গোলা নিক্ষেপ করিয়া, তাহারও যথেষ্ট ধ্বংস করিতে ত্রুটী করেন নাই।

দুই বৎসর পরে জোয়ান ডি নুয়েভা (Joan Di Nueva) নামক আর একজন নাবিক আসিয়া কিছুদিন কালিকটে ছিলেন ; কিন্তু তাঁহার বিশেষ কোন অত্যাচারকাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করে নাই। ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামা দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আসেন। পূর্ব্ববার আরবীয়েরা তাঁহাকে যে কারাযন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ দিবার জন্য ভাস্কো তাহাদের কতকগুলি বাণিজ্যতরী সবলে কবলগত করিলেন। জামরীণের সহিত সন্ধি হইল না ; পর্টুগীজদিগের অসার উপহারের চাকচিক্য বারংবার কাহারও নয়নের তৃপ্তিসাধনে সক্ষম ছিল না। সদ্ভাবে সন্ধি না হওয়াতে, নগরের উপর অজস্র গোলাবর্ষণ ও রাজপ্রাসাদের ধ্বংসসাধন প্রভৃতি অনুষ্ঠান ভাস্কোর দ্বিতীয় অভিযানের বার্ত্তা রক্তাক্ষরে রক্ষা করিল। তাঁহার সহিত আরবীয়দিগের একটি জলযুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি শত্রুপোত ধৃত, লুণ্ঠিত ও দগ্ধীভূত করা হয় এবং বন্দীকৃত মপলাগণ নির্দ্দয়রূপে নিহত হইয়া জন্মের মত নিষ্কৃতি লাভ করে।

ইহার পরে যিনি আসিলেন, তাঁহার নাম আলমিডা (Francisco d'Almeida। তিনিও দ্বাবিংশ অর্ণবযান সহকারে কালিকটে আগমন করেন। তাঁহার সহিতও আরবীয়দিগের কয়েকটি যুদ্ধ হয়। তিনিই ভারতীয় পর্টুগীজ-রাজ্যের ভিত্তি সংস্থাপন করেন। তিনিই ঐ সকল অধিকারের প্রথম রাজপ্রতিনিধি বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ১৫০৯ খৃষ্টাব্দে ফার্ণাণ্ডো কন্‌টিনহো (Marshal Don Fernando Continho) কালিকট আক্রমণ করিয়া বিফলমনোরথ হন। পর বৎসর সুপ্রসিদ্ধ পর্টুগীজবীর আল্‌বুকার্ক (Alfonso d'Albuquerque) তিন সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে কালিকট আক্রমণ করেন ; এবার পর্টুগীজগণ সহরে অগ্নি সংযোগ করিয়া দিয়া, জামরীণের রাজপ্রাসাদ লুণ্ঠন করেন। তখন পলায়নপর জামরীণ নায়র-

যোদ্ধৃগণকে সমবেত করিয়া, প্রণষ্ট গৌরব রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। চেষ্টা সফল হইয়াছিল; দুর্দ্ধর্ষ নায়রসম্প্রদায়ের দারুণ যুদ্ধে পর্টুগীজগণ পরাজিত হন, এবং পলায়নপূর্ব্বক পোতারোহণ করিয়া কালিকট পরিত্যাগ করেন। কালিকটে পরাজিত হইলেও অদ্ভুতকর্ম্মা আল্‌বুকার্ক অন্যান্য অনেক স্থলে পর্টুগীজ-জয়পতাকা উড্ডীন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পর্টুগীজ যোদ্ধা বা শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে একমাত্র আল্‌বুকার্কই সর্ব্বসাধারণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন এবং অভীষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছিলেন। ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে জামরাণ তাঁহার সহিত এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। তদনুসারে পর্টুগীজগণ কালিকটে একটি সুরক্ষিত কুঠি প্রতিষ্ঠা করেন। এইবার প্রথম কালিকটে ইয়ুরোপীয়দিগের স্থায়ী আবাসস্থান নিরূপিত হয়। পরবর্ত্তী এক শত বর্ষ কালের মধ্যে কালিকটে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে নাই। পরে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কালিকটে একটি কুঠি নির্ম্মাণ করেন। পরবর্ত্তী প্রায় দেড়শত বর্ষকাল জামরীণ নৃপতিগণ নির্ব্বিবাদে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন; হয়তঃ জানিতেন না যে, তাঁহাদের দেশের সন্নিকটে এক প্রবল শত্রু গাত্রোত্থান করিতেছিল।

মহীশূর হিন্দুরাজ্য ছিল। নরপতি চিক্কা কৃষ্ণরাজের সময়ে সুদক্ষ মন্ত্রী নন্দরাজ রাজার নামে দেশ-শাসন-কার্য্যে রত ছিলেন। নন্দরাজেরই কৃপায় হায়দর আলি নামক এক বিকৃতদর্শন মুসলমান যুবক সামান্য সৈনিকপদে ব্রতী হন। ফকির হইতে লোকে কিরূপে স্বীয় প্রতিভাবলে আমীর হইতে পারে, হায়দর আলি তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। একজন অজ্ঞাতকুলশীল ফৌজদারের পুত্র, পরাশ্রয়ে প্রতিপালিত হায়দর, অল্প দিনে রণনিপুণ ও নীতিকুশল হইয়া উঠেন; অবশেষে রাজার সৈন্যে রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া যবণের মর্য্যাদায়

অবমাননা করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি মহীশূর রাজ্য হস্তগত করিয়া চতুর্দ্দিকে রাজ্যবিস্তার করিতে প্রবৃত্ত হন। কালিকটের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হইলে, তদানীন্তন জামরীণ প্রথমে বশ্যতা স্বীকার করিয়া, দুর্ব্বৃত্ত মুসলমানের কৃপাভিখারী হইয়াছিলেন। কিন্তু বিনম্র নৃপতির মধুর বচনে রাজ্যলিপ্সুর প্রবল পিপাসা মিটিল না। অবশেষে যখন যবনের অত্যাচার অনিবার্য্য হইয়া উঠিল, তখন জামরীণ স্বীয় আবাস-স্থলীতে অগ্নিসংযোগ করিয়া দিয়া সেই প্রজ্জলিত হুতাশনে তনুত্যাগ করতঃ ধর্ম্ম ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। কালিকট হায়দরের করায়ত্ত হইল। কিন্তু তত্রত্য নায়রসম্প্রদায় তখনও সম্পূর্ণ অধঃপতিত হয় নাই; তাঁহারা পার্শ্ববর্ত্তী নৃপতিবৃন্দের সমবেত সহায্যে স্বদেশে স্বাধানতার জন্য আবার দণ্ডায়মান হইলেন এবং হায়দরের সৈন্যদলকে সদর্পে বিতাড়িত করিলেন। সংবাদ পাইবা মাত্র পর্য্যাপ্ত সৈন্যসহকারে হায়দর পুনরায় কালিকট আক্রমণ করিলেন—এবার নায়রগণ পর্য্যদস্ত হইলেন। কালিকটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হইল।

কিছুদিন পরে হায়দর কর্ণাট প্রদেশ অধিকার করাতে ইংরাজ-দিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ হইল (১৭৮০)। এই সময়ে ইংরাজ সেনাপতি হায়দরের সৈন্যদলকে পুনরায় কালিকট হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে হায়দরের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র টিপু ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন ১৭৮৪)। টিপু সুলতান উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র। তিনি সৈনাপত্যে পিতা অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না; কিন্তু নৃশংসতায় পিতাকেও বিশেষভাবে পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে আবার কালিকট অধিকার করিয়া লন। এবার অধিবাসি-গণের উপর অশ্রুতপূর্ব্ব অমানুষিক অত্যাচার করা হইল। বার্টলোমিউ

পাঠ করিলে মানবমাত্রেরই রোমহর্ষ উপস্থিত হয়। "প্রথমতঃ, সেনাপতি লালীর অধীনে কয়েকটি বড় কামান এবং প্রায় ৩০ হাজার পশুপ্রকৃতিক সৈন্য (কালিকট নগরের মধ্য দিয়া) চলিল; তাহারা যাহাকে সম্মুখে পাইল, তাহাকেই নির্দ্দয়রূপে হত্যা করিতে লাগিল। ইহারই পশ্চাতে টিপু স্বয়ং গজারোহণে চলিলেন; তাঁহারও সঙ্গে প্রায় ৩০ হাজার সৈন্য ছিল। কালিকটের অধিবাসিবর্গের উপর তিনি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা অতি ভীষণ। তাহাদের পুরুষ, স্ত্রী সকলকেই রজ্জুবদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল; তৎপরে মাতার গলদেশে পুত্রদিগকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া লম্বিত করা হইতে লাগিল। কতকগুলি হিন্দু ও খৃষ্টানকে উলঙ্গ অবস্থায় আনিয়া হস্তী সকলের পায়ে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। হস্তীর পদনিপীড়নে তাহাদের দেহযষ্টি হইতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল খসিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল।" এতদ্ব্যতীত যে সকল ব্রাহ্মণ বা খৃষ্টানকে তৎক্ষণাৎ নিহত করা হইল না, তাহাদিগকে বেপুর নামক নিকটবর্ত্তীস্থানে লইয়া গিয়া বলপূর্ব্বক মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল। যাহারা অস্বীকৃত হইল তাহারা গলদেশে রজ্জু-বদ্ধ হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল। বৈদেশিক বণিকগণকে কালিকট হইতে দূরীভূত করিয়া দেওয়া হইল। তাহাদের চিত্তাকর্ষণ করিতে কালিকটে কিছুই না থাকে, এই উদ্দেশ্যে সহরের যথাসর্ব্বস্ব উৎসন্ন করিবার পক্ষে ক্রটী বা কালাবলম্ব হইল না। নিকটবর্ত্তী প্রদেশে যেখানে যত নারিকেল বা চন্দনতরু ছিল, সমস্ত কর্ত্তিত হইল; মরীচের বাগান সমূলে উৎপাটিত হইল। পরে উৎসন্ন সহরের যাহা কিছু ধ্বংসাবশেষ রহিল, তাহা ছয় মাইল দূরবর্ত্তী নেল্লুর নামক স্থানে নীত হইয়া একটি নূতন দুর্গ ও নূতন সহর নির্ম্মিত হইল। নেল্লুরের ভাগ্য বাস্তবিকই প্রসন্ন বটে, এবং তাহার সেই সৌভাগ্যপরিজ্ঞাপন জন্য তাহাকে ফরাক্কাবাদ এই নূতন নাম দেওয়া হইল।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের শাসনকালে যখন পুনর্ব্বার মহীশূর-যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন বৃটিশ সেনাপতি হার্টলী কালিকট অধিকার করিয়া লন (১৭৯০)। কালিকটের উপকণ্ঠে টিপুর যে সৈন্য সমবেত হইয়াছিল, হার্টলী তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এই যুদ্ধে টিপুর ৯০০ সৈন্য বন্দী হয়; অবশিষ্ট পলায়ন করিয়া ফরাক্কাবাদে আশ্রয় লয় বটে, কিন্তু তাহাদিগকেও অবশেষে অস্ত্রত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। এদিকে গবর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বয়ং হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সাহায্যবলে বলীয়ান হইয়া, যখন টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তন অধিকার করিতে অগ্রসর হন, তখন টিপু ইংরাজদিগকে রাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিয়া সন্ধি করেন (১৭৯২)। এই সন্ধির ফলে কালিকট ইংরাজদিগের অধিকারে আসে। তদবধি কালিকটে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ইংরাজদিগের সুচ্ছায়-শাসনদণ্ডতলে বসতি করিবার অবসর পাইয়া, কালিকটের পলায়িত ও বিতাড়িত প্রতিবাসিবর্গ একে একে নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আবাসস্থলী নির্ম্মাণ করিলেন। অল্পদিন মধ্যেই কালিকট পুনরায় জনবহুল সমৃদ্ধ সহরে পরিণত হইয়া উঠিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন বুকানন সাহেব এই স্থান পরিদর্শন করেন, তখন তিনি নবনির্ম্মিত সহরের গৃহসংখ্যা প্রায় ৯৫,০০০ দেখিতে পাইয়াছিলেন বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০ হইবে, তন্মধ্যে অধিকাংশই "মপলা" মুসলমান; পর্টুগীজের সংখ্যাও চারি পাচ সহস্রের কম নহে।

কালিকটের মত ভাগ্যবিপর্য্যয় ভারতবর্ষের অতি কম স্থানেরই হইয়াছে। এত অত্যাচার ও এত পরিবর্ত্তনে কালিকট যে এখনও আছে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। তবে কালিকট আছে বটে, কিন্তু আর সে পূর্ব্বসৌন্দর্য্য বা সমৃদ্ধি কিছুই নাই। এক সময়ে কালিকটের

পোতাশ্রয় স্থান অতি সুন্দর ছিল ; শত শত দেশীয় ও বিদেশীয় জাহাজ পণ্যবিনিময় উদ্দেশ্যে নিরুদ্বেগে এই স্থানে কালযাপন করিত। কিন্তু এখন সে সুন্দর স্থান বালুকা পড়িয়া ভরিয়া গিয়াছে ; এক্ষণে জাহাজ আসিলে বহুদূরে উন্মুক্ত সমুদ্রে নঙ্গর ফেলিয়া থাকিতে হয়। এজন্য বাণিজ্যতরী এ বিঘ্নসঙ্কুল স্থানে অধিক দিন না থাকিয়া, বম্বে ও সুরাট প্রভৃতি স্থানে যায়। কালিকটের বাণিজ্যখ্যাতি চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-খচিত সুরম্যহর্ম্ম্যরাজি কালিকটের শোভাবর্দ্ধন করিত, তাহার একটিও নাই। যখন ভাস্কো ডা গামা এইস্থান প্রথম পরিদর্শন করেন, তখন তিনি যে প্রকাণ্ড হিন্দুদেবমন্দিরসন্দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন, তাহার চিহ্নমাত্রও নাই। তৎকালে পর্টুগালের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মঠও উহার সমতুল্য ছিল না। এক্ষণে যে সকল অট্টালিকা আছে, তন্মধ্যে জেল বা কারাগৃহই সর্ব্বপ্রধান ; উহাতে ৬০০ বন্দী থাকিবার উপযুক্ত স্থান আছে। আর সে জামরীণ ? সে সকল দৃপ্তনৃপতির কীর্ত্তিকাহিনী গল্পগুজবে পরিণত হইয়া বিনিদ্র ব্যক্তির নিদ্রালুতার সাহায্য করে মাত্র। যিনি একদিন সুকণ্ঠে হেমহার দুলাইয়া, বেণীবদ্ধদীর্ঘকেশে মণিমরকতমুক্তামালা জড়াইয়া, কর্ণদ্বয়ে প্রকাণ্ড কুণ্ডল ঝুলাইয়া এক বিরাট অট্টালিকার বিচিত্র-কক্ষে বৈদেশিক ভাস্কো ডা গামাকে রাজোপচারে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, তাঁহার বংশধর আজি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সামান্য বৃত্তিভোগী হইয়া নগরোপকণ্ঠে দীনভাবে কালযাপন করিতেছেন। কালের কি বিচিত্রলীলা !

শ্রীসতীশচন্দ্র মিত্র।

প্রথম বসন্তে।

প্রথম বসন্তে আজ কার প্রেম লেখা,
ছড়াইয়ে পড়েছে এত প্রান্তর কাননে ?
নেমেছ কি ধরা মাঝে তুমি বিশ্বসখা ?
তোমারি কি প্রেমপূর্ণ স্নিগ্ধ আলিঙ্গনে,
বিমুগ্ধা প্রকৃতি দিছে চকিতে খুলিয়া
পূর্ণ হৃদয়ের দ্বার ! মুক্ত পরাণের
আকুল প্রেমের শ্বাস আসিছে ছুটিয়া ;
কাননে পড়েছে দাগ শত চুম্বনের ?
রোমাঞ্চে—কণ্টক নহে—পুষ্পময়তনু
শ্যামল পল্লবে কত ভাবের উচ্ছ্বাস,
প্রদীপ্ত নয়ন দু'টী শশী আর ভানু,
উন্মুক্ত হৃদয় অই অনন্ত আকাশ !
প্রথম বসন্তে আজ মহাপ্রেমখেলা,
বিশ্বপ্রকৃতিতে হের আলিঙ্গন মেলা !

শ্রীশরৎকুমার সেনগুপ্ত।

বাঙ্গালা-সাহিত্যের বিবরণী।

বিজ্ঞান—(১) আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ।

প্রথম ভাগ।

কটককলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক,

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম, এ, প্রণীত।

আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত পরিতোষলাভ করিয়াছি। সংস্কৃত "গণকচক্রচূড়ামণি" এবং ইংরেজী ভাষায় বেণ্টলি, বেন্‌ফি, কোলব্রুক্, থিবো, কারন্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ কর্ত্তৃক রচিত এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু বাঙ্গলায় এরূপ গ্রন্থের এই প্রথম প্রকাশ হইল বলিয়া আমরা যোগেশ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে প্রথম বোধ হইবে, ইহা ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের একটী তালিকামাত্র, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় গ্রন্থকার ইহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের মত অবলম্বন পূর্ব্বক বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। তিনি যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, উহার অধিকাংশই সম্ভবতঃ স্বয়ং পাঠ করিতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে স্বদেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মন্তব্যের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঐ সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্যের মতামত রীতিমত বুঝিয়া সঙ্কলন করতঃ এই গ্রন্থকার প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন

যে যে স্থলে আমাদের সহিত যোগেশ বাবুর মতভেদ আছে আমরা এইবার তাহার উল্লেখ করিব। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন "বরাহ মিহির মগধ দেশে কাম্পিল্লনগরে দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করেন।" কাম্পিল্লনগরের বর্ত্তমান নাম কাল্পী। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জলৌন জেলার অন্তর্গত প্রধান নগর।" তাঁহার এই গবেষণায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিনা। যোগেশ বাবু [illegible]

পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উহার অর্থ বোধ করিতে পারেন নাই। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই ;

আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্ত বোধঃ,
কাপিথকে সাবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তিকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যা
গেঘারাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার॥

বরাহমিহির, আদিত্যদাসের পুত্র এবং তাঁহা হইতেই জ্ঞানলাভ করেন। তিনি কাপিথক নামক (বিদ্বজ্জনবহুল) পল্লীতে সূর্য্যকে আরাধনা করিয়া তাঁহা হইতে বরলাভ করিয়াছিলেন। বরাহমিহির অবন্তীতে জাত অথবা ঐ স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং মুনিগণের মতের আলোচনা করিয়া মনোহর হোরাশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের টীকাকার উৎপল স্পষ্টই লিখিয়াছেন; বরাহমিহির শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ংও বৃহৎসংহিতার সাম্বৎসর সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপীয় দৈববিৎ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ৪২৭ শকের পূর্ব্বে বরাহমিহির যে জন্মগ্রহণ করেন, উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আর কাম্পিল্ল নগরের সহিত কাপিথক গ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও অবস্থিত নহে। বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের পূর্ব্বনাম মগধ, ইহা সকলেরই জানা আছে। কাপিথক উহারই কোন অজ্ঞাত পল্লী হইবে। বরাহমিহির যে উজ্জয়িনী রাজসভার অন্যতম সদস্য বা রত্ন ছিলেন সে বিষয়ে আবার সন্দেহ কি? তিনি নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন না হইলে মগধ ছাড়িয়া উজ্জয়িনীতে যাইবেন কেন? শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুলের গৌরবভূত অযোধ্যার বর্ত্তমান মহারাজ সার্ প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের সন্নিহিত আত্মীয়, কাশীস্থ স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজবল্লভ শাস্ত্রীর পৌত্র সদাশিব মিশ্র মহাশয় বলেন "তিনি বরাহমিহিরের বংশসম্ভূত।" মিশ্র মহাশয় আরও বলেন "মগধই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের আদি বাসস্থান। মগধ হইতেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা উজ্জয়িনীতে গমন করেন এবং সেখান হইতে কয়েক পুরুষ পরে মগধে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ তাঁহার নিকট আছে।"

আর এক কথা যোগেশ বাবুর গ্রন্থে বঙ্গীয় অনেকগুলি জ্যোতির্ব্বিদ্ ও জ্যোতিষ-গ্রন্থের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালী বলিয়াই একথাটা লিখিলাম, নতুবা উহা লেখার কোন প্রয়োজন ছিলনা। তন্মধ্যে নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ নবদ্বীপনিবাসী গ্রহবিপ্রকালো [illegible]

বাঙ্গালা সাহিত্যের বিবরণী।

বিজ্ঞান—(১) আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ।

প্রথম ভাগ।

কটককলেজের বিজ্ঞানশাস্ত্রের অধ্যাপক,

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, এম, এ, প্রণীত।

আমরা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত পরিতোষলাভ করিয়াছি। সংস্কৃত "গণকচক্রচূড়ামণি" এবং ইংরেজী ভাষায় বেণ্টলি, বেন্‌ফি, কোলব্রুক্, থিবো, কারন্ প্রভৃতি য়ুরোপীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ কর্ত্তৃক রচিত এই শ্রেণীর গ্রন্থ অনেক ছিল, কিন্তু বাঙ্গলায় এরূপ গ্রন্থের এই প্রথম প্রকাশ হইল বলিয়া আমরা যোগেশ বাবুকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ করিতেছি। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে প্রথম বোধ হইবে, ইহা ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের একটী তালিকামাত্র, কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে দেখা যায় গ্রন্থকার ইহাতে যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বহুসংখ্যক সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের মত অবলম্বন পূর্ব্বক বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের ক্রমবিকাশের একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন। তিনি যে সকল জ্যোতিষ গ্রন্থের নাম করিয়াছেন, উহার অধিকাংশই সম্ভবতঃ স্বয়ং পাঠ করিতে পারেন নাই, তৎসম্বন্ধে স্বদেশীয় বিদেশীয় পণ্ডিতগণের মন্তব্যের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য যে, ঐ সকল গ্রন্থ সম্বন্ধে অন্যের মতামত রীতিমত বুঝিয়া সঙ্কলন করতঃ এই গ্রন্থকার প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

যে যে স্থলে আমাদের সহিত যোগেশ বাবুর মতভেদ আছে আমরা এইবার তাহার উল্লেখ করিব। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন "বরাহ মিহির মগধ দেশে কাম্পিল্লনগরে দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করেন।" কাম্পিল্লনগরের বর্ত্তমান নাম কাল্পী, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে জলৌন জেলার অন্তর্গত প্রধান নগর।" তাঁহার এই গবেষণায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিনা। যোগেশ বাবু বৃহজ্জাতকের উপসংহারের একটী

পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু উহার অর্থ বোধ করিতে পারেন নাই। সম্পূর্ণ শ্লোকটী এই ;—

আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্ত বোধঃ,
কাপিথকে সবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তিকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যা
গ্‌ঘোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার॥

বরাহমিহির, আদিত্যদাসের পুত্র এবং তাঁহা হইতেই জ্ঞানলাভ করেন। তিনি কাপিথক নামক (বিদ্বজ্জনবহুল) পল্লীতে সূর্য্যকে আরাধনা করিয়া তাঁহা হইতে বরলাভ করিয়াছিলেন। বরাহমিহির অবন্তীতে জাত অথবা ঐ স্থানের অধিবাসী ছিলেন এবং মুনিগণের মতের আলোচনা করিয়া মনোহর হোরাশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থসমূহের টীকাকার উৎপল স্পষ্টই লিখিয়াছেন; বরাহমিহির শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্বয়ংও বৃহৎসংহিতার সাম্বৎসর সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূর্য্যোপাসক শাকদ্বীপীয় দৈববিৎ ব্রাহ্মণের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। ৪২৭ শকের পূর্ব্বে বরাহমিহির যে জন্মগ্রহণ করেন, উহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। আর কাম্পিল্ল নগরের সহিত কাপিথক গ্রামের কোন সম্বন্ধ নাই, উহা উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও অবস্থিত নহে। বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের পূর্ব্বনাম মগধ, ইহা সকলেরই জানা আছে। কাপিথক উহারই কোন অজ্ঞাত পল্লী হইবে। বরাহমিহির যে উজ্জয়নী রাজসভার অন্যতম সদস্য বা রত্ন ছিলেন সে বিষয়ে আবার সন্দেহ কি? তিনি নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন না হইলে মগধ ছাড়িয়া উজ্জয়িনীতে যাইবেন কেন? শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুলের গৌরবভূত অযোধ্যার বর্ত্তমান মহারাজ সার্ প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদুর কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের সম্মিলিত আত্মীয়, কাশীস্থ স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রাজবল্লভ শাস্ত্রীর পৌত্র সদাশিব মিশ্র মহাশয় বলেন "তিনি বরাহমিহিরের বংশসম্ভূত।" মিশ্র মহাশয় আরও বলেন "মগধই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের আদি বাসস্থান। মগধ হইতেই তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা উজ্জয়িনীতে গমন করেন এবং সেখান হইতে কয়েক পুরুষ পরে মগধে পুনরায় প্রত্যাবৃত্ত হন। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ তাঁহার নিকট আছে।"

আর এক কথা যোগেশ বাবুর গ্রন্থে বঙ্গীয় অনেকগুলি জ্যোতির্ব্বিদ্ ও জ্যোতিষগ্রন্থের নাম পরিত্যক্ত হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালী বলিয়াই একথাটা লিখিলাম, নতুবা উহা লেখার কোন প্রয়োজন ছিলনা। তন্মধ্যে নদীয়ার সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ্ নবদ্বীপনিবাসী গ্রহবিপ্রকুলোদ্ভব প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামরুদ্র বিদ্যানিধি মহাশয়ের কৃত "জ্যোতিঃসারসংগ্রহ" একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। আর

পাবনা জেলার অন্তর্গত প্রতাপপুর নিবাসী গ্রহবিপ্রকুলোদ্ভব গঙ্গাগোবিন্দ আচার্য্য কৃত কোষ্ঠীকৌমুদী ও তদীয় আত্মীয় হরগোবিন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ কৃত সূর্য্যসিদ্ধান্তের সংস্কৃত টীকা ও বঙ্গানুবাদ সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বিশেষতঃ কোষ্ঠী-কৌমুদীর তুল্য সুবৃহৎ ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ জাতক বিষয়ে অতি বিরল। আর কলিকাতা-সন্নিহিত বালীনিবাসী গ্রহবিপ্রকুলোদ্ভব সনাতন বাচস্পতি কৃত "রাত্রিন্দিবোজ্জ্বল" নামক গ্রন্থখানি পঞ্চাঙ্গগণনা সম্বন্ধে বিশেষ উপযোগী। এতকাল কলিকাতা অঞ্চলের জ্যোতির্বিদগণ একমাত্র এই গ্রন্থের সাহায্যেই পঞ্জিকা গণনা সম্পন্ন করিতেন। আরও এরূপ অনেক গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশা করি এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ কালে যোগেশবাবু এই সকল গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইবেন না।

যোগেশবাবু ১৩৩—১৩৪—১৩৫ পৃষ্ঠায় পঞ্জিকাসংস্কারের কথা তুলিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তিনি ইহার সবিশেষ সংবাদ না লইয়াই স্বীয় মন্তব্য প্রকটিত করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত গ্রহবিপ্রকুলোদ্ভব ৺কালীনাথ তর্করত্ন মহাশয়ের নিকট জ্যোতিঃশাস্ত্রের চর্চ্চা করেন। সংস্কৃতকলেজে পঞ্জিকা-সংস্কার উপলক্ষে যে বিরাট ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভার অধিবেশন হয়, উহাতে পূর্ব্বোক্ত মহামহোপাধ্যায় ন্যায়রত্ন মহাশয় ৺কালীনাথ তর্করত্ন মহাশয়কে প্রাচীন মতের পক্ষপাতী জানিয়াও সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, তর্করত্ন মহাশয়ের নানা-শাস্ত্রে বিশেষতঃ জ্যোতিঃশাস্ত্রের গভীর জ্ঞানের বিষয় খ্যাপনপূর্ব্বক উহা সমর্থন করেন। পরে দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া নাবিক পঞ্জিকার পক্ষপাতিগণের সহিত প্রাচীন মতাবলম্বিগণের বাদানুবাদ হয়। কিপ্রকার যুক্তিবলে প্রাচীনমতাবলম্বী জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ তিথি, নক্ষত্র ও গ্রহণ গণনা বিষয়ে নাবিক পঞ্জিকার অসারতা প্রতিপন্ন করেন, উহা যোগেশ বাবুর একবার আলোচনা করা কর্ত্তব্য। উপসংহারে বক্তব্য গ্রন্থকারের সহিত অনেক বিষয়ে আমাদের মতভেদ সত্ত্বেও আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই গ্রন্থের প্রশংসা করিতেছি। বঙ্গভাষায় তিনি এই বিষয়ের অবতারণা করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্র ও বঙ্গভাষার মহোপকার সাধন করিয়াছেন এ বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

গুপ্তপ্রেসপঞ্জিকা প্রণেতা—

শ্রীবিশ্বম্ভর জ্যোতিষার্ণব।

নবদ্বীপ।

শিলাদিত্য।

শিলাদিত্যের যখন জন্ম হয়নি, যে সময় বল্লভীপুরে রাজা কনক সেনের বংশের শেষ রাজা রাজত্ব করছিলেন, সেই সময় বল্লভীপুরে সূর্য্যকুণ্ড নামে একটি অতি পবিত্র কুণ্ড ছিল। সেই কুণ্ডের একধারে প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দিরে এক অতিবৃদ্ধ পুরোহিত বাস করতেন। তাঁর একটিও পুত্রকন্যা কিম্বা বন্ধুবান্ধব ছিল না; অনন্ত আকাশে সূর্য্যদেব যেমন একা, তেমনি আকাশের মত নীল প্রকাণ্ড সূর্য্যকুণ্ডের তীরে, আদিত্যমন্দিরে, সূর্য্যপুরোহিত তেজস্বী সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বড়ই একাকী, বড়ই সঙ্গীহীন ছিলেন। মন্দিরে দীপ-দান, ঘণ্টাধ্বনি, উদয়-অস্ত দুই সন্ধ্যা আরতি, সকল ভার তাঁর উপর—ভৃত্য নাই, অনুচর নাই, একটি শিষ্যও নাই। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একাই প্রতিদিন ত্রিশ সের ওজনের পিতলের প্রদীপে দুই সন্ধ্যা সূর্য্যদেবের আরতি করতেন। প্রতিদিন সেই শীর্ণহাতে রাক্ষসরাজার রাজমুকুটের মত মন্দিরের প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাজাতেন, আর মনে মনে ভাবতেন, যদি একটি সঙ্গী পাই তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তার হাতে সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। সূর্য্যদেব ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। একদিন পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় চারিদিক অন্ধকার ছিল, সূর্য্যদেব অস্ত গিয়েছেন, বৃদ্ধ পুরোহিত সন্ধ্যার আরতি শেষ করে ভীমের বুকপাটা থানার মত প্রকাণ্ড মন্দিরের লোহার কপাট বহুকষ্টে বন্ধ করছেন, এমন সময় ম্লানমুখে একটি ব্রাহ্মণকন্যা তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল—পরনে ছিন্নবাস কিন্তু অপূর্ব্ব সুন্দরী—বোধ হল যেন শীতের ভয়ে একটি সন্ধ্যাতারা সূর্য্যমন্দিরে আশ্রয় চায়, ব্রাহ্মণ দেখলেন কন্যাটি সুলক্ষণা অথচ বিধবার বেশ; তিনি জিজ্ঞাসা করলেন "কে তুমি? কি চাও?" তখন সেই ব্রাহ্মণ-বালিকা কমল-

কলির মত ছোট দুই খানি হাত জোড় করে বল্লে, "প্রভু আমি আশ্রয় চাই, ব্রাহ্মণকন্যা, গুর্জ্জর দেশের বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা আমি, নাম সুভগা; বিয়ের রাত্রে বিধবা হয়েছি, সেই দোষে দুর্ভাগা বলে, সকলে মিলে আমাদের দেশের বার করেছে। প্রভু, আমার মা ছিলেন, এখন মাও নাই, আমায় আশ্রয় দাও।" ব্রাহ্মণ বল্লেন, "আরে অনাথিনি, এখানে কোন্ সুখের আশায় আশ্রয় চাস্? আমার অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, আমি যে নিতান্ত দরিদ্র বন্ধুহীন!"—ব্রাহ্মণ মনে মনে এই কথা বল্লেন বটে, কিন্তু কে যেন তাঁর মনের ভিতর বলতে লাগ্‌ল—হে দরিদ্র, হে বন্ধুহীন, এই বালিকাকে তোমার বন্ধু কর, আশ্রয় দাও। ব্রাহ্মণ একবার মনে করলেন আশ্রয় দিই, আবার ভাবলেন—যে মন্দিরে আশি বৎসর ধরে একা এই সূর্য্যদেবের পূজা কল্লেম, আজ শেষ দশায় আবার কার হাতে তাঁর পূজার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হই। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন; তখন সহসা সন্ধ্যার সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে, পৃথিবীর পশ্চিম পার থেকে এক বিন্দু সূর্য্যের আলো, সেই দুঃখিনী বালিকার মুখখানিতে এসে পড়ল। ভগবান আদিত্যদেব যেন নিজের হাতে দেখিয়ে দিলেন—এই আমার সেবাদাসী। হে আমার প্রিয়ভক্ত, এই বালিকাকে আশ্রয় দাও, যেন চিরদিন এই দুঃখিনী বিধবা, আমার সেবায় নিযুক্ত থাকে। ব্রাহ্মণ জোড় হস্তে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করে দেবাদিত্য ব্রাহ্মণের কন্যা সুভগাকে সূর্য্যমন্দিরে আশ্রয় দিলেন। তার পরে কতদিন কেটে গেল, সুভগা তখন মন্দিরের সমস্ত কাযই শিখেছেন, কেবল ননির মত কোমল হাতে ত্রিশ সের ওজনের সেই আরতির প্রদীপটা কিছুতেই তুলতে পাল্লেন না বলে, আরতির কাযটা বৃদ্ধকেই করতে হত। একদিন সুভগা দেখলেন, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীর্ণ শরীর যেন ভেঙ্গে পড়েছে, আরতির প্রদীপ শীর্ণ হাতে টলে পড়ছে। সেইদিন সুভগা বল্লভীপুরের বাজারে গিয়ে একসের

ও্জনের একটি ছোট প্রদীপ নিয়ে এসে বল্লে, "পিতা আজ সন্ধ্যার সময় এই প্রদীপে সূর্য্যদেবের আরতি করুন।" ব্রাহ্মণ একটু হেসে বল্লেন, "সকালে যে প্রদীপে দেবতার আরতি আরম্ভ করেছি, সন্ধ্যাতেও সেই প্রদীপে দেবতার আরতি করা চাই। নূতন প্রদীপ তুলে রাখ, কাল নূতন দিনে নূতন প্রদীপে সূর্য্যদেবের আরতি হবে। সেইদিন ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্য্যের আলোয় যখন সমস্ত পৃথিবী আলোময় হয়ে গেছে, সেই সময় ব্রাহ্মণ সুভগাকে সূর্য্যমন্ত্র শিক্ষা দিলেন। যে মন্ত্রের গুণে সূর্য্যদেব স্বয়ং এসে ভক্তকে দর্শন দেন, যে মন্ত্র জীবনে একবার ছাড়া দুইবার উচ্চারণে নিশ্চয় মৃত্যু। তারপর সন্ধিক্ষণে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, আরতিশেষে, নিভন্ত প্রদীপের মত, ব্রাহ্মণের জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে গেল ; সূর্য্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন। সুভগা একলা পড়লেন। প্রথম, দিন কতক বৃদ্ধের জন্য কেঁদে কেঁদে কাটালেন। তারপর দিনকতক নিজের হাতে জঙ্গল পরিষ্কার করে, মন্দিরের চারিদিকে ফলের গাছ, ফুলের গাছ লাগাতে কেটে গেল। আরও কতদিন মন্দিরের পাথরের দেওয়াল মেজে ঘসে পরিষ্কার করে, তার গায়ে লতা, পাতা, ফুল, পাখী, হাতী, ঘোড়া, পুরাণ, ইতিহাসের পট লিখতে চলে গেল। শেষে সুভগার হাতে আর কোনো কাজ রইল না। তখন তিনি সেই ফলের বাগানে, ফুলের মালঞ্চে, একা একাই ঘুরে বেড়াতেন। ক্রমে যখন সেই নূতন বাগানে দুটি একটি ফল পাকতে আরম্ভ হল, দুটি একটি ফুল ফুটতে লাগল, তখন ক্রমে দু একটি ছোট পাখী, গুটিকতক রঙ্গিন প্রজাপতি, সেই সঙ্গে একপাল ছোটবড় ছেলেমেয়ে দেখা দিলে। প্রজাপতি শুধু একটুখানি ফুলের মধু খেয়ে সন্তুষ্ট ছিল, পাখী শুধু দু একটা পাকা ফল ঠোকরাত মাত্র, কিন্তু সেই ছেলের পাল ফুল ছিঁড়ে, ফল পেড়ে, ডাল ভেঙ্গে, চুরমার করত। সুভগা কিন্তু কাহাকেও কিছু বলতেন না, হাসি মুখে সকল উৎপাত সহ্য

করতেন। সবুজ ঘাসে গাছের তলায় নানা রঙের কাপড় পোরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে খেলে বেড়াতো, দেখতে দেখতে সুভগার দিনগুলো আনমনে কেটে যেত। ক্রমে বর্ষা এসে পড়ল; চারিদিকে কাল মেঘের ঘটা, বিদ্যুতের ছটা আর গুরু গুরু গর্জ্জন, সেই সময় একদিন ক্ষুরের মত পূবের হাওয়া, সুভগার নূতন বাগানে ফুলের বোঁটা কেটে, গাছের পাতা ঝরিয়ে, তার সাধের মালঞ্চ শূন্য প্রায় করে, শন্ শন্ শব্দে চলে গেল। পাখীর ঝাঁক হাওয়ার মুখে উড়ে গেল, প্রজাপতির ভাঙ্গা ডানা, ফুলের পাপড়ির মত চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ছেলের পাল কোথায় অদৃশ্য হল। সুভগা তখন সেই ধারাশ্রাবণে একা বসে বসে বাপমায়ের কথা, শ্বশুরশাশুড়ীর নিষ্ঠুরতা, আর বিয়ের রাত্রে সুন্দর বরের হাসিমুখের কথা, মনে করে কাঁদ্‌তে লাগলেন, আর মনে মনে ভাবতে লাগলেন—"হায় এই নির্জ্জনে সঙ্গিহীন বিদেশে কেমন করে সারা জীবন একা কাটাব।" হরিণের চোখের মত সুভগার কালো কালো দুটি বড় বড় চোখ অশ্রুজলে ভরে উঠল, তিনি পূবে দেখিলেন অন্ধকার, পশ্চিমে অন্ধকার, উত্তরে দক্ষিণে চারিদিকে অন্ধকার; মনে পড়ল এমনি অন্ধকারে এক দিন তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আজ সে দিনের মত অন্ধকার, সেই বাদলার হাওয়া, সেই নিঃশব্দ প্রকাণ্ড সূর্য্যমন্দির, কিন্তু হায়, কোথায় আজ সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, যিনি সেই দুর্দ্দিনে অনাথিনী অভাগিনী সুভগাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন? সুভগার কালো চোখ থেকে দুটি ফোঁটা জল দুই বিন্দু বৃষ্টির মত অন্ধকারে ঝরে পড়ল। সুভগা মন্দিরের সমস্ত দুয়ার বন্ধ করে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঠাকুরের আরতি করলেন, তারপর কিজানি কি মনে করে সুভগা সেই সূর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখে ধ্যানে বসলেন। ক্রমে সুভগার দুটি চক্ষু স্থির হয়ে এল, চারদিক থেকে ঝড়ের ঝন্‌ঝনা, মেঘের কড়্‌মড়ি, ক্রমে যেন দূর হতে বহুদূরে সরে গেল। সুভগার মনে আর কোন শোক নাই,

কোন দুঃখ নাই। তাঁর মনের অন্ধকার যেন সূর্য্যের তেজে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে। সুভগা ধীরে ধীরে, ভয়ে ভয়ে—বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কাছে শেখা —সেই সূর্য্যমন্ত্র উচ্চারণ করলেন; তখন সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল, সুভগা যেন শুনতে পেলেন, চারিদিকে পাখীর গান, বাঁশীর তান, আনন্দের কোলাহল; তারপর গুরু গুরু গভীর গর্জ্জনে সমস্ত আকাশ কাঁপিয়ে, চারিদিক আলোয় আলোময় করে, সেই মন্দিরের পাথরের দেওয়াল, লোহার দরজা, যেন আগুনে আগুনে গলিয়ে দিয়ে, সাতটা সবুজ ঘোড়ার পিঠে আলোর রথে কোটি কোটি আগুনের সমান জ্যোতির্ম্ময় আলোময় সূর্য্যদেব দর্শন দিলেন। সে আলো সে জ্যোতি মানুষের চোখে সহ্য হয় না। সুভগা দুই হাতে মুখ ঢেকে বল্লেন, "হে দেব, রক্ষা কর, ক্ষমা কর, সমস্ত পৃথিবী জ্বলে যায়।" সূর্য্যদেব বল্লেন, "ভয় নাই—ভয় নাই, বৎসে, বর প্রার্থনা কর;" বলতে বলতে সূর্য্যদেবের আলো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এল, শুধু একটুখানি রাঙ্গা আভা সধবার সিন্দুরের মত সুভগার সিঁথি আলো করে রইল। তখন সুভগা বল্লেন, "প্রভু আমি পতিপুত্রহীনা, বিধবা অনাথিনী, বড়ই একাকিনী, আমাকে এই বর দাও যেন এই পৃথিবীতে আমায় আর না থাকতে হয়, সমস্ত জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয়ে আজই তোমার চরণতলে আমার মরণ হোক।" সূর্য্যদেব বল্লেন, "বৎসে দেবতার বরে মৃত্যু হয় না, দেবতার অভিশাপে মৃত্যু হয়, তুমি বর প্রার্থনা কর।" তখন সুভগা সূর্য্যদেবকে প্রণাম করে বল্লেন "প্রভু যদি বর দিলে তবে আমাকে একটি ছেলে আর একটি মেয়ে দাও, আমি তাদের মানুষ করি। ছেলেটি তোমারি মত তেজস্বী হবে, মেয়েটি হবে যেন চাঁদের কোনার মত সুন্দরী।" সূর্য্যদেব তথাস্তু বলে অন্তর্দ্ধান করলেন; ধীরে ধীরে সুভগার চোখে ঘুম এল, সুভগা পাষাণের উপর আঁচল পেতে শুয়ে পড়লেন। চারিদিকে ঝম্ ঝম্ করে বৃষ্টি নাব্‌ল। তখন ভোর হয়ে এসেছে,

সুভগা ঘুমের ঘোরে শুনতে লাগলেন, তাঁর সেই ভাঙা মালঞ্চে দুটি ছোট পাখী কি সুন্দর গান ধরেছে! ক্রমে সকাল বেলার একটুখানি সোনার আলো সুভগার চোখে পড়ল, তিনি তাড়াতাড়ি উঠে বসলেন, আঁচলে টান পড়ল, চেয়ে দেখলেন কঁচি দুটি ছেলেমেয়ে কোলের কাছে ঘুমিয়ে আছে। সূর্য্যদেবের বর সফল হল—সুভগা দেবতার মত সুন্দর সন্তান দুটি কোলে নিলেন। সকল লোকের চোখের আড়ালে নির্জ্জন মন্দিরে জন্ম হল বলে, সুভগা দুজনের নাম দিলেন গায়েব গায়েবী। সুভগা গায়েব আর গায়েবীকে বুকে নিয়ে মন্দিরের বাহিরে এলেন, তখন পূবে সূর্য্যদেব উদয় হচ্ছিলেন, পশ্চিমে চাঁদ অস্ত যাচ্ছিলেন; সুভগা দেখলেন গায়েবের মুখে সূর্য্যের আলো ক্রমেই ফুটে উঠতে লাগল, আর গায়েবীর কালো চুলে চাঁদের জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে নিভে গেল; তিনি মনে মনে বুঝলেন গায়েবীকে এই পৃথিবীতে বেশি দিন ধরে রাখা যাবে না।

গায়েব ক্রমশঃ যখন বড় হয়ে পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করলেন, সেই সময় গায়েবী মায়ের কাছে বসে মন্দিরে কাজকর্ম্ম শিখতে লাগলেন। গায়েব যেমন দুরন্ত দুর্দ্দান্ত, গায়েবী তেমনি শিষ্টশান্ত। গায়েবীর সঙ্গে কত ছোট ছোট মেয়ে সেধে সেধে খেলা করতে আসত, কিন্তু গায়েবের উৎপাতে পাঠশালার সকল ছেলে অস্থির হয়ে উঠেছিল। শেষে তারা সকলে মিলে একদিন পরামর্শ করলে —গায়েব আমাদের চেয়ে লেখায়, পড়ায়, গায়ের জোরে, সকল বিষয়ে বড়। এস আমরা সকলে মিলে গায়েবকে রাজা করি, আর আমরা তার প্রজা হই; তাহলে গায়েব আর আমাদের উপর অত্যাচার করতে পারবে না। এই বলে সকলে মিলে গায়েবকে রাজা বলে কাঁধে করে নৃত্য আরম্ভ করলে। গায়েব মহাখুসিতে সেই সকল ছোট ছোট ছেলের কাঁধে বসে আছেন; এমন সময় একটি খুব ছোট ছেলে বলে,

উঠল, "আমি রাজার পূজারী। মন্ত্র পড়ে গায়েবকে রাজটিকা দেব।" তখন সেই ছেলের পাল গায়েবকে, একটা মাটির ঢিবির উপর বসিয়ে দিলে। গায়েব সত্যি রাজার মত সেই মাটির সিংহাসনে বসে আছেন, এমন সময়, সেই ছোট ছেলেটি তাঁর কপালে তিলক টেনে দিয়ে বল্লে, "গায়েব তোমার নাম জানি, বল তোমার মায়ের নাম কি, বাপের নাম কি?" গায়েব বল্লেন, "আমার নাম গায়েব, আমার বোনের নাম গায়েবী, মায়ের নাম সুভগা, আমার বাপের নাম—কি?" গায়েব জানেননা যে তিনি সূর্য্যদেবের বরপুত্র। নাম বলতে পাল্লেন না, লজ্জায় অধোবদন হলেন, চারিদিকে ছেলের পাল হো হো হাততালি দিতে লাগল; লজ্জায় গায়েবের মুখ লাল হয়ে উঠল। তখন এক পদাঘাতে সেই মাটির সিংহাসন চূর্ণ করে, চড়েচাপড়ে ছোট ছেলেদের ফোলাগাল বেশি করে ফুলিয়ে, রাগে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গায়েব একেবারে দেবমন্দিরে উপস্থিত হলেন। সুভগা গায়েবীর হাতে পিতলের একটি ছোট প্রদীপ দিয়ে, কেমন করে সূর্য্যদেবের আরতি করতে হয় শিখিয়ে দিচ্ছিলেন, এমন সময়, ঝড়ের মত গায়েব এসে পিতলের সেই প্রদীপটা কেড়ে নিয়ে, টান মেরে ফেলে দিলেন। নিরেট পিতলের প্রদীপ পাথরের দেওয়ালে লেগে ঝন্ ঝন্ শব্দে চুরমার হয়ে গেল, সেই সঙ্গে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি লেখা একখানা কালো পাথর সেই দেওয়াল থেকে খসে পড়ল। সুভগা বল্লেন "আরে উন্মাদ, কি করলি? সূর্য্যদেবের মঙ্গল আরতি ছারখার করে দেবতার অপমান করলি?" গায়েব বল্লেন, "দেবতাও বুঝিনে, সূর্য্যও বুঝিনে, বল আমি কার ছেলে? না হলে আজ তোমার সূর্য্যমূর্ত্তি কুণ্ডের জলে ডুবিয়ে দেব।" যদিও প্রকাণ্ড সেই সূর্য্যমূর্ত্তি ভীম এলেও তুলতে পারতেন না, তবু গায়েবের বীরদর্প দেখে সুভগার মনে হল—কি জানি কি করে, তিনি তাড়াতাড়ি গায়েবের দুটি হাত ধরে বল্লেন, "বাছা শান্ত হ, স্থির হ, আর সূর্য্যদেবের

অপমান করিসনে; পিতার নামে কি কায? আমি তোর মা আছি, গায়েবী তোর বোন, আর তোর কিসের অভাব?" গায়েব তখন কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, "তবে কি মা, আমি নীচ, জঘন্য, অপবিত্র, পথের ধূলা ভিখারীর অধম? কথাগুলো তীরের মত সুভগার বুকে বাজল, তিনি দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন—মনে মনে ভাবলেন—হায় ভগবান, কি করলে? এ দুরন্ত ছেলেকে কেমন করে বোঝাই, কি বলে প্রবোধ দিই? গায়েব গায়েবী নীচ নয়, অপবিত্র নয়, সূর্য্যের সন্তান, সকলের চেয়ে পবিত্র, একথায় কে বিশ্বাস করবে? সুভগার সূর্য্যমন্ত্রের কথা একবার মনে হল, কিন্তু যখন ভাবলেন যে দুইবার মন্ত্র উচ্চারণ করলে নিশ্চয় মৃত্যু—এই কচি বয়সে গায়েব গায়েবীকে একা ফেলে পৃথিবী ছেড়ে চিরকালের মত চলে যেতে হবে,—তখন তাঁর মায়ের প্রাণ কেঁদে উঠল; সুভগা বল্লেন, "বাছা কথা রাখ, ক্ষান্ত দে, চল আমরা অন্য দেশে চলে যাই, সূর্য্যদেবকেই তোদের পিতা বলে জেনে রাখ।" গায়েব ঘাড় নাড়লেন বিশ্বাস হয় না—তখন সুভগা বল্লেন, "তবে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ কর্, এখানি তোদের পিতাকে দেখতে পাবি, কিন্তু হায় আমাকে আর ফিরে পাবি না।" সুভগার দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল। গায়েবী বল্লে, "ভাই, মাকে কেন কষ্ট দাও?" গায়েব উত্তর না দিয়ে মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন; সুভগা দুজনের হাত ধরে সূর্য্যমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়ে ধ্যানে বসলেন। এই মন্দিরে একাকিনী সুভগা একদিন মৃত্যু ইচ্ছা করে যে মন্ত্র নির্ভয়ে উচ্চারণ করেছিলেন, কালসর্পের মত সেই সূর্য্যমন্ত্র আজ উচ্চারণ করতে তাঁর মায়ের প্রাণে কতই ভয়, কত ব্যথা। সূর্য্যদেব দর্শন দিলেন, সমস্ত মন্দির যেন রক্তের স্রোতে ভাসিয়ে প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দর্শন দিলেন। সুভগা বল্লেন, "প্রভু গায়েব গায়েবী কার সন্তান?" সূর্য্যদেব একটিও কথা কইলেন না। দেখতে দেখতে সূর্য্যের প্রচণ্ড তেজে ভিখারিনী

সুভগার সুন্দর শরীর জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গায়েবী কেঁদে উঠল—'মা, মা'—গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন 'মা কোথা ?' সূর্য্যদেব কোনই উত্তর করলেন না, কেবল পাষাণের উপর সেই রাশীকৃত ছাই দেখিয়ে দিলেন ; গায়েব বুঝলেন—মা আর নাই—রাগে দুঃখে তাঁর চোখে আগুন ছুটল। গায়েব মন্দিরের কোণ থেকে সূর্য্যমূর্ত্তি লেখা সেই পাথর খানা কুড়িয়ে সূর্যদেবকে ফেলে মারলেন। যমরাজের মহিষের মাথাটার মত সেই কালো পাথর সূর্য্যদেবের মুকুটে লেগে জলন্ত কয়লার মত এক দিকে ঠিকরে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে গায়েব মূর্চ্ছিত হলেন। অনেক ক্ষণ পরে গায়েব যখন জেগে উঠলেন তখন সূর্য্যদেব অন্তর্দ্ধান করেছেন, মাথার কাছে শুধু গায়েবী বসে আছে—গায়েব জিজ্ঞাসা করলেন 'সূর্য্যদেব কোথায় ?' গায়েবী তখন সেই কালো পাথর খানা দেখিয়ে বল্লে, "ওই লও ভাই আদিত্যশিলা। এই পাথর তুমি যার উপর ফেলবে তাঁর নিশ্চয় মৃত্যু। সূর্য্যদেব এটি তোমায় দিয়ে গেছেন, আর বলেছেন তুমি তাঁরই ছেলে, আজ থেকে তোমার নাম হল শিলাদিত্য। তোমার বংশ সূর্য্যবংশ নাম নিয়ে পৃথিবী শাসন করবে, আর তুমি মনে মনে ডাকলেই ওই সূর্য্যকুণ্ড থেকে সাতটা ঘোড়ার পিঠে সূর্য্যের রথ তোমার জন্যে উঠে আসবে। সে রথের নাম সপ্তাশ্বরথ। 'যাও ভাই সপ্তাশ্বরথে আদিত্যশিলা হাতে পৃথিবী জয় করে এস।" গায়েব বল্লেন, "তোকে কোথা রেখে যাব বোন্ ?" গায়েবী বল্লে, "ভাই আমাকে এই মন্দিরে বন্ধ করে রেখে যাও, আমি বাগানের ফল, কুণ্ডের জল খেয়ে জীবন কাটাব। তারপর তুমি যখন রাজা হবে, আমায় এই মন্দির থেকে রাজবাড়ীতে নিয়ে যেও।" গায়েব মহা আনন্দে গায়েবীকে সেই মন্দিরে রেখে সাত ঘোড়ার রথে পৃথিবী জয় করতে চলে গেলেন। আর গায়েবী সেই রাশীকৃত ছাই সূর্য্যকুণ্ডের জলে ঢেলে দিয়ে 'মারে ভাইরে' বলে পাষাণের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। সেই দিন গভীর রাত্রে

যখন আকাশে তারা ছিল না, পৃথিবীতে আলো ছিল না, সেই সময় হঠাৎ সেই সূর্য্যমন্দির ঝন্ ঝন্ শব্দে একবার কেঁপে উঠল। তারপর আশি মণ কালো পাথরের প্রকাণ্ড সূর্য্যমূর্ত্তিকে নিয়ে, আর ননির পুতুলের মত সুন্দরী গায়েবীকে নিয়ে, আধখানা মন্দির ক্রমে মাটির নীচে চলে যেতে লাগল। গায়েবী প্রাণভয়ে পালাবার চেষ্টা কল্লে— বৃথা চেষ্টা। গায়েবী দেওয়াল ধরে ওঠবার চেষ্টা কল্লে, পাথরের দেওয়ালে পা রাখা যায় না—কাঁচের সমান। তখন গায়েবী 'ভাইরে' বলে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তারপর সব শেষ, সব অন্ধকার। গায়েব প্রথমে সেই সপ্তাশ্বরথে পৃথিবী ঘুরে, দেশবিদেশ থেকে সৈন্য সংগ্রহ করে, রাজ্যের পর রাজ্য জয় করে, শেষে বল্লভীপুরের রাজাকে সেই আদিত্যশিলা দিয়ে সম্মুখযুদ্ধে সংহার করে, শিলাদিত্য নাম নিয়ে, রাজসিংহাসনে বসে, পাঠশালার সঙ্গীদের কাউকে মন্ত্রী, কাউকে বা সেনাপতি করে, যত নিষ্কর্ম্মা বুড়ো কর্ম্মচারীদের তাড়িয়ে দিলেন। তারপর হুলুধ্বনি শঙ্খধ্বনির মাঝখানে শিলাদিত্য চন্দ্রাবতী নগরের রাজকন্যা পুষ্পবতীকে বিয়ে করে, শ্বেতপাথরের শয়নমন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। ক্রমে রাত্রি যখন গভীর হল, কোন দিকে সাড়া শব্দ নাই, পায়ের কাছে চামরধারিণী চামর হাতে ঢুলে পড়েছে, মাথার শিয়রে সোনার প্রদীপ নিভ নিভ হয়েছে, সেই সময় শিলাদিত্য তাঁর সেই ছোট বোন গায়েবীর কচি মুখখানি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর মনে হল যেন অনেক অনেক দূর থেকে সেই মুখখানি তাঁর দিকে চেয়ে আছে, আর যেন সেই সূর্য্যমন্দিরের দিক থেকে কে যেন ডাকছে—ভাইরে, ভাইরে, ভাইরে— শিলাদিত্য চীৎকার করে জেগে উঠলেন। তখন ভোর হয়েছে, তিনি তৎক্ষণাৎ রথে চড়ে সৈন্যসামন্ত নিয়ে সূর্য্যমন্দিরে উপস্থিত হলেন; দেখলেন, ভীমের বর্ম্ম দুই খানার মত মন্দিরের দুখানা কবাট একেবারে বন্ধ, কত কালের লতা পাতা সেই মন্দিরের দুয়ার যেন লোহার

শিকলে বেঁধে রেখেছে। শিলাদিত্য নিজের হাতে সেই লতা পাতা সরিয়ে মন্দিরের দুয়ার খুলে ফেল্লেন; দিনের আলো পেয়ে এক ঝাঁক বাদুড় ঝটাপট্ করে খোলা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিলাদিত্য মন্দিরে প্রবেশ কল্লেন, চেয়ে দেখলেন যেখানে সূর্য্যদেবের মূর্ত্তি ছিল সেখানে প্রকাণ্ড একখানা অন্ধকার কালো পর্দ্দার মত সমস্ত ঢেকে রেখেছে। শিলাদিত্য ডাকলেন 'গায়েবী? গায়েবী? কোথায় গায়েবী'? অন্ধকার থেকে উত্তর এল—'হায় গায়েবী, কোথা গায়েবী'। শিলাদিত্য মশাল আনতে হুকুম দিলেন; সেই মশালের আলোয় শিলাদিত্য দেখলেন—উত্তর দিকটা শূন্য করে সূর্য্যমূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের আধখানা যেন পাতালে চলে গেছে, কেবল কালো পাথরের সাতটা ঘোড়ার মুণ্ডু বাসুকির ফণার মত মাটির উপর জেগে আছে। যে ঘরে শিলাদিত্য গায়েবীর সঙ্গে খেলা করেছেন, যে ঘরে সারাদিন খেলার পর দুটি ভাই বোন্ গুর্জ্জরদেশের গল্প শুনতে শুনতে মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়তেন, যেখানে দেবদারু গাছের মত পিতলের সেই আরতি-প্রদীপ ছিল, সে সকল ঘরের চিহ্নমাত্র নাই। শিলাদিত্য সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে ডাকলেন 'গায়েবী, গায়েবী'? তাঁর সেই করুণ স্বর সেই অন্ধকার গহ্বরে ঘুরে ফিরে ক্রমে দূর থেকে দূরে পাতালের মুখে চলে গেল; গায়েব নিশ্বাস ফেলে রাজমন্দিরে ফিরে এলেন। সেই দিন রাজ আজ্ঞায় রাজকর্ম্মকারেরা পুরু সোনার পাত দিয়ে সেই প্রকাণ্ড মন্দির আগা গোড়া মুড়ে দিতে লাগল। শিলাদিত্য সে মন্দিরে আর অন্য মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলেন না। সেই অন্ধকার গহ্বর থেকে সূর্য্যের ঘোড়াগুলি যেমন আধখানা জেগেছিল তেমনিই রইল। তারপর শিলাদিত্য পাহাড় কেটে শ্বেতপাথর আনিয়ে, সূর্য্যকুণ্ডের চারিদিক সুন্দর করে বাঁধিয়ে দিলেন। যখনি কোন যুদ্ধ উপস্থিত হত, শীলাদিত্য সেই সূর্য্যকুণ্ডের তীরে সূর্য্যের উপাসনা করতেন।

তখনি তাঁর জন্য সপ্তাশ্বরথ জল থেকে উঠে আসত। শিলাদিত্য সেই রথে যখন যে যুদ্ধে গিয়েছেন, সেই যুদ্ধেই তাঁর জয় হয়েছে। শেষে একজন বিশ্বাস-ঘাতক মন্ত্রী, যাকে তিনি সব চেয়ে বিশ্বাস করতেন, সব চেয়ে ভাল বাসতেন, সেই তাঁর সর্ব্বনাশ করলে। সেই মন্ত্রী ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ জানতনা যে, শিলাদিত্যের জন্য সূর্য্যকুণ্ড থেকে সপ্তাশ্ব উঠে আসে। সিন্ধুপারে শ্যামনগর থেকে পারদ নামে অসভ্য একদল ম্লেচ্ছ যখন বল্লভীপুর আক্রমণ করলে, তখন সেই বিশ্বাসঘাতক তুচ্ছ পয়সার লোভে সেই অসভ্যদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে গোরক্তে সেই পবিত্র কুণ্ড অপবিত্র করলে। শিলাদিত্য যুদ্ধের দিন যখন সেই সূর্য্যকুণ্ডের তীরে সূর্য্যের উপাসনা করতে লাগলেন, তখন আগেকার মত নীল জল ভেদ করে দেবরথ উঠে এলনা। শিলাদিত্য সাতটা ঘোড়ার সাতটা নাম ধরে বারবার ডাকলেন, কিন্তু হায়, কুণ্ডের জল যেমন স্থির তেমনিই রইল। শিলাদিত্য হতাশ হয়ে রাজরথে শত্রুর সম্মুখে উপস্থিত হলেন, কিন্তু সেই যুদ্ধেই তাঁর প্রাণ গেল। সমস্ত দিন যুদ্ধের পর সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের বরপুত্র শিলাদিত্য অস্ত গেলেন। বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ সোনার মন্দির চূর্ণ করে বল্লভীপুর ছারখার করে চলে গেল।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মাঙ্গল্য।

অন্ধ করিও না আঁখি, এস আলো, প্রভাসি নয়ন।
করিও না স্বার্থমগ্ন, এস প্রেম হৃদয় রতন।
এনোনা সংহার তুমি, এস জ্ঞান, মানস উজলি।
সরস করিয়া চিত্ত, এস ভক্তি, প্রবাহে উছলি।
বিশ্বপদে আমি মোরে নেহারিব বিশ্বের আলোকে;
হেরিব অগণ্য বিশ্ব, ব্রহ্মপদে শান্বিত পুলকে।

এস তুমি হে পুরুষ, দেহ মাঝে বিক্রম বিস্তারি;
যৌবন-মাধুরী লয়ে বক্ষ মাঝে এস তুমি নারী।
অসংখ্য কর্ম্মের শিলা, স্কন্ধে আমি করিব বহন;
অচ্ছেদ্য মিলনে সবে মিলাইয়া গড়িব ভবন।
বিশ্বের সেবায় মোরে, বিশ্বদেব দেহ গো প্রেরণা;
বজ্রসম দিও পণ, পুষ্পসম কোমল করুণা।

বাঙ্গালার ইতিহাসের উপকরণ।

এদেশে ইতিহাসসঙ্কলনের উপযোগী মৌলিক অনুসন্ধানের বড়ই অভাব পরিদৃষ্ট হয়,—মৌলিক অনুসন্ধান না হইলে, দেশের প্রকৃত ইতিবৃত্ত কখনই লিপিবদ্ধ হইতে পারে না। এই দেশের পল্লীতে পল্লীতে খোঁজ করিলে এখনও প্রচুর ইতিহাসের উপকরণ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে, বৎসর বৎসর তাহার অনেকগুলি লুপ্ত হইয়া যাইতেছে, সুতরাং সেই সকল বিবরণ সংগ্রহ করা এখন অত্যাবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। এখন অনেক স্থানে প্রাচীন মঠ, মন্দির, ভগ্ন-ইষ্টকস্তূপ, পল্লীগাথা প্রভৃতি বিচিত্র প্রকারের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উপকরণে দেশের প্রাচীন স্মৃতি মৌনভাবে আত্মরক্ষা করিতেছে। সেই সমস্ত উপকরণ সংগ্রহানন্তর ধারাবাহিকভাবে "ভারতী"তে প্রবন্ধ প্রকাশ করা মনস্থ করিয়া আমরা নিম্নলিখিত প্রশ্নাবলী লইয়া পাঠক-বৃন্দের নিকট উপস্থিত হইতেছি। দেশের লুপ্ত-ইতিহাস-উদ্ধারের জন্য তাঁহাদের সহায়তা পাইব, এই ভরসায় তাঁহাদের নিকট আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ যে প্রশ্নের তালিকা অনুযায়ী যাঁহার যতটা জানা আছে, তদ্রূপ উত্তর প্রদান করিয়া আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন। যে কোন স্থানের বৃত্তান্ত পাইলেই আমাদের আংশিকভাবে কোন না কোনরূপ উপকার হইবে।

১। জেলার যে সকল গ্রামে অন্ততঃ শত বৎসরের প্রাচীন দেবালয়, মঠ বা ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ আছে সেই সকল গ্রামের তালিকা। সেই সকল ইষ্টকালয়, মঠ বা মন্দিরের বিস্তৃত ইতিহাস। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বিশেষরূপে উল্লেখ করিতে হইবে।

(ক) উহাদের আকৃতি ও গঠনের বিশেষত্ব। যদি কোন গৃহ বা মন্দির দোচালা ঘরের মত থাকে—তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

(খ) যদি গৃহ বা মন্দিরসংলগ্ন কোন প্রস্তরফলক থাকে, তবে তাহার লিপি উদ্ধারের চেষ্টা।

(গ) যদি ইষ্টকালয়ে কোনরূপ খোদাই চিত্র থাকে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ। উক্তরূপ গৃহ বা মন্দির সম্বন্ধে কোনরূপ জনশ্রুতি বা গল্প থাকিলে তৎবিবরণ।

২। যদি কোন মন্দির বা ইষ্টকালয়ের ভগ্নাবশেষ থাকে (অন্ততঃ ১০০ বৎসরের প্রাচীন)—তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ মনোযোগ আবশ্যক।

(ক) ঘরগুলির দৈর্ঘ্য এবং বিস্তৃতি।

(খ) জানালা এবং দরজার গঠন ও সংস্থান।

(গ) ইটগুলি কত বড়।

(ঘ) ইষ্টকালয়ের গঠনাদি সম্বন্ধে কোনও রূপ বিশেষত্ব থাকিলে তাহার বিবরণ।

(ঙ) কোনরূপ প্রতিমূর্ত্তি থাকিলে তাহার বিবরণ।

(চ) গ্রামে তৎসম্বন্ধে কোন প্রবাদ বা জনশ্রুতি আছে কি না? কোন রাজা, জমিদার কিংবা অপর কাহারও নামের সঙ্গে উহা কোনরূপে সংশ্লিষ্ট কি না?

৩। পূর্ব্বোক্ত প্রকারের গৃহ বা মন্দিরাদি ব্যতীত গ্রামে অপর কোনরূপ ঐতিহাসিক নিদর্শন আছে কি না,—মাটীর ঢিপি, পাথরের মূর্ত্তি ইত্যাদি। কিছু থাকিলে তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক।

৪। কোনও গ্রাম পূর্ব্বে খুব সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু এখন হীন অবস্থাপন্ন হইয়াছে—এরূপ জানা গেলে তৎসম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস। কেন সেই গ্রামের তদ্রূপ অবস্থা হইল।

৫ পুষ্করিণী খননকালে কিম্বা নদীগর্ভে কোন দেবমূর্ত্তি, লিপিযুক্ত প্রস্তরফলক বা অন্য কোনরূপ নিদর্শন পাওয়া গিয়া থাকিলে, তৎসম্বন্ধে পূর্ণ বিবরণ।

৬। কোন পাকাপথ বা সাঁকোর কোন নিদর্শন থাকিলে—তাহার বিবরণ।

৭। গ্রামে কোন শিল্পের উন্নতি হইয়া থাকিলে তাহাদের বিস্তৃত ইতিহাস। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

(ক) শিল্পজাত দ্রব্য কত প্রকারের ও কি কি মূল্যের।

(খ) শিল্পীর পারিশ্রমিকের হার কত, এবং উক্ত দ্রব্য প্রস্তুত করিতে কত সময় লাগে?

(গ) কোন্ সময়ে সেই শিল্পের বিশেষরূপে উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।

(ঘ) উহার অবনতি ঘটিয়া থাকিলে তাহার কারণ।

(ঙ) উহার পুনরুদ্ধার কিরূপে সংসাধিত হইতে পারে।

৮। কোন স্থানে গ্রাম্যগীতি, গাথা বা চলিতগল্প কিছু থাকিলে তাহার উল্লেখ।

৯। জেলার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্তবংশসমূহের ইতিবৃত্ত ও বংশ-তালিকা।

১০। গ্রামে কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীবিশেষের দ্বারা আচরিত বীরত্ব-সূচক বা আত্মত্যাগজনক কাহিনী চলিত থাকিলে তাহার বিবরণ।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

নারায়ণী।

ষড়বিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

রাত্রে একবারমাত্র শৈলজানন্দের সহিত রতনের সাক্ষাৎ হইল। শৈলজানন্দ রতনের বিশ্রামের ব্যবস্থা করিয়া প্রস্থান করিলেন। দুইজনে আর কোনও কথা হইল না।

রতন স্থির করিয়াছিলেন, শৈলজানন্দের বিষয় বড় একটা চিন্তা করিবেন না। কিন্তু তাঁর সমস্ত রাত্রি শৈলজানন্দের ভাবনাতেই কাটিয়া গেল। সে বৃদ্ধ, একটী পরিচ্ছন্ন, প্রশস্ত গৃহে, কোমল শয্যায় তাঁহার শয়নের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ সারারাত্রি তাহার উপরে এপাশ ওপাশ করিলেন,—নিদ্রা আসিল না। ভাবিলেন, রাজা-রাণীর চিন্তা ছাড়িলাম, নারায়ণীর চিন্তা ছাড়িলাম, অমন সুখের অনন্তপুবকেই ভুলিতে চলিয়াছি, তখন কোথাকার কে শৈলজানন্দের চিন্তা লইয়া মরি কেন? আমার কার্য্যত শেষ হইয়াছে, সুতরাং আর এখানে থাকিয়া লাভ কি? ছোটনাগপুরের চিন্তা এই স্থানেই রাখিয়া তীর্থের দিকে চলিয়া যাই।

শৈলজানন্দের সঙ্গে দেখা হইলে, হয়ত দুচারিদিনের মধ্যে এস্থান ত্যাগ করিতে পারিব না, বিলম্ব করিলে, আরও কত কি আপদ কত দিক হইতে ঘেরিয়া ধরিবে, অন্যমনস্কে হয়ত আবার কোন একটা কঠিন শৃঙ্খল পায়ে জড়াইব—নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ব্রাহ্মণ শৈলজানন্দের ঘর ছাড়িতে সংকল্প করিলেন। সেই দুষ্ট বালকটার মূর্ত্তি ধরিয়া, একটা কঠিন শৃঙ্খল যেন তাঁহার চোখের উপর দিয়া, ঝন ঝন শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই এস্থান ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তামাকুটা সাজিয়া খাইবেন, তাঁহার সে সাহসও কুলাইল না। তল্পীটা কাঁধে তুলিয়া, মৃগচর্ম্মটা বগলে পুরিয়া, একহাতে

লাঠী অন্য হাতে হুঁকাটী লইয়া ব্রাহ্মণ ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ভৃত্য ঝম্মন দ্বারদেশে মাথা রাখিয়া শুইয়াছিল। চৌকাট পার হইতে চরণটা তার মাথায় ঠেকিয়া গেল।

তখনও অনেক রাত্রি ছিল। চৌকাটে মাথা রাখিয়া ঝম্মন একটা বড় সুখের স্বপ্ন দেখিতেছিল। অনেক দিন পূর্ব্বে প্রতিবাসিনী ষোড়শী মুংরীর সঙ্গে তার বিবাহের সম্বন্ধ হয়। গরীব ঝম্মন যা যেখান হইতে উপার্জ্জন করিয়া আনিত, সমস্তই মুংরীর মায়ের হাতে ধরিয়া দিত। তথাপি অকৃতজ্ঞা মুংরীর মা, মুংরীকে অন্য ব্যক্তিকে সম্প্রদান করিল। ঝম্মনের মনোকষ্টের সীমা রহিল না। কিন্তু মুংরীর মাকে বহুদিন ধরিয়া সে যে সমস্ত সামগ্রী দান করিয়াছিল, একদিনের জন্যও তার দাবী দাওয়া করে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, মুংরী তাহাকে ভাল বাসিত। শুধু তার মায়ের জন্যই সে অন্য ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুতরাং মুংরীর উপর ক্রুদ্ধ না হইয়া সে তাহার একটা অসহনীয় দুঃখ কল্পনা করিত। মনে মনে ভাবিত, অনিচ্ছায় পরহস্তে পড়িয়া বালিকাটা তাহার জন্য কত কষ্টই না পাইতেছে! কিন্তু দিন কয়েক পূর্ব্বে মুংরীর সহিত দুই চারিবার সাক্ষাতে ঝম্মন তাহার ভিতর ভালবাসার বড় একটা চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। ঝম্মনের এইবার যথার্থই ক্রোধ হইয়াছে।

ক্রোধে ঝম্মন স্বপ্ন দেখিতেছিল। সে একটা গাছ তলায় বসিয়া আছে, আর মুংরী তাহারই প্রদত্ত সাড়ীখানি পরিয়া, স্বামীর সঙ্গে তাহারই সম্মুখে পথ চলিতেছে। রাগে ঝম্মন গাছের তলায় বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে, এমন সময় তাহার বোধ হইল, পশ্চাৎ হইতে মুংরী তাহার মাথায় ঠোকর মারিল। আহ্লাদে কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া, ঝম্মন তাহার হাত ধরিয়া ফেলিল। রতন দেখিলেন, সতর্ক প্রহরী ঝম্মন, চোর মনে করিয়া তাঁর পা ধরিয়াছে।

রতন। ঝম্মন ছাড়িয়া দে,—আমি চোর নই।

ঝম্মন। তুমি চোর নওত, চোর কে? তুমি আমার যথাসর্ব্বস্ব চুরি করিয়াছ।

রতন। আমি তোর কি চুরি করিলাম?

ঝম্মন। তুই আমার মন চুরি করিয়াছিস্, প্রাণ চুরি করিয়াছিস্।

রতন অবাক হইয়া দাঁড়াইলেন। ভাবিলেন, বেটা বলে কি?

মুংরাকে নিরুত্তর দেখিয়া ঝম্মনের সাহস হইল। তখন সে আরও জোর করিয়া যেন তাহার হাত চাপিয়া ধরিল, এবং সবিনয়ে বলিল, "বল্ মুংরী, আমাকে ছাড়িবি না?"

ব্রাহ্মণ বুঝিলেন ভৃত্যটা স্বপ্ন দেখিতেছে। তখন কি করেন, ধীরে ধীরে তার হস্ত হইতে চরণ মুক্ত করিলেন। সে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে চুপ করিল। বহির্গমনমুখেই বাধা পাইয়া, তাঁহার মনে একটু আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, অদৃষ্টে আরও বিপদ আছে নাকি?

কিন্তু পদে পদেই বিপদ ভাবিতে হইলে, আর পথ চলা হয় না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন, অদৃষ্টে যাই থাকুক, আর ফিরিব না।

বহির্দ্বারের নিকটে বারাণ্ডায় মুন্না ঘুমাইতেছিল। রতন তাহাকে উঠাইয়া বলিলেন,—"আমি চলিলাম। তুমি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত প্রহরীর কার্য্য কর।"

মুন্না। মণিবের সঙ্গে দেখা করিবেন না?

রতন। দেখা করিলে, সহজে যাইতে পাইব না।

মুন্না। তুলসীর সহিত দেখা করিবেন না?

রতন। ফিরিয়া আসিলে দেখা করিব। মুন্না! এখন আর বাধা দিয়োনা।

মুন্না দ্বিরুক্তি না করিয়া সাষ্টাঙ্গে রতনকে প্রণাম করিল। ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিয়া বাটীর বাহির হইলেন।

সপ্তবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকারে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া রতন সেই পূর্ব্বোক্ত সরোবর-তীরে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে একটা কাপড়ের পুঁটুলী বগলে করিয়া তুলসী তাঁহার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। রতন বুঝিলেন, মুন্নার কাছে সংবাদ পাইয়া, তুলসী তাঁহাকে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়াছে। ঘন ঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দে, সেটা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন; কিন্তু কক্ষে একটা বৃহৎ পুঁটুলীর অস্তিত্বের কারণ নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। কিঞ্চিৎ অপ্রতিভের মত তিনি বলিলেন—"তোমার সঙ্গে দেখা হইল, ভালই হইল। মা! তোমার পিতাকে বলিও, আমি চলিলাম। তীর্থে যাইবার জন্য আমার মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে।"

তুলসী। তবে আমাকে লইয়া যাইবে কে?

রতন। তুমি কোথায় যাইবে?

তুলসী। আমিও তীর্থে যাইব।

রতন। তীর্থে যাইবে!

তুলসী। হাঁ প্রভু! তীর্থে যাইবার জন্য আমারও মন উদ্বিগ্ন হইয়াছে।

রতন। তা আমার সঙ্গে কিরূপে যাইবে?

তুলসী। আপনি আমার স্বামীর গুরু। তীর্থের পথ আপনি দেখাইবেন নাত দেখাইবে কে?

রতন। তুলসী আমি ভাল বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি একজন সম্ভ্রান্তের কন্যা। অভিভাবকহীনার ন্যায়, এক ভিখারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে তীর্থে যাইবে কি? লোকে শুনিলেই বা কি মনে করিবে?

তুলসী। আপনি কি কিছু জানেন না?

রতন। কি জানিব?

তুলসী। আমার স্বামীর পত্রের কথা?

রতন। আমি কেমন করিয়া জানিব? সদাশিব ত পত্রের বিষয় আমাকে কিছু বলে নাই। আমার হাতে মোড়ক করিয়া আনিয়া দিয়াছে; আমিও সেই অবস্থায় পত্র তোমার পিতার হাতে আনিয়া দিয়াছি।

মাথা হেঁট করিয়া তুলসী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিল, তারপর বলিল, যদি নাই জানেন, তথাপি আপনি আমাকে কি সাহায্য করিতে পারেন না?

রতন। কি করিতে হইবে বল।

তুলসী। আমাকে অনন্তপুরে রাখিয়া আসিবেন।

রতন। তোমার স্বামী কি যাইতে লিখিয়াছেন?

তুলসী। পত্রখানা সঙ্গে আছে, পাঠ করিবেন কি?

রতন। এখনও অন্ধকার আছে।

তুলসী। অনুমতি করুন, আমি পড়ি।

রতন। পড়িতে হবে না, কি লেখা আছে বলিতে পার।

তুলসী। তিনি পত্রপাঠ অনন্তপুর পাঠাইতে পিতাকে অনুরোধ করিয়াছেন।

রতন। কেন বুঝিতে পারিয়াছ কি?

তুলসী। রাজকুমারী নারায়ণীর সহচরী হইয়া আমাকে অনন্তপুরে থাকিতে হইবে।

রতন। এরূপ কার্য্যে তোমার পিতা সম্মতি দিলেন! ইহাতে যে তাঁর মানহানি হইবে।

তুলসী। রাজার পূর্ব্বাবস্থা থাকিলে হইত, তাঁর এখন বড়

দুরবস্থা। এরূপ সময়ে তাঁর পরিবারভুক্ত হইলে, তাঁহারই উপকার করা হয়। আমি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মত নারায়ণীর ভারগ্রহণ করিব।

তুলসী যদি অন্ধকারে দেখিতে পাইত, তাহা হইলে দেখিত, ব্রাহ্মণ তাহার মুখ দেখিবার জন্য আকুলনেত্রে, আকাশব্যাপী গ্রহতারার কাছে আলোক ভিক্ষা করিতেছে।

"তুলসী!—কিন্তু তুলসা"—রতনের স্বর কাঁপিয়া উঠিল। "কিন্তু মা! তোমারও যে দুর্দ্দশা হইবার সম্ভাবনা।"

তুলসী। বিবাহের পর হইতেই স্বামিদর্শনসুখে বঞ্চিত আছি। নারীর এহ'তেও দুর্দ্দশা আর কি হইতে পারে প্রভু!

তুলসী এবারে ব্রাহ্মণকে চলিতে অনুরোধ করিল। বলিল, অপেক্ষা করিলে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা। বুঝিয়াছেন ত আমি সন্তান ফেলিয়া চলিয়াছি।—সে যদি জাগিয়া পথরোধ করে, তাহা হইলে আজ হয়ত যাইতে পারিব না।—আজ কেন, হয়ত, আর কখনও পারিব না। অনেক কষ্টে মন প্রস্তুত করিয়াছি। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে, আসুন অগ্রসর হই।"—

তুলসী অগ্রসর হইল। দেবাদিষ্টবৎ ব্রাহ্মণ তার অনুসরণ করিলেন। একবারমাত্র তীর্থের কথাটা মনে উঠিল। মনে মনে বলিলেন, "আমি কোথায় চলিয়াছি?" হৃদয়মধ্য হইতে উত্তর আসিল—"তীর্থে।"—"পথ দেখাইতেছে কে?"—উত্তর—"দেবতা।"

আর একবার তুলসীকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল—"সেখানে নারায়ণীর রক্ষায় চলিয়াছ। কিন্তু সে অবস্থায় স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলে যে তাহার অনিষ্ট হইবে। তোমার স্বামী রাজার শত্রুর গৃহে চাকুরী করিতেছে।"

"স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিব না। তিনি দেখা করিতে আসিলে, দেখা করিব না। বহুদিনের পর দেখা, তিনি যদিও চিনিতে পারেন,

আমি তাঁহাকে চিনিব না।" মাথা তুলিয়া, ব্রাহ্মণ এবারে প্রাণপণে তুলসীর মুখ দেখিতে চেষ্টা করিলেন। চেষ্টা সফল হইল। বৃদ্ধ দেখিলেন, সুন্দরীর মুখ মৃদু হাসিতে ভরিয়া গিয়াছে। আর তারই কিয়দংশ চুরি করিয়া উষার আকাশ সোণার বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে।

অষ্টাবিংশতিতম পরিচ্ছেদ।

দুইদিন পরে, সন্ধ্যায় দুইজন দরোয়ান বীরচন্দ্রের দেউড়ীর সম্মুখের বেদীর উপর বসিয়া কথা কহিতেছিল। তাহার মধ্যে বাক্যিদার পাঁড়ে, পলায়ন সিংহ তেওয়ারীকে কহিল, "পণ্ডিতজীকে পাকড়াও করা কি পেট গজন্দার সিপাইএর কাজ? উহারা লাঠী খেলার কি জানে? লড়ায়ে লাঠী কেমন করিয়া ধরিতে হয়, তাই এখনও শিখে নাই। শুধু সুপারিষের জোরে দেওয়ানজীর কাছে চাকুরী পাইয়াছে।"

পলা। তা যা বলিয়াছ পাঁড়েজী! সুপারিষের কাল পড়িয়া সকলেরই পশার বাড়িয়া গেল। নহিলে তুমি আমি দশ টাকায় জন্ম কাটাইলাম, আর কোথাকারকে সদাশিব সংগুজার রাজার সুপারিষের জোরে, একেবারে সবাইকে ডিঙাইয়া কুড়ি টাকার জমাদারী পাইল!

বাক্য। সেই জন্যইত পণ্ডিতজীকে ধরিয়াও ধরিলাম না।

পলা। সেই জন্যইত আমি দূরে দূরে দাঁড়াইয়া শুধু লড়াই দেখিতে লাগিলাম। দশটা টাকার জন্য প্রাণ দিতে যাব কেন?

বাক্য। লড়াই করিলে কি পণ্ডিতজী চোখের সামনে দিয়া পলাইতে পারে? তার কাণ পাকড়াইয়া একেবারে সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করিতাম।

পলা। কই সদাশিব ত আস্ফালন করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু বৃদ্ধকে ধরিতে পারিল কি? আমি হইলে না ধরিয়া কি ফিরিতাম? বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন চোখের সামনে দিয়া পলাইয়া যায়, তখন একবার মনে

করিলাম, লাঠী দিয়া বৃদ্ধের ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিই। এই মনে করিয়া লাঠীটী উঠাইলাম, কিন্তু সদাশিবের কথা মনে পড়িতেই, রাগে শরীর কাঁপিয়া গেল। লাঠীটাও অমনি ঠক্ করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। মনে করিলাম, কেন ধরিব, কার জন্য ধরিব, এ সংসারে মানীর মর্য্যাদা কই? সূক্ষ্ম বিচার কই? ভাবিতে ভাবিতে চলিয়া আসিলাম। লাঠীটে যে মাটীতে ফেলিয়াছি, সেটা মনেই রহিল না।

বাক্য। পণ্ডিতজী—পণ্ডিতজী—নাম যা শুনিয়াছিলাম, তা কাজে দেখিলাম কই?

পলা। তুমিও যেমন, দূর হইতে যা শোনা যায়, কাছে তার কি দেখিতে পাওয়া যায়?

বাক্য। ওই কি লাঠী ঘোরান। একটু বাঁয়ের প্যাঁচ মেরে ডাইনে ঠোকর দিলে, টপ্ করিয়া বুড়ার হাত. হইতে লাঠীটা খসিয়া পড়িত। লাঠী খেলাটা দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া রাগে আমারও সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল।

পলা। কিন্তু পণ্ডিতজীকে যে ধরিতে পারিবে, তাহাকে আর চাকুরী করিয়া খাইতে হইবে না।

বাক্য। এই জন্যই ত ক্রোধটা আমার কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় বাড়িয়া গিয়াছে। আজ কোন একটা অযোগ্যলোক বুড়াকে ধরাইয়া দিয়া, এক দমে হাজার টাকা পাইবে, ফাঁকতালে বড়লোক হইয়া যাইবে—এ দুঃখ আমাদের প্রাণে সহিতেছে না।

দুঃখের সমস্ত বোঝাটা যেন পলায়নসিংএর ঘাড়ে পড়িয়া গেল। তাহার বোধ হইল, যেন কোন অজ্ঞাতকুলশীল নরাধম তাহার সম্মুখ হইতে, টাকার তোড়াটা ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতেছে। মনের ভিতর হইতে রাণীমুখো টাকাগুলা, তার পানে চাহিয়া, যেন হাসিয়া হাসিয়া এ উহার গায়ে ঢলিয়া পড়িতেছে। কি মধুর প্রাণস্পর্শী ঠুনঠুন, টুনটুন

শব্দ! তেওয়ারীজী আর সহিতে পারিল না। অতি মিষ্টরস প্রাণে পশিয়া তাহার সর্ব্বশরীরে এক অসহনীয় জ্বালা উৎপাদন করিল। তেওয়ারীজী সর্ব্বাঙ্গ নখদ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিয়া, পৃষ্ঠে গণ্ডে গোটাকতক চাপড় মারিয়া, বলিয়া উঠিল—"ইস্! এক হাজার টাকা! সুদের সুদ, তার সুদ—আরও কতকির সঙ্গে মিশিয়া, পাঁচ বছরে সে হাজার টাকা কি বাড়ই না বাড়িত! বাগান বাগিচায়, ঘরে দোরে, চাকরে বাকরে—জমা জমীতে কত প্রকারেরই মূর্ত্তি ধরিয়া, সে হাজার টাকা? ইস্!"—তেওয়ারীজী আর বলিতে পারিল না। কেবল বার কতক ইস্ ইস্ করিতে লাগিল। তেওয়ারীজীর বোধ হইল, টাকাগুলা যেন হাতের কাছ হইতে সরিয়া যাইতেছে। আহা! হতভাগ্য পণ্ডিতজী যদি নিজের পায়ে লাঠী মারিয়া খোঁড়া হইয়া পড়িত, কিম্বা তাহাকে দেখিয়া মুদ্রিত চক্ষে হাত দুইখানি বাড়াইয়া দিত; এক গাছি কোমল রজ্জু দিয়া বাঁধিবার জন্য—তাহা হইলে আজ তেওয়ারীজীর অন্ন খাইত কে?

আসল কথা রতনের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। রতনের হাত হইতে নিস্তার পাইবার ভয়ে, আনন্দদেব কর্ত্তৃপক্ষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বুঝাইয়াছে দুর্দ্দান্ত দস্যু রতন রায়, তার প্রাণনাশে সর্ব্বদা সচেষ্ট। তাহার হাত হইতে রক্ষা না করিলে, তিনি সত্বর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন। আনন্দদেবের অপসারণে জমীদারী কার্য্যে বিশৃঙ্খলা ঘটিতে পারে, ভাবিয়া রাঁচির বড় সাহেব, দস্যুদমন সঙ্কল্পে, অনন্তপুরে নিজেই তদারকে আসিয়াছিলেন। তদারকের ফলে হারলি তিরস্কৃত হইয়াছেন, এবং অবৈধজনতা, দস্যুতা, গুরু প্রহারাদি অভিযোগে রতনের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে। পুলীশ চারিদিকে রতনের সন্ধান করিয়াছে। থানাতল্লাসী করিতে বীরচন্দ্রের প্রাসাদে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। রতনকে কোথাও লুকাইয়া রাখিয়াছেন বলিয়া রাজাকে কতকটা লাঞ্ছিতও হইতে

হইয়াছে। অনুসন্ধানে যখন রতনকে পাওয়া গেল না, তখন তাহাকে গ্রেপ্তারের জন্য হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষণা হইল।

পলায়ন সিং যখন সেই পুরস্কারটা স্মরণ করিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতেছিল, তখন আর একজন দরোয়ান সেখানে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, পণ্ডিতজী ধরা পড়িয়াছে। পুলীশ তাহাকে হাতকাড় দিয়া অনন্তপুরে আনিতেছে।

শুনিবামাত্র তাহারা ব্রাহ্মণকে দেখিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে, গভীর কোলাহল অনন্তপুর আবৃত করিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

স্বর্গীয় রাজা প্রমথনাথ রায় বাহাদুরের শিল্পানুষ্ঠান।

খ্রীঃ ১৮৬৭—১৮৮৩।

[দেশীয় শিল্পসম্বন্ধীয় "ভারতী"র অনেক প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে, সমাজের উচ্চশ্রেণীর মস্তিষ্ক ও নিম্নশ্রেণীর হস্ত যদি সহযোগে কার্য্য করিতে ব্রতী হয়, তবেই দেশীয় শিল্পের পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি হইতে এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ শিক্ষালাভ হইবে। ইহাতে দেখা যায় দীঘাপতিয়ার ভূতপূর্ব্ব রাজা বাহাদুর কিরূপ উপাদান লইয়া শিল্প সম্বন্ধে উৎকর্ষের দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যন্ত্রীদের দ্বারা গালিচা নির্ম্মাণ, এবং মাল্যকরের দ্বারা চিত্রকার্য্য সুসম্পন্ন করা—কঠিন হইলে কতকটা স্বাভাবিক, কেননা বিদ্যাগুলি কতক পরিমাণে একজাতীয়। এই ভাবে যে ব্যক্তি যে কার্য্যের উপযোগী তাহা আবিষ্কার করিয়া সে ব্যক্তিকে সেই কার্য্যে নিয়োগ করাতেই উচ্চশ্রেণীর লোকের মনস্বিতার পরিচয় হয়। তাহা ছাড়া স্বাধিকারের প্রজাদিগের দ্বারা সমস্ত প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ম্মাণ করিয়া তাহ

উপভোগ করিত যে একটা নির্ম্মল তৃপ্তির ভাব উপস্থিত হয়,—স্বীয় প্রজামণ্ডলীর জীবিকা সংস্থানের উৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহাদি সজ্জিত করিয়া তাহাতে বাস করায় যে আনন্দ জন্মে আধুনিক ধনী সন্তানগণের মধ্যে অনেকেই তাহা হইতে বঞ্চিত। দীঘাপতিয়ার রাজা বাহাদুরের এই উদাহরণ সর্ব্বথা অনুকরণীয়, আশা করি বর্ত্তমান রাজা তাঁহার পিতার প্রবর্ত্তিত এই সকল অনুষ্ঠানের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া তাঁহাদের এই স্বদেশপ্রিয়তার কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। ভাঃ সং।]

যে সময়ের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে সে সময়ে দারজিলিঙ রেলওয়ে স্থাপিত হওয়ার কেবল সূত্রপাত হইতেছিল মাত্র, তখনও উত্তরবঙ্গের সহিত কলিকাতার তেমন যোগাযোগ হয় নাই; সুতরাং আজিকালিকার মত তখন নাটোর অঞ্চলে আধুনিক সভ্যতা-সম্মত দ্রব্যজাত সংগ্রহ করা সুদুষ্কর ছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত রাজা প্রমথনাথ, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের অধীন কলিকাতার ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসন হইতে পাঠ সমাপন পূর্ব্বক গৃহে আসিয়া এই অভাব উপলব্ধি করিলেন এবং তখন হইতেই নিজের এবং এতদ্দেশের অভাবপূরণ করিবার নিমিত্ত যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার উদ্যম সাফল্য লাভ করিবার পূর্ব্বেই ১৮৮৩ খ্রীঃ অব্দে ৩৪ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনি ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। এই অত্যল্পকালের মধ্যেই যে সকল শিল্পানুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল।

এ অঞ্চলের যে সকল ছুতার মিস্ত্রী ছিল তাহারা মোটামুটি খট্টা, তক্তপোষ, পিঁড়ী, সিন্দুক প্রভৃতি সচরাচর আবশ্যক গৃহোপকরণ ছাড়া অন্য কিছুই প্রস্তুত করিতে পারদর্শী ছিল না। প্রমথনাথ কলিকাতা হইতে উৎকৃষ্ট সূত্রধর আনাইয়া স্বদেশীয় ছুতারবৃন্দকে কাষ্ঠ-যোজনা (joining) প্রভৃতি দুরূহ কার্য্যে তৎপর করিয়া তাহাদিগের দ্বারা চেয়ার, টেবিল, আলমায়রা প্রভৃতি প্রস্তুত করাইয়া লইতেন। এই সঙ্গে কাষ্ঠখোদাই (carving) কার্য্যেও ইহারা বিশেষ পারদর্শিতা

লাভ করিয়াছিল। সূত্রধরগণ এমন সুদক্ষ হইয়াছিল যে, রাজা প্রমথনাথ ইহাদিগের সাহায্যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নিম্নলিখিত পাঁচখানি বজরা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ; 'নূরজাহান', 'বারিক', 'যমুনা' এবং বড় ও ছোট ভাউলে।'

ইহার মধ্যে 'নূরজাহান'* নামক বজরাখানি অতিশয় বৃহৎ ছিল ; ইহার দৈর্ঘ্য ৯৫ ফিট। এবং মাস্তুল, বুম, দড়া, দড়ি প্রভৃতিতে যখন সজ্জিত হইত তখন দেখিতে একখানি ক্ষুদ্র জাহাজের ন্যায় প্রতীয়মান হইত। ইহার অভ্যন্তরে সুপ্রশস্ত চারিটী কামরা ছিল। প্রথম কামরা (vestibule) ভৃত্যাদির বাসের নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট ছিল ; দ্বিতীয় কামরা (salon) সমাগত ভদ্রলোকদিগের অভ্যর্থনার নিমিত্ত ও বৈঠকখানারূপে ব্যবহৃত হইত।

তৃতীয় কক্ষটী শয়নাগার চতুর্থটী শৌচ ও স্নানাগার। এই বৃহদায়তন নৌ-নির্ম্মাণে ছত্রিশ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বজরা 'বারিক' নূরজাহান অপেক্ষা ক্ষুদ্রতর হইলেও উহাতে একটী অধিক কামরা আছে, সুতরাং দুইটী শয়নাগার থাকায় নূরজাহান অপেক্ষা ইহা আরামজনক। 'যমুনা' 'নূরজাহানেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভাউলে দুইখানিতেও চারিজন ভদ্রলোকের সচ্ছন্দ রাত্রিবাসের বন্দোবস্ত ছিল। স্থানীয় সূত্রধারগণ যে, এই সকল সুবৃহৎ বজরাগুলি-সমাধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিল, ইহা রাজা প্রমথনাথের পক্ষে বড় কম শ্লাঘার বিষয় নহে, বিশেষতঃ সেকালে চীনা মিস্ত্রারও রাজত্ব ছিল না।

কাঠের কার্য্য শিখাইতে হইলেই তাহার আনুসঙ্গিক 'বার্ণিসের' কাজ ও বেত্রমণ্ডনের কাজ শিখানও প্রয়োজন হয়, সুতরাং রাজা

* প্রমথনাথের মৃত্যুর পর রাজসাহীর তৎকালীন কমিশনর সাহেব কাহারও উপরোধে কর্ণপাত না করিয়া নূরজাহান বিক্রয় করিয়া ফেলেন। এক্ষণে প্রমথনাথের পুত্র 'দ্বিতীয় নূরজাহান' নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ইহার দৈর্ঘ্য ৯০ ফিট।

বাহাদুর এতদুভয় কার্য্যেও স্থানীয় লোকদিগকে পারদর্শী করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত হস্তীর 'হাওদা', চারজামা ও পাল্কী প্রভৃতি নির্ম্মাণেও ছুতারগণ অপারগ ছিল না। এতৎস্থলে বলা বোধ হয়ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, রাজাবাহাদুর নিজ পছন্দ মতে সুন্দর দুইখানি পাল্কী ও এক খানি তাঞ্জাম প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাদিগের সাজ দাণ্ডা প্রভৃতি রৌপময় ছিল এবং অভ্যন্তর প্রদেশ ফেল্ট বস্ত্রের আস্তরণে আচ্ছাদিত ছিল। গদি প্রভৃতি 'মরক্কো' মণ্ডিত, তাঞ্জামের হুড ফিটন গাড়ীর হুডের ন্যায় সঙ্কোচনসাধ্য ও চর্ম্ম-নির্ম্মিত। শিকারী হাওদা ব্যতীত রাজাবাহাদুর হস্তিপৃষ্ঠে সান্ধ্যভ্রমণের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একখানি 'আরাম' হাওদা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। এই হাওদাখানি দেখিতে চক্রশূন্য ফিটন গাড়ীর আকৃতি এবং ইহাতেও সঙ্কোচনসাধ্য হুড এবং 'মরক্কোর' গদি প্রভৃতি বিদ্যমান ছিল। এই ধরণের 'আরাম' হস্তীর হাওদা, তৎকালে অন্য কোনও রাজামহারাজার ছিল কি না সন্দেহ।

তাম্বু, কানাৎ, শামিয়ানা প্রভৃতি ছিঁড়িয়া যায় দেখিয়া রাজাবাহাদুর তাহার সংস্কারকার্য্যও দেশীয় লোকদিগকে শিখাইয়াছিলেন। তাম্বু না হউক ইহারা নূতন কানাৎ ও শামিয়ানা আপনারাই প্রস্তুত করিতে পারে।

স্বর্গীয় রাজাবাহাদুরের বোধ হয় এই সংকল্প ছিল যে, ভবিষ্যতে কোন কার্য্যে যথাসম্ভব কম বৈদেশিকের সাহায্যগ্রহণ করিবেন, তাই জীবনের শেষভাগে Cushioned চেয়ার কৌচ প্রভৃতির Upholstry (গদিমোড়াই) কার্য্যে দেশীয় দরজীদিগকে পারদর্শী করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এই কার্য্য এবং আরও বহুবিধ সৎকার্য্যাবলী অসম্পূর্ণ রাখিয়াই ৩৪ বৎসর বয়সে মারা যান; সুতরাং একার্য্যে কেহ বিশেষত্বলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই :

উদারহৃদয় প্রমথনাথ সামান্য চর্ম্মকারদিগকেও উপেক্ষা করেন নাই; তাঁহার উৎসাহে চর্ম্মকারেরাও বহু সূক্ষ্ম কার্য্য শিক্ষা করিয়াছিল। অনের

সাজ প্রভৃতি ইহারা প্রস্তুত করিতে শিখিতেছিল, এবং Upholstry (গদিমোড়াই) কানাৎ প্রভৃতির কার্য্যে আবশ্যকীয় চর্ম্মের কার্য্য ইহারাই সম্পাদন করিত। শিকার লব্ধ ব্যাঘ্রচর্ম্ম সংস্করণ (curing) এবং তচ্চর্ম্মে নির্ম্মিত মণ্টিথের স্লিপার প্রস্তুত করিতে রাজাবাহাদুর ইহাদিগকে দক্ষ করিয়াছিলেন। এই উৎসাহের ফলে এক সময়ে রূপলালি-চটি নাটোর অঞ্চলে বিলক্ষণ প্রতিপত্তিলাভ করিয়াছিল।*

রাজাবাহাদুরের অনেক হস্তি-দন্ত জমা হওয়ায় উহার সদ্ব্যবহার কল্পে মুর্শিদাবাদ হইতে মথুর ও রামেশ্বর নামক দুইজন দক্ষ শিল্পী আনাইয়া স্বায় বৈঠকখানার একটী কুঠরীতে গজদণ্ডের Work-shop কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই কারখানায় নিজতত্বাবধানে ও উপদেশে নিম্নলিখিত উত্তম কারুকার্য্যসমন্বিত দ্রব্যগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।†

(ক) দুর্গাপ্রতিমা‡—কলিকাতা মিউজিয়ামে রক্ষিত দুর্গাপ্রতিমা হইতে ইহা অনেক বৃহৎ এবং সূক্ষ্মকারুকার্য্যবিশিষ্ট; 'কলাবৌটী, পর্য্যন্ত বাদ যায় নাই। প্রতিমার সম্মুখে নৈবেদ্যাদি সোপকরণে পরিবেষ্টিত পূজানিরত পুরোহিত এবং সনারিকেল ঘটত্রয়। চালচিত্রে প্রিয়বাহন ও নন্দীর সহিত মহাদেব খোদিত রহিয়াছেন।

* বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর এই চর্ম্মকারগণের দ্বারা বহু ব্যাঘ্রচর্ম্মসংযোগে একখানি সুদীর্ঘ সোপানাবরণ প্রস্তুত করাইয়াছেন। বিগত কনফারেন্স উপলক্ষে 'সিংহ দালানের' বৃহৎ সোপানাবলীর উপরে এই আবরণ খানি পাতা হইয়াছিল।

† এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে প্রমথনাথের পিতামহ বহুকাল পূর্ব্বে একখানি গজদন্তের মনোহর পালঙ্ক প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। প্রমথনাথের মৃত্যুর পরেও সে পালঙ্ক বিদ্যমান ছিল।

‡ এই প্রতিমা ও তালিকাবর্ণিত তাবৎ গজদন্তনির্ম্মিত দ্রব্যগুলি এক্ষণে কলিকাতা ১৬৩ নং লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ ভবনে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। বর্ত্তমান রাজা বাহাদুর আরও নবনব দ্বিরদনির্ম্মিত দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইয়া তাহাও এতৎ সঙ্গে সাজাইয়া রাখিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনটী গোটা দন্ত ব্রহ্মপ্রদেশ হইতে অতি সুন্দররূপে খোদাইয়া আনা হইয়াছে।

(খ) তাজমহল—ইহা একটী যন্ত্রবিশেষ, ইহার নির্ম্মাণকৌশল ও কারুকার্য্য নিখুঁত।

(গ) সুসজ্জিত হস্তী—পৃষ্ঠোপরি হাওদার ভিতরে আরোহী ও তৎভৃত্য এবং স্কন্ধে অঙ্কুশ হস্ত মাহুত।

(ঘ) পাল্কী—মায় পূর্ণসংখ্যক বাহক, বরকন্দাজ, চোপদার এবং ছাতাবরদার। ভিতরে সুখে সমাসীন আরোহী পাঠনিরত।

(ঙ) অশ্বশকট—সুসজ্জিত-অশ্ব-সংযোজিত। কশাবলগাহস্ত চালক ও আরোহীরও অপ্রতুল নাই।

(চ) গো শকট—মায় বলীবর্দ্দযুগল এবং 'মাঘাল'-শীর্ষ ধূমপান-নিযুক্ত চালক। শকটের 'বাঁতাগুলি'ও সুস্পষ্ট! এইরূপ আরও অনেকগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুত্তলাদি ছিল, কিন্তু তাহাদের বর্ণনা না করিয়া হস্তিদন্তনির্ম্মিত দুইটী সুপ্রসিদ্ধ দ্রব্যের উল্লেখ করিব।

বর্ত্তমান ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড মহোদয় যখন প্রিন্স অব ওয়েলস্ রূপে ভারতে শুভাগমন করিয়াছিলেন তখন রাজা প্রথম নাম এই Work-shop (কারসনিরে) গজদন্ত নির্ম্মিত সুন্দর একটী সিগারেট কেস প্রস্তুত করাইয়া তাহাকে উপায়ন স্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন।* বিবিধ সূক্ষ্ম কারুকার্য্যাভ্যন্তরে সিগারেট কেসের উপর কবিবর হেম বাবুর প্রণীত নিম্নলিখিত শ্লোকটী raised বঙ্গাক্ষরে খোদিত ছিল:—

"ফিরিবে যখন মায়ের নিকটে
ব'ল বাছাধন ব'ল অকপটে
ভারত-ব্রহ্মাণ্ড-প্রাণী এক কালে
ডাকে তাঁর নাম প্রাতঃসন্ধ্যাকালে
তাদের পরাণ যেন জুড়ায়।"

---

* ইহার প্রতিদানে প্রিন্স ইংলণ্ডে ফিরিয়া রাজাবাহাদুরকে কাচের আবরণে রৌপ্য চর্ম্মমণ্ডিত বন্ধুর উপলবহুল ক্ষেত্রে সমাসীন কৃষ্ণ কুক্কুট যুগল উপহার পাঠাইয়া-ছেন।

আবার যখন ৺ ডিউক অব এডিনবরা এই দেশে আসিয়াছিলেন তখন তাঁহাকেও গজদন্তনির্ম্মিত এক সেট দবা ও ছক রাজা-বাহাদুর এই কারখানায় প্রস্তুত করিয়া উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন।* রাজা-বাহাদুর বহুব্যয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নানাবিধ মূল্যবান শিল্পজাত দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া স্বীয় ভবন সজ্জিত করিয়াছিলেন। নিম্নে কতকগুলির নামোল্লেখ করা যাইতেছে;—কাশ্মীরী শালের গালিচা,† কাশ্মীরী কারুকার্য্যবিশিষ্ট সুবর্ণময় পানপাত্র‡ মায় খুঞ্চে (ট্রে)। অমৃতসরী সুকোমল পুরু গালিচাচয় এতন্মধ্যে দুইখানি সুবৃহৎ—৬০ ফিট পরিমিত দীর্ঘ। জয়পুরের মিনাগজের জিনিষ এবং শ্বেতমর্ম্মরের পুত্তলাদি। আমরা দেখিয়াছি—দুই খানি শ্বেতমর্ম্মরের টেবিল ছয়টী মোড়াকৃতি আসন এবং উক্ত সংখ্যক বৃহৎ জলচৌকী বারান্দা প্রভৃতির শোভাসম্পাদন করিত। মোরাদাবাদী ও বেনারসী বিবিধকারুসমন্বিত ব্র্যাস অয়ার, লক্ষ্ণৌ ও কৃষ্ণনগরের মৃৎপুত্তলাদি, এতন্মধ্যে মৃতহস্তী, গো, অশ্ব প্রভৃতিও ছিল। আগরার অস্তনিবিষ্ট মর্ম্মর-কৌটাদি। বিশাখপত্তনের গজদন্ত, শৃঙ্গ ও চন্দনকাষ্ঠাদি উপকরণে নির্ম্মিত সম্পুটক প্রভৃতি। রাজপুতনার বিবিধ প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র ছিল, একখানি ছোরার বাঁট মণিখচিত স্ফটিকনির্ম্মিত ছিল, অপর একখানির বাঁট খোদিতগজদন্তনির্ম্মিত। নেপালের রৌপ্য, প্রবাল ও ফিরোজাদি মণ্ডিত সকোষ খুকড়ি। লেপ্চা ছোরা সাঁওতালা তীরধনুক। আদত গণ্ডারচর্ম্মের ঢাল ও বহু কিরিচ খড়্গাদি এখনও দিঘাপতিয়া রাজবাটীর vestibule প্রভৃতির শোভা সম্পাদন করিতেছে।

---

* ডিউকও ঐরূপ কৃষ্ণ ফুলট যুগল প্রত্যুপহার দিয়াছিলেন।

† বহুবিধ শাল জামিয়ার প্রভৃতির উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেবল একখানি জামিয়ারের লেপ ও বর্ত্তমানে একখানি জামিয়ারের বালাপোষ আমরা দেখিয়াছি।

‡ এই পানপাত্র সেটটী অতিশয় গুরুভার, ইহার মূল্য হামিল্টন কোম্পানি আট হাজার টাকা নিরূপণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান রাজাবাহাদুর বহুবিধ কাশ্মীর রৌপ্য বাসনাদি ও পেপিয়ার মেশির গৃহসজ্জা কাশ্মীর হইতে আনিয়াছেন।

ইহা ছাড়া বাণারসী শচ্চাজরি শম্মা ও চুমিকী বক্সান হস্ত্যশ্বের বিচিত্র আস্তরণ ঝুল প্রভৃতি; মছলন্দ মায় তাকিয়াদি, ছত্র ও চামর আরানি পাড়া, খাসগেলাস প্রভৃতির আস্তরণ ইত্যাদি। কাণপুর হইতে বৃহদাকারের সতরঞ্চ ও বহুমূল্য বনাতের তাম্বু।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, রাজা প্রমথনাথ অতি অল্প বয়সে স্বর্গারোহণ করেন, সুতরাং তাঁহার আরব্ধ কার্য্য অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে বালিকাতার বিখ্যাত Inter-national Exhibition এ যাইয়া তদ্দর্শনে নবনব শিক্ষালাভপূর্ব্বক ফরিয়া দেশের আরও বহু উন্নতিসাধন করিবেন ইহা মনন করিয়া তন্নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন, এমত সময়ে সাহসা তাঁহার মৃত্যু ঘটিল। শিক্ষা ও শিল্পে স্বীয় বাসভূমি রাজসাহীকে সবিশেষ উন্নত করিবেন ইহাই তাঁহার একান্ত বাসনা ছিল, কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ করিবার অবকাশ পান নাই। রাজসাহীবাসী মাত্রেই অবগত আছেন এ সম্বন্ধে রাজাবাহাদুরের কিরূপ আন্তরিক এই স্থানছিল, নিত্য ব্যবহার্য্য স্বদেশীয় দ্রব্য ও যানাদি বিভিন্ন প্রদেশের উৎকৃষ্ট আদর্শে সংস্কার করিবেন ইহার নিমিত্ত আগ্রহ ও যত্ন দেখা যাইত। পোষাকপরিচ্ছদে ও এইরূপ আদর্শে সংস্কারবিধান করিতে তাঁহার চেষ্টা ছিল।* এই সকল শিল্পানুষ্ঠানের উন্নতিকল্পে অত্র জেলার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও জমিদারবর্গের সহিত সর্ব্বদা পরামর্শ করিতেন এবং তাঁহাদিগকে এবিষয় চিন্তা করিতে উৎসাহিত করিতেন। মহামান্ত হাইকোর্টের জজ স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র, ৺ভূদে মুখোপাধ্যায় ও ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি মস্বিগণ রাজা প্রমথ নাথের এই উদ্যমে সর্ব্বদা উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়া সহায়তা করিতেন।

শ্রীকালিদাস সান্ন্যাল।

---

* এতৎ স্থলে বাবু রাজকুমার সরকার, হরকুমার সরকার, লালোরের বাবু তারানাথ চৌধুরী, চন্দ্রনাব নাটোরের রাজা কুমুদনাথ ও নাটোরের মুসলমান জমিদার রসিদ মিঞা প্রভৃতির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে।

নেহাল ওস্তাদ।

(১)

পত্নী ও পুত্রের মৃত্যুতে সংসারের সকল বন্ধন যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল, সেই সময় আমার প্রিয় এস্‌রাজটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন হইল,—যাহা কিছু শান্তি উহাতেই পাইতাম। একদিন সন্ধ্যাবেলা যমুনা-তীরে এক ক্ষুদ্র বাগানে বসিয়া এস্‌রাজের তারে হৃদয়ের ব্যাকুলতা ঢালিয়া দিয়া নতমস্তকে বাজাইতেছিলাম, সহসা অস্তমিত সূর্য্যের কিরণ ও আমার মাঝে একটি ছায়া পতিত হইল। আমি বাজনা নামাইয়া চাহিয়া দেখিলাম একব্যক্তি আমার অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আছে। আশ্চর্য্য হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম ও দেখিলাম লোকটি একজন বৃদ্ধ শিখ। তাহার উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল চক্ষু ও সমগ্র মূর্ত্তি দেখিয়াই মনে হইল যে, এ ব্যক্তি কোন সাধারণ লোক নহে। তাহার বদনে এক আবেগপূর্ণ ভাব অঙ্কিত। সহসা সে উত্তেজিতস্বরে "উঃ" বলিয়া উঠিল ও তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে লাগিল। কেন সহসা এ ব্যক্তি এইরূপ করিল জানিবার নিমিত্ত প্রবল কৌতূহল হইল। আমি দ্রুতপদে তাহার গতিরোধ করিয়া কহিলাম—"শিখজি, আপনি আমার বাজনা শুনিয়া যেন বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন।" শিখজি থমকিয়া দাঁড়াইলেন, নীরবে ক্ষণকাল আমার মুখের প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া উত্তম হিন্দুস্থানিতে কম্পিতস্বরে বলিলেন, "বাবুজি, কিছু মনে করিবেন না। আপনার মত এমন বাজাইতে অনেকদিন শুনি নাই—ধন্য আপনার কৌশল! কিন্তু এই বাদ্যযন্ত্র আমি বিষধর সর্পের ন্যায় ভয় করি, ভুলেও স্পর্শ করি না। আজ অনেক দিন পরে ইহার মোহন সুরে, রুদ্ধস্মৃতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে।"

"আপনার নাম জানিতে পারি কি ?"

"নেহাল ওস্তাদ।"

আমি চমকিত ও বিস্মিত হইলাম। এ নাম অপরিচিত নহে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নেহাল ওস্তাদের নামে সমুদায় উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। উহার অদ্ভুত বাদ্যকৌশল শুনিবার জন্য দেশবিদেশের লোক আসিত। কিন্তু সহসা একদিন এই প্রসিদ্ধ বাদক অদৃশ্য হইলেন। কোথায় গেলেন, কেন গেলেন, কেহ আর জানিতে পারে নাই। তবে জনরব ছিল যে, নেহাল ওস্তাদ সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। আমি কহিলাম—

"নেহাল ওস্তাদের নাম কে না শুনিয়াছে! কিন্তু আজ ওস্তাদজির নিকট সঙ্গীতের আলাপ অপ্রীতিকর কেন ?"

"বাবুজি, আজ আপনার এস্‌রাজের মোহন সুরে হৃদয় প্লাবিত হইয়াছে, অতীত—বর্ত্তমান হইয়াছে। বাবুজি, বসুন, মুক্তকণ্ঠে একবার সেই গল্প করি।"

অনতিদূরে তিন চারিখানা প্রস্তরখণ্ড পথিপার্শ্বে একত্রিত ছিল, নেহাল ওস্তাদ একটীর উপর উপবেশন করিলেন, আমিও বসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, যমুনার ক্ষুদ্র শুভ্র তরঙ্গমালা উঠিতেছে ও পড়িতেছে। তাহার প্রতি চাহিয়া স্বপ্নজড়িত স্বরে শিখজি এই গল্পটি বলিলেন।

(২)

"আমি মহারাজা রণজিৎ সিংহের দরবারী বাদকদের একজন ছিলাম, কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ে মহারাজ রণজিৎ সিংহ আর ইহলোকে নাই। মহারাণী চাঁদ কুয়র শূন্যসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। জানকজি ওস্তাদ আমাদের দলের গুরু ছিলেন। তাঁহার সহিত আমরা আরও আট দশ জন বাদক রাজপুরীসংলগ্ন কয়েকটি

কুঠরাতে বাস করিতাম। আমি তখন যৌবনে পদার্পণ করিয়াছি মাত্র। সে সময়ে রাজ্যে অশান্তি, গোপনে বিদ্রোহ, কিন্তু রাজপুরবাসিগণ সর্ব্বদা আমোদ উৎসবে রত থাকিত। বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর অবধি সর্ব্বত্র প্রমোদতরঙ্গ উথলিত হইত। প্রাঙ্গনে অসামান্যা রূপবতী ও সালঙ্কারা নর্ত্তকীগণের নৃত্য ও কৌতুক-রঙ্গ, সুমধুর গীতবাদ্যধ্বনি, সভাগৃহে দূরদেশের ঐন্দ্রজালিকগণের অদ্ভুত অপূর্ব্ব বিস্ময়জনক ইন্দ্রজাল, রঙ্গালয়ে নব নব রঙ্গ—সর্ব্বত্র আমোদ কৌতুক পরিপূর্ণ। বসন্ত-উৎসব আসিল। সে রাত্রির কথা আর কি বলিব। চতুর্দ্দিকে দীপমালা, অগণিত উজ্জ্বল প্রদীপের আলোকে রাজপুরী আলোকিত হইল। চতুর্দ্দিকে পুষ্পের সৌরভ—কক্ষ, প্রাঙ্গন, ফটক নানা বর্ণের সুগন্ধি পুষ্পে শোভিত, সজ্জিত। ইহার সহিত বীণা-সেতার-এসরাজের মধুর ধ্বনি, রমণীকণ্ঠনিঃসৃত ললিত গীত, নর্ত্তকীর অলঙ্কারধ্বনি মিশ্রিত। বসন্ত-উৎসব ত সমাপন হইল, কিন্তু নানা প্রকার জনরব শুনা যাইতে লাগিল। দুর্দ্দান্ত শিখসৈন্যদল অসন্তুষ্ট হইয়াছিল ও নানা প্রকার ভয় দেখাইতেছিল।

কিন্তু রাজপুরবাসিগণ কিছুই গ্রাহ্য করিল না, পূর্ব্ববৎ আমোদে মত্ত রহিল। বসন্ত-উৎসবের পর চতুর্থ দিনের রাত্রে সংবাদ আসিল যে মহারাজার শিখসৈন্যগণ নগর আক্রমণ করিয়াছে এবং সর্ব্বত্র লুট করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বিদ্রোহিগণ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করিল। আমরা শয্যাত্যাগ করিলাম ও স্ব স্ব তরবারিধারণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম রাজপুরী সৈন্যদ্বারা বেষ্টিত, বুঝিলাম যে যুদ্ধ করা বৃথা। বৃদ্ধ জনককে স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষা ও লাহোরত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ স্থির করিলাম। কিন্তু আমার এসরাজ, বাল্যকালের ও যৌবনের, সুখদুঃখের প্রিয়সঙ্গী, কিরূপে ফেলিয়া যাই। উহা আনিবার জন্য পুনরায় নিজকক্ষাভিমুখে ফিরিলাম।

কিয়দ্দূর গিয়াই দেখিলাম যে প্রবেশ করা অসাধ্য; সর্ব্বত্র শিখসৈন্য ঘুরিতেছে।

আমাদের বাসগৃহের সম্মুখে রাজপুরীর যে অংশ ছিল, তাহা বহুকাল ব্যবহৃত হয় নাই। আমি সেই জনশূন্য পরিত্যক্ত কক্ষগুলির দিকে চলিলাম। এক পার্শ্বে বৃহৎ বারাণ্ডা, অধিকাংশ কক্ষদ্বার উন্মুক্ত; দ্রব্যাদিশূন্য। আমার সঙ্গিগণ কোথায়? কোন্ দিক হইতে রাজপথে বাহির হইতে পারিব ভাবিতে ভাবিতে একটা ক্ষুদ্র কক্ষের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দ্বার দুইটি ভগ্নাবস্থায় ভূতলে পড়িয়া আছে, যেন কেহ বলক্রমে বাহির হইতে আঘাত দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। দাঁড়াইয়া দেখিতেছি, সহসা কক্ষের প্রতি একটা অজানিত আকর্ষণ অনুভব করিলাম, প্রবেশ করিবার প্রবল ইচ্ছা হইল। ভগ্নদ্বার পার হইয়া কুঠরীতে ঢুকিলাম। কক্ষ ক্ষুদ্র, সুসজ্জিত। একটী পালঙ্কের তলদেশে সুন্দর গালিচা পাতা, দেওয়ালে বিবিধ প্রকার চিত্র শোভা পাইতেছে। একটা আলনার উপর নীল, লোহিত, জাফ্রান্, গোলাপি ইত্যাদি বিবিধবর্ণের স্বর্ণ-রৌপ্য-খচিত বহুমূল্য ওড়না ও নর্ত্তকীর কয়েকটা পোষাক রহিয়াছে। সুগঠিত আবলুসকাষ্ঠনির্ম্মিত ও হস্তিদন্ত-খচিত ক্ষুদ্র পালঙ্কের শয্যা কারুকার্য্যবিশিষ্ট লাল মখমলের চাদরে আবৃত। পালঙ্কের সম্মুখের দেওয়ালে একটী বৃহৎ আয়না এবং তাহার পার্শ্বে একটী এস্‌রাজ ঝুলিতেছে। আশ্চর্য্য হইয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে কক্ষের সকল সামগ্রীর উপরে ধূলির পুরু আবরণ পড়িয়া আছে, যেন কত দিনের, কত মাসের ধূলি সঞ্চিত হইয়াছে। সহসা এস্‌রাজ-টির উপরে আমার নয়ন আকৃষ্ট হইল, স্থিরদৃষ্টিতে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া উহার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। সহসা এস্‌রাজ যেন ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল, তাহার পর স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যেন কেহ কাতর স্বরে বলিতেছে, "আমাকে লও, আমাকে লও।" চমকিত হইয়া

চারিদিকে চাহিলাম, পুনরায় এস্‌রাজের দিক হইতে সেই কাতর স্বর যেন একটি মৃদু নিঃশ্বাসের মত কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি স্বপ্ন-চালিতের ন্যায় ধীরে ধীরে যন্ত্রটি দেওয়াল হইতে নামাইলাম, উহা স্পর্শমাত্র শরীর শিহরিয়া উঠিল।

এমন সময় বাহিরে গোলযোগ শুনিতে পাইলাম, এবং দুই জন শিখ্‌সেনা ঝড়ের মত আসিয়া কক্ষ দ্বারদেশ অন্ধকার করিয়া দাঁড়াইল; কক্ষের অপর দিকে একটা ক্ষুদ্র ঝরকার ছিদ্র দেখা যাইতেছিল। আমি এস্‌রাজ হাতে লইয়া সবলে রুদ্ধ ঝরকাদ্বার ভাঙ্গিয়া বাগানে লাফাইয়া পড়িলাম এবং অবিলম্বে প্রাচীরের একটি দ্বার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া লাহোরের প্রশস্ত রাজপথে গিয়া পড়িলাম। আমি কাপুরুষ নহি, কিন্তু এই শিখবিদ্রোহিগণের সহিত হৃদয়ে গোপনে সহানুভূতি ছিল, অথচ তাহারা আমাকে রাজপুরীর লোক জানিয়া আক্রমণ করিত, কিন্তু রাজপুরীর নিযুক্ত বাদক হইলেও আমি এই উপলক্ষে রাণীর পক্ষে দাঁড়াইয়া প্রাণ দিতে উৎসুক ছিলাম না, তাই এই সময়ে পলায়ন করিতে কিছুই দ্বিধা হইল না।

কিয়দ্দূর গিয়া নগরীর এক ফটক দিয়া বাহির হইয়া লাহোর ত্যাগ করিলাম, এবং পিতৃগৃহাভিমুখে চলিলাম। পথে বহুলোক পলায়ন করিতেছে। কেহ বলিল রাজকোষ লুণ্ঠিত হইতেছে, কেহ বলিল মহারাণী ও তাঁহার অনুচরবর্গ বন্দী হইয়াছেন, ইত্যাদি নানা কথা শুনিতে পাইলাম। চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, সমুদায় কোলাহল পশ্চাতে ফেলিয়া আমাদের গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলাম। বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত আমি এক বৃক্ষতলে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে এসরাজ খানা তুলিয়া দেখিতে লাগিলাম। যন্ত্রটি উৎকৃষ্ট, সুন্দর, সৌখিন; ধূলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া উল্টিয়া পাল্টিয়া দেখিতে দেখিতে সহসা উপরিভাগের কাষ্ঠের এক কোণে কয়েকটি অক্ষর নয়নে পড়িল।

ভালরূপে নিরীক্ষণ করিয়া পড়িলাম, উর্দ্দূ ভাষায় খচিত রহিয়াছে "রিজিয়া বন্দিনী।" একটি বাদ্যযন্ত্রে এই অদ্ভুত অক্ষরগুলি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ইহার মানে কি? ভাবিতে ভাবিতে এস্‌রাজের ছড়িখানা উঠাইয়া সুর মিলাইতে আরম্ভ করিলাম। তৎক্ষণাৎ এক অপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল। এক নূতন সুরে যন্ত্র কাঁপিয়া উঠিল, মনে হইল যেন আমি আর বাজাইতেছিনা, যেন কোন মন্ত্রবলে আমার হস্ত-চালনা হইতেছে। এক অপরিচিত আকুল করুণাপূর্ণ রাগিণী এস্‌রাজের তন্ত্রী হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁপিয়া উঠিতে ও পড়িতে লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট রোদনের মত অশ্রুময় সুরলহরী বহিয়া যেন চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিল। আমার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, আমি ভীত হইয়া সহসা এস্‌রাজ ভূতলে ফেলিয়া দিলাম। নিঃশব্দে উহা শ্যামল তৃণের উপর পড়িয়া গেল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অতি নিকটে এক মৃদু বিষাদ-পূর্ণ দীর্ঘনিঃশ্বাসের শব্দ কর্ণে প্রবেশ করিল। আমি চমকিত হইয়া, চারিদিকে চাহিলাম, কিন্তু কেহ কোথায়ও নাই। ভূতলে শব্দহীন এসরাজের জন্য সহসা যেন একটা মায়া অনুভব করিলাম। কিছু বুঝিতে না পারিয়া হতবুদ্ধিভাবে উহা উঠাইয়া পুনরায় পথে চলিতে লাগিলাম এবং অবিলম্বে নিজগৃহে পৌঁছিলাম। বহুদিন পর পিতার সহিত সাক্ষাৎ। আমি মাতৃহীন। পিতাই সে অভাব পূর্ণ করিয়া যথাসাধ্য আদর যত্ন করিলেন। মিলনের আনন্দের পর রাজপুরীর শিখসৈন্যগণের বিদ্রোহের গল্প করিতে রাত্রি অধিক হইয়া গেল, তখন উভয়ে শয়ন করিতে গেলাম।

(৩)

আমি নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলাম। এস্‌রাজ দেওয়ালে ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম। ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র রাজপুরীতে যেরূপে উহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম, সহসা সেইরূপ একটা অজ্ঞানিত

প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলাম। আবার স্পষ্ট যেন শুনিতে পাইলাম, "আমাকে লও, আমাকে লও।" এস্‌রাজ বাজাইবার প্রবল ইচ্ছা জন্মিল। ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া শয্যায় যাইব ভাবিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই নীরব কাতর মিনতি, সেই আহ্বানে চালিত হইয়া মন্ত্রের ন্যায় দেওয়াল হইতে এস্‌রাজ নামাইয়া বাজাইতে লাগিলাম। কতক্ষণ বাজাইলাম কিছুই জানি না, সহসা স্কন্ধে কাহার হস্তস্পর্শ অনুভব করিলাম। চমকিয়া চাহিয়া দেখিলাম পিতা নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। তিনি কম্পিত স্বরে কহিলেন "বাবা নেহাল, ধন্য তোমার শক্তি। বাদ্যের উপর তোমার এমন অসাধারণ ক্ষমতা হইয়াছে ভাবি নাই। এমন সুর এজন্মে শুনি নাই, দেখ আমি কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছি। কিন্তু রাত্রি প্রায় অবসান হইল, শয়ন করিতে যাও।" আমি নিরুত্তর রহিলাম, এস্‌রাজ তুলিয়া রাখিয়া শয্যায় শয়ন করিলাম। প্রতি রাত্রে এইরূপ হইতে লাগিল। আহারাদির পর যখন নিজ শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় বসিতাম, তখন সেই আকুল আহ্বান, সেই কাতর নীরব মিনতি, সে অজানিত প্রবল আকর্ষণে অস্থির হইতাম। তাহার পর এস্‌রাজ নামাইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া বিভোর হইয়া, বাজাইতাম। অপূর্ব্ব, অজানিত, করুণাপূর্ণ রাগিণী নিঃসৃত হইত। যখন রাত্রি প্রায় অবসান হইত, তখন সেই সুর আপনি বিলীন হইয়া যাইত। ছড়িখানা শ্রান্ত হস্ত হইতে পড়িয়া যাইত। আমি ক্লান্ত অবসন্ন দেহে, শয্যায় পড়িতাম ও নিমেষমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িতাম। প্রতিদিন এক সুর বাজিত না। কখনও কাতর মিনতি, কখনও ব্যাকুলরোদন, কখনও বিষাদময়ী রাগিণী নিঃসৃত হইত। কিন্তু কি বাজাইতাম তাহা মনে থাকিত না, এস্‌রাজের তন্ত্রী ত আর আমার বশে ছিল না, আমিই উহার বশীভূত হইলাম। কিন্তু ক্রমে দেহবল

ক্ষীণ হইতে লাগিল, রাত্রিগুলি নিদ্রাহীন—দিবসগুলি চিন্তাপূর্ণ। এই বাদ্যযন্ত্রতে কি ঐন্দ্রজালিক শক্তি গুপ্ত আছে? আমি কি চিরজীবন উহার বশে থাকব? প্রতি রাত্রি কি এইরূপ কাটিবে? আর ঐ কয়টি অক্ষর "রিজিয়া বান্দনী" কি গুপ্ত রহস্যপূর্ণ? ক্রমে আমার যেন একটা মোহ জন্মিল। সারাদিন, রাত্রের সেই সময়ের জন্য যেন অপেক্ষা করিয়া থাকিতাম, তথাপি উহাকে ভয়ও করিতাম।

একদিন পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন আমি প্রতিরাত্রে কেন এইরূপ করি এবং দিনে না বাজাইয়া, এইরূপে প্রতিরাত্রি জাগরণের কারণ জানিতে চাহিলেন। আমি কহিলাম "রাত্রে বাজান আমার একটা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে।" পিতা কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া বলিলেন "কিন্তু নেহাল তোমার দেহ কৃশ হইতেছে।"

আমার পিতা, মহারাজা রণজিৎ সিংহ জীবিত থাকিতে তাঁহার রাজদরবারের বাদক ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি লাহোরে বাস করিতেন। তাঁহার নিকট এই "রিজিয়া" নাম পরিচিত হইলেও হইতে পারে মনে করিয়া, একদিন পিতাকে কহিলাম "পিতা, রিজিয়া কি, রিজিয়া কে?"

পিতা ক্ষণকাল বিস্মিতনয়নে আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন—

"রিজিয়া? নেহাল, তোমার মুখে এই নাম শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইতেছি। সে বহুদিনের কথা। রিজিয়া মহারাজার সময়ে এক খ্যাতনামা প্রসিদ্ধ সুন্দরী বিদেশিনী নর্ত্তকী ছিল।"

"এ নর্ত্তকীর কি কোন বিশেষ বৃত্তান্ত জানেন?"

"হ্যাঁ, একটা গল্প আছে। পেশোয়ার হইতে একজন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক আসিয়াছিল এবং রাজপ্রাসাদের নিকটেই থাকিত। তাহার অপূর্ব্ব অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেশবিদেশে বিখ্যাত ছিল। এই ব্যক্তি

"পেশোয়া যাদুকর" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। পেশোয়া যাদুকরের সহিত রিজিয়া নাম্নী এক নর্ত্তকী আসে এবং শুনা যাইত যে সে উহার ক্রীতদাসী। এই নর্ত্তকী পরে রাজপ্রাসাদের অন্যান্য নর্ত্তকীদলের সহিত বাস করিতে লাগিল। তাহার রূপে লাহোরের রাজপ্রাসাদের সকল যুবা, বৃদ্ধ মোহিত হইল। একজন উচ্চপদস্থ শিখ সেনাপতি উহাকে ক্রয় করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল, কিন্তু পেশোয়া যাদুকর কিছুতেই সম্মত হইল না। সহসা একদিন রিজিয়া নর্ত্তকী অদৃশ্য হইল এবং উক্ত শিখকর্ম্মচারীর মৃতদেহ লাহোরের প্রধান রাজপথে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া গেল। এই ঘটনার দুইচার দিন পরেই পেশোয়া যাদুকর লাহোর ত্যাগ করিয়া গেল। ইহার ভিতরকার রহস্য কেহ জানিতে পারে নাই, তবে এই যাদুকরই যে শিখের মৃত্যু ও নর্ত্তকীর অদৃশ্য হইবার কারণ তাহাতে কাহারও সন্দেহ রহিল না। কিন্তু রিজিয়া সহসা কোথায় গেল, তাহার কি হইল, আর জানা গেল না। নর্ত্তকীগণ রাজপুরীসংলগ্ন কয়েকটি কুঠরীতে থাকিত। এই ঘটনার পর রিজিয়ার কক্ষ হইতে রাত্রে নানারূপ অস্বাভাবিক শব্দ, কখনও রোদনধ্বনি, কখনও গীতধ্বনি শুনা যাইত। ক্রমে সেই অংশ পরিত্যক্ত হইল। ভয়ে আর কেহ সেই কক্ষগুলিতে থাকিতে চাহিত না। নেহা'ল তুমি সে সময়ে শিশু ছিলে, তাই আজ তোমার মুখে তাহার নাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। ইহার কথা কেন জিজ্ঞাসা করিলে?"

"রাজপুরী হইতে চলিয়া আসিবার সময় আমি বোধ হয় সেই নর্ত্তকীগণের কক্ষের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলাম, কারণ একটি ক্ষুদ্র কক্ষে রিজিয়া নাম যেন দেখিলাম—তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।"

এই কথাবার্ত্তার কিছুদিন পরে আমি পিতাকে একদিন কহিলাম, "পিতা, আর কতদিন এ স্থানে বসিয়া থাকিবেন? চলুন কোন নগরে

যাই, যদি কিছু হয়।” পিতা কহিলেন, “হাঁ, আমিও তাহাই ভাবিতে-ছিলাম। কিন্তু লাহোর গিয়া কি হইবে? সেখানে কেবল অশান্তি বিদ্রোহ শুনিতে পাই। আগ্রায় আমার একজন ধনী বন্ধু আছেন, আপাততঃ সেখানে চল—যদি কিছু সুবিধা হয়।” আমরা ওস্তাদের গোষ্ঠী, ইহাই আমাদের জীবিকা ও কর্ম্ম। আমরা আগ্রায় গেলাম। পিতার বাল্যবন্ধু সোহন সিং ধনী ও উদার প্রকৃতির ব্যক্তি। তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা। আমরা থাকিবার জন্য দুইটি কক্ষ পাইলাম। সেখানেও সেই এস্‌রাজের মোহ ধরিল, প্রতিরাত্রে নিজকক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া বাজাইতাম। একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেই আকর্ষণ অনুভব করিলাম, বাজাইবার প্রবল ইচ্ছা হইল, দমন করিতে পারিলাম না। এস্‌রাজ লইয়া বারাণ্ডায়ই বসিলাম। কেন সেখানে বসিলাম জানি না, সে সময় আমি অন্য এক শক্তিদ্বারা পরিচালিত হইতেছিলাম। বারাণ্ডার সম্মুখ দিয়াই আগ্রার এক প্রধান পথ গিয়াছে। কতক্ষণ বাজাইলাম জানি না। সহসা অতি নিকটে দীর্ঘ উচ্চারিত “আ—ঃ” শব্দ শুনিয়া চমকিয়া থামিলাম। বিস্ময়পূর্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিলাম প্রায় পঁচিশ ত্রিশ জন ব্যক্তি একত্রিত হইয়া অতি নিকটে দাঁড়াইয়া আমার বাদ্য শুনিতেছে। একজন মুসলমান বলিয়া উঠিল—

“বাঃ শিখজি, আপনি অতি উত্তম বাজান।” আর একজন বলিল, “আঃ, এমন বাজনা জন্মে শুনি নাই।” আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে ভিড় ভাঙ্গিয়া গেল, আমিও শয়নকক্ষে গিয়া এস্‌রাজ তুলিয়া রাখিলাম। কিন্তু সেইদিন অবধি আমার নাম লোকসমাজে পরিচিত হইল। চতুর্দ্দিক হইতে আমার বাজনা শুনিতে লোক আসিতে লাগিল। ক্রমে নবাব, ওমরাহ, রাজা, মহারাজা দ্বারা দেশবিদেশে নিমন্ত্রিত হইতে লাগিলাম। নেহাল ওস্তাদের নাম দেশবিদেশে সুপ্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু আমার হৃদয়ের

শান্তি নাই, সুখ নাই। বাদাশক্তি আর আমার নহে, আমার নিজের কোন ক্ষমতা নাই, আমি কেবল একটা অজানিত শক্তির অধীন। এক বৎসর এইরূপে কাটিল। ক্রমে একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে বাজাইবার সময় স্তব্ধ, চেতনাশূন্য প্রায় অবিচলিত হৃদয়ে বাজাইতাম, কিন্তু ক্রমে যেন একটা অস্থিরতা, একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলাম। অলৌকিক রাগিনীর প্রতি স্বর যেন হৃদয় বিদীর্ণ করিত, মর্ম্মান্তর ভেদ করিয়া যেন কোথায় তীব্র আঘাত করিত। মনে হইত, যেন কেহ আকুল হইয়া অধীর হইয়া কি চাহিতেছে। আমার প্রাণও সেই কাতর মিনতি, আকুল প্রার্থনা পূর্ণ করিবার জন্য অস্থির হইত, ছটফট করিত। তখন সহসা সুরের স্রোত থামিয়া যাইত, বাদ্য নীরব হইত। একদিন এইরূপ হইয়া এস্‌রাজ হইতে এক বিকৃত অৰ্দ্ধস্ফুট চীৎকার বহির্গত হইল। সেই ধ্বনি অস্বাভাবিক, অমানুষিক, যেন একটা আহত পক্ষীর কাতর চীৎকার।

আমি ভীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। আমার শ্রোতৃগণ চমকিত হইয়া উঠিল। সেদিন আমি বৃহৎ সভার সম্মুখে আসীন। শরীর অসুস্থ বলিয়া সেস্থান ত্যাগ করিলাম। ইহার পর তিন চারি বার বহুলোকসম্মুখে ঐরূপ ঘটিল। তখন লোকে কহিতে লাগিল "এ লোক যাদুকর। উহার বাদ্য অস্বাভাবিক, অমানুষিক-শক্তিপূর্ণ।" ক্রমে লোকে আমাকে ভয় করিতে লাগিল। আমার যে কয়জন সুহৃদ ছিল, তাহারা আমাকে ত্যাগ করিল। আর আমার আদর নাই। আমাকে কাহারও প্রয়োজন নাই তথাপি এস্‌রাজের আকর্ষণ আমাকে ছাড়িল না। হৃদয়ে অশান্তি ত ছিলই, এখন একটা অজানিত ভয় আমাকে বিহ্বল করিল। একদিন রাত্রে বাটী হইতে বাহির হইলাম। তখন নির্ম্মল চন্দ্রালোকে নীরব নগরী প্লাবিত। যমুনা-তীরে চলিতে লাগিলাম। জ্যোৎস্নালোকে যেন রজতস্রোতের ন্যায়-

স্রোতস্বিনী মৃদু কলকল রবে বহিয়া যাইতেছিল। আমি এস্‌রাজ খানা তুলিয়া ধরিলাম। আজন্ম কি এই বাদ্যযন্ত্রের দাস হইয়া থাকিব? তৎক্ষণাৎ সেই আকুল মিনতি শুনিতে পাইলাম। আমি হৃদয়ের সমুদায় বল সংগ্রহ করিয়া বাজাইবার ইচ্ছা প্রবল রূপে দমন করিয়া অধীর হইয়া সহসা সজোরে এস্‌রাজ ভূতলে নিক্ষেপ করিলাম। একটি শিলাখণ্ডের উপর পড়িয়া উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ এক মৃদু দীর্ঘনিশ্বাসধ্বনি শ্রুত হইল। আমি চমকিয়া উপরে চাহিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা এখনও ভুলিতে পারি নাই। চন্দ্র-কিরণে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণীর মুখ ভাসমান। কেবল মুখখানি! কিন্তু কি রূপলাবণ্য-কমনীয়তা! বড় বড় নয়নে কি করুণ শান্তিময় মধুর ভাব! আমি স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। আবার সেই মৃদু নিশ্বাসধ্বনি! দেখিতে দেখিতে সে মুখচ্ছায়া চন্দ্রকিরণের সহিত মিশিয়া বিলুপ্ত হইল। আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? ভগ্ন এস্‌রাজের প্রতি চাহিলাম। সহসা তাহার একটি কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে একখণ্ড শ্বেত কাগজের ন্যায় কি নয়নে পড়িল। কাষ্ঠখণ্ডের গায়ে উহা সংলগ্ন ছিল। আমি টানিয়া উঠাইয়া লইয়া ভাঁজ খুলিলাম। দেখিলাম অক্ষর রহিয়াছে। আমাদের ভাষা। উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণে তাহা পড়িলাম।

"পাপিষ্ঠা, অবিশ্বাসিনী রিজিয়া। পেশোরা যাদুকর এইরূপে শাস্তি দেয়। তুমি বন্দিনী।" আমি স্তম্ভিত হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলাম। ধীরে ধীরে যেন ইহার অর্থ অনুভব করিতে লাগিলাম।

"বাবুজী সেই অবধি আমি বাদ্যযন্ত্র ত্যাগ করিয়াছি। স্পর্শ করি না, শুনি না।"

নেহাল ওস্তাদ শেষ কথাটি বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তখনি পশ্চাৎ ফিরিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিতে লাগিলেন এবং অবিলম্বে বৃক্ষচ্ছায়ার অন্ধকার মধ্যে অদৃশ্য হইলেন।

শ্রীস্নেহলতা সেন।

শিশু-রহস্য।

কহিতে জানে না কথা মুখে ভাঙা ভাষ,
চলিতে পারে না সদা চলিবার আশ,
হাসি কি জানে না, মুখে হাসি আছে ফুটে,
কান্না অর্থহীন, চুম্বনেতে কেঁদে উঠে,
ভাবুক নহেক তবু খেয়ালেতে আছে,
আকাশের চাঁদেরে সে মিতা করিয়াছে,
ভালমন্দ নাহি বুঝে যা'পায় তা'খায়,
মায়ে মারে তবু ফিরে মার কাছে যায়,
রাতদিন ধূলা মাখে তবু সুন্দর,
হাসিতে ফুটিয়া উঠে কলিকা কুন্দর,
ধর্ম্মের ধারে না ধার কৃষ্ণ কিম্বা যীশু,
লজ্জাহীন নগ্নকায় অধার্ম্মিক শিশু।
সর্ব্বলোকশিশুপিতা বিধাতার বরে,
অকলঙ্ক শিশুবেশে মানবের ঘরে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

উর্ব্বশী ও তুকারাম।

দ্বিতীয় সর্গ।

প্রথম দৃশ্য।

শ্রেষ্ঠীভবন।—প্রাতঃকাল।

(মেনকা একখানি থালায় ফুল ও অন্য খানিতে মিষ্টান্ন সাজাইতে সাজাইতে।)

মে। মোদের বিবাহ হবে? বেশ? হোক তাই,
পিতামাতা যা করেন সকলি মঙ্গল।
বিধাতার ইচ্ছা যাহা হউক পূরণ।
আজিকে পূর্ণিমা তিথি পর্জ্জন্যের দিন—
আমি লয়ে যাব তথা মিষ্টান্নের ডালি
লোকজনে খাওয়াইতে বড় ভালবাসি।
ধন ধান্যে পূর্ণ দেব করুন ধরণী
অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি হোক নিবারণ
সুখ শান্তি সুমঙ্গলে কাটুক বৎসর।
এ থালা উর্ব্বশী লবে—কুসুমের ডালি
তাহার কুসুম হস্তে শোভিবে ইহাই।
ইহা হতে এক গাছি মালা শুধু লয়ে
আহুতি করিব দান পতির উদ্দেশে।
(ফুলমালা লইয়া মিষ্টান্নের থালায় রাখিয়া)
সুপ্রসন্ন হও দেব ভকত-বৎসল;
ললাট লিপিতে বিধি লিখেছেন যারে—

রাজা বা ভিখারী তিনি হউন যাহাই
আজীবন ভক্তিভরে তাঁর পদ সেবি
কাটে যেন এজীবন এই ভিক্ষা মাগি।
(উর্ব্বশীকে আসিতে দেখিয়া)
এই যে উর্ব্বশী কেন রোষাক্ত আনন !
গোলাপ কপোল দুটি উঠেছে জ্বলিয়া
রাঙ্গা জবা সম মরি ! রক্তিম ভ্রূ-ধনু
আরো সুবঙ্কিম, বক্ষ কাঁপিছে সঘনে ;
রোষেতেও কি সুন্দর !
(উর্ব্বশীর প্রবেশ।)

উ। শুনেছিস লো বোন—
আমাদের বলিদান হয়ে গেছে স্থির ?

মে। মোদের বিবাহ হবে তাই কহিছ কি !

উ। হাঁ গো তাই তাই, সে কি নহে বলিদান ?
বলিদান চেয়ে বেশী। সামান্য শ্রেষ্ঠীরে—"

মে। সামান্য ? কি বল দিদি ? ধনী তারা খুব
ধনরাজ চেয়ে ধনী, রাজা বলে সবে ;—
দেশমুখ সেথাকার।

উ। সে তাদের পিতা—
এক কড়া কানা কড়ি জীবনে তাহারা
করেনি অর্জ্জন নিজে। এমনি পৌরুষ।
ধড়া চূড়া পরা শুধু কাঠের পুত্তলী—
ধার করা ধন লয়ে যত জারি জুরী।
সামান্য বলেছি সেত ঢের মৃদু ভাষা,
অকৃতি অকর্ম্মা নর ঘৃণ্য হেয়ঙ্কর।

আজীবন তার সাথে দেহ মন বাঁধা!
গণিস সৌভাগ্য যদি তুই বেশ ভাল।
আশীর্ব্বাদ সুখে থাক ধনী পতি লয়ে।
অসহ্য অসহ্য কিন্তু মোর পক্ষে তাহা।
ধনরাজ মহাদেব কি করিল দোষ!
এর চেয়ে শত গুণে ভালত তাহারা!
এর চেয়ে সব ভাল, ভাল বলিদানও।

মে। বলিদান লহ তবে স্কন্ধে হাসি মুখে।
তব যোগ্য বর জেনো নাহি ভূ-ভারতে।

উ। এই দেহে যত দিন বহিবে চেতনা
জেনো মনে তুমি বোন তাহা হইবে না।
কত নারী ইতিপূর্ব্বে করেছে বহন,
কুমারী জীবন চির—বরঞ্চ তাদের
অনুগামী হব আমি, তবু সামান্য সে—"

মে। কেমন করিয়া ছি ছি আনিতেছ মুখে,
অত অবহেলা বাণী বুঝিতে না পারি?
সামান্য শ্রেষ্ঠীর কন্যা আমরা কি নহি?

উ। পিতামাতা কেহ কারো সন্তানের কাছে
নহেন সামান্য, পূজ্য সম চিরদিন।
ক্ষুদ্র গোপ নরনারী নন্দ যশোদারে,
শ্রীমধুসূদন হরি বন্দেন স্বয়ং।
তাই বলি, বলিব না সামান্যে সামান্য?
তাই বলে বরিব কি যাহারে তাহারে?

মে। এত গর্ব্ব দিদি ছিছি অতি হাস্যকর
জনম সামান্য বংশে তোমারো যখন।

উ। কেন কিসে শুনি ? বিধি সৃজিলেন যবে
অসামান্য করি ? নলিনীত পঙ্কজিনী
কিন্তু দৃষ্টি তার সদা, সবিতারি পানে।
মলিন মৃত্তিকাতলে জন্মে কোহিনুর
সম্রাটের কণ্ঠে শুধু হতে শোভমান।
যেই দেখে সেই কি কহেনা এইরূপ—
স্বর্গের বিধিয় ভবে, দেবতা দুর্লভ ?
এত যশ এত খ্যাতি সব নিরর্থক ?
বৃথা বিড়ম্বনা শুধু জল বুদ্বুদ ?

মে। নিয়তি নিষ্ঠুর অতি কে পারে লঙ্ঘিতে
তারে বোন ; বৃথা দুঃখ বৃথা এ ক্রন্দন !
কত ফুল দেখ বনে গোপনে শুকায়,
কে করে আঘ্রাণ ? কত মণি চিরদিন
মাটীতে লুকায়ে থাকে, কে পায় সন্ধান ?

উ। অল্পগন্ধ দীনহীন বনফুল তাহা—
ঝরে যাহা অনাদরে ফুটে বনমাঝে
তাহা শুধু শৈলমণি ম্লান নিরুজ্জ্বল
চিরদিন তরে মৃত্তিকা আশ্রয়।
কিন্তু কোন্ নীলপদ্ম, কোন্ পদ্মরাগ,
না লভে সংসারে কহ যোগ্য সমাদর ?
আমাদেরই বেলা শুধু নিয়ম কি অন্য,
অযোগ্য নগণ্য এক অভাজন নর,
তাহার দাসত্ব জন্য বিধাতা কি, হায়,
পাঠালেন মোরে হেথা ! এত রূপ লয়ে !

এই ভুজ যারে সবে বলে বাখানিয়া
চম্পকঅঙ্গুলিশোভা, মৃনালকোমল,
সৃজন ইহার শুধু আলিপনা দিয়া
তাম্বুল গড়িয়া শয়ন রচিয়া আর
রন্ধনিয়া অন্ন সহ পঞ্চাশ ব্যঞ্জন নিত্য
তার ভোগ তরে? অগ্নিতাপে দহি নিত্য
কৃষকীর হস্ত হল গড়িতে কাঠিন্য ?
এই পদ নাম যার শশীকলা নথা—
রতিপ্রভা শ্রীচরণ, তাহার গঠন
শুধু বোন, তার কাজে ছুটাছুটি করি
বিকৃত বিরূপা হতে পাদুকার সর্ম্ম?
অপরূপ এই বর তনু, এ আনন—
ললিত লাবণ্য ভরা এ নব-যৌবন
তার মনস্তুষ্টি তরে সকলি সৃজন,
তার মত দীন. হেয়, রাশি রাশি, তার
সন্তানেরে জন্মদানে লালন পালনে,
ক্ষুধাতুরা ধরণীর ভার বৃদ্ধি ছাড়া
নাহিক উদ্দেশ্য অন্য উচ্চ মহত্তর
অপরূপ অলৌকিক এ রূপরাশির ?
ভাবিতেও শিহরি যে সঙ্কোচে ঘৃণায় ?

মে। তুমি নহ একা—কত শত রাজবালা
বহিছেন অকাতরে হীন ভাগ্য হেন।

উ। রাজকন্যা শত শত, কিন্তু যাজ্ঞসেনী
কয় জন হেথা কহ ? পাঞ্চালী হইয়া
জনম যাহার ভবে, অর্জ্জুন তাহার

অবশ্যই আচম্বিতে উদি একদিন—
ভেদিবে দুর্জ্জয় লক্ষ্য লভিতে তাহারে।

মে। কলিকাল ইহা দিদি—বীর পার্থ কোথা?

উ। কলিকালে বীর নাই? রূপের সম্মান
এ যুগে না জানে কেহ? কোন্ কালে তবে
কৃষ্ণকুমারীর তরে ঘটিল সমর?
সংযুক্তা হরণ কবে? তাই কহ দেখি?
কেনই বা আনি টেনে অতীতের কথা,
সাহাজির প্রেম শৌর্য্য ভুবন বিখ্যাত।
নন্ পৌরাণিক চিত্র আখ্যান নায়ক,
এ কালের রাজা তিনি স্বজাতীয় বীর;
প্রাণবন্ত কীর্ত্তিমন্ত জীবিত পুরুষ,
কি কাণ্ড করিলা কত লভিবার তরে
বাদশাজাদির সখী মীরা সুন্দরীরে
সুলতান পাঠাইল দিল্লি তাঁরে যবে।

মে। সত্য, তবু সত্য বলে নাহি লয় মনে,
হৃদয় দ্রাবণকারী উপন্যাস সম
মনে হয় সে কাহিনী অশ্রুজল বহে।
কি গভীর দুঃখে হায়! না জানি সে বীর
তেয়াগি পুরুষ ধর্ম্ম করিলা বরণ
দুর্ব্বল শরীর যোগ্য কৌমার্য্য ব্রত
না লভি মীরারে। একমাত্র সেই দিদি
তোর যোগ্য বর কলির অর্জ্জুন সত্য।
তুমি যদি পার রূপালোকে পুনঃ

সে প্রেম নিভন্ত হৃদে জ্বালাতে অনল
তা হলে সার্থক তব সৌন্দর্য্য মহিমা।

উ। ক্রুদ্ধ মনে হাসি আসে তোর কথা শুনি।
দূর করা পুরুষের সামান্য বিরাগ
এত কি বিচিত্র কথা অসাধ্য সাধনা?
তার চেয়ে মহাকাণ্ড এ সৌন্দর্য্য বলে
ঘটাইতে পারি, হেন অনুভবি চিতে।
শব যদি এ শক্তির কটাক্ষ চালনে,
প্রাণ লভি উঠে ; তাতে বিস্ময় না গণি।

মে। মৃতে প্রাণ দিবে সত্য, যদি সাহাজির
শুষ্কহৃদে ছুটাইতে পার গো নির্ঝর!

উ। উত্তেজিত হয়ে উঠে হৃদয় শোণিত
নিমেষের কাজ এ যে! মুহূর্ত্তের খেলা!
দুঃখ এই দেখাবার নাহি অবসর!

মে। শুন নাই আসিতেছে মোগল দক্ষিণে,
যুঝিতে তাদের সনে যাবেন সাহাজি
এই পথ দিয়া। পাবে সুযোগ বিস্তর
দেখাইতে তাঁরে তব সৌন্দর্য্য প্রভাব।

উ। খুলিলাম এই দেখ্ কুন্তল আমার
জয় করি তাঁরে পুনঃ রচিব কবরী
প্রতিজ্ঞা আমার এই ভীমের মতন।

মে। যদি মান পরাজয়?

উ। জানিব তা হলে—
উর্ব্বশীর রূপ মিথ্যা, মিথ্যা জন্ম তার,

জানিব অযোগ্যতম অভাজন নর—
সেও যোগ্য উর্ব্বশীর হস্ত লভিবারে।

মে। ঐ শুন শুন বাজে উৎসব বাজনা!
ভুলিয়া ছিলাম মোরা কথায় কথায়
মোদের কঠোর স্থির অলঙ্ঘ্য নিয়তি।

উ। বাজুক, আসুক বর বসুক আসরে
উর্ব্বশীর পণ তবু রহিবে অটল।
চলিনু মন্দিরে আমি অরুণাবতীর
লভিতে করুণা তাঁর। দেখিব এবার
কেবা ধরে মহা শক্তি নিয়তি কি নর?

মে। সে কি দিদি! নাহি যাবে পর্জ্জণ্য মন্দিরে?

উ। না মেনকা, কহিব অসুস্থ আছি—
সবে চলি গেলে পরে যাব অন্য পথে;
উত্তম সুযোগ ইহা, জানিবে না কেহ।

মে। কেমনে যাইবে একা বিজন মন্দিরে?

উ। ভয় ডর কোথা এবে? ভাঙ্গিব নিয়তি
প্রাণ পণ যুদ্ধ দিব তারে—

মে। বেশ তবে—
আমিও যাইব, একা নাহি দিব যেতে।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(রাজা ও তুকারামের প্রবেশ।)

রাজা। আজিকে পূর্ণিমা তিথি!

তুকা। সেই শুভ দিন!

রাজা। সত্যই ঘটিবে তবে দেবী দরশন ?

তুকা। তাহাতে সংশয় কিবা ?

রাজা। কে জানে সৈনিক

অদৃষ্টের ভবিষ্যাঙ্ক ইহাতে সূচনা

কিম্বা শেষ যবনিকা আরম্ভে পতন ?

(সেনাপতির প্রবেশ।)

সেনা। জয় হোক মহারাজ।

রাজা। কহ কি সংবাদ।

সেনা। আমাদের গুপ্তচর কৌশল করিয়া

ভুল পথে মোগলেরে এনেছে ফেলিয়া

সমুদ্রের অন্য তীরে—

রাজা। উত্তম উত্তম—

সমুদ্র লঙ্ঘন বিনা এবে তাহাদের

উপায় নাহিক অন্য, তাই মোরা চাই।

চরগণে পরিতোষ দাও সেনাপতি,

সৈন্যগণে যুদ্ধ তরে রাখহ প্রস্তুত।

যখনি পৌঁছিবে শত্রু এই উপকূলে

সমস্ত সেনানি লয়ে পড়িব উপরে,

শত্রুগণে একেবারে করিব নির্ম্মূল।

সেনা। যো হুকুম মহারাজ—

(গমনে উদ্যত।)

রাজা। শুন সেনাপতি—

বিজন ভ্রমণে যাব ক্ষণ কাল তরে,

হলেও হইতে পারে বিলম্ব ফিরিতে।

চিন্তার কারণ নাহি, নিকটেই রব
রাখ এই রাজভেরী, আবশ্যক হ'লে
বাজাইও তুঙ্গ নাদে, তখনি ফিরিব।

সেনা। দেবতা প্রসন্ন হোন্, তথাস্তু রাজন্।

(গমন।)

রাজা। তুমি কর কাজ এক,

তুকা। হউক আদেশ।

রাজা। এই মোর মণিমালা, হীরকের হার
কণ্ঠে পর সখা, দাও উষ্ণীষ্ তোমার
মোর শিরস্ত্রাণ সহ করহে বদল।

তুকা। স্বগত) এ আবার কি খেয়াল!
(প্রকাশ্যে) তথাস্তু রাজন্!

রাজা। (সহাস্যে) বুঝিতে না পার অর্থ বিস্ময়মগন,
সবে বলে সুপুরুষ রমণী মোহন—
বুঝিবারে চাহি তাহা সত্য কিম্বা স্তুতি,
রমণীর শিরোমণি উর্ব্বশী সুন্দরী
বিনা রাজবেশে যদি এজনের মাঝে,
নেহারেন বরণীয় পুরুষের গুণ—
তবেই পরীক্ষা হবে মাহাত্ম্য আপন
বুঝিব রাজারো উর্দ্ধে আছি দাঁড়াইয়া।
বুঝিলে কথাটা এবে!

তুকা। চমৎকার কথা! বুঝিলাম জল যেন!

রাজা। দেখিতেছি বটে
বুদ্ধিটুকু যাহা ছিল সাফ্ জলে ধুয়ে—
বুঝ নাই একটুও। নহি আমি রাজা।

তুকা। ক্ষমুন রাজন্, মোরে; কে তবে আপনি ?

রাজা। আবার রাজন্! তুমি রাজা, আমি সেনা!

তুকা। তুমি রাজা—আমি সেনা—

রাজা। পুনরায় ভুল!

তুমি রাজা আমি সেনা, বুঝিলে এখন ?

তুকা। বুঝেছি কঠিন আজ্ঞা—গুরু অভিনয়!

ভুলে যাই যদি পাঠ গর্ভাঙ্কের মাঝে

ক্ষমিতে হইবে, তুমি রাজা—আমি,—না না

তুমি সেনা আমি এবে—

রাজা। সাহাজি ধিরাজ।

ভুলিওনা,—বুঝিলেত ? চল এবে যাই।

(উভয়ের গমন।)

তৃতীয় দৃশ্য।

গ্রাম্যপথ।—(পথিপার্শ্বে পর্ব্বত অন্তরালে রাজা ও তুকারাম। রঙ্গমঞ্চের এক দিক দিয়া রমণীমণ্ডলীর ডালি হস্তে লইয়া প্রবেশ ও অন্য দিক দিয়া গমন।)

রাজা। একি শোভা চলন্ত ফুলের গুচ্ছ যেন!

উথলিত গ্রাম্যপথ সৌন্দর্য্য হিল্লোলে।

তুকা। মোর মনে আসে যাহা কব কি নির্ভয়ে ?

রাজা। কি কহেন মহারাজ! এ কি উপহাস ?

তুকা। বটে বটে! আমি রাজা, ভুলি দুঃখ এই!

রাজা। বলিতে হউক্ আজ্ঞা কিবা অভিপ্রায় ?

তুকা। সবে করে নারী সনে ফুলের তুলনা—
মোর মনে লয় তাহা নিরর্থক কথা ?
গৌরব বাড়ে কি তাহে কোন সুরূপার ?
কোন্ ফুল শোভা ধরে এমন মোহিনী,
কোন্ ফুল পুলকিত করে হৃদি মন
সুন্দরী বালার মত অতুল সুগন্ধে ?

রাজা। রসিক কবির মত বাঃ বেশ কথা ?
চলেছেন দেখিতেছি প্রথম শ্রেণীতে
ব্রাহ্মণ ললনা যত, মুক্ত শিরোভাগ
গুম্ফিত বেণীর চক্রে শোভে ফুলমালা
হস্তে মিষ্টান্নের ডালা, কুসুম চন্দন
কস্তুরী সুগন্ধি অর্ঘ্য, তাম্বুল, মসলা।
বরণীয়া দেবীরূপা, প্রণমি উদ্দেশে,

(উভয়ের নমস্কার।)

তুকা। মাড়োয়ার-বালাগণ দ্বিতীয় শ্রেণীতে,
কিবা ঘাগরার ঘের—কিবা—

রাজা। দেখ ঐ
মধ্যের যুবতী, শিরে ঘৃত কুম্ভ যার,
কি সুঠাম গতি কিবা অঙ্গের গঠন ?
এমনি সৌষ্ঠবশালী উর্ব্বশী তোমার ?

তুকা। ক্ষান্ত হও মহারাজ—সখা ক্ষণকাল,
কিছু পরে করিবেন রূপের বিচার !

রাজা। কে ঐ রমণী কিবা জ্যোতির্ম্ময়ী-রূপা ?
বুঝি ক্ষত্রিয়াণী ! কিংখাপ ঘাগরা পরা,
কণক খচিত সূক্ষ্ম ওড়নাগুণ্ঠন,

স্ফুরে তার মধ্য দিয়া স্বর্ণ-বর্ণ-দ্যুতি
দামিনী চমকে যেন নীলাম্বর মাঝে!
উর্ব্বশী কহহে তব হেন সুবরণী!

তুকা। খদ্যোতের সনে কেন চন্দ্রের তুলনা?

রাজা। ইঁহারা কাহারা! গুর্জ্জরী ললনা বুঝি?
শ্বেত পীত রক্ত নীল নানা বস্ত্রে সাজি,
ইন্দ্রধনু শোভা ঢালি চলেন সাজিয়া?
পীতাম্বরী বালা ঐ হস্তে ফল ডালি,
মতির মালিকা গলে, হীরা নাসিকায়,
কি সুন্দর আঁখি শোভা ভুরুর ভঙ্গিমা

তুকা। সব শোভা প্রভাহীন উর্ব্বশীর কাছে।

রাজা। কে ঐ তরুণী? চন্দ্রকলা পরিধানা,
চাহিয়া তোমার পানে অপাঙ্গ দৃষ্টিতে?
চকিত চরণে চলে, অঞ্চল দুলায়
ছড়াইয়া চরিদিকে রূপের মহিমা?
মনে হয় চন্দ্রাবলী চলেছেন যেন
তরুতলে, ভেটিবারে রাখাল বালক।
এই কি উর্ব্বশী?

তুকা। দক্ষিণী রমণী ইনি,
আলম্বিত মুক্তবেণী ফুলদাম ভরা।

রাজা। কতক্ষণে আসিবেন তিলোত্তমা তবে?
অধীর আকুল চিত্ত, ব্যথিত নয়ন।

তুকা। এইবার পূর্ণ সখা হবে মনোরথ,—
আসিছেন এবে দেখি মহারাষ্ট্রী বালা
দাসদাসী সুবেষ্টিতা মধ্যখানে যিনি

কনকবসনা বামা, হীরক-ভূষিতা
হস্তে সুবর্ণের বালা,—শ্রেষ্ঠীপত্নী উনি,
উর্ব্বশীর মাতা—পার্শ্বে বৃন্দা সহচরী.
কিন্তু হায় হেরিনাত উর্ব্বশী দেবীরে !

রাজা। এত আশা সব ব্যর্থ ?

তুকা। তাইত ! কি হোল !

রাজা। শূন্য করি হৃদি প্রাণ, শূন্য করি পথ,
একে একে বামা সব গেলেন চলিয়া,
পূর্ণিমা তিথিতে হয় পূর্ণিমার চাঁদ,
না হোল উদয় আজি আমার ভাগ্যেতে ।

তুকা। সহজে মিলিলে বস্তু আদর কোথায় ?
আরাধ্যা দেবতা তিনি তাই এ নিরাশা।

রাজা। চল তবে কেঁদে কেঁদে আরাধনা করি,
বনে বনে ফিরি মোরা।

(নেপথে বাদ্যধ্বনি শুনিয়া)

একি এ সময়ে !
কেন বাদ্য কোলাহল ! যাও হে নিবার,
গোপনে রাখিতে চাহি শিবির মোদের।
সেনাপতি সনে কহি দু একটি কথা—
আমিও তোমার সাথে মিলিব সত্বর।

[উভয়ের গমন।

শ্রী পদ্মা,
[illegible]গুণ্ঠন,

চতুর্থ দৃশ্য।

[গ্রাম্যপথ—ঢাক ঢোল বাজাইতে বাজাইতে সেনা দলের প্রবেশ।]

(রঙ্গমঞ্চের বাহিরে কোন গ্রাম্যকে লক্ষ করিয়া।)

প্রথম সেনা। কে যাসরে গ্রাম্য ? অরুণা মন্দির
কোথায় বলিয়া দেনা ?

(গ্রামবাসীর প্রবেশ।)

গ্রাম্য। জানিসনে সেটা কেবা তোরা মূঢ় ?
এদিকে যে দেখি ভারী তারা হুড়ো।

দ্বি-সেনা। চুপ কর মাথা করি দিব গুড়ো
সকলে। আমরা সা'জির সেনা।

(একজন বৃদ্ধের প্রবেশ।)

বৃ। সাহাজির সেনা ! শোন বলি তবে।
ঐ যে পাহাড় তল।
ছখানি দেখিবে পর্ণ কুটীর,
তৃণ পত্র দিয়া আচ্ছাদিত শির,
একটিতে থাকে পূজারী সুধীর—
একটি দেবতা স্থল।

সেনারা। জয় জয় জয় অরুণাবতীর
বাজারে নাগেড়া ঢোল।

প্র। শুনিয়াছি বড় জাগ্রত সে দেবী।

দ্বি। মহাসমারোহে চল তারে সেবি।

বৃ। আহাহা কর কি। হারাইবে সবি
কর যদি গণ্ডগোল।

গ্রাম্য। হাহা—সেথায় বাজেনা, দামামা নাগাড়া

সানাই বাঁশরী বাদ্য।

বৃ। জনসমাগমে নাহি বাক মেলা

পূজে নরনারী আসিয়া একেলা

ঘণ্টা নাহি পড়ে আরতির বেলা

তপে জপে দেবী বাধ্য।

প্র। কি বলে বুড়াটা! শুনিনিত হেন।

কেমন দেবতা তবে?

দ্বি। কে শোনে ও কথা, বাজাদে বাজনা।

সকলে। জানিস আমরা সাহাজির সেনা?

বৃ। দেবতা মোদের তাহা বুঝিবেনা।

শোন বলি বাছা তবে।

বহু দিন থেকে জানেনাক লোকে

গত কত শত অব্দ।

দেবীর হেথায় ছিল অধিষ্ঠান।

গ্রা। সহসা হলেন তিনি অন্তর্ধান।

বৃ। বৎসরেক মাত্র ব্রাহ্মণ কৃষাণ

পেয়েছে স্বপন লব্ধ।

প্র। রাখ্‌ রাখ্‌ বুড়া ইতিহাস তোর

পরে লিখে হোস্‌ ধন্য।

দ্বি। বাজারে বাজনা ভেপু ঢাক ঢোল,

তৃ। বল বল বল জয় জয় বোল,

প্র। চল চল চল সদাপে পা তোল।

সকলে। আমরা সাজাজির সৈন্য।

বৃ। বাপুরা শোননা দেবী সুপ্রসন্না
স্বপ্নেতে কহিলা আসি
আবির্ভাব আসি হব তোর ঘরে,
মিথ্যা যাগ যোগে পূজিওনা মোরে
ভক্তি পায় ক্ষয় বৃথা আড়ম্বরে
জানুক গ্রামের বাসী।

প্র। সত্য নাকি বুড়া!
সকলে। তবে ত মুস্কিল।
প্র। আমরা সাজির সেনা।
মোরা হাতে কাটি মুণ্ড, পায়ে নাড়ি হাতি
দ্বি। ঘর দ্বার চূর্ণ, ভাঙ্গি রাতারাতি।
তৃ। শুধু—সোরসার আর জানি মাতামাতি।
সকলে। চুপের না ধারি দেনা।
তৃ। শোননারে বৃদ্ধ কি বলে আবার।
বৃ। ব্রাহ্মণ সন্তানহীন।
বুড়বুড়া দোঁহে পাহাড়ের তলে
খুঁজিয়া দেখিল কি যেন উজলে,
ভক্তিভরে বৃদ্ধ উঠাইল কোলে।
সকলে। কি মজা তাধিন ধিন!
প্র। রূপেতেও দেবী আড়ম্বরহীনা,
নিরূপা বলিলে হয়!
বৃ। নাহি কোন মূর্ত্তি নাহি অঙ্গ নানা,
সিন্দুর চর্চ্চিত রাঙ্গা মেখলানা।
প্রা। সরল সুদীর্ঘ শিলা এক খানা
তা ছাড়া কিছুই নয়।

বৃ। তাহারি এমন মাহাত্ম্য মহান!

বৃ ও গ্রা। হ্যাঁগো, তথনি বাধিল গ্রামে—

বৃ। এসেছেন দেবী মোদের অরুণা।

গ্রা। ছুটে বৃদ্ধা বৃদ্ধ তরুণ তরুণা।

বৃ। দুখীজনে লভি তাঁহার করুণা

ফিরে নিজ নিজ ধামে।

প্র। তবে চল, চল ফিরে যাই মোরা।

সকলে। জয় জয় শাজি রাজা।

দ্বি। এমন দেবতা আমার না পূজি।

তৃ। পার্ব্বতী মন্দিরে চল সবে খুঁজি।

প্র। মোরা লম্ফ ঝম্প আর হুহুঙ্কার বুঝি।

সকলে। জোরে জোরে ডাক বাজা।

(সকলের প্রস্থান।)

(পার্ব্বতীর মন্দিরের নিকটবর্ত্তী পথে মেনকা ও উর্ব্বশীর প্রবেশ।)

উ। সেনাদল এ বিজন গ্রাম পথে! একি!
এরি মাঝে এলেন কি সাহাজি ধিরাজ?

মে। দেখি দেখি! কোথা রাজা কোথা সেনাপতি?
অতুল অমিত যশ শাহাজিধিরাজ?
মোদের দেশের বীর ভারতগৌরব
নামেতে রোমাঞ্চি উঠে গর্ব্বে তনু মন!

উ। অশ্বারোহী হেরি নাতি কেবল পদাতি!

মে। কি ভীষণ মূর্ত্তি সবে ধরে, কি হুঙ্কার!
অট্ট হাসি! এইদিকে যদি আসে ওরা?
বড় ভয় করে! অসহায়া অরক্ষিতা
আমরা দুজনে, এস লুকাই আমরা।

(পাহাড় অন্তরালে গমন ও অশ্বের পদধ্বনি শুনিয়া।)

উ। কে আসিছে অশ্বারোহী যোদ্ধৃ সুপুরুষ,
বাম পথভাগে—

সে। যদি সাহাজি বা হন ?
নির্ভয় আমরা এবে, নিশ্চয় এ তিনি—
কি আশ্চর্য্য আমাদেরি অভিমুখে দেখ,
অশ্ব অগ্রসর !

উ। এমনি আশ্চর্য্য কিবা !
পতঙ্গ আলোক হেরি কোথা আর ফিরে ?

মে। সত্য তাহা ! না ফুরাতে মুখের বচন
সিদ্ধ যে হইল দেখি তোমার সে পণ !

(নেপথ্যে সৈনিকদিগের প্রতি অশ্বারোহী।)
প্রশান্ত মন্দির দ্বারে একি উপদ্রব।
কোলাহল আমোদের এই বুঝি ঠাঁই ?
এই কি সময় ! থামা বাদ্য মূঢ় তোরা
শিবিরে ফিরিয়া চল্, রাজার আদেশ !

(বাদ্যধ্বনি নিস্তব্ধ এবং অশ্বারোহীর রঙ্গভূমিতে প্রবেশ ও উর্ব্বশী ও মেনকাকে পর্ব্বতপার্শ্বে দেখিয়া সবিস্ময়ে।)

যাহারে খুঁজিয়া ফিরি বিশ্ব চরাচর
সহসা প্রকাশ তিনি আঁখির উপর ?
সত্বর সংবাদ দানে আনি মহারাজে।

(দ্রুত অশ্ব চালনা করিয়া প্রস্থান।)

মে। একি দিদি ! চেয়ে দেখি' আমাদের দিকে
চকিতে [illegible]

রমণীর মুখ যেন না চান দেখিতে।
নিশ্চয় সাহাজী ইনি-কে আর নহিলে
উপেক্ষিয়া চলে যায় উর্ব্বশীর রূপ।

উ। তীক্ষ্ণধার ছুরি বাজে এই অবহেলা!
বৃথা গর্ব্ব নারায়ণ মহাদেবে মোহি!
ক্ষুদ্র দীপ পতঙ্গেরে করে আকর্ষণ
সাগর আকৃষ্ট শুধু চন্দ্র সূর্য্যকরে।

মে। শান্ত হও উর্ব্বশী হয়ো না নিরাশ
হয় ত বা না দেখি তোমা গেলেন চলিয়া।

উ। শান্ত হব সেই দিন যেই দিন হায়
তাঁহার তুরঙ্গ সম ইচ্ছার সঙ্কেতে
পারিব ফিরাতে তাঁর সুবঙ্কিম মন।
দেখেও না রহিলেন আবার দেখিতে!
বারেক না কহিলেন সম্মান বচন!

মে। যাদুকর দেখি তিনি! উপেক্ষা আঘাতে
জাগালেন অনুরাগ বিরাগী হৃদয়ে।

উ। থাকুক একথা এবে চল মোরা যাই।

(একদিক দিয়া উভয়ের প্রস্থান, কিছু পরে অন্যদিক দিয়া
রাজা ও তুকার প্রবেশ।)

রাজা। (সবিস্ময়ে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া)
কোথা তিলোত্তমা তব শুধু কি কৌতুক!
মায়ামৃগ দেখিয়াছ ঘুমিয়া স্বপনে?

তুকা। স্বপ্ন নহে, মায়া নহে সত্যই রাজন
কিছু পূর্ব্বে উর্ব্বশীরে দেখিনু হেথায়।

রাজা। তুমি ভাগ্যবান সখা—দুর্ভাগ্য আমার!
চন্দ্রমা নীরদে লুপ্ত আমার দৃষ্টিতে?
চল তবে ফিরে যাই নিরাশা বহিয়া।

(রঙ্গভূমির একদিক দিয়া গমন, অন্যদিক দিয়া কিছু পরে পুনঃ প্রবেশ এবং রাজা আকাশে দৃষ্টিপাত করিয়া)

রাজা। অস্তগামী সবিতার শেষ রশ্মিছটা!
মিলায়ে পড়িছে ধীরে দিগন্তের কোলে!
হের আচম্বিতে সখা ঘোর ঘন ঘটা
জমিতেছে স্তূপে স্তূপে ঈশান গগণে
বন মাঝে সুবিশাল জটার মতন।

তুকা। তাইত! কি অন্ধকার দেখিতে দেখিতে!
বন মাঝে পথহারা না হইলে বাঁচি।

[উভয়ের প্রস্থান।

[ক্রমশঃ]

শ্রীস্বর্ণকুমারী দেবী।

উৎকল ভাষা ও সাহিত্য।

বিবিধ বিষয়ে বঙ্গপ্রদেশের সহিত উৎকলের সম্পর্ক সুদূরকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত। এবং নানা হেতুবশতঃ সেই সম্পর্ক দিন দিন ক্রমশঃ নিকটতর এবং ঘনিষ্ঠতর হইতেছে। বঙ্গীয় আধুনিক শিক্ষিত সমাজ উৎকল সম্বন্ধীয় নানা জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার জন্য নিতান্ত ইচ্ছুক। পরিতাপের বিষয় বঙ্গোৎকল সম্পর্কটা বহুকালব্যাপী হইলেও উৎকল প্রদেশ এবং উৎকলবাসীদিগের সম্বন্ধে অনেক

বঙ্গবাসীর মনে নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। বিশেষতঃ উৎক ভাষা ও উৎকল সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গবাসীদিগের ধারণা নিতান্ত বিস্ময়ক: আমরা অন্ত সে সম্বন্ধে ভারতীর পাঠকবৃন্দকে স্থূলতঃ কয়েকটী কং জানাইতে ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু আমরা এসম্বন্ধে নিজের কিছু অভিমত প্রকাশ না করিয়া উৎকল-সাহিত্য নামক মাসিক পত্রিকা পুরী জিলা স্কুলের হেড পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদাশিব মিশ্র কাব্যকণ্ঠ লিখি ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধ বিচার নামক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইতে বক্তব্য সংগ্র করিব।

ওডিশা এই ভূখণ্ড যে অতি প্রাচীন এবিষয়ে কোন মতদ্বৈধ নাই। মনু এবং মহাভারতাদি গ্রন্থে বহুল স্থলে এদেশের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রীয় প্রমাণ হইতে অনুমান করা যায় পূর্ব্বে এদেশে শবর এবং ওডিয়া এই দুই জাতি বাস করিত। তাহাদের কথিত ভাষার নাম ওট্র এবং শাবরী। অনেক শাবরী শব্দ উৎকল দেশজ শব্দমধ্যে দৃষ্ট হওয়ায়, প্রাচীন পণ্ডিতগণ ওট্র ভাষাকে শাবরীর এক শাখা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় প্রাচীন ওড্ এবং শবরগণ অশিক্ষিত অবস্থায় ছিল। উক্ত দুই চলিত প্রাচীন ভাষায় লিখিত কোন গ্রন্থ না থাকায় তাহাদের পরস্পর সামঞ্জস্য এবং পার্থক্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিতে অক্ষম হইলাম। কেবল সামান্য কয়েকটা পদ উল্লেখ করিতেছি, পাঠকগণ ইহা হইতে কতক বিষয় হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবেন।

শাবরী।	উৎকল।
অস্তক অকং ধনং	আস্ত মানসে ধন
হকে অ অ	মু আসি থিলি।

স্থানান্তরে লেখক নিম্নলিখিত ভাষাকে ওট্রী ভাষা নাম দিয়াছেন। হণ্টর সাহেবের মতে মার্কণ্ড দাসের কেশব কোইলী ছয় শত বর্ষ

পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে, কিন্তু দেখা যায় সম্প্রতি প্রচলিত উৎকল ভাষার সহিত কেশব কোইলীর কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। যথা :—

"কোইলালো কেশব যে মথুরাকুসলা"—

কাহারোনে গলা পুত্র বাইড়ী নোইলালো কোইলা।

থণ্ড ক্ষির দিবি মু কাহাকু, খাইবার পুত্র গলা মথুরা পুরকু কোইলী।

ইহা হইতে স্পষ্ট অনুমিত হইতেছে বর্ত্তমানে যাহা বিশুদ্ধ সাহিত্য বলিয়া কথিত হয় তাহার উৎপত্তি ৬৷৭ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে।

এই ৬৷৭ শত বর্ষ পূর্ব্বে উৎকলে যে দেশীয় শাস্ত্রের চর্চ্চা ছিল একথা বলিতে পারি না। কারণ বর্ত্তমান ভারতবর্ষে কোন এক সার্ব্বভৌম ভাষা নির্দ্দিষ্ট নাই। সংস্কৃত চর্চ্চা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে। প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র এক একটী ভাষা আবির্ভাব হইয়াছে। এই সকল প্রদেশের শিক্ষিত লোকগণ স্ব স্ব দেশীয় ভাষার উন্নতি কল্পে বদ্ধ পরিকর হইতেছেন। বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনায়। যেহেতু সংস্কৃত শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে নিতান্ত সহজসাধ্য নহে সুতরাং প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই প্রাদেশিক ভাষার উন্নতিকারাদিগের মধ্যে অধিকাংশ পাশ্চাত্য বিদ্যায় শিক্ষিত। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে এখনও দেশীয় ভাষার উন্নতির জন্য যত্নশীল দেখা যায় না। প্রাচীন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ যে দেশীয় ভাষার অলোচনায় তাদৃশ যত্নশীল ছিলেন না, তজ্জন্য তাঁহাদের প্রতি দোষারোপ করা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত দেবভাষা বলিয়া ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদিসম্মত। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বিষয় প্রতি সর্ব্বসাধারণের যাদৃশ শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেশীয় ভাষায় লিখিত বিষয়ের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধা দেখা যায় না। তজ্জন্য পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ যে সংস্কৃত ভাষায় সমস্ত লিখিতেন ইহা স্বাভাবিক।

এই হেতু বশতঃ প্রাচীন উৎকল পণ্ডিতগণ সমস্ত বিষয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া গিয়াছেন। বাবু সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম এ, প্রণীত আত্মতত্ব প্রকাশ নামক পুস্তকে লিখিত আছে—বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বসুবন্ধুর শিষ্য দিঙ্নাগাচার্য্য এক সময়ে উৎকল দেশীয় সমস্ত দার্শনিক পণ্ডিতদিগকে পরাস্ত করিয়া তর্কভূষণ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তৎপ্রণীত তাবতীয় প্রামাণিক গ্রন্থ তিব্বত দেশে বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার গুরু বসুবন্ধু ৫৪০ খৃষ্টাব্দের লোক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে উৎকল দেশে যে দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিদ্যমান ছিলেন নিঃসন্দেহে একথা বলা যাইতে পারে।

মেকলে বলেন সমাজের প্রথমাবস্থায় কবির জন্ম, তাহার পর দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব হয়। বেদ হইতে উপনিষদ ও দর্শন পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে মেকলের উক্তি প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। এ প্রসঙ্গে উৎকলের কতক প্রাচীন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

১। ক্ষেত্র মাহাত্ম্য—ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্ম্মিত জগন্নাথ মন্দিরের সমসাময়িক।

২। বীরজা মাহাত্ম্য এবং একাম্র মাহাত্ম্য—কেশরীবংশীয়ের সমসাময়িক।

এতদ্ভিন্ন কপিল সংহিতা ও বামদেব সংহিতা প্রভৃতি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছে কবিতা ভিন্ন অনেক প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রও উৎকলে পাওয়া যায়—

১। শ্রাদ্ধকারিকা—শম্ভুকর বাজপেয়ী প্রণীত।

২। নিত্যাচার পদ্ধতি—বিদ্যাধর বাজপেয়ী প্রণীত।

৩। নিত্যাচার প্রদীপ—নৃসিংহ বাজপেয়ী প্রণীত।

৪। প্রায়শ্চিত্ত প্রদীপ— ঐ

৫। বিষ্ণুভক্তি প্রদীপ—নৃসিংহ বাজপেয়ী প্রণীত।

৬। চয়মা প্রদীপ— ঐ

৭। শ্রাদ্ধ প্রদীপ }
৮। কাল প্রদীপ } দিব্য সিং মহাপাত্র প্রণীত।

বহুকালাবধি এই সকল গ্রন্থ উৎকলে প্রচলিত আছে। বঙ্গীয় রঘুনন্দন কৃত স্মৃতিগ্রন্থে এই সমস্ত গ্রন্থের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

দর্শন শাস্ত্র যথা—

সটীক ন্যায় মুক্তাবলী—লোকনাথ মিশ্র কৃত।

জ্যোতিষ প্রকাশ—হলধর কৃত।

সুপ্রকাশ—ভবদানন্দ কৃত।

ব্যাকরণ—

চন্দ্রোদয়—হরিদাস কৃত।

যজ্ঞ সম্বন্ধীয়—

অগ্নিষ্টোম পদ্ধতি—জগন্নাথ কৃত।

এই সমস্ত গ্রন্থ সচরাচর প্রচলিত। এতদ্ ভিন্ন বহুল গ্রন্থ তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থায় রহিয়াছে। কবি যথার্থই লিখিয়াছেন "সাগরগর্ভে, অন্ধকারময় গর্ত্তে অশেষ রত্ন বিদ্যমান রহিয়াছে এবং নিবিড় কাননে অসংখ্য কুসুম গুপ্তভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া বিলীন হইতেছে।" যে সকল গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা গেল সে সমস্ত যে ১৩।১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। খৃঃ ১০০০ পূর্ব্বে লিখিত উড়িয়াদিগের অনেক গ্রন্থ দৃষ্টিগোচর হয়।

মার্কণ্ডের প্রাকৃত সর্ব্বস্ব গঙ্গাবংশানুচরিত প্রভৃতি এই সময়ে রচিত।

অতি পূর্ব্বকালে উৎকলীয়েরা ইতিহাসের গৌরব এবং উপকারিতা

অনুভব করিয়াছিলেন। সেই সূত্রে পুরীর মাদলা পঞ্জিকার সৃষ্টি, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় দুর্দান্ত কালাপাহাড় উক্তপঞ্জিকার অনেকাংশ নষ্ট করিয়া দিয়াছে।

অতি প্রাচীন কালে ওড়িষায় বিশেষভাবে শাস্ত্রালোচনা হইত, ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। একটী প্রমাণ এই—এসিয়াটিক সোসাইটী প্রেরিত একজন পণ্ডিত প্রাচীন পুস্তকান্বেষণের জন্য উৎকলে আসিয়াছিলেন। তিনি এস্থানে এ প্রকার পুস্তক দেখিয়াছেন যাহা ভারতের অন্য প্রদেশে সুলভ নহে, যথা :—

কাক্যনা ভ্যুদর কাব্য (মল্লিনাথ টীকায় ইহার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।) বৈদান্তিক শিব পরভাষ্য—অপেয় দীক্ষিত কৃত। ঈদৃশ অনেক গ্রন্থ উৎকলে বিদ্যমান রহিয়াছে। পণ্ডিতেরা বলেন যদ্দ্বারা হিতসাধিত হয় তাহার নাম সাহিত্য। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে যাহা পাঠ করিলে মনে আনন্দ অনুভূত হয়, হৃদয় প্রশস্ত হয়, অজ্ঞান জড়তা দূর হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান জন্মে, আপনার এবং সংসারের হিতসাধন করা যাইতে পারে, স্থূলতঃ যদ্দ্বারা মানবের শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন হয়, তাহাই প্রকৃত সাহিত্য পদবাচ্য ; অতএব কাব্য, নাটক, ইতিহাস, উপন্যাস, লোকচরিত, স্মৃতি, দর্শন, পুরাণ, গণিত ও জ্যোতিষ প্রভৃতি সমস্তই সাহিত্য পদবাচ্য।

দুঃখের বিষয় উৎকলে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য আলোচিত হয় নাই। জ্যোতিষ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে কতক শাস্ত্র আছে সত্য কিন্তু সংখ্যায় নিতান্ত অল্প। কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে উৎকল দরিদ্র নহে কিন্তু তাহাও কেবল পদ্যে পরিপূর্ণ। যদিচ কোইলী প্রভৃতি অনেক প্রাচীন কবিতা উৎকলে পাওয়া যায়, কিন্তু প্রকৃত উৎকল সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধিকাল ৪০০ শত বৎসরের অধিক নহে। প্রকৃত উৎকল সাহিত্যের উন্নতি ভক্তকবি জগন্নাথ দাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উৎকলে ভাষা ও

ধর্ম্ম প্রচার এবং লোকসমাজে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধিকরণ উদ্দেশে মহাত্মা জগন্নাথ দাস ভাগবত উৎকল ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই মহৎ উদ্দেশ্য যথেষ্ট পরিমাণে সাধিত হইয়াছে। তাঁহার অনুবাদিত উৎকল ভাগবত এখন প্রত্যেক গৃহস্থের আরাধ্যবস্তু হইয়াছে, কৃষকের পর্ণকুটীর হইতে ব্রাহ্মণের দেবালয় এবং নৃপতির অট্টালিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র বিরাজিত। জগন্নাথ দাস অতি সরল ভাষায় ভাগবত অবিকল অনুবাদ করিয়াছেন। এতাদৃশ কঠিন বিষয় এত সরল ভাষায় অনুবাদ করা অন্যের সাধ্যাতীত।

জগন্নাথ দাসের অব্যবহিত পরে বলরাম দাস, শরলা দাস ও কৃষ্ণ সিংহ প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অদ্যবধি উৎকলের সমস্ত কবিকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে :—

১ম ভক্তকবি। উৎকলে ভক্তকবির সংখ্যাই অধিক। তাঁহারা মৌলিক বিষয় ভিন্ন সংস্কৃত অষ্টাদশ পুরাণ অবিকল পদ্যে অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় কোন প্রাদেশিক কবি এত দূর কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

২য় কাব্যকার। উপেন্দ্র ভঞ্জ, দীনকৃষ্ণ দাস, অভিমন্যু সামন্ত সিংহার, কবিসূর্য্য, বলদেব রথ, কবিসূর্য্য ব্রহ্মা, কৃপাসিন্ধুদাস, বিপ্র-শ্রীধর, লোকনাথ বিদ্যাধর, যদুমনি মহাপাত্র, নারায়ণ আচার্য্য, লোকনাথ ভঞ্জ, নিধিরথ, লোক নাথ নায়ক প্রভৃতি ২য় শ্রেণীর কবি। ইহাঁদিগের মধ্যে লোকনাথ নায়ক লীলাবতী অনুবাদ করিয়াছেন। দীনকৃষ্ণ দাসের বৈদ্যশাস্ত্র সম্বন্ধীয় একখণ্ড গ্রন্থ আছে। কিন্তু ইহাঁরা কাব্য রচনায় সুপ্রসিদ্ধ। জগন্নাথ দাস প্রভৃতি ভক্তকবিগণ উৎকল সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপক হইলেও, ২য় শ্রেণীর কবিগণের যত্ন এবং অধ্যবসায়ে উৎকল স্বতন্ত্র ভাষারূপে পরিণত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কবিগণ উৎকল সাহিত্যে কাব্য সৃষ্টির প্রথম প্রবর্ত্তক। যদিচ ইহাঁদিগের

কাব্য সকল আদিরস পরিপূর্ণ তথাচ কাব্য রচনায় ইহাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

এই কবিগণ স্বকীয় কাব্যের স্থানে স্থানে বৃক্ষলতা পরিশোভিত অনন্ত কাননরাজি, অসংখ্য নদী-নির্ঝরিণী-সমাকীর্ণ উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশ্রেণী পরম রমণীয় শ্যামল শস্যপূর্ণ কেদারাবলী, নিত্য তরঙ্গায়িত ফেণিল্-বক্ষ মহার্ণব, প্রভাতের নবোদিত তপনছবি, পরম শোভাকর সুধাংশু মণ্ডল, অট্টালিকা শ্রেণী পরিশোভিত, অসংখ্য নরনারীপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী বৃহন্নগর এবং নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ঋতু সকল অতি সুন্দর রূপে চিত্রিত করিয়াছেন; এবং প্রকৃতি বর্ণনায় ক্ষমতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গকবি মাইকেল 'মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনাকাব্যে লিখিয়াছেন—

আকাশে করেন কেলি লয়ে কলাধরে
রোহিণী কুমুদ তারে পূজে সৌধ তলে
কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাঙ্গা পদে।

* * * *

এস তবে প্রাণ সখে দিনু জলাঞ্জলি,
কুল মানে তব জন্যে ধর্ম্ম লজ্জাভরে,
কুলের পিঞ্জর ভাঙ্গি কুল বিহঙ্গিনী,
উড়িল পবন পথে ধর আসি তারে—
তারানাথ? তারানাথ? কে তোমারে দিল
প্রণাম হে গুণনিধি কহ তা তারারে।

এরূপ স্থলে একজন প্রাচীন উৎকল কবি কি লিখিয়াছেন দেখুন—

"চন্দ্র বিনু চকোরকু আন গতি কাহিকি,
জল বিনু মীন দিন নেব পুণি কাহিকি।

কুমুদিনী বিনা বাধা কিছু অই বিধুর,
দূতাগো—বধুকু কহ দেখু প্রীতি শশীর,
কালা হেলে হে আদর ন তেজন্তি নিশির।
কমলীনীরে বিশ্বাস সর্ব্বদা ষট্‌ পদর।
বাসঙ্গ সঙ্গে কি ন করহ আদর। ইত্যাদি।

প্রকৃত চিত্র বর্ণনায় উৎকল কবিগণ যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

বীর রসাত্মক কবিতার উৎকলে অভাব বলিয়া নব্যদল প্রচার করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা কিঞ্চিৎ পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অন্বেষণ করিলে তাঁহাদের সংস্কার সহজে দূরীভূত হইতে পারে। আমরা এ সম্বন্ধে বাঙ্গালা ও উৎকল তুলনা করিয়া দেখাইতে ইচ্ছা করি। বাঙ্গলার কবিবর মধুসূদন দত্ত লিখিয়াছেন বীরবাহুর নিধন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ বলিতেছে—

"কতক্ষণে চেতনা পাইয়া,
বিষাদ নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা রাবণ
নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,
রে দূত—অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর—সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে ফুল শর দিয়া—
কাটিল কি বিধাতা শালমলী তরু বরে,
হা পুত্র হা বীরবাহু বীরচূড়ামণি,
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে,
কি পাপ দেখিয়া মোর রে দারুণ বিধি,
হরিলি এ ধন তুরে হায় কে কেমনে,

সহি এ যাতনা আ...
এ বিপুল কুল মান এ ... স...

শত শত বৎসর পূর্ব্বে উৎকলীয় কবি ঈদ... ক লিখিয়াছেন দেখুন—

'বানর বলরে বলরে ... নরে আসি লঙ্কারে—
বীরমণি বীরবাহুর নাশ কলে রণরে।
বার্ত্তাবহ বারতার সে কথা জলি পাবক।
বীরকেশ ধরি আউসি, বোলে লঙ্কানায়ক।
বোহ্নলা একি রে আশ্চর্য্য, ঘৃণা লয় সুত্ররে।
রাবণ কি বন্ধা হোইলা, শুনা 'গলা কর্ণবর।
বারিধি তরঙ্গ বারণে, ক্ষম সৈকত সেতু।
বিজলিত বহ্নি নির্ব্বাণে, তৃণ গুচ্ছ কি হেতু।

পাঠকগণ দেখুন কবিগণ বিভিন্ন দেশীয় এবং বিভিন্ন সময়ে আবির্ভূত হইয়াও ভাবে কিরূপ সামঞ্জস্য ঘটাইয়াছেন, ইহাই কবির চাতুরী। দুঃখের বিষয় প্রাচীন অমূল্য কবিতা গুলি ঘোর অন্ধকারে নিহিত আছে, সে বিষয়ে কেহই তত্ত্ব লইতেছেন না।

আনন্দের বিষয় দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপায় বর্ত্তমান সময়ে উৎকল সাহিত্যাকাশে শ্রীমান রাধানাথ রায় বাহাদুর, শ্রীমধুসূদন রাও, শ্রীফকীর মোহন সেনাপতি, মহারাজা সুচল প্রভৃতি কয়েকটী অত্যুজ্জ্বল চন্দ্ররূপে সমুদিত হইয়া উক্ত অন্ধকার দূর করিতেছেন।

ইহাঁরা নব্য শ্রেণীর ৩য় বিভাগের কবি। ইহাঁরা নব রুচি অনুসারে উৎকল সাহিত্য ভাণ্ডারে অভিনব রত্নমালায় পরিপূর্ণ করিতেছেন। এই শ্রেণীর কবিগণ ইংরাজি, সংস্কৃত, বাঙ্গলা এবং প্রাচীন উৎকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া রত্নোদ্ধার করিতেছেন। ইহাঁদিগের দ্বারায় আজি উৎকল-দেশ গৌরবান্বিত।

রায় কবির স্বভাবোক্তি মণ্ডিত প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং ভারতীয় বহু স্থানের চিত্রাঙ্কন উৎকল কাব্য জগতে এক নূতন সৃষ্টি। তাঁহার বর্ণিত হইলেও কাব্যপাঠমাত্র স্থানের প্রকৃত চিত্র হৃদয়ে প্রতিভাত হয়। এই মহাত্মা আদিরস সীমাবদ্ধ বিষয়ে কিরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন যযাতী কেশরী পাঠে তাহা জানা যায়। এবং উৎকলী পাঠকের নিকট ইনি একজন বীররসের সুপ্রসিদ্ধ লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর "মহাযাত্রা"র কাম ক্রোধাদির রূপক চিত্রন এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

বাবু মধুসূদন রাও গদ্য ও পদ্য উভয় প্রকারের রচনায় সিদ্ধহস্ত।

বাবু ফকীরমোহন সেনাপতি উৎকলের একজন সুযোগ্য লেখক। এই মহাশয়ের ইতিহাস এবং রামায়ণ মহাভারতাদির অনুবাদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পুস্তকাবলী উৎকল সাহিত্য ভাণ্ডারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেছে, বিশেষতঃ ইহাঁর প্রণীত উপন্যাস উৎকলের এক নূতনত্ব।

শ্রীযুক্ত বামড়াধিপতি সুচল দেব মহোদয় এতদূর উচ্চ পদারূঢ় হইয়াও বহু যত্ন স্বীকারপূর্ব্বক "অলঙ্কার বোধোদয়" ও বিদ্রোৎপলা রচনা করিয়া উৎকল সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। ইহাঁর অলঙ্কার বোধোদয় উৎকল সাহিত্য ভাণ্ডারে এক অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন। উল্লিখিত কবিগণ ব্যতীত গঙ্গাধর মেহের, দামোদর মিশ্র, বিশ্বনাথ কর, গোপালবল্লভ দাস, রামশঙ্কর রায়, নন্দকিশোর বল, শশীভূষণ রায়, হরিহর রথ প্রভৃতি অনেকগুলি উৎসাহী লোক সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নশীল হইয়াছেন। দয়াময় পরমেশ্বর ইহাঁদিগকে দীর্ঘজীবী করুন।

শ্রীগোপালচন্দ্র প্রহরাজ।

গোহ।

প্রকাণ্ড বটগাছের মাঝে পাতায় ঢাকা পাখীর বাসাটি যেমন ছোটখাট, গগনস্পর্শী বিন্ধ্যাচলের কোলে চন্দ্রাবতীর শ্বেত পাথরের রাজপ্রাসাদও তেমনি সুন্দর—তেমনি মনোরম ছিল। ম্লেচ্ছদের সঙ্গে যুদ্ধের কিছুদিন পূর্ব্বে শিলাদিত্য একদিন জনকতক রাজপুত বীরকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রাবতীর রাজকন্যা গর্ভবতী রাণী পুষ্পবতীকে সেই চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে বাপ মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর মনে বড় ইচ্ছা ছিল যে যুদ্ধের পর শীতকালটা বিন্ধ্যাচলের শিখরে নির্জ্জনে সেই শ্বেত পাথরের প্রাসাদে রাণী পুষ্পবতীকে নিয়ে আরামে কাটাবেন; তারপর রাণীর ছেলে হলে দুজনে একসঙ্গে রাজপুত্রকে কোলে নিয়ে বল্লভীপুরে ফিরবেন। কিন্তু হায়—বিধাতা সে সাধে বাদ সাধলেন, বিধর্ম্মী শত্রুর বিষাক্ত একটা তীর তাঁর প্রাণের সঙ্গে বুকের সমস্ত আশা বিদীর্ণ করে বাহির হয়ে গেল—শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারালেন। তাঁর আদরের মহিষী পুষ্পবতী চন্দ্রাবতীর সুন্দর প্রাসাদে একাকিনী পড়ে রইলেন।

বিন্ধ্যাচলের গায়ে রাজ অন্তঃপুরে যেদিকে পুষ্পবতীর ঘর ছিল, ঠিক তার সম্মুখে পাহাড় থেকে পঞ্চাশ গজ নীচে বল্লভীপুরে যাবার পাকা রাস্তা। পুষ্পবতী সেইবার চন্দ্রাবতীতে এসে যত্ন করে নিজের ঘরখানির ঠিক সম্মুখে দেওয়ালের মত সমান সেই পাহাড়ের গায়ে পঁচিশ গজ উপরে যেন শূন্যের মাঝখানে ছোট একটী শ্বেত পাথরের বারাণ্ডায় বসেছিলেন। সেইখানে বসে সেই রাস্তার দিকে চেয়ে তিনি প্রতিদিন একখানি রূপার চাদরে, সোণার সুতোয় সবুজ রেশমের, সবুজ ঘোড়ায় চড়া সূর্য্যের মূর্ত্তি সোণার ছুঁচ দিয়ে সেলাই করতেন আর

মনে ভাবতেন—মহারাজা যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে, পাখীর পালকের মত হাল্কা এই পাগড়িটী মহারাজের মাথায় নিজের হাতে বেঁধে দেব। তারপর দুজনে মিলে পঁচিশ গজ ভাঙ্গনের গায়ে—পাতলা একখানি মেঘের মত সাদা—শ্বেতপাথরের সেই বারাণ্ডায় বসে মহারাজার মুখে যুদ্ধের গল্প শুনব। মাঝে মাঝে পুষ্পবতী দেখতেন সেই বল্লভীপুরের রাস্তার বহুদূরে একটী বল্লমের মাথা ঝক্‌মক্ করে উঠত, তারপর কাল ঘোড়ার পিঠে বল্লভীপুরের রাজদূত দূর থেকে হাতের বল্লম মাটির দিকে নামিয়ে অন্তঃপুরের বারাণ্ডায় রাজরাণী পুষ্পবতীকে প্রণাম করে তীর বেগে চন্দ্রবতীর সিংহদ্বারের দিকে চলে যেত, সেইদিন দাসীর হাতে মহারাজা শিলাদিত্যের চিঠি পুষ্পবতীর কাছে আসত, পুষ্পবতী সেদিন সমস্ত কাজ ফেলে শূন্যের উপরে সেই বারাণ্ডায় মহারাজার চিঠি হাতে করে বসে থাকতেন; সেই আনন্দের দিনে যখন কোন বুড়ো জাঠ গান গেয়ে মাঠের দিকে যেতে যেতে, কোন রাখাল বালক, পাহাড়ের নীচে ছাগল চরাতে চরাতে, চন্দ্রাবতীর রাজকুমারীকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করত, তখন পুষ্পবতী কারো হাতে এক ছড়া পান্নার চিক, কারো হাতে বা এক গাছা সোনার মল ফেলে দিতেন। রাজকুমারীর প্রসাদ মাথায় ধরে হাজার হাজার আশীর্ব্বাদ করতে করতে সেই সকল রাজভক্ত প্রজা সকাল বেলায় কাযে যেত, সন্ধ্যাবেলায় সেই রাজদূত সেই কালো ঘোড়ার পিঠে বল্লম হাতে মহারাণী পুষ্পবতীর চিঠি নিয়ে বল্লভীপুরের দিকে ফিরে যেত। পুষ্পবতী নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় পাহাড়ে পাহাড়ে সেই কালো ঘোড়ার ক্ষুরের আওয়াজ অনেকক্ষণ ধরে শুনতে পেতেন; কখন বা কোন বুড়ো জাঠের মেঠো গান আর সেই সঙ্গে রাখাল বালকের মিষ্টি সুর সন্ধ্যার হাওয়ায় ভেসে আসত, তারপর বিন্ধ্যাচলের শিখরে বিন্ধ্যবাসিনী ভবানীর মন্দিরে সন্ধ্যাপূজার ঘোর ঘণ্টা বেজে উঠত, তখন পুষ্পবতী মহারাজের সেই চিঠি খোঁপায়

ভিতর লুকিয়ে রেখে প্যাটের সাড়ি প'রে দেবীর পূজায় বসতেন। মনে মনে বল্‌তেন, "হে মা চামুণ্ডে, হে মা ভবানী, মহারাজকে ভাল ভালয় যুদ্ধ থেকে ফিরিয়ে আন্‌। ভগবতী আমার যে ছেলে হবে সে যেন মহারাজেরই মত তেজস্বী হয় আর তাঁরই মত যেন নিজের রাণীকে খুব ভাল বাসে।" হায়, মানুষের সকল ইচ্ছা পূর্ণ হয় না—পুষ্পবতী রাজারই মত তেজস্বী ছেলে পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর মনে যে বড় সাধ ছিল—সেই শ্বেতপাথরের বারাণ্ডায় বসে মহারাজার মুখে যুদ্ধের গল্প শুনবেন,—তাঁর যে বড় সাধ ছিল—নিজের হাতে মহারাজের মাথায় হাওয়ার মত পাতলা সেই সুন্দর চাদর খানি জড়িয়ে দেবেন— সে সাধ কোথায় পূর্ণ হল? তাঁর সে মনের ইচ্ছা মনেই রইল, আর মহারাজের সঙ্গে দেখা হল না।

যেদিন বল্লভীপুরে শিলাদিত্য যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন, সেইদিন চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদে রাণী পুষ্পবতী মায়ের কাছে বসে সেই রূপার চাদরে ছুঁচের কায করছিলেন; কায প্রায় শেষ হয়েছিল, কেবল সূর্য্যমূর্ত্তির নীচে সোনার অক্ষরে শিলাদিত্যের নামটি লিখতে বাকি ছিল মাত্র। পুষ্পবতী যত্ন করে নিজের কালো চুলের চেয়ে মিহি আগুনের চেয়ে উজ্জ্বল একগাছি সোনার তার সরু হতেও সরু একটি সোনার ছুঁচে পরিয়ে একটি ফোঁড় দিয়েছেন মাত্র! আর চাঁপার কলির মত পুষ্পবতীর কচি আঙ্গুলে সেই সোনার ছুঁচ বোলতার হুলের মত বিঁধে গেল! যন্ত্রণায় পুষ্পবতীর চোখে জল এল; তিনি চেয়ে দেখলেন একটি ফোঁটা রক্ত জ্যোৎস্নার মত পরিষ্কার সেই রূপার চাদরে রাঙ্গা এক টুক্‌রো মণির মত ঝক্‌ ঝক্‌ করছে; পুষ্পবতী তাড়াতাড়ি নির্ম্মল জলে সেই রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলতে চেষ্টা করলেন; জলের ছিটে পেয়ে সেই এক বিন্দু রক্ত ক্রমশঃ ক্রমশঃ বড় হয়ে একটুখানি ফুলের গন্ধ যেমন সমস্ত হাওয়াকে গন্ধময় করে, তেমনি পাতলা ফুরফুরে চাদর

খানি রক্তময় করে ফেল্লে। সেই রক্তের দিকে চেয়ে পুষ্পবতীর প্রাণ কেঁপে উঠল; তিনি ছলছল চোখে মায়ের দিকে চেয়ে বল্লেন, "মা আমাকে বিদায় দাও, আমি বল্লভীপুরে ফিরে যাই, আমার প্রাণ কেমন করছে, বুঝিবা সেখানে কি সর্ব্বনাশ ঘটল?" রাজরাণী বল্লেন আর দুটাদিন থেকে যা, ছেলেটি হয়ে যাক্।" পুষ্পবতী বল্লেন, "না না, না মা?" সেইদিন সন্ধ্যাবেলা বল্লভীপুরের আশি জন রাজপুত বীর আর দুইটা উটের পিঠে নীল রেশমে মোড়া একখানি ছোট ডুলি বড় রাস্তা ধরে বল্লভীপুরের দিকে চলে গেল। চন্দ্রাবতীর রাজপ্রাসাদ শূন্য করে রাজকুমারী পুষ্পবতী বিদায় নিলেন।

চন্দ্রাবতী থেকে বল্লভীপুর যেতে হলে প্রকাণ্ড একটা মরুভূমি পার হতে হয়। মালিয়া পাহাড়ের নীচে বীরনগর পর্য্যন্ত চন্দ্রাবতীর পাকা রাস্তা, তারপর মরুভূমির উপর দিয়ে আগুণের মত বালি ভেঙ্গে, উটে চড়ে, বল্লভীপুর যেতে হয়, আর অন্য পথ নেই! পুষ্পবতী সেই পথের শেষে মরুভূমির সম্মুখে এসে শুনতে পেলেন, যে শিলাদিত্য আর নাই, বিধর্ম্মী ম্লেচ্ছ বল্লভীপুর ধ্বংস করেছে। পুষ্পবতীর চোখে এক ফোঁটা জল পড়ল না, তাঁর মুখে একটিও কথা সর্‌ল না, কেবল তাঁর বুকের ভিতরটা সম্মুখের সেই মরুভূমির মত ধূ ধূ কর্‌তে লাগ্‌ল। তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার হীরের গহনা গা থেকে খুলে বালির উপর ছড়িয়ে দিলেন, সিঁথের সিন্দুর মুছে ফেল্লেন, তারপর উদাস প্রাণে বিধবার বেশ ধরে শিলাদিত্যের আদরের মহিষি পুষ্পবতী সন্ন্যাসিনীর মত সেই মালিয়া পাহাড়ের প্রকাণ্ড গহ্বরে আশ্রয় নিলেন। মরুপারে দশমাস দশদিন পূর্ণ হলে সন্ন্যাসিনী রাণীর কোলে, অন্ধকার গুহায়, রাজপুত্রের জন্ম হল, নাম রইল গোহ। রাণী পুষ্পবতী সেই দিনই বীর নগর থেকে তাঁর ছেলেবেলার প্রিয়সখী ব্রাহ্মণী কমলাবতীকে ডেকে পাঠিয়ে, সেই আশি জন রাজপুত বীরের সম্মুখে তাঁর বড় সাধের রাজপুত্র

গোহকে সঁপে দিয়ে বল্লেন, "প্রিয়সখি, তোমার হাতে আমার গোহকে সঁপে দিলুম, তুমি মায়ের মত একে মানুষ করো; তোমায় আর কি বলব ভাই, দেখো রাজপুত্রকে কেউনা অযত্ন করে; আর ভাই যখন চিতার আগুণে আমার এই দেহ ছাই হয়ে যাবে, তখন আমার সেই একমুঠ ছাই কার্ত্তিক পূর্ণিমায় কাশীর ঘাটে গঙ্গাজলে ঢেলে দিও। যেন আমাকে জন্মান্তরে আর না বিধবা হতে হয়।" ঝর ঝর করে কমলাবতীর চোখে জল পড়তে লাগল।

সেইদিন সন্ধ্যাবেলা সেই আশিজন রাজভক্ত রাজপুত চন্দনের কাঠে চিতা জ্বলিয়ে চারিদিক ঘিরে দাঁড়াল, শিলাদিত্যর মহিষি রাজপুত রাণী সন্ন্যাসিনী সতী পুষ্পবতী হাসিমুখে জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিলেন। দেখ্তে দেখ্তে ফুলের মত সুন্দর পুষ্পবতীর কোমল শরীর পুড়ে ছাই হল। চারিদিকে রব উঠল—'জয় মহারাণীর জয়, জয় সতীর জয়।" কমলাবতী ঘুমন্ত গোহকে এক কোলে আর সেই ছাই মুঠো এক হাতে নিয়ে চক্ষের জল মুছতে মুছতে বীরনগরে ফিরে গেলেন; সঙ্গে সঙ্গে সেই আশিজন রাজপুতবীর রাজপুত্রকে ঘিরে সেইদিন থেকে বীরনগরে বাসা নিলেন।

চন্দ্রাবতীর রাজারাণী অনেকবার গোহকে চন্দ্রাবতীতে নিয়ে যেতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু বল্লভীপুরের তেজস্বী সেই রাজপুত বীরের দল গোহকে কিছুতেই ছেড়ে দেন নাই। তাঁরা বল্তেন—"আমাদের মহারাণী আমাদের হাতে রাজপুত্রকে সঁপে গেছেন, আমরাই তাঁকে পালন করব। বল্লভীপুরের রাজকুমার বল্লভীপুরের রাজপুতেদের রাজা হয়ে এই মরুভূমিতেই থাকুন। এই তাঁর রাজপ্রাসাদ।"

গোহ সেই বীরনগরে কমলাবতীর ঘরে মানুষ হতে লাগলেন। কমলাবতী গোহকে ব্রাহ্মণের ছেলের মত নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত করতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু বীরের সন্তান গোহের লেখাপড়া পছন্দ হলনা,

তিনি বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, কোন দিন ভীলেদের সঙ্গে ভীল বালকের মত, কেন দিন বা সেই রাজপুত বীরদের সঙ্গে রাজার মত, কথন ঘোড়ায় চড়ে মরুভূমির উপর সিংহ শিকার করে, কথন বা জাল ঘাড়ে বনে বনে হরিণের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। মালিয়া পাহাড়ের নীচে বীরনগর। সেখানে যত শিষ্ট শান্ত নিরীহ ব্রাহ্মণের বাস, আর পাহাড়ের উপরে যেখানে বাঘ ডেকে বেড়ায়, হরিণ চরে বেড়ায়, যেখানে অন্ধকারে সাপের গর্জ্জন, দিবারাত্রি ঝরণার ঝর্ঝর, আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ফুলের গন্ধ, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বনের ছায়া, সেখানে সেই সকল অন্ধকার বনে বনে—ভীলরাজ মাণ্ডলিক সাপের মত কালো, বাঘের মত জোয়াল, সিংহের মত তেজস্বী, অথচ ছোট একটি ছেলের মত সত্যবাদী বিশ্বাসী, সরলপ্রাণ ভীলের দল নিয়ে রাজত্ব করতেন। গোহ একদিন সেই সকল ভীল-বালকদের সঙ্গে ভীল রাজত্বে ঘোড়ায় চড়ে উপস্থিত হলেন। সেখানে বল্লম হাতে বাঘের ছালপরা হাজার হাজার ভীল-বালক ঘোড়ায় চড়া সেই রাজপুত রাজকুমারকে ঘিরে "আমাদের রাজা এসেছেরে—রাজা এসেছেরে" বলে মাদোল বাজিয়ে নাচতে নাচতে ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্রমে সেই ছেলের পাল গোহকে নিয়ে রাজবাড়িতে উপস্থিত হল। তখন খোড়ো চালের রাজবাড়ি থেকে ভীলদের রাজা বুড়ো মাণ্ডলিক বেরিয়ে এসে বল্লেন—"আরে কোথায়রে তোদের নতুন রাজা?" ছেলের পাল গোহকে দেখিয়ে দিলে। তখন সেই বুড়ো ভীল গোহকে অনেকক্ষণ দেখে বল্লেন, "ভালরে ভাল; নতুন রাজার কপালে তিলক লিখেদে।" তখন একজন ভীল বালক নিজের আঙ্গুল কেটে বুড়ো রাজা মাণ্ডলিকের সামনে রক্তের ফোঁটা দিয়ে গোহের কপালে রাজতিলক টেনে দিলে; ভীলদের নিয়মে সে রক্তের তিলক মুছে দেয় এমন সাধ্য কারো নাই। গোহ সত্য সত্যই রাজা হয়ে ভীলদের রাজসভায় বুড়ো রাজার কাঠের রাজসিংহাসনের

ঠিক নীচে একখানি ছোট পিঁড়ির উপর বসলেন। এই পিঁড়িখানি অনেকদিন শূন্য পড়ে ছিল, কারণ মাণ্ডলিক চিরদিন নিঃসন্তান; তাঁর, দীনদুঃখী সামান্য প্রজা তাদের ঘর আলো করা কালো বাঘের মত কালো ছেলে। কিন্তু হায় রাজার ঘর চিরদিন অন্ধকার, চিরকাল শূন্য ছিল। সেদিন যখন সমস্ত ভীলদের মধ্যস্থলে, রক্তের তিলক পোরে গোহ যুবরাজ হয়ে পিঁড়েয় বসলেন, তখন বুড়া মাণ্ডলিকের দুই চক্ষু সেই সুন্দর রাজকুমারের দিকে চেয়ে আনন্দে ভেসে গেল। ভীলরাজের এক ছোট ভাই ছিলেন। দশবৎসর আগে একদিন কি জানি কি নিয়ে দুই ভায়ে খুব ঝগড়া হয়েছিল, সেই থেকে দুই ভায়ে বিচ্ছেদ, দেখা শোনা পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল। গোহ যুবরাজ হবার দিন মাণ্ডলিকের ছোট ভাই হিমালয় পর্ব্বত থেকে ভীল রাজত্বে হঠাৎ ফিরে এলেন; এসে দেখলেন রাজপুত্রের ছেলে যুবরাজের আসন জুড়ে বসেছে! রাগে তাঁর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল, তিনি রাজসভার মাঝে মাণ্ডলিককে ডেকে বল্লেন, "এরে ভাইয়া বুড়া হয়ে তুই কি পাগল হয়েচিস্! বাপের রাজ্যি ছেলেতে পাবে, তোর ছেলে হলনা, তোর পরে আমি রাজা, রাজপুতের ছেলেকে পিঁড়ায় বসালি কি বলে?" মাণ্ডলিক বল্লেন, "ভাইজি ঠাণ্ডা হ"। ভাই-রাজ বল্লেন "ঠাণ্ডা হব যেদিন তোরে আগুনে পোড়াব," এই বলে মাণ্ডলিকের ভাইজি রাগে ফুলতে ফুলতে রাজসভা থেকে বেরিয়ে গেলেন; মাণ্ডলিক বল্লেন "দূর হ, আজ হতে তুই আমার শত্রু হলি।" তারপর সোজা হয়ে সিংহাসনে বসে গোহকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সমস্ত ভীল সর্দ্দারদের ডেকে গোহের কপালে হাত দিয়ে শপথ করালেন যেন—সেইদিন থেকে সমস্ত ভাল মন্দে, বিপদে আপদে, সুখে দুঃখে, গোহকে রক্ষা করে—গোহের শত্রু যেন তাদেরও শত্রু হয়। তারপর রাজসভা ভঙ্গ হল। অনেক আমোদ আহ্লাদ করে গোহ বীরনগরে ফিরে গেলেন। সেইদিন কি ভেবে গভীর রাত্রে ভীলরাজ মাণ্ডলিক

গোহের কাছে চুপি চুপি গিয়ে বল্লেন "গোহ, আমি তোকে ছেলের মত ভালবাসি, তোকে আমি রাজা করেছি, তোর ছুরিখানা আমায় দে, আমি নিজের হাতে তোর শত্রুকেও মেরে আসব।" গোহ কোমর থেকে নিজের নামলেখা ধারাল ছুরি খুলে দিলেন। ভীলরাজ সেই ছুরি হাতে বেরিয়ে পড়লেন; পাহাড়ের গায়ে তখন জোনাকি জ্বলছে, ঝিঁঝি ডাকছে, দূরে দূরে দু একটা বাঘের গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। মাণ্ডলিক সেই ছুরি হাতে রাত দুপুরে ভাই রাজার দরজায় ঘা দিলেন —কারো সাড়া শব্দ নাই। ভীলরাজ ধীরে ধীরে ভাইয়ার ঘরে প্রবেশ করলেন, দেখলেন তাঁর ছোটভাই সামান্য ভীলের মত মাটির উপরে এক হাতে মুখ ঢেকে পড়ে আছেন। ভীলরাজের প্রাণে যেন হঠাৎ ঘা লাগল, তিনি কালো পাথরের পুতুলটির মত ছোট ভাইয়ের সুন্দর শরীর মাটির উপর পড়ে থাকতে দেখে, আর চোখের জল রাখতে পারলেন না। মনে মনে ভাবলেন—আমি কি নিষ্ঠুর? হায় ছোট ভাইয়ের রাজ্য পরকে দিয়েছি, আবার কিনা শত্রু ভেবে ঘুমন্ত ভাইকে মারতে এসেছি! তিনি গোহের ছুরি দূরে ফেলে, কুড়ি বৎসরের সেই ভীলরাজকুমারের মাথার শিয়রে বসে ডাকলেন—ভাইয়া—। একবার ডাকলেন, দুইবার ডাকলেন, তারপর মুখের কাছে থেকে তার নিটোল হাতখানি সরিয়ে নিয়ে ডাকলেন—ভাইয়া—কোনই উত্তর পেলেন না; তখন বুড়ো রাজা ছোট ভাইয়ের মুখের কাছে মুখ রেখে তার কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুলে হাত বুলিয়ে বল্লেন, "ভাইয়া, রাগ করেছিস্? ভাইয়া আমার সঙ্গে কথা কইবিনে ভাইয়া? আমি তোর জন্যে হিমালয়ের আধখানা জয় করে রেখেছি, সেইখানে তোকে রাজা করব, তুই উঠে বোস্ কথা ক? ওরে ভাই কেন তুই এই দশ বছর আমায় ছেড়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়ালি! কেন আমার কাছে কাছে চোখে চোখে রইলিনে ভাই? আমি সাধকরে কি রাজপুতের ছেলেকে

ভাল বেসেছি! তুই ছেড়ে গেলে আমার যে আর কেউ ছিল না—সে সময়ে গোহ যে আমার শূন্য ঘর আলো করেছিল। ভাই ওঠ, আমি তোর রাজত্ব কেড়ে নিয়েছি, আবার তোকে শত্রু বলে মারতে এসেছি; এই নে এই ছুরিখানা, আমার বুকে বসিয়ে দে, সব গোল মিটে যাক?" মাণ্ডলিক ভাইয়ের হাতে ছুরিখানা জোর করে গুঁজে দিলেন; ধারাল ছুরি ভাই-রাজের মুঠ থেকে খসে পড়ল; বুড়ো দাদা চম্‌কে উঠলেন—ছোট ভাইয়ের গাটা যেন বড়ই ঠাণ্ডা বোধ হল—কান্‌পেতে শুনলেন—নিশ্বাসের শব্দ নাই—তিনি ভাইয়া ভাইয়া বলে চিৎকার করে উঠলেন; তাঁর সমস্ত রাগ মাটির উপর মরা ভাইকে ছেড়ে, রাজসিংহাসনে গোহের উপর গিয়ে পড়ল। গোহ যদি না থাকত তবে তো আজ দশ বৎসর পরে তিনি ছোট ভাইটিকে বুকে ফিরে পেতেন, তবে কি আজ ভীলরাজকুমার রাজ্য-হারা হয়ে রাগে দুঃখে বুক ফেটে মারা পড়ত? মাণ্ডলিক অনেকক্ষণ ধরে ছোট ভাইটির বুকে হাত বুলিয়ে দিলেন। কিন্তু হায় খাঁচা ফেলে পাখি যেমন উড়ে যায় তেমনি সেই ভালবালকের সুন্দর শরীর শূন্য করে প্রাণপাখী অনেকক্ষণ উড়ে গেছে। মাণ্ডলিক আর সে ঘরে বসে থাকতে পারলেন না, ছুরি হাতে সদর দরজা খুলে বাহিরে দাঁড়ালেন, তাঁর প্রাণ যেন কেঁদে কেঁদে বলতে লাগল—গোহরে তুই কি করলি? আমার রাজ্য নিলি, রাজসিংহাসন নিলি, ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ ঘটালি, গোহ তুইও কি শেষে আমার শত্রু হলি? হঠাৎ সেই পাহাড়ে রাস্তা দিয়ে দুটি ভীলের মেয়ে গলা ধরাধরি করে চলে গেল; একজন বলে গেল "আহা কি সুন্দর রাজা দেখেছিস্ ভাই! আর একজন বল্লে "নতুন রাজা যখন আমার হাত ধরে নাচতে লেগেছিল তখন তার মুখ খানা যেন চাঁদপারা দেখলুম"। মাণ্ডলিক নিশ্বাস ফেলে ভাবলেন—হায় এরি মধ্যে আমার প্রজারা বুড়ো রাজাটাকে ছেঁড়া কাপড়ের মত ছেড়ে

ফেলেছে—ভীলরাজের মনে হল যেন পৃথিবীতে তাঁর আর কেউ নাই, তিনি শূন্য মনে পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদখানার দিকে চেয়ে রইলেন; সেই সময় কালো ঘোড়ায় চড়ে দুইজন রাজপুত ভীলরাজের সামনে দিয়ে চলে গেল; একজন বল্লে "ভাই রাজকুমার আজ শুভ-দিনে ভীল-রাজত্বের রাজসিংহাসনে না বসে সকলের সামনে যুবরাজের আসনে বসে রইলেন কেন?" অন্যজন বল্লে "গোহ প্রতিজ্ঞা করেছেন যতদিন বুড়ো রাজা বেঁচে থাকবেন, ততদিন তিনি যুবরাজের মত তাঁর পায়ের কাছে বসবেন।" মাণ্ডলিকের প্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হল, তিনি হাসি মুখে মনে মনে বল্লেন—"ধন্য গোহ, ধন্য তার ভালবাসা"—হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার নিশ্বাসের শব্দ শোনা গেল; মাণ্ডলিক ফিরে দেখলেন, ছোট ভাইয়ের প্রকাণ্ড শিকারী কুকুরটা নিঃশব্দে অন্ধকারে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলছে! বুক যেন তাঁর ফেটে গেল, তিনি—ভাইরে বলে পাহাড়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লেন; পাথরের গায়ে লেগে গোহের সেই ছুরি শিকারী কুকুরের দাঁতের মত ভীলরাজের বুকে সজোরে বিঁধে গেল; পাহাড়ে পাহাড়ে শেয়ালের পাল চীৎকার করে উঠল হায় হায়, হায় হায় হায়, হায় হায় হায়। পরদিন সকালে একজন রাজপুত পাহাড়ের পথে বীরনগরে যেতে যেতে এক জায়গায় দেখতে পেলেন—ভীলরাজের রক্তমাখা দেহ, বুকে মহারাজ গোহের ছুরি বেঁধা—রাজপুত সেই ছুরি হাতে গোহের কাছে এসে বল্লেন "মহারাজ করেছ কি? আশ্রয়দাতা চিরবিশ্বাসী ভিলরাজকে খুন করেছ?" তিনি তৎক্ষণাৎ সেই রাজপুতের মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিলেন, তারপর সেই রক্তমাখা ছুরি কোমরে গুঁজে দুই হাতে চক্ষের জল মুছে ভাইরাজার সঙ্গে প্রাণের চেয়ে প্রিয় মাণ্ডলিককে চিতার আগুনে তুলে দিয়ে সূর্য্যবংশের রাজপুত্র গোহ ভীলরাজের রাজসিংহাসনে বসে রাজত্ব করতে লাগলেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯০১ সালের সেন্সস রিপোর্ট।

গত ১৯০১ সালের ১লা মার্চ্চ তারিখে ভারতের সর্ব্বত্র সেন্স গৃহীত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশের সেন্সসের কর্ত্তৃত্বভার গে সাহেবের উপর দেওয়া হইয়াছিল। তিনি প্রায় দুই বৎসর পরিশ্র করিয়া অতি সুন্দর রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার সারাং আমরা পাঠককে উপহার দিব। এই সেন্সসের সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে ৩ লক্ষ নব্বই হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সেন্সসে ৭ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছিল। সর্ব্বসমেত বাঙ্গালা দেশে ৪ বার সেন্সস গৃহীত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সেন্সসে বাঙ্গালা প্রদেশের লোকসংখ্যা—

ইংরাজ শাসনাধীন দেশে	... ...	৭৪৭৪৪৮৬৬
দেশীয় রাজাদিগের শাসনাধীন দেশে	...	৩৭৪৮৫৪৪
	মোট—	৭৮৪৯৩৪১০

ধর্ম্ম।—বাঙ্গালা দেশে নিম্নলিখিত কয়েক প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী লোক দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) হিন্দু, (২) মুসলমান, (৩) খৃষ্টান, (৪) জড়োপাসক প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায়।

সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেরাই নানা জাতি বা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। বর্ত্তমান প্রবন্ধে কেবল হিন্দুদের বিষয় আলোচিত হইবে।

উপাস্য দেবতার নাম অনুসারে হিন্দুগণ ৫টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা— শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্য ও শৈব। ইহার মধ্যে সৌর ও গাণপত্য প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। শৈবের সংখ্যাও অল্প। শাক্ত ও

বৈষ্ণবের সংখ্যাই অত্যন্ত অধিক। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতির মধ্যে প্রায় সকলেই শাক্ত। নবশাখ, সুবর্ণবণিক, কৈবর্ত্ত, চণ্ডাল প্রভৃতির মধ্যে বৈষ্ণবই অধিক। টিপ্রা জাতীয় লোক কোঁচ ও মেচেরা প্রায়ই শাক্ত। পূর্ব্ব ও উত্তর বাঙ্গালায় শাক্তের সংখ্যা অধিক। পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালায় বৈষ্ণবের সংখ্যা অধিক। এ দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচলন বাহুল্যের কারণ এই যে চৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান শিষ্যেরা সকলেই এই দেশের লোক, এবং তাঁহারা এই দেশেই ধর্ম্মমতের প্রচার করিয়াছেন। চৈতন্য সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের গুরুবংশ মধ্যে নিত্যানন্দ, অদ্বৈত রঘুনন্দন ঠাকুরের বংশীয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানিত। চৈতন্য সম্প্রদায় ব্যতীত বৈষ্ণবদের মধ্যে কর্ত্তাভজা, শিব-নারায়ণী, পাঁচপীরিয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আছে।

বিবাহ।

হিন্দুদিগের বিবাহ একটা চুক্তিমাত্র নহে, ইহার সংস্কার প্রত্যেক লোকেরই পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য শ্রাদ্ধাধিকারী পুত্র উৎপাদন করা আবশ্যক। "পুত্রার্থঃ ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ।" কন্যার পিতারও কন্যাকে পাত্রস্থ না করিলে পাপ হয়। পরাশর বলেন, কন্যার বিবাহ ৮।৯ বৎসরের মধ্যে দেওয়া কর্ত্তব্য। বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা ঋতুমতী হইলে পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরকে গমন করেন। সাধারণতঃ হিন্দুমাত্রেই রজোদর্শনের পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। কেবল রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণেরা কুলীন পাত্র না পাইলে কন্যাকে অনেক বয়স পর্য্যন্ত এমন কি কোন কোন স্থলে মৃত্যু পর্য্যন্তও অবিবাহিত রাখিয়া থাকেন। পুরুষের পক্ষে বিবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট বয়স নাই। তবে মনুর লেখার ভঙ্গীতে বোধ হয় যে পুরুষের পক্ষে ২৪ বৎসরের পূর্ব্বে বিবাহ করা কর্ত্তব্য নয়।

বিধবা-বিবাহ।—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, নবশাখাদির মধ্যে কোন দিন বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। চণ্ডাল জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। এখন তাঁহারা উহ ত্যাগ করিয়াছেন। রাজবংশীরাও ঐ প্রথা ত্যাগ করিতেছেন। বাগ্দী, বাউরী ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এখনও বিধবাবিবাহ চলিত আছে। বিধবা-বিবাহের নাম 'সাঙ্গা', ইহা যে যে জাতির মধ্যে মধ্যে চলিত আছে তাহাদের মধ্যে মৃতস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করাই সর্ব্বোত্তম কল্প বলিয়া গণ্য হয়। কনিষ্ঠ দেবর না থাকিলে অথবা বিবাহ করিতে অসম্মত হইলে, বিধবা সজাতীয় অপর যে কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারেন। 'সাঙ্গা' করিতে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক হয় না। সজাতীয় কয়েকজন প্রধান প্রধান লোকের সাক্ষাতে মালা বদল ও নববধূর কপালে সিন্দুর লেপন করিলেই হইল। দেবরের সহিত 'সাঙ্গা' হইলে কন্যাপণ দিতে হয় না। দেবরের বাড়ীতেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। অন্য কাহারও সহিত 'সাঙ্গা' হইলে বিধবার পিতার বাড়ীতে বসিয়া হয়, এবং সমাজের নিয়ম অনুসারে পণও দিতে হয়।

বহুবিবাহ।—একটি পত্নী লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করাই সাধারণতঃ বাঙ্গালীর রীতি। তবে প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা বা অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হইলে, সাধারণতঃ দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের আবশ্যকতা হয়। কোন কোন জাতিতে এরূপ স্থলেও দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণার্থ জাতীয় পঞ্চায়তের অনুমতি লইতে হয়। সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার, ছোট নাগপুর, উড়িষ্যায় যেখানে বিবাহিত পুরুষের সংখ্যা ১০০০, সেখানে বিবাহিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৯৮৬। পাঠক মনে করিবেন না যে বাঙ্গালা দেশে পাণ্ডবদের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। এই সংখ্যা বৈষম্যের কারণ এই যে, পশ্চিমাঞ্চলের অনেক বিবাহিত পুরুষ কর্ম্মউপলক্ষে বাঙ্গালা দেশে বাস করেন, তাঁহাদের স্ত্রী দেশেই আছেন।

পণ।—আমরা আজকাল বর-পণের বিরুদ্ধে যথেষ্ট আন্দোলন শুনিতে পাই। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে কন্যাপণের প্রথাও চলিত আছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে শ্রোত্রিয়দিগকে ও কায়স্থদিগের মধ্যে বাহাত্তরে মৌলিকদিগকে এবং অনেক নিম্নজাতায় লোককে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। তবে কন্যাপণের ভার ক্রমেই বাড়িতেছে। বিবাহের পর কন্যাকে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া পতিগৃহে যাইতে হয়, এজন্য কন্যাপণ গ্রহণ প্রথা সাধারণতঃ কন্যাবিক্রয় বলিয়া সমাজে নিন্দিত। বিদ্যাবুদ্ধি ও ধন অধিক থাকিলে বরের পণের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আবার বয়স ও শারীরিক সৌন্দর্য্যের জন্য কন্যার মূল্য বাড়িয়া থাকে।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ।—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কৌলীন্যের নিয়ম বড়ই গোল-মেলে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা মহারাজ বল্লালসেন কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছে। তৎপরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের কুলীনেরা দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক ৩২টি মেলে বিভক্ত হইয়াছেন। এক মেলের কুলীন অপর মেলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে পারেন না। শ্রোত্রিয়েরা সকল কুলীনকেই কন্যাদান করিতে পারেন। কুলীনেরা কুলচ্যুত হইলে ভঙ্গ নাম পান। কয়েক পুরুষ পরে তাঁহাদের বংশজ নাম হয়। কুলীনরা কুলীন কিম্বা শ্রোত্রিয়ের নিকট হইতে কন্যা গ্রহণ সময়ে বরপণ বলিয়া অনেক অর্থ করিয়া থাকেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।—ইহাঁদের সামাজিক নিয়ম প্রায় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের ন্যায়, তবে ইহাদের কৌলীন্যের নিয়ম ততটা গোলমেলে নয়। রাঢ়ীয়েরা যাহাকে বংশজ বলেন, ইহাঁরা তাহাকে কাপ বলেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণ।—বৈদিক ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য এই দুই সমাজে বিভক্ত। ইহাঁদের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য নাই। পূর্ব্বে ইহাঁদের বিবাহে কোনরূপ পণ আদান প্রদানের নিয়ম ছিল না। কিন্তু এখন একটু একটু করিয়া হইতেছে।

বৈদ্য।—ইহাঁরা চার সমাজে বিভক্ত। পঞ্চকোটী, রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ। ইহাদের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা আছে। ইহাঁদের বিবাহের নিয়ম অনেকটা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ন্যায়।

কায়স্থ।—ইহারা প্রধানতঃ চার সমাজে বিভক্ত। উত্তর রাঢ়ীয়, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও বঙ্গজ। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ সমাজে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা আছে। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কৌলীন্য মর্য্যাদা অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা অধিক। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলীনের কন্যা প্রথম বিবাহ করিতে হয়। তিনি দ্বিতীয়বার মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন, এবং অনেক সময় করিয়াও থাকেন। কুলীনের অন্যান্য পুত্রেরা কুলীন কিংবা মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। সাধারণতঃ তাঁহারা মৌলিকের কন্যাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাঁদের মধ্যে ধনী মৌলিকদের মধ্যে একটি নিয়ম চলিত আছে। তাহা এই—মৌলিক স্বয়ং কুলীন হইতে পারেন না। সুতরাং তাঁহাদের চেষ্টা যে তাঁহাদের দৌহিত্র কি উপায়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুলীন হইতে পারেন। সেইজন্য তাঁহাদের কোন কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত নিজের কন্যার বিবাহ সুস্থির করিয়া তাহাকে কোন কুলীনের শিশুকন্যা বিবাহ করিতে হয়। চার মাসের শিশুকুলীন কন্যারও বিবাহ হইয়াছে এরূপ শুনা যায়। তৎপরে তিনি পূর্ব্বোক্ত মৌলিকের বয়স্থা কন্যাকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ইহাতে প্রথমেই মৌলিক কন্যার সন্তান হইবার সম্ভাবনা। সুতরাং সেই সন্তানই কুলীনের জ্যেষ্ঠপুত্র হইলেন। এই প্রথার নাম আগুরস।

বঙ্গজ কুলীনেরা কুলীন কিম্বা মৌলিকের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন। তাহাতে বাধা নাই। ইহারা বিবাহে কন্যার পিতার নিকট হইতে পণ আদায় করিয়া থাকেন।

নবশাখ। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা ধনী ও বিদ্বান তাঁহারা টাকা

দিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়া সম্মানজনক বিবেচনা করেন। কিন্তু কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করাই এই সকল জাতীর সাধারণ নিয়ম।

গোয়ালা, কৈবর্ত্ত, রাজবংশী, চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিকে কন্যাপণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। সজাতীয় জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা অনুসারে এই পণের মূল্য স্থির হয়। যেমন কৈবর্ত্ত ও গোয়ালার মধ্যে ৫০৲ হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত এবং পোদ ও চণ্ডালের মধ্যে ১৫৲।২০৲ হইতে ১০০৲।১২০৲ টাকা পর্য্যন্ত পণ শুনা যায়।

মেচ, কৈবর্ত্ত, সাঁওতাল, কোঁচ প্রভৃতি জাতির মধ্যে যাঁহারা দারিদ্র্য নিবন্ধন অর্থসংগ্রহ বিবাহ করিতে পারেন না, তাঁহারা অনেক সময়ে বিবাহ করিয়া শ্বশুর বাড়ীতে ঘরজামাই রূপে থাকেন এবং পরিশ্রম দ্বারা শ্বশুরের কার্য্যের সাহার্য্য করেন। ঐ পরিশ্রমের বেতনই পণ বলিয়া গণ্য হয়। তাঁহাকে বেতন দেওয়া হয় না, কেবল খাওয়া পরা দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পরে ঐ জামাতা শ্বশুরের নিকট হইতে সামান্য কিছু অর্থ লইয়া সস্ত্রীক পৃথক বাস করেন। সমাজে এইরূপ বিবাহে নিন্দা আছে।

উত্তর বাঙ্গালায় আর একটি রীতি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা টাকা দিয়া কুমারী বিবাহ করিতে না পারেন, বিধবা-বিবাহ সমাজে প্রচলিত থাকিলে তাঁহারা অনেক সময়ে বিধবাবিবাহ করেন। যদি ঐ জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকে, তবে তাঁহারা বৈষ্ণব হইয়া মালাচন্দন বদল করিয়া বিবাহ করিয়া থাকেন।

বিবাহ সম্বন্ধে অন্য অদ্ভুত রীতি।

কাহারও কাহারও এরূপ বিশ্বাস আছে যে বিবাহ হইলে অকাল-মৃত্যু হয় না। এজন্য ঐ সকল লোকে অতিশিশু পুত্রকন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। যাঁহাদের পুত্রকন্যা শৈশব অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছে,

তাঁহারা অনেক সময় তৎপরজাত পুত্র কন্যার ঐ বয়স প্রাপ্তির পূর্ব্বেই বিবাহ দিয়া থাকেন। "তিন" এই সংখ্যাটি অমঙ্গলজনক। এইজন্য কেহ কেহ তিন বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই শিশুর বিবাহ দিয়া থাকেন। তিন সংখ্যাটি অমঙ্গলজনক বলিয়া তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে বর কোন ফুলগাছ বা অন্য কোন ছোট গাছ, কোন কোন স্থানে পায়রা বা অন্য কোন পাখী বিবাহ করিয়া তৎপরে একটি মানুষীকে পত্নীত্বে বরণ করেন।

রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কুলীনকে কন্যাদান করা অত্যাবশ্যক। উহা না করিলে কৌলীন্যে দোষস্পর্শ হয়। সুতরাং যাঁহার কন্যা নাই, তিনি কোন কুলীনকে কুশময়ী কন্যাদান করিয়া থাকেন। অথবা "আমার কন্যা হইলে কুলীনকে কন্যাদান করিতাম"—ঘটকের সম্মুখে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করেন।

আঙ্গিক ও মানসিক বৈকল্য।

উন্মাদ।—বাঙ্গালাদেশে পাগলের সংখ্যা শতকরা ১০ জন হ্রাস পাইয়াছে। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে পাগলের সংখ্যা বেশী। ইহার কারণ বোধ হয় স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে মদ, গাঁজা প্রভৃতি নেশার চলন না থাকা। অবরোধ প্রথা থাকার দরুন স্ত্রীলোকদিগকে সংসার প্রতিপালনার্থ পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জন করিতে হয় না। রংপুর, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহারেই পাগলের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরেই চট্টগ্রাম। এই সকল জেলাতে পবন দেবের এত অনুগ্রহের কারণ কি বুঝিতে পারা যায় না। কোঁচ জাতির মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা পাগলের সংখ্যা অধিক। শিশু ও বৃদ্ধদিগের মধ্যে উন্মাদরোগীর সংখ্যা কম —যুবকের মধ্যেই বেশী। বাঙ্গালা দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে পাগলের সংখ্যা ১৩ গুণ অধিক। অত্যাধিক মাদক সেবনই বোধ হয় ইহার কারণ।

বধির। এ সম্বন্ধেও উত্তর বাঙ্গালা অগ্রগণ্য। দার্জ্জিলিং, কুচবিহার, পূর্ণিয়া, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, রংপুর ও পাবনাতেই বধিরের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। ১৯০১ সালের সেন্সস রিপোর্টে দেখা যায় যে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে বধিরের সংখ্যা ৫৩১৫৪। ইহার মধ্যে আবার ৬৬৬ জন পাগল। পূর্ব্ব সেন্সস অপেক্ষা এবারে বধিরের সংখ্যা শতকরা ২৪ জন কম।

অন্ধ। অন্ধের সংখ্যা ঈষৎ কমিয়াছে। ৫০ বৎসর অপেক্ষা অল্প-বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে অন্ধের সংখ্যা বর্ত্তমান সেন্সসে ২২৮২৩। ঐ বয়সের স্ত্রীলোকের মধ্যে ১৬১৪১ জন অন্ধ। তাহা অপেক্ষা অধিক বয়সের অন্ধ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ১৪৬৬০ এবং ১৭২৩৫।

কুষ্ঠ। কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা কিছু কমিয়াছে। মানভূম, সাঁওতাল পরগণা, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান প্রভৃতি পশ্চিম বাঙ্গালা জেলাতেই কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব অধিক। পূর্ব্ব ও মধ্য বাঙ্গালায় অতি অল্প। স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের মধ্যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা তিন গুণ অধিক। ১০ বৎসরের অপেক্ষা অল্প বয়স্ক লোকের মধ্যে কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব ১০ বৎসরের পর ৬০ বৎসরের ইহার প্রকোপ অধিক। তৎপরে আবার কম।

শিক্ষা।

নিম্নলিখিত বিবরণীতে "শিক্ষিত" অর্থ যাহারা অন্ততঃ একটি ভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারে। এই হিসাবে দেখা যায় যে সমগ্র বাঙ্গালা দেশে শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যা ৪০৯৭৫৭৪। শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ২০৯৯০০। শিক্ষা বিষয়ে খৃষ্টানগণ অগ্রগণ্য। ইহার প্রথম কারণ বঙ্গপ্রবাসী অনেক ইয়োরোপীয় এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। দ্বিতীয় কারণ খৃষ্টান পাদ্রীগণ দেশীয় খৃষ্টানদের মধ্যে শিক্ষবিস্তারে জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকেন।

কলিকাতা রাজধানী এবং তাহার চতুপার্শ্ববর্ত্তী স্থানেই শিক্ষার বিস্তার অধিক। কলিকাতা সহরে প্রতি ৩ জন পুরুষের মধ্যে ১ জন, শিক্ষিত। হাওড়া, মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, ও হুগলি প্রভৃতি জেলায় ৫ জনের মধ্যে একজন শিক্ষিত। পশ্চিম বাঙ্গালার অন্যান্য জেলাও বেশ উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু নদীয়া, মুরসিদাবাদ, এবং যশোর যদিও রাজধানীর নিকটবর্ত্তী তথাপি ঐ সকল স্থানে শিক্ষার বিস্তার আশানুরূপ হয় নাই। বাখরগঞ্জে ৭ জনের মধ্যে একজন পুরুষ শিক্ষিত। খুলনা, ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলায় ৮ জনের মধ্যে ১ জন শিক্ষিত। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণায় অনেক শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস। তথাপি ঢাকা জেলায় শিক্ষার বিস্তার কম, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।

স্ত্রী-শিক্ষা।

স্ত্রীশিক্ষার বিস্তার বাঙ্গালা দেশে আরও অল্প। কলিকাতায় অনেক শিক্ষিত স্ত্রীলোক আছেন। কলিকাতায় প্রতি ৯ জনের মধ্যে ১ জনের অধিক স্ত্রীলোক শিক্ষিত। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে হওড়া, হুগলি, দারজিলিং ও চব্বিশ পরগণা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল স্থানে ৭০ জনের মধ্যে একজন স্ত্রীলোক শিক্ষিত। ইহার পর ঢাকা। তথায় ১০০ জনের মধ্যে ১ জন শিক্ষিত।

শিক্ষার বৃদ্ধি।

সমগ্র বাঙ্গালা দেশে গত ১০ বৎসরে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা পুরুষের মধ্যে শতকরা ১৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছে। মধ্য-বাঙ্গালায় শতকরা ২২ জন ও পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় শতকরা ১২ জন বাড়িয়াছে। পশ্চিম-বাঙ্গালা মধ্য আসন পাইয়াছে।

পুরুষদিগের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার অধিক না হইলেও স্ত্রীশিক্ষা বেশ বাড়িয়াছে। এবিষয়ে উত্তর বাঙ্গালাই অগ্রগণ্য। সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ৬৩ জন বাড়িয়াছে।

ইংরাজী শিক্ষা।

সমগ্র বাঙ্গালা দেশে প্রতি দশ হাজার পুরুষের মধ্যে ৮৯ জন। এবং প্রতি দশ হাজার স্ত্রীলোকের মধ্যে ৬ জন ইংরাজী জানেন। কলিকাতা সহরে বহু ইংরাজের এবং বহু শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাস বলিয়া কলিকাতায় প্রতি দশ হাজার পুরুষের মধ্যে ১৩২৩ জন এবং প্রতি দশ হাজার স্ত্রালোকের মধ্যে ৪৫৫ জন ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ। ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে কলিকাতাব পর যথাক্রমে হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা, বর্দ্ধমান, নদীয়া এবং ঢাকার আসন। সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধেও এই সকল জেলাই অগ্রগণ্য। এই সকল জেলার অধিবাসীর মধ্যেই বাঙ্গালী অফিসার, উকীল প্রভৃতির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক।

বাঙ্গালীদিগের মধ্যে শিক্ষায় সকল বিষয়ে বৈদ্যজাতি অগ্রগণ্য। বৈদ্য পুরুষের মধ্যে হাজার করা ৬৪৮ জন শিক্ষিত। ইহার মধ্যে ৩০৩ জন ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ। স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজার করা ২৫৯ জন শিক্ষিতা। ইহার পরেই ব্রাহ্মণদিগের আসন। তাঁহাদের মধ্যে হাজার করা ৬৩৯ জন পুরুষ শিক্ষিত। কিন্তু ব্রাহ্মণজাতি স্ত্রীশিক্ষা ও ইংরাজী শিক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে পারেন নাই। ইঁহাদের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হাজার করা ৫৬ জন শিক্ষিতা এবং পুরুষদের মধ্যে হাজার করা ১৫৭ জন ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ। শিক্ষাসম্বন্ধে কায়স্থের আসন তৃতীয়। ইঁহাদের মধ্যে হাজার করা ৫৬০ জন পুরুষ শিক্ষিত এবং হাজার করা ১৪৭ জন পুরুষ

ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ। স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজার করা ৬৬ জন শিক্ষিতা।

সুবর্ণবণিক্, গন্ধবণিক্ এবং আগুরি জাতির মধ্যে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার কম নহে। ইহাদের সংখ্যা প্রতি হাজারে যথাক্রমে ৫১৯, ৫১০ এবং ৪৯১। ইংরাজি শিক্ষিতের সংখ্যা সুবর্ণবণিকের মধ্যে হাজার করা ২৬৮, গন্ধবণিকের, মধ্যে হাজারি করা ১৭৫। কিন্তু স্ত্রীশিক্ষায় ইহারা উন্নতি করিতে পারেন নাই। সুবর্ণবণিক স্ত্রীলোকের মধ্যে হাজার করা ৮১ জন শিক্ষিতা। গন্ধবণিক্ ও আগুরি জাতি অনেক নিম্নে।

নিম্ন বর্ণের মধ্যে পোদ জাতি শিক্ষায় অগ্রগণ্য। চণ্ডাল ও রাজবংশী জাতির মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সামান্যই হইয়াছে। কাঁসারী, তেলী, ও ময়রা জাতির মধ্যেও শিক্ষার বিস্তার মন্দ নহে।

মুসলমানদের মধ্যে আসরাফ সম্প্রদায় (সৈয়দ, মোগল ও পাঠান মধ্যে শিক্ষার বিস্তার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কুলু, কালাল, বেদীয়া মল্লিক, রংরেজ, কসাই, দফালী ও ভাটের আসন দ্বিতীয়। জোলা হাজ্জাম, লাহেরী, দাই, দর্জি, ফকীর, কুঁজড়া, চুড়িহার, ধুনীয়া, ধাওয় ধোবী, বেহারা, ও ভাটিয়ারার আসন তৃতীয়। কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকের মধেই শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প।

জড়োপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার আদপেই নাই বলিলেও চলে।

শ্রীযোগীন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ।

বঙ্গসাহিত্যের মাসিক বিবরণী।

সাহিত্য (৬) চরিত শাখা।

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ। ৩৫ খানি সুপ্রসিদ্ধ প্রতিকৃতি সহিত। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত। রয়েল ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। কাপড়ের বাঁধাই ও মুদ্রাঙ্কন পরিপাটী।

শাস্ত্রী মহাশয় যে কালের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহা যেন তাঁহার নখদর্পণে। তখন নব্যবঙ্গ গঠিত হইয়া নব আশায় ও আকাঙ্খায় মাতিয়া উঠিয়াছিল; একদিকে ঈশ্বর গুপ্তের নেতৃত্ব,অপর দিকে ডিরোজিওর শিক্ষা,—তখন বঙ্গভাষা ভট্টাচার্য্যদিগের সমাসকণ্টকিত দুর্গম পন্থা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি পাইয়া একবারে কালীপ্রসন্ন সিংহের শঙ্কমিশ্র আলালী স্রোতে অবগাহন করিয়া উঠিয়াছিল এবং বঙ্কিমবাবু হঠাৎ এক নূতন পথ আবিষ্কার করিয়া এই ভাষাকে সৌন্দর্য্যভূষিত পুলিনশয্যার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতেছিলেন ;—তখন মাইকেলের ন্যায় কয়েকজন প্রতিভাপন্ন ব্যক্তি সমাজবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া যথেচ্ছাচারতন্ত্র হইয়া পড়িতেছিলেন—অপর দিকে কেশবচন্দ্রের ন্যায় সুধী নেতা সমাজ সংস্কার ব্রত গ্রহণ করিয়া আশ্চর্য্য বাক্‌পটুতা ও সাধু জীবনের প্রভাবে নব্য সম্প্রদায়কে মুগ্ধ করিতেছিলেন ; তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নীলদর্পণ এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল, এবং তৎকালীন বঙ্গীয় পত্রিকাগুলির চটুল ও কুৎসিৎ পন্থা হইতে সুদূরে অবস্থিত "সোমপ্রকাশ" স্বীয় গম্ভীর ওজস্বী স্বরে ও সংযম প্রভাবে সাপ্তাহিক পত্রের প্রতি সর্ব্বসাধারণের সশ্রদ্ধ অনুরাগ আকর্ষণ করিতেছিল। এই ঘটনাবহুল, অবস্থার বৈষম্য ও বিভিন্ন মতের প্রচারে বিচিত্রভাবে পুষ্ট, নবচ্ছন্দে বিকাশোন্মুখ যুগের ইতিহাস শাস্ত্রী মহাশয় নখদর্পনে দেখিয়াছেন। তিনি প্রাঞ্জল ও কৌতূহলোদ্দীপক সুন্দর ভাষার আকর্ষণে আমাদিগকে মুগ্ধের ন্যায় টানিয়া লইয়া বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর আবরণ উন্মোচন করিয়া দেখাইয়াছেন। স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয় এই বিচিত্র ইতিবৃত্তে একটি সম্ভ্রম-জনক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে নবপ্রবর্ত্তিত যুগের দোষের লেশ স্পর্শ করে নাই, নবশিক্ষা তাঁহাকে উদার বিশ্বহিতের পথে নিয়োগ করিয়াছিল,

উহা উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির মুখে তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায় নাই। তিনি কিরূপ দৃঢ় হস্তে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন,—কি গভীর প্রেমের সহিত ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন—এবং তাঁহার প্রখর বিশ্বাসের তেজে শোকের ঘন আঁধার কিরূপ কোয়াষার মত কাটিয়া গিয়াছে—তাহা এই পুস্তকখানিতে বিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার সাধু জীবন নিঃশব্দে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের মধ্যে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, সেই প্রভাব কবির লেখনী ও সংস্কারকের আগ্রহকে অলক্ষিত ভাবে নিয়মিত করিয়া সমগ্র শিক্ষিত সমাজটিকে স্বীয় পুণ্যগণ্ডীর মধ্যে আনিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। রামতনু লাহিড়ী সম্বন্ধীয় দীনবন্ধু মিত্রের সুরধুনী কাব্যে এই দুইটি ছত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া সমাধিস্তম্ভে স্থান পাইবার যোগ্য,—

"এক দিন তাঁর কাছে করিলে যাপন।
দশ দিন থাকে ভাল দুর্ব্বিনীত মন।"

আমরা শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সুন্দর পুস্তকখানির বহুল প্রচার প্রার্থনা করি।

সাহিত্য (৩) নাট্যশাখা।

৭। কর্পূরমঞ্জরী। কবি রাজশেখর প্রণীত। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত।

জ্যোতি বাবু অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রায় সমস্ত গুলি সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই অনুবাদগুলি প্রকাশ করিয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা দিক উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। আজকাল বঙ্গীয় সাহিত্যিকের সংখ্যা অনেক, কিন্তু সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য যে শ্রম স্বীকার করা আবশ্যক,—তাহা আধুনিক লেখকগণের অনেকে ভুলিয়া গিয়াছেন। জ্যোতি বাবুর এই শ্রমসাধ্য সুন্দর অনুবাদগুলি দেখিয়া মনে হয়,—আমাদের ভাষার হিতৈষী ও তৎপ্রতি প্রকৃত অনুরাগী দুএকজন লেখক এখনও নিঃশব্দে কার্য্য করিতেছেন,—ইহা অতি আশাপ্রদ।

সাহিত্যের দিক হইতে দেখিলে এই অনুবাদগুলি অমূল্য। ইহাতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের আদর্শগুলি বাঙ্গালার সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর নিকট সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিবে—সেই আদর্শই বাঙ্গালা কাব্যের প্রকৃত অবলম্বস্বরূপ গৃহীত হওয়া উচিত,—বিদেশীয় উপকরণ দ্বারা আমরা এদেশের সাহিত্যকে খচিত করিতে পারি, কিন্তু

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃত অস্থিপঞ্জর এইখানে। অনুবাদ হাতে না পাইলে এই সংস্কৃত নাটক সাহিত্য যাঁহারা পাঠ করিতে অবসর পাইতেন, তাঁহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যায়। সুতরাং এই অনুবাদগুলি বাঙ্গালার সাহিত্যসেবীদের জন্য যে অনায়াসলব্ধ সুযোগের সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে পারা যায় না।

কিন্তু এই অনুবাদগুলির আর একটা মূল্য আছে তাহাও বড় অল্প নহে। নাটকে সাময়িক আচার ব্যবহার, ও সামাজিক চিত্রের প্রতিচ্ছায়া যেরূপ প্রাপ্ত হওয়া যায়,—সাহিত্যের অন্য কোন বিভাগে তাহার উদাহরণ মিলে না। সাধারণ পাঠক এই অনুবাদগুলি পাঠ করিয়া স্বদেশের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইবেন, যাহারা একটী লিপি-সংযুক্ত-ফলক, মুদ্রা বা ভগ্ন ইষ্টক খুঁজিয়া দেশের প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন করিতে সচেষ্ট, তাঁহাদের নিকট নাট্যসাহিত্য উপেক্ষার বিষয় নহে, নাটকের চিত্রে প্রাচীন সমাজের জীবন্ত রূপ দৃষ্ট হয়,—উহার সঙ্গে তুলনায় মন্দিরের ফলক ও ভূমিদানপত্র নগণ্য; সংস্কৃত নাটকগুলি বহু প্রাচীন, সুতরাং জ্যোতি বাবু কোন মৌলিক তত্ত্ব আবিষ্কারের সুবিধা প্রদান করিয়াছেন,—ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু দেশের যে উপাদানগুলি সাধারণের পক্ষে সুদূরে অবস্থিত ছিল, তাহা তিনি তাহাদের হাতে আনিয়া দিলেন এবং বঙ্গদেশে প্রাচীন ইতিহাস চর্চ্চার পথ সুগম করিয়া দিলেন, ইহা অবশ্য মানিয়া লইতে হইবে।

তাঁহার অনেকগুলি অনুবাদ আমরা পাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা উচিত কিন্তু আপাততঃ কর্পূরমঞ্জরী প্রকাশিত হইয়াছে, বহিখানি ক্ষুদ্র কিন্তু ইহা পাঠ করিয়া আমার মনে নানা কথার উদয় হইয়াছে।

ক্ষুদ্র পুস্তক খানি প্রাচীন একটী হিন্দু রাজার প্রেমকাহিনী, ইহা নাটক নহে, সংস্কৃত পণ্ডিতগণ ইহাকে সট্টক সংজ্ঞায় অভিহিত করেন, ইহা আদ্যন্ত প্রাকৃত ভাষায় রচিত। এই পুস্তকে যে সমাজের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে—তাহাতে দৃষ্ট হয়, সে সময়ে হিন্দুরমণীগণ রীতিমত লেখা পড়ার চর্চ্চা করিতেন। বিচক্ষণা দাসী যে সমস্ত সুন্দর কবিতা রচনা করিতেছেন, তাহা অনেক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সুধী কবিকে লজ্জা প্রদান করিবে—বিভ্রমলেখা, রাণী, কর্পূরমঞ্জরী প্রভৃতি রমণীবর্গের সকলেই কবিতা-প্রিয় ছিলেন, এবং অন্তঃপুরমধ্যে যে সকল কথোপকথন হইত, তাহার শ্লেষ, ও আমোদ প্রমোদ অলঙ্কার শাস্ত্রানুযায়ী হইত, উহা কবির কল্পনা-লোকের সামগ্রী

বলিয়া বোধ হয় না, চিত্রটি এরূপ জীবন্ত যে মনে হয় কবি সেই সময়ের চিত্রই দিয়াছেন,—বাকচাতুর্য্যের মধ্যে সর্ব্বত্র একটা পাণ্ডিত্যের লক্ষণ পাওয়া যায়। বিদূষক বলিতেছেন—"আমি যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতা নামক তোমার যে অঙ্গ (কর্ণ) তাহা উৎপাটন করিব।"

দাসী উত্তরে বলিতেছেন,"ভগবান ত্রিলোচন মস্তকে যাহা ধারণ করেন (অর্দ্ধচন্দ্র) তুমি তাহাই পাইবে' কিম্বা "যাহাতে অশোক মঞ্জুরী প্রস্ফুটিত হয় (পদাঘাত) তাহাই তোমার অদৃষ্টে আছে।"

এরূপ পণ্ডিত্যপূর্ণ শ্লেষ প্রতি কথায় কথায়।

পুস্তক খানি অনেক স্থলে কবিত্বময়, প্রতি পত্রেই বেশ নূতন কৌতুহলোদ্দীপক কথার ভঙ্গী, প্রশংসনীয় লিপিকৌশল ও চাতুর্য্য লক্ষিত হয়। বৈতালিকগণ মলয় বাতাসের যে কার্য্যকলাপগুলি কীর্ত্তন করিয়াছেন তাহা বড়ই সুন্দর বোধ হইয়াছে—তাহা এই ভাবের "—পাণ্ডুদেশের রমণীদের গণ্ড পুলক-রক্তিমা আনায়ন করিয়া, কাঞ্চীদেশের মালিনীদের প্রাতঃ ও সন্ধ্যার মান ভঞ্জন করিয়া, চোলাঙ্গনা-দিগকে প্রমত্ত করিয়া, কর্ণাট অঙ্গনাদের চূর্ণকুন্তল চঞ্চল করিয়া, কুন্তলবাসিনী-গণকে স্বীয় কান্তের সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া—

"মন্দ মন্দ বহে কিবা
শীতল পবন।"

কিন্তু এই পুস্তকে বিদূষকের স্বপ্ন বৃত্তান্তটীতে প্রাচ্যকল্পনার যে অপূর্ব্ব বিকাশ দৃষ্ট হয়, তাহার আস্বাদ পাঠকদিগকে না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

"স্বপ্ন দেখলেম আমি গঙ্গার স্রোতের উপর শুয়ে আছি, মহাদেবের শিরে যে গঙ্গার পাদপদ্ম ন্যস্ত সেই গঙ্গার জলে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধুয়ে গেল।

"তার পর, শরৎকালবর্ষী জলধারায় আমাকে গ্রাস করে' ফেল্লে।

"তার পর, ভগবান মার্ত্তাণ্ড স্বাতি নক্ষত্রে চলে গেলে পর যে সমুদ্রে তাম্রপর্ণী নদী মিশেছে, সেই সমুদ্রে সেই মহা মেঘও চলে গেল। আমিও সেই মেঘের মধ্যে বসে তারি সঙ্গে চল্লেম।

"তার পর সেই খানে গিয়ে সেই মেঘ স্থূল জলবিন্দু বর্ষন করতে লাগ্‌ল। তার পর সমুদ্রের মধ্যে যে ঝিনুক থাকে তারা তাদের আবরণ উদ্‌ঘাটন করে জল বিন্দুদের পান করলে, সেইসঙ্গে আমাকেও পান করে। আমি জল মাখা প্রমাণ মুক্তা ফল হয়ে তাদের গর্ভে রইলাম। * *

"তার পর সেই শুক্তিদের সমুদ্র হতে উঠিয়ে এনে বিদারণ করা হল। আমি চৌষট্টি মুক্তা ফলের আকারে ছিলাম। লক্ষ সুবর্ণ দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠ আমাকে কিনে নিলে।

"তার পর সেই শ্রেষ্ঠ একজন বেধকারকে এনে মুক্তাফলগুলি বিদ্ধ করালে। আমার একটু বেদনা বোধ হ'ল।

"তার পর একজন বণিক একটী কৌটায় ক'রে সেই হারটি পাঞ্চালাধিপতি শ্রীবজ্র যুধ দেবের নিকট কোটি সুবর্ণ মুদ্রায় বিক্রয় করলে।"

ইহার পরে রাজা স্বীয় নবযৌবনগর্ব্বিতা রমণীর বক্ষে সেই হারটি বিলম্বিত করিয়া তাঁহাকে সপ্রেমে আলিঙ্গন করিলেন—

"তাহার পীড়নে আমি হনু জাগরিত।"

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, এখানি নাটক নহে সট্টক। ইহার শিক্ষা গুরু গম্ভীর বা প্রগাঢ় নহে—তাহা কৌতুকাবহ, বিচিত্র ও তরল। রমণী চরিত্রগুলি একটু বেশী প্রগল্‌ভা ও লজ্জাহীনা—ভাষায় ও ব্যবহারে অনেকটা সংযমের অভাব। তপোবনের শকুন্তলা—দুষ্মন্তকে প্রথম প্রেম-পত্র লিখিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার লজ্জাহীনতার পরিচয় দেয় নাই, তপোবনবাসিনীর গভীর প্রেমের সারল্য পরিস্ফুট করিয়াছিল মাত্র। রাজ-অন্তঃপুরে পালিতা কুমারী কর্পূর-মঞ্জরীর প্রথম পত্র লেখার অভিনয় শকুন্তলার বিকৃত নকল।

এই সট্টকে তান্ত্রিক আচার্য্যের যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা অদ্ভুত এবং বীভৎস কিন্তু উহা খাঁটী ঐতিহাসিক চিত্র—ভৈরবানন্দ কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিয়া বলিতেছেন—মদিরা, প্রমদা, এবং মাংস, ইহাদের উপভোগেই "মোক্ষ অপবর্গ" লব্ধ হইয়া থাকে।

এই পুস্তকখানিতে হরিচন্দ্র, নন্দিচন্দ্র, কোটিশহাল প্রভৃতি কয়েকজন তৎকাল-প্রসিদ্ধ কিন্তু অধুনালুপ্ত কবির নাম পাওয়া যাইতেছে, কে জানে যদি ইহাঁদের কোন কাব্য কালে আবিষ্কৃত হয়, তাহা হইলে কর্পূর-মঞ্জরীর এই উল্লেখের ঐতি-হাসিক গুরুত্ব জানা যাইতে পারিবে।

জ্যোতিবাবুর এই অনুবাদগুলি ভালরূপ বাঁধাই করিয়া বঙ্গসাহিত্যের প্রকোষ্ঠে

সাহিত্য (৫) কাব্যশাখা।

৯। **শ্রীগৌরপদ তরাঙ্গণী।** মহাজন পদাবলী প্রণেতা, অবসরপ্রাপ্ত গবর্ণমেণ্ট স্কুলের ভূতপূর্ব্ব প্রধান শিক্ষক দীন শ্রীজগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত ও সম্পাদিত। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থভাগ ডিমাই ৮ পেজী ফর্ম্মার ৫৬৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, এতদ্ব্যতীত ১৮৯ পৃষ্ঠার একটি উপক্রমণিকা, ৫ পৃষ্ঠার একটী ভূমিকা এবং ৪৮ পৃষ্ঠার একটী সূচীপত্র আছে। সর্ব্বশুদ্ধ পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা ৮১০। গ্রন্থের প্রারম্ভে সপার্ষদ মহাপ্রভুর একখানি হাফ্‌টোন ছবি প্রদত্ত হইয়াছে।

গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে বটতলার হাত হইতে উদ্ধার করিয়া একটী সটীক সংস্করণ প্রকাশপূর্ব্বক শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিপথবর্ত্তী করিয়াছিলেন। ইঁহারই সংস্করণ প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী সংস্করণগুলি রচিত হইয়াছে। প্রাচীন সাহিত্যের খনিতে এখন যে সে রত্নলাভের আশায় হস্তক্ষেপ করিতেছে; ইনিই শিক্ষিত সমাজকে সর্ব্বপ্রথম সেই খনির সন্ধান দিয়াছিলেন, একথা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লিখিত হওয়ার যোগ্য। জগদ্বন্ধুর দ্বিতীয় কীর্ত্তি—ব্যঙ্গরাজ্যে; মেঘনাদবধ কাব্যের হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ ছুছুন্দরী বধকাব্যের নাম অনেকেই জানেন, জগদ্বন্ধু বাবুই এই ছুছুন্দরী বধ প্রণেতা।

ভদ্র মহাশয় আজীবন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ পদাবলী সেই জীবনব্যাপী শ্রমের ফল। সাম্প্রদায়িক ভক্তির উচ্ছাসের সঙ্গে সঙ্গে আমরা অগ্রসর হইতে অসমর্থ, ভক্তগণ এই পুস্তকখানি তুলসীপত্র ও চন্দনচর্চ্চিত করিয়া পূজার গৃহে রাখিবেন—আমরা ততদুর ভক্তি প্রদর্শন করিতে না পারিলেও বলিতে বাধ্য—সর্ব্বশ্রেণীর সাহিত্যিকের নিকট এই পুস্তক গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পাইবে। উপক্রমণিকায় ৮৫ জন পদকর্ত্তার জীবনী প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা অনেকাংশে মৌলিক, প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের এরূপ বিস্তৃত বিবরণ একসঙ্গে আর কোথায়ও পাওয়া যাইবে না। এই সংগ্রহে গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে ১২০০টি প্রাচীন পদ প্রদত্ত হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে এত প্রাচীন পদ আর কোন পুস্তকে দৃষ্ট হয় নাই।

সংগ্রহকারক যে বিরাট চেষ্টায় এই পদগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; কিন্তু ভক্তি স্বীয় আবেগে যে সমস্ত দুরূহ কার্য্য সম্পাদন করে, ভক্তের হস্ত সেই কার্য্যভারে পীড়িত হয় না, উহার বিরাট শ্রমের মধ্যে প্রচুর আনন্দ সঞ্চিত থাকে ; কিন্তু এই সুবৃহৎ পুস্তকের ব্যয় সংগ্রহ করিবার জন্য তাঁহাকে যেরূপ লাঞ্ছনা পাইতে হইয়াছে—তাহা তিনি সেরূপ সহিষ্ণুতার সহিত বহন করিতে পারেন নাই। ক্রমান্বয়ে বঙ্গের দুইজন খ্যাতনামা ধনী এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কন ব্যয় বহন করিতে স্বীকৃত হইয়া শেষকালে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিলেন; সঙ্কলয়িতা দয়া করিয়া তাঁহাদের নাম প্রকাশ করেন নাই। এই ক্ষমাগুণ প্রকৃত বৈষ্ণবোচিতই হইয়াছে। তাঁহার এইরূপ বিপদের সময় টাকীর প্রসিদ্ধ জমিদার বদান্যবর রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় এই গ্রন্থের সমস্ত মুদ্রাঙ্কন ব্যয় বহন করিয়া ভদ্র মহাশয়কে এবং তৎসঙ্গে বঙ্গভাষাকে অশেষ ঋণবদ্ধ করিয়াছেন। সাহিত্য পরিষদ হইতে এ পর্য্যন্ত যতগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে এইখানিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

১০। রাঘব-বিজয় কাব্য।—শ্রীশশধর রায় প্রণীত। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৩২৯ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা বাঁধাই উৎকৃষ্ট।

এই কাব্যখানি মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যের অনুকরণে লিখিত। "কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এতুচ্ছ সমরে" (৩৫ পৃষ্ঠা) "কে তোমরা এ নিশাকালে আগত এ পুরে ?" (১৬৭ পৃষ্ঠা)—"হেরিয়াছি নিক্ষিপিতে...হেরি নাই হেন দ্বন্দ্ব যুদ্ধ" ৯ পৃষ্ঠা প্রভৃতি কথাগুলিকে মাইকেলের কাব্যের অনুকরণ বা অপহরণ নামে অভিহিত করিব, তাহা বলিতে পারি না।

রাবণের আড়ম্বরময় বক্তৃতাগুলি পাঠ করিয়া আমাদের মনে অদ্ভুত গুম্ফ-বিরাজিত যাত্রার অভিনেতাকে বারংবার মনে হইয়াছে, কবি নিকষাকে আবার তাহার উপর রং ফলাইয়া চিত্রিত করিয়াছেন। রমণীর বীরত্বে অনুপ্রাণিত হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু ত্যাগ ও স্নেহের পরিপূর্ণতা বীরাঙ্গনা-দেরও চরিত্রের প্রধান উপাদান, তাঁহারা সেই উদ্বেল ভাবরাশিকে যে অপূর্ব্ব তেজে সংযত করেন, তাহা আমাদিগের বিস্ময় উদ্রেক করে, তাঁহাদের বীরত্ব ত্যাগের ভাবে পুষ্ট। নিকষা অন্তঃকরণশূন্যা, রাক্ষসবংস ধ্বংস পাইতেছে, নিকষা উকীলের মত কেবলই বড় বড় কথায় বক্তৃতা করিতেছে, এই নির্ম্মম প্রাণহীন চরিত্রকল্পনায় কবি কোন কৌশলই দেখাইতে পারেন নাই। এদিকে

নিকষা যেমন রাবণকে কেবলই যুদ্ধে প্রবর্ত্তিত করিতেছে, মন্দোদরী আবার অপর-দিকে তেমনই আগ্রহে তাঁহার পরিচ্ছদের প্রান্ত ধরিয়া আঙ্গিনায় আকর্ষণ করিতেছে। মহিষীর এই অযোগ্য মৃদুতা এবং রাজমাতার বীরত্বের উন্মাদনা উভয়ই কাব্য কৌশলের অভাবকে সুস্পষ্ট করিতেছে। ইহাও ক্ষমনীয় কিন্তু মন্দোদরীর প্রতি রাবণের নিম্নোদ্ধৃত ব্যঙ্গোক্তি নিতান্ত বিসদৃশ বোধ হয়, এই কথাগুলি না লিখিয়া কবি তাঁহার মসীপত্রের সমগ্র মসী রাবণ-চিত্রের উপর ঢালিয়া ফেলিলেও বোধ চিত্রটি এত বিবর্ণ হইত না।

"কি ভাবিছ একাকিনী ?
কতদিনে বিভীষণ হবে রাজা আর
তুমি হ'বে রাজরাণী ?" ইত্যাদি।

শশধর বাবুর বর্ণিত যুদ্ধক্ষেত্র—সমাধিস্তম্ভে পূর্ণ. কোন সমাধিতে লিখিত রহিয়াছে—"ত্যজ অভিমান দম্ভি ; কুম্ভকর্ণ হত এই স্থলে"। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার সমধিফলকে লিখিত আছে "দাঁড়াও পথিকবর, হের নেত্রে" ইত্যাদি। বিশেষ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্তগুলি স্তম্ভই রামচন্দ্র শত্রুপক্ষীয় বীরগণের পরাভবের স্মৃতিরক্ষার জন্য নিজ ব্যয়ে গড়িয়া দিয়াছিলেন। বিরহখিন্ন রাজকুমার যে মহাহবের প্রাঙ্গনে সুকুমার শিল্পচর্চ্চার প্রতি এতদূর মনোযোগী হইতে পারিয়াছিলেন, তাহা শুধু কবিকে সমাধিস্তম্ভ বর্ণনার একটা সুযোগ দেওয়ার জন্য, অন্য কোন উদ্দেশ্যে নহে।

পুস্তকের ভাষাটিতে বেশ একটা প্রবাহ আছে, তাহা অমিত্রাক্ষর ছন্দের সুখপাঠ্য উদাহরণ স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। কাব্যের উপসংহারটি আমাদের নিকট বেশ ভাল বোধ হইল। কবি সমাধিস্তম্ভের বিশেষ পক্ষপাতী, রাবণের একটা স্মৃতি-চিহ্নের সংস্থান না করিয়া পুস্তক শেষ করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণ রাবণের সমাধি ফলকের জন্য এই কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন—

শাস্ত্র অধ্যয়ন,
সুগ্রন্থ দর্শন, যাগ যজ্ঞ, তপোবল—
অদ্যম বাহু বিক্রম, ত্রিভুবন-জয়,
চরিত্র বিহীন জনে বৃথা এ সকলি।

অসংযমী শান্তি ভবে নাহি পায় কভু।
হে পথিকবর, শিখ এই মহাশিক্ষা
দাঁড়ায়ে এস্থলে।—

সেই নির্জ্জন সৈকতে সমাধিস্তম্ভের পাদ লেহন করিয়া বিশাল সমুদ্র-তরঙ্গ আবর্ত্তিত হইল, এবং অনির্দ্দিষ্ট আক্ষেপে বায়ু প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বিক্রান্ত যোদ্ধা, উচ্চাকাঙ্খার চূড়া রাক্ষসরাজের শ্মশানের উপর স্বভাবের প্রবল দুইটি শক্তির এই নিঃশব্দ লীলা আমাদিগের মনে গুরু গম্ভীর রহস্যপূর্ণ চিন্তার উদ্রেক করিতেছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

জ্বালামুখী।

ভারতে বিরাজে শুধু তীর্থ জ্বালামুখী ;
দগ্ধ অন্য পুণ্যধাম পিশাচ নিশ্বাসে।
ব্রহ্মনাম শূন্য আজি এভূমি নিরখি
পদতলে দলে প্রেত ধরম-বিশ্বাসে।

দুরিত-হারিণী নাহি ভক্তি-স্রোতস্বতী,
নাহি শান্তি-তপোবন তপস্যায় পূত,
নির্ব্বাপিত চিরতরে সাধনা-শাশ্বতী,
প্রাণের দেবতা আজি প্রেমাসনচ্যুত।

আনন্দ মন্দির ভগ্ন ; ইষ্টকের রাশি
বেষ্টিয়া রয়েছে ক্ষেত্র, ধ্বংস-সাক্ষীরূপে ;
সেই ধ্বংস পুর মাঝে বসি দেশবাসী
অতীত গৌরব স্মরি কাঁদে চুপে চুপে।

বিন্দু মাত্র তাপ যদি হৃদয় দহিয়া—
বাহিরিতে চাহে কভু নিশ্বাসের সাথে,
রুদ্ধ কণ্ঠ যদি কভু যাতনা বহিয়া—
ফুটিয়া কহেরে কথা ; প্রেত-পদাঘাতে

চূর্ণ হয় বক্ষঃস্থল, বিলুপ্ত চেতনা।
নিঃশব্দে শ্মশান ক্ষেত্রে ঘোর অন্ধকারে
বিরচে আপনা চিতা আপনি যাতনা।
জ্বলে তীর্থ জ্বালামুখী জ্বালি আপনারে।

জ্বাল তুমি জ্বালামুখী তীর্থ ভারতের
বেদ বেদান্তের কথা, ধর্ম্ম, ভক্তি, প্রীতি,
বীরকীর্ত্তি, প্রেমগীতি, গাথা আনন্দের,
জ্বালাও অতীত সাক্ষী গৌরবের স্মৃতি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমার কাচ-নির্ম্মাণ-শিক্ষা।

[মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ ওয়াগ্‌লে বি, এ, গত ১৮৯৯ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে কাচের কাজ শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। তিনি সম্প্রতি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া কলিকাতার সন্নিকটস্থ টিটাগড়ে কাচের কারখানা খুলিবার প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি যেরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কাচ-নির্ম্মাণ শিক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার নিজমুখে বর্ণিত তৎবিবরণী ঠিক উপন্যাসের ন্যায় কৌতূহলপ্রদ, আমরা তাহা বাঙ্গলায় ভাষান্তরিত করিয়া নিম্নে প্রকাশিত করিলাম। লেখকের অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যপরতা সম্বন্ধে বিলাতের কোন সভায় সার জর্জ বার্ডউড, লর্ড রে, সার জন জার্ডিন, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সুধিবৃন্দ খুব উচ্চভাবের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি সার জন জার্ডিন তাঁহাকে পিটার-দি-গ্রেট এবং বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সহিত তুলনা করিয়াছিলেন। অতঃপর, 'ভারতবর্ষের শিল্প ও বাণিজ্যের পুনরুন্নতির পন্থা' সম্বন্ধে ওয়াগ্‌লে মহোদয়ের কতকগুলি প্রবন্ধ পর্য্যায়ক্রমে ভারতীতে প্রকাশিত হইবে। ভাঃ সং।]

আমার বিলাতযাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য কাচনির্ম্মাণ-বিদ্যাশিক্ষা করা। আমি এ বিষয়ে বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিয়াছিলাম যে, কাচনির্ম্মাণোপযোগী সমস্ত উপকরণাদির যে সুবিধা ভারতবর্ষে হইতে পারে, তাহাতে এদেশে ইহার ব্যবসায় বিশেষরূপ ফলপ্রদ হইবে। আমি বিলাত যাইয়া ভারতবন্ধু সার জর্জ বার্ডউড, সার মাঞ্চার্জি ভাউনগরী এবং পরলোকগত মিষ্টার ওয়াডিয়া—এই তিন জনের নিকট স্বীয় উদ্দেশ্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করি। এই সময়ে মিষ্টার ওয়াডিয়ার অনেক কাচের কারখানার সহিত কারবার চলিতেছিল। তিনি তাঁহার এজেণ্ট মিষ্টার হ্যারোয়ারের দ্বারা আমার জন্য চেষ্টিত হন। মিষ্টার হ্যারোয়ার আমার বিষয়ে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য আহূত একটি সভায় জ্ঞাপন করেন যে, তিনি প্রায় বত্রিশটি

কারখানায় আমার সম্বন্ধে প্রস্তাব করিয়াছেন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহই আমাকে এপ্রেণ্টিসস্বরূপ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহে। শুধু ইয়র্কের কারখানা "বিদেশীয়"কে এপ্রেণ্টিসস্বরূপ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত ছিল। কিন্তু তজ্জন্য তাহাদিগকে দুই শত পাউণ্ড দিতে হইবে এবং এত টাকা দিয়াও আমি শুধু কারখানার একটি বিভাগে শিক্ষা করিবার অধিকার পাইব। এই দাবী আমার নিকট খুব অধিক বলিয়া বোধ হইল। বিলাতে আসিবার সময় মনে করিয়াছিলাম, অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং অজেয় ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিব, কিন্তু এখন দেখিলাম শুধু ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সফলতা লাভ হয় না। এই অবস্থায় ইয়র্কের কারখানায় টাকা দিব কিনা তৎসম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিলাম না। এত অর্থ দেওয়া আমার পক্ষে সহজ ছিল না; অথচ, দিব না বলিলে, বিফলমনোরথ হইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করা আমার পক্ষে মৃত্যুতুল্য হইবে। ইয়র্ক-কারখানার স্বত্বাধিকারিগণ—এই প্রস্তাবে আমি সম্মত কি না, তাহার উত্তর তদ্দণ্ডেই চাহিয়াছিলেন। আমি সার জর্জ বার্ডউডকে এই সঙ্কটাপন্ন অবস্থা জ্ঞাপন করিলে তাঁহার অন্তঃকরণ দ্রব হইল। তিনি হ্যারোয়ারের দ্বারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া উক্ত স্বত্বাধিকারিগণকে আমাকে শেষ উত্তর দেওয়ার জন্য কিছু সময় দিতে সম্মত করাইলেন।

আমার ভবিষ্যৎ অত্যন্ত অন্ধকার বোধ হইল। বার্ডউড সাহেবের একখানি চিঠি লইয়া লণ্ডনের একটা ভাল কাচের কারখানার অধ্যক্ষের সহিত দেখা করিলাম। তাঁহার নিকট শুনিলাম কারখানার শিল্পিগণ বিদেশীর প্রতি অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। তাহাদের আশঙ্কা এই যে, অপরিচিত লোক এই কাজ শিখিলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহাদের ব্যবসায়ের অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি তাঁহাকে পুস্তকাদির দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইলাম যে, আমি এই কাচের ব্যবসায়

শিখিলে তাহাদের বিন্দুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। অষ্ট্রিয়া, বেল-জিয়ম এবং জর্ম্মনি প্রধানতঃ এই তিন দেশ হইতেই ভারতবর্ষে কাচ আমদানি হইয়া থাকে, লণ্ডন হইতে অতি সামান্য পরিমাণে কাচ ভারতবর্ষে চালান হয়, তাহা খুব উৎকৃষ্ট কাচ, শুধু চসমা এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদিনির্ম্মাণের উপযোগী। আমি কাচের কাজ শিখিলেও ভারতবর্ষে উক্তরূপ উৎকৃষ্ট কাচ প্রস্তুত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। কারখানার অধ্যক্ষ আমার যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া আমাকে এপ্রেণ্টিসস্বরূপ গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। দাবীদাওয়ার বিষয় অতি সহজেই মীমাংসা হইয়া গেল, এবং স্থির হইল যে, সোমবার অতি ভাল দিন, আমি সেদিন প্রথম কাজে ভর্ত্তি হইব। আমি সোমবার দিন আগুনের সম্মুখে আধ ঘণ্টা কাল কাজ করিয়াছিলাম মাত্র, তখনই দেখিতে পাইলাম যে প্রায় ত্রিশ জন শিল্পী কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, এবং অবশিষ্ট শিল্পিগণ ধর্ম্মঘট বাঁধিবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। এই অবস্থায় আমার জন্য অধ্যক্ষের বিষম ক্ষতি আশঙ্কা করিয়া আমি শিল্পীদিগের প্রধানের নিকট যাইয়া বলিলাম যে আমার দ্বারা তাহাদের কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই, আমাকে তাঁহারা দয়া করিয়া বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করেন, এই বিনীত প্রার্থনা। ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "ভাই, তোমার উপর আমাদের কোনরূপ দ্বেষ নাই, তুমি ওরূপ বিমর্ষ হইও না, যদি এদেশের কোন ভদ্রলোক এখানে কাজ শিখিতে আসিত, তাহা হইলেও আমরা ঠিক ঐরূপ করিতাম। আমরা বাহিরের কোন লোককে কাজ শিখিতে দিতে প্রস্তুত নাহ।"

এই অবস্থায় আমার সমস্ত উদ্যম কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। আমি লণ্ডনের পথে পথে নৈরাশ্যমগ্ন হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম। তখন মনে হইল লণ্ডনের দুর্দ্দম বেগে চালিত কোন শকটের নীচে পড়িয়া

যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলেও আমার কষ্টের কোন কারণ থাকিবে না।

একদিন আমি "ইম্পিরিয়াল্ ইন্‌ষ্টিটিউটে" যাইয়া পোষ্টাপিস ডিরেক্টরী হইতে লণ্ডনের সমস্ত কাচের কারখানার নাম ও ঠিকানা লিখিয়া লইলাম, এবং মনে মনে স্থির করিলাম যে প্রত্যহ তিন চারিটী করিয়া কারখানাতে যাইয়া ভাগ্যপরীক্ষা করিতে হইবে। তখনও যে আমার একটি আশার ক্ষীণরশ্মি ছিল না, তাহা নহে। যদি আর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়, অন্ততঃ ইয়র্কের কারখানার সুবিধা পাইতেই পারিব। আমার এখন মনে হইল যে, কারখানার অধ্যক্ষদিগের দ্বারা চেষ্টা না করিয়া শিল্পীদিগের মধ্যে চেষ্টা করাই সমীচীন হইবে। তখন আমি প্রত্যহ এক এক কারখানায় যাইয়া তিন চারিটি করিয়া শ্রমজীবীর সহিত আলাপ করিতে লাগিলাম। কখনও তাহাদিগকে কিছু মদ খাইবার পয়সা দিয়া, কখনও তাহাদের লইয়া গাড়ীতে ঘুরিয়া নানাপ্রকারে তাহাদের মনোরঞ্জন করিতে চেষ্টিত হইলাম। কিন্তু ইহাতে আমার বিশেষ কোন সুবিধা হইল না। আমার প্রস্তাব শুনিয়া কেহ উপহাস করিল, কেহ বলিল এরূপ নজীর নাই, কেহ কিছু শুনিতেই চাহিল না। একটি শ্রমজীবীর সঙ্গে আমি প্রায় একঘণ্টা কাল আলাপ করার পরে সে আমাকে বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে কারখানায় যাইবে?—তুমি কি আমার সঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিবে?" আমি একথার অর্থ না বুঝিয়া তার মুখের দিকে চাহিলাম। তখন সে বারম্বার "স্বর্গে যাবে কি না?" এই প্রশ্ন করিতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলাম—"তোমার যাওয়া যদি সেখানে ঠিক থাকে, তবে আমিও যাইব।"

আর একটি শ্রমজীবী আমার প্রস্তাব শুনিয়া আমার প্রতি এরূপ

গ্রাস করিয়া ফেলিবে। তারপর বলিল, "আমরা ঢের ঢের বিদেশী দেখেছি"—এবং শেষে তাহার অভিধানের বাছা বাছা শব্দ আমার প্রতি প্রয়োগ করিল। আমি কোন উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করিলাম না, কিন্তু আমার মনে হইল আমার ভবিষ্যৎ-আকাশ ক্রমশঃ ঘনীভূত অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতেছে, আমি দুই চক্ষে পথ দেখিতে পাইলাম না। তখন আমার উৎসাহ, বল এবং ইচ্ছাশক্তি সমস্ত পরাভব পাইল, 'আমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত' বারম্বার এই ভাবটি আমার মনে উদয় হইতে লাগিল।

কিন্তু কারখানাগুলিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া আমার একটি লাভ হইয়াছিল,—আমি বিলাতী শ্রমজীবিগণের চরিত্র ভাল করিয়া চিনিবার সুবিধা পাইলাম, তাহাদের ভালবাসার বস্তু কি, কিসে তাহাদের অপ্রীতি জন্মে তাহার একটা ভালরূপ পরিচয় পাইলাম। আমি দেখিলাম বিলাতী শ্রমজীবী ও ভদ্রলোকশ্রেণীদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিজাতীয় ধন্ম ঘৃণা বা ম্ম ক্ষ হিয়াছে। শ্রমজীবী মনে করে সভ্যতার যাহা কিছু অনুষ্ঠান, সকলই তাহাদের কৃত। তাহাদেরই যত্ন, অধ্যবসায় ও নৈপুণ্যের ফলে য সভ্যতার সমস্ত উপকরণ প্রস্তুত হইতেছে এবং ভদ্রলোকেরা নিতান্ত স্বা অলস ও অকর্ম্মণ্য অথচ তাহারা বিনাশ্রমে শিল্পীদিগের বিরাট শ্রমলব্ধ রে দ্রব্যাদি ভোগ করিতেছে; এ বিষয়ে তাহাদের কৃতিত্ব বা যোগ্যতা কিছুই নাই। ভদ্রশ্রেণী মনে করেন, শ্রমজীবিগণ শুধু অভ্যাসের দরুণ হাতের কাজ সুসম্পন্ন করে তাহারা মস্তিষ্কচালনা করিতে জানে না, সদ্ভাব ও উচ্চচিন্তা তাহাদের মনে উদয় হয় না, ঐ সকল গুণ শুধু ভদ্র-লোকগণেরই নিজস্ব, এবং তাঁহারা স্বীয় উচ্চ প্রতিভার বলে শিল্পিগণের শ্রমলব্ধ দ্রব্যাদি ভোগ করিতে প্রকৃতরূপে অধিকারী। ভদ্রলোকগণ কারখানাকে অতি হেয়স্থান বলিয়া মনে করেন, সেখানে যন্ত্রাদি

পরিষ্কার জল পাওয়া দুর্ঘট। কিন্তু শিল্পিগণ কারখানাকেই স্বর্গতুল্য মনে করে, কারখানা হইতে যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু গৌরবজনক তাহা প্রস্তুত হইয়া দেশবিদেশে ইংলণ্ডের কীর্ত্তি প্রচারিত করে। ভদ্রলোকগণের ধারণা সামাজিক সম্মিলন উচ্চ সভ্যতার ভিত্তিস্বরূপ, উহা অবাধে আনন্দ বিতরণ করিয়া জনসমূহের চিত্ত সরস রাখে, উহা মনের গতিকে উচ্চ চিন্তায় প্রধাবিত করিয়া সভ্যতার আদর্শ গঠন করে, এবং ন্যায়কে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে—সামাজিক সম্মিলন বিশাল আকাশের ন্যায়, উহাতে নরনারীগণ নক্ষত্রের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকেন, কিন্তু শিল্পিগণ মনে করে সামাজিক সম্মিলন একটা অনাবশ্যক আড়ম্বর মাত্র, উহা না থাকিলে সংসারের ঢের কাজ হইত, উহা অলসতার আশ্রয়ভূমিস্বরূপ।

শিল্পজীবিগণের সহানুভূতি ও আশ্রয়ই আমার প্রধান অবলম্বন করিতে হইবে, ভদ্রবেশে উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রীতিলাভ আমার পক্ষে সুদূর পরাহত হইবে। সুতরাং আমাকে ভদ্রবেশ ত্যাগ করিতে হইল। এ কাজ অতি সহজ, জামা এবং জুতা দুই সপ্তাহকাল ব্রুস না করিয়া ফেলিয়া রাখ, যে কলারটা বহুপূর্ব্বে ধোবিখানায় দেওয়া উচিত ছিল, তাহাই ব্যবহার কর, খুব জমকালো লাল নীল কিম্বা পীতবর্ণের নেকটাই পরিয়া লও এবং দরকার হইলে আরও কয়েকটি পেরেক লাগাইয়া বুট জুতাকে এমন করিয়া ফেল যে হাঁটিবার সময় খুব শব্দ হয়। আমি এ সকল উপায় অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার ঘুরিতে লাগিলাম। এবং মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীরপতন অঙ্গীকার করিয়া পুনর্ব্বার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার পরে একটু সুযোগের আভাষ পাইলাম। সমুনার ষ্ট্রীটে "ব্লাকফ্রায়ার্স গ্লাসওয়ার্কস" নামক কারখানায় একদিন প্রবেশ করিলাম। অনেকগুলি লোক সেখানে কাজ করিতেছিল, তাহারা কেহই আমার প্রতি [illegible] করিল না। আমি অধ্যক্ষের অনুসন্ধান করিলাম।

তিনি উপস্থিত ছিলেন না, তাঁর কন্যার সহিত দেখা লইল। আমি কি চাই জিজ্ঞাসিত হইয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলাম। কিঞ্চিৎ কালের মধ্যেই একটা উত্তর আসিয়া মুখে যুটিল—"এক ডজন বোতলের অর্ডার দিতে এসেছি।" আমাকে পর দিন আসিতে বলা হইল। আমি তদনুসারে উপস্থিত হইয়া অধ্যক্ষকে এক ডজন বোতলের অর্ডার দিলাম, এবং মূল্য অগ্রিম দিবার জন্য ব্যস্ততা দেখাইলাম। ইহাতে অধ্যক্ষ ভারি খুসী হইলেন। এই সুযোগেই আমি ঘণ্টা তিনেক কারখানায় ঘুরিয়া কাজ দেখিলাম। শ্রমজীবিগণ আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল। "ভারতবর্ষ কি রকম দেশ? সেখানকার সব লোক তোমার মতনাকি? তারা কি খায়? সেখানে রেলওয়ে আছে?—ইত্যাদি।" রেলওয়ে আছে একথা অনেকে অবিশ্বাস করিল, এবং রেলওয়ে কিরূপ তাহার ধারণা আমার আছে কি না পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহারা আমার কাছে বাঘ, সাপ এবং হাতার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। এই ভাবে আমি সেদিন কারখানা হইতে চলিয়া আসিলাম। তার পরের দিন আবার আমি কারখানায় যাইয়া শ্রমজীবীদের সহিত কথোপকথন করিলাম। তাহাদিগকে আমার প্রতি একটু প্রসন্ন বোধ হইল। কারখানার সত্বাধিকারী মিষ্টার বিব্বিকে আমি মদ খাইবার নিমন্ত্রণ করিলাম, তদুত্তরে তিনি একটি কাষ্ঠফলকের দিকে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিলেন—দেখিলাম, তার মধ্যে লিখিত রহিয়াছে, "এখানে সর্ব্বপ্রকার মাদক পানীয় ব্যবহার হওয়া নিষিদ্ধ।" তিনি কেন মাদক দ্রব্য পান করেন না এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন যে, "আমিও প্রথমতঃ একজন শ্রমজীবী ছিলাম, সপ্তাহে এক গিনি উপায় করিতাম। আমার যাহা কিছু উন্নতি দেখিতেছ আমি মদপান করিলে ইহার কিছুই হইত না।" এই উত্তরে আমার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল, কিন্তু ইহাঁর সহিত বন্ধুত্ব ঘনীভূত করিবার [illegible]

একটু দুঃখিত হইলাম। আমি প্রায়ই সেই কারখানায় যাইয়া শ্রমজীবীদিগের সহিত আলাপ করিতাম, তাহারা আমার প্রতি বিশেষ প্রীত তাহা বুঝিতে পারিলাম। এমন কি এই বিশ্বাসে আমি এতদূর উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম যে, মিষ্টার বিব্বিকে একেবারে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলাম তিনি বেতন লইয়া আমাকে তাঁহার কারখানায় কাজ শিখাইতে স্বীকৃত আছেন কি না? তিনি কিছুমাত্র না ভাবিয়া দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"না, তাহা হইতে পারে না, কখনই নয়।" এখন এই মিষ্টার বিব্বি কি রকম লোকটা ছিলেন তাহা একবার শুনুন; গোঁফদাড়ি কামান, খুব লম্বা, খাড়া একটি মূর্ত্তি কল্পনা করুন; তিনি কাণে কিছু কম শোনেন, এবং অতি অল্প কথা ব্যয় করিয়া থাকেন। যদি কাহাকেও কোন ভুল করিতে দেখেন তবে পিছনে আসিয়া দাঁড়ান এবং দৃঢ়হস্তে ভুলকারীর হস্ত এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সরাইয়া ফেলিয়া তাহাকে ঠিকপথে প্রবর্ত্তিত করেন, এই সংশোধনকার্য্য প্রায়ই নিঃশব্দে সমাহিত হইয়া থাকে। যদি কোন বিষয়ে তিনি "না" বলেন তবে সেই সময়েই সে কথার ইতি হইয়া গেল মনে করিতে হইবে। তাঁহার অস্বীকারসূচক কথা শুনিয়া আমি একেবারে নিরাশমনে ফিরিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় তাঁহার কন্যার সঙ্গে আমার দেখা হইল এবং বহুক্ষণ আলাপ হইল। তিনি আমাকে একেবারে আশা ছাড়িয়া দিতে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন "সুবিধামত আবার কথা পাড়িও"। আমি হয়ত আর সে কারখানায় আসিতাম না, কিন্তু মিস্ বিব্বির উপদেশে আবার সেখানে যাতায়াত করিতে লাগিলাম। কালক্রমে মিষ্টার বিব্বির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা খুব বৃদ্ধি পাইল। আমি একদিন তাঁহাকে থিয়েটরে যাইতে নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনি সচরাচর এসব ব্যাপারে প্রায়ই রাজী হইতেন না, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এবার আমার কথায়

যাইতে দিলেন না। ষ্ট্র্যাণ্ডের উপর যে থিয়েটর ছিল, তাহাতেই গেলাম। সন্ধ্যার সময় আকাশ কুয়াষাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু যখন রাত্রি সাড়ে এগারটার সময় আমরা থিয়েটর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিব তখন আকাশ বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। আমরা হাঁটিয়া আসিলাম। আমাদের পাশে নদীর উপর চন্দ্রকিরণ আসিয়া পড়িয়াছিল, এবং দৃশ্যগুলি এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে আমার মনে হইল আমারও মনের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। এবার মিষ্টার বিব্বিকে আমার সেই পূর্ব্বপ্রশ্ন নূতনভাবে জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইলাম। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে আমার একটি বিশেষ বন্ধু স্বদেশ হইতে এখানে কাচের কাজ শিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। তাহাকে আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনার কারখানায় এপ্রেণ্টিসস্বরূপ রাখিতে পারেন কি না? তিনি বলিলেন, "দেখ, একাজ বড় কঠিন। আমি তাকে নিতে পারি না।" তখন আমি বলিলাম, "সে বড় ভাল লোক, আপনি একবার তার সঙ্গে পরিচিত হলে ভারি খুসী হবেন।" কিন্তু তিনি দৃঢ়ভাবে বলিলেন—"আমি তাকে নিতেই পারিনা। তুমি হ'লে আমি তোমাকে বোধ হয় নিতে পারিতাম, অপর কাহাকেও নিতে পারি না।"—তখন আমি উল্লাসের সহিত বলিয়া উঠিলাম "আপনি আমাকে নেবেন?"—"তা—নিতে পারি।"

"একি একটি প্রতিশ্রুতি?"

"হ্যাঁ, আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌ছি, কাজ শিখতে চাইলে আমি তোমাকে শিখাব।" এই কথাবার্ত্তার পাঁচ মিনিট পরেই আমি তাঁর নিকট বিদায় লইলাম। আমার মনে কি ভাব হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। আমার মনে হইল পর্ব্বতের মত একটা গুরুভার আমার মন হইতে সরিয়া গেল, আমি যেন নূতন জীবন পাইলাম, আমি এতদূর আনন্দিত হইলাম যে সেরাত্রে আমার ঘুম হইল না। প্রত্যূষে

আমি সার জন বার্ডউডকে এই সম্বাদ দিলাম। তিনি আমাকে সমস্ত বিপদ এবং নৈরাশ্যের মধ্যে উৎসাহ দিয়া সজীব রাখিয়াছিলেন। তাঁহারই আশ্বাসে আমি নানারূপ লাঞ্ছনা পাইয়াও অধ্যবসায় ত্যাগ করি নাই। তিনি এই সুখকর সম্বাদ পাইয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং সোৎসাহে আমার করমর্দ্দন করিলেন। আমার মনে হইল তিনি আমার অপেক্ষাও বেশী আনন্দিত হইয়াছেন। জীবনে নিত্যসংঘটিত নানারূপ নীরস কাহিনীর মধ্যে অতি অল্প ঘটনাই স্থায়ী-রূপে স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়। সে দিনের সেই আনন্দ আমি জীবনে বিস্মৃত হইব না।

আমি সার জর্জ্জ বার্ডউডের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিয়া কাচের কারখানায় গেলাম। আমার একবার আশঙ্কা হইয়াছিল, পাছে মিষ্টার বিব্বি তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন না করেন, কিন্তু সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ অমূলক ছিল। আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত হইল—আমি সপ্তাহে এক পাউণ্ড হারে বেতন দিয়া কাজ শিখিব। গতবারে আমার পক্ষে সোমবার দিনটা অশুভ হইয়াছিল, সুতরাং এবার রবিবার দিন কাজ আরম্ভ করিলাম। শনিবার এবং রবিবার মিষ্টার বিব্বির সম্পূর্ণ অবসর, সুতরাং এই দুই দিন রোজ ২ ঘণ্টা করিয়া শিখিব এবং অপরাপর দিন আধ ঘণ্টা করিয়া শিখিব, ইহাই নির্দ্ধারিত হইল।

আমি এইভাবে ১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষ রবিবারে মিষ্টার বিব্বির কারখানায় শিক্ষানবিস স্বরূপ প্রবেশ করিলাম। কিন্তু ৩।৪ দিন কাজ না করিতে করিতেই আবার এক বিপদে পড়িয়া গেলাম। একদিন মিষ্টার বিব্বি ট্রেডস্ ইউনিয়নের লোকদের নিকট হইতে এই মর্ম্মে এক-খানি চিঠি পাইলেন যে, তাঁহারা শুনিতেছেন যে, একজন বিদেশী ভদ্রলোক তাঁহার কারখানায় কাজ শিখিতেছেন, এ বিষয়ে মিষ্টার বিব্বি কি কৈফিয়ৎ দিতে পারেন। মিষ্টার বিব্বি এই চিঠি আমাকে দেখাইলেন

এবং উত্তরে লিখিলেন, তিনি যে লোকটিকে কাজ শিখাইতেছেন, তাঁহাকে তিনি ভালরূপে জানেন। তাঁহার দ্বারা তাঁহাদের বাণিজ্যের কোনরূপ অনিষ্ট হইবে না, ইহা নিশ্চয় জানিয়া তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। এই উত্তর দেওয়ার প্রায় দশ দিন পরে তিনি তাঁহাদের নিকট হইতে আর একখানি চিঠি পাইলেন। তাহাতে লিখিত ছিল যে, যদি তিনি আমাকে অগোণে বিদায় করিয়া না দেন, তবে সমস্ত শিল্পজীবিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে ধর্ম্মঘট করিবে। এই বিপদে আমি আবার চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। এবং নিতান্ত দুঃখিতভাবে মিষ্টার বিব্বিকে বলিলাম—আপনি আমার জন্য যথেষ্ট করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট চিরঋণী থাকিব। কিন্তু আমার জন্য আপনার নিজের অনিষ্ট করা কখনই যুক্তিসঙ্গত নহে, আপনি বিদায় দিন, আমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। তিনি বলিলেন, "তুমি নিরাশ হইও না, একবার তোমাকে যাহা বলিয়াছি তাহার অন্যথা হইবে না, আমি কোন ক্রমেই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করিব না।" এই বলিয়া তিনি ট্রেডস্ ইউনিয়ানকে এই মর্ম্মে চিঠি লিখিলেন যে—তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিত আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। আমার দ্বারা এই কারবারের কোনই অনিষ্টের আশঙ্কা নাই. সুতরাং এ সম্বন্ধে আন্দোলন বা কোনরূপ কঠোর বিধানের কোনই প্রয়োজন নাই। ইহা বলা সত্ত্বেও যদি ট্রেড্স্ ইউনিয়ন তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে চাহেন, তবে তাহা অনায়াসে করিতে পারেন, তিনি কিছুতেই প্রতিশ্রুতিপালনে বিরত হইবেন না।" ইহার পরে ট্রেড্স ইউনিয়ান আর কিছু করেন নাই। এই ঘটনার পরে আমি বুঝিতে পারিলাম, মিষ্টার বিব্বির প্রতিশ্রুতিভঙ্গ সম্বন্ধে আমার আশঙ্কা কতদূর অমূলক ছিল,—এবং মনে মনে ভারি লজ্জিত হইলাম।

মিষ্টার বিব্বি আমাকে একটা চিমটা, একখানা কাঁচি, একটা

ক্লুট-ক্লিপ্ এবং একটি ফুৎকারের যন্ত্র দিলেন, এবং আমি কাজ আরম্ভ করিলাম। কারখানায় কিরূপ আগুনের নিকট কাজ করিতে হয়, তাহা অনেকের ধারণাই নাই। প্রথম প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়া আমার মনে হইত যেন মূর্চ্ছা যাইব, কাজ করিতে করিতে আমি হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। সাধারণতঃ আমি তিন চার ঘণ্টার বেশী কাজ করিতে পারিতাম না। এই সময়ের বেশী কাজ করা অসম্ভব। কার্য্যান্তে যখন আমি বাড়ীতে ফিরিতাম, তখন দিনের বাকী সময়টা মৃতের মত পড়িয়া থাকিতাম। অনেক সময়ই আমি পীড়িত থাকিতাম, এবং মনে মনে এই প্রশ্ন হইত কেন আমি শরীরকে এত কষ্ট দিতেছি? এইরূপ অবসন্নতার মধ্যেও সার জর্জ্জ বার্ডিউডের অবিরাম উৎসাহে আমি কার্য্যক্ষেত্রে সুদৃঢ় ছিলাম। যাহা হউক, যখন একবার কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত অধ্যবসায় স্থির রাখিতে হইবেই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণ ছাড়া এমন আরও কতকগুলি কারণ ছিল যাহাতে অসুবিধা বোধ করিতাম। সেগুলি কতকটা আমাদের দেশীয় সংস্কারজনিত, ইংরেজরা তাহা ভালরূপ বুঝিতে পারিতেন না। মনে করুন প্রথম দিনেই মিষ্টার বিব্বি ফুৎকার যন্ত্রটি নিজের মুখ হইতে নামাইয়া তন্মধ্যে ফুঁ দিবার জন্য আমার নিকট ধরিলেন। তখন আমার সমস্ত ব্রাহ্মণ্যরক্ত বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। মিষ্টার বিব্বির মুখের দিকে তাকাইয়া এই কার্য্যে আমি এত ঘৃণাবোধ করিলাম যে, আমি ফুঁ দিতে অত্যন্ত দ্বিধা বোধ করিলাম। মিষ্টার বিব্বি বলিলেন—"তুমি কর্‌ছ কি? শীঘ্র ফুঁ দাও, কাচ জুড়িয়ে গেল।" তথাপি আমাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া তিনি বলিলেন—"তুমি হাবার মত দাঁড়িয়ে রৈলে যে? তোমার বুঝতে হবে যে তোমাকে মুখ দিয়ে ফুঁ দিতে হবে, চোখ দিয়ে দিতে হবে না।" সেদিন কাচ জুড়াইয়া গেল।

যাহা হউক ক্রমে ক্রমে আমি আমার ঘোর সংস্কার ও অনিচ্ছা দমন

করিয়া কার্য্যে অভ্যস্ত হইলাম। ইহার পরে শ্রমজীবিগণের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন করা আমার ঐকান্তিক যত্নের বিষয় হইল। তাহাদের প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সহায়তা না পাইলে আমার পক্ষে উৎকৃষ্টরূপে শিক্ষালাভ অসম্ভব। তদর্থে আমাকে ঠিক তাহাদেরই মত বেশভূষা, আচারব্যবহার এবং কথায় কথায় শপথ করার প্রণালীও অবলম্বন করিতে হইল। তাহাদের সঙ্গে দেখা হইলে মাথার টুপি উঠাইতে হইবে না, ঐরূপ ব্যবহার ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত। শ্রমজীবীদের সঙ্গে দেখা হইলে টুপিতে শুধু হস্তস্পর্শ করিতে হইবে, তাহাদিগকে মিষ্টার বলিয়া সম্বোধন করিলে তোমাকে ভদ্রলোক মনে করিয়া সে দূরে থাকিবে, তাহাকে দেখিলে "কি হে ভায়া! ওহে জ্যাক্—কি জিম"—এই ভাবে সম্বোধন করিলে সে ভারি খুসী হয়। এবং প্রথম সাক্ষাৎকারের সময় করমর্দ্দন করিতে হইবে, সেই কর, কালী কি ধুলিময় যেরূপ অবস্থায়ই থাকে তাহাতে শিহরিত হইতে হইবে না। অনেক সময় তাহাদের বাড়ী পর্য্যন্ত যাইয়া গৃহিণীর সহিতও তদ্রূপ ব্যবহার করিতে হইবে। কখন বা তাহার ছেলেটিকে ধরিয়া—"কি সুন্দর! ঠিক এর মায়ের মত" এই ভাবে আদর করিতে হইবে। যদি ঘরে কোন বড় ছেলে বা মেয়ে থাকে তাহাদিগকে একটি সিকি দিলে খুব ঘরের লোক বনিয়া যাইবে। আসল কথা তাহাদের সঙ্গে এরূপভাবে মিশিতে হইবে যে তোমার সঙ্গে কোনরূপ বিভিন্নতা আছে ইহা যেন বোধ করিবার সুবিধা না পায়। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আচরণ দ্বারা আমার সঙ্গে তাহাদের গভীর সহানুভূতি স্থাপিত হইয়াছিল। বিশেষ কোন সময় খুব বড় একটা দান করিয়াও সেরূপ প্রীতি উৎপাদন সম্ভবপর হয় না। আমাদের কারখানার শ্রমজীবীরা অপরাহ্নে চা খাইত, চা-পাত্রটি টিন নির্ম্মিত, তাহাতে সারাদিন কাদা গোলা হইতে আরম্ভ করিয়া সহস্র প্রকার কার্য্য হইত; তাহার উপরের রং উঠিয়া গিয়াছিল। সেই

চা-পাত্রে একটু গরম জল আর চা একজনে খাইয়া আর একজনের হাতে দিতে থাকিত, এবং যখন আমার পালা আসিত তখন মনের সমস্ত ঘৃণা দমন করিয়া আমাকেও তাহার অংশ গ্রহণ করিতে হইত। সেই চায়ের মধ্যে একটু দুধ বা চিনির লেশ মাত্র থাকিত না। তাহার আস্বাদ অবর্ণনীয়। যখন কারখানা হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া যাইতে হইবে তখন হাত ধুইবার জল নাই। জামাতে হাত মোছাই সেখানকার রীতি। এই সব করার দরুন আমি এরূপ লোক-প্রিয় হইয়া উঠিলাম যে আমি প্রবেশমাত্রই "কি হে ভায়া"—এই সম্বোধনে চারদিক হইতে আপ্যায়িত হইতাম, এবং যখন আমার কোন ভুল হইত তখন যে তাহা দেখিত সেই দ্রুতপদে আসিয়া আমাকে কাজ শিখাইয়া যাইত। এই সহায়তা না লইলে আমার নানারূপ অসুবিধা হইত তাহা বলাই বাহুল্য। কাচের কারবার সম্বন্ধে কোন তত্ত্বই তাহারা আমার নিকট গোপন করে নাই, এবং সেরূপ করিবার ইচ্ছাও তাহাদের ছিল না। আমি অনেক সময় তাহাদের নিকট রাজনীতি, ব্যবহারনীতি এবং দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে আলাপ করিয়াছি। শিক্ষিত সমাজে যে ভাবে আলাপ হইয়া থাকে ইহা ঠিক সে ভাবে নহে। কিন্তু আমি দেখিয়াছি অনেক সময় পার্লা-মেণ্টের বড় বড় সভ্যগণ যে ভাবে রাজনীতি বুঝিয়া থাকেন, ইহারা তাহা অপেক্ষাও উদার ভাবে সেই সকল সত্য গ্রহণ করিতে পটু। এই বুয়র যুদ্ধ সম্বন্ধে তাহাদের মতামত ঠিক স্বার্থদ্বারা সঙ্কীর্ণদৃষ্টি উচ্চশিক্ষিত শ্রেণীর মত ছিল না, তাহারা উদার ভাবে এ যুদ্ধের ন্যায়ান্যায় বিচার করিতে পারিত। মিষ্টার বিব্বির সঙ্গে আমার সাহিত্যবিষয়ক আলোচনাও হইত, যথা—সেক্সপীয়র বেশ ভাল নাটক লেখক, মিল্টন ভারি পণ্ডিত, ড্রাইডেন ও শেলি কোন কাজেরই নয়, এবং ডাক্তার জন্‌সন্ হইতেছেন সাহিত্যজগতের রাজা, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

একদা আমি একটি শ্রমজীবীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম।

গৃহিণী আমার নিকট একখণ্ড গোমাংস উপস্থিত করাতে আমি ধন্য-বাদের সহিত বলিলাম "আমি মাংস খাইনা।" তখন তিনি বলিলেন "মেষমাংস খাবেন কি?" আমি বলিলাম "আমি কোন মাংসই খাই না।" গৃহস্বামী আমার দিকে ক্রুদ্ধভাবে তাকাইয়া বলিলেন "কেন খাওনা?" আমি বলিলাম "আমার আর কোন আপত্তি নাই, তবে ভাল লাগেনা বলিয়াই খাইনা।" তখন সে চটিয়া লাল হইয়া বলিল—"তোমার মত বেকুব আমি দেখি নাই।" কিন্তু এই "বেকুব" শব্দে সে আত্মীয়তার ভাবই বেশী বুঝাইয়াছিল, সুতরাং আমি ক্ষুব্ধ হই নাই। ইহার পরে আমার একটি সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। আমার পিতৃব্য যিনি আমার শিক্ষার ব্যয় বহন করিতেছিলেন, তাঁহার মৃত্যুসম্বাদ আসিল। আমি কয়েক দিন শোকে কারখানায় যাইতে পারি নাই। তার পর এক দিন উপস্থিত হইলে মিষ্টার বিব্বিকে এই সম্বাদ বলাতে তিনি বলিলেন "তোমার পিতৃব্য কি তোমার জন্য কিছু টাকা রাখিয়া গিয়াছেন?" এই প্রশ্ন হইতেও তাঁহার শেষের কথা নিষ্ঠুরতর,—"যাও তুমি শীঘ্র বাকী শিশিগুলি তৈয়ার করে ফেল।"

আমি ক্ষুণ্ণমনে যন্ত্র লইয়া কাজ করিবার ভাণ করিতে লাগিলাম। ইতিমধ্যে তাঁহার কন্যা আসিয়া আমাকে আমার পিতৃব্যের মৃত্যুসম্বন্ধে, অনেক প্রশ্ন করিলেন। এবং বলিলেন "তোমাকে ভারি খারাপ দেখাইতেছে।" এই কথা শুনিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার পিতৃব্যের কথা আপনাকে কে বলিয়াছে?" তিনি বলিলেন "কেন? বাবা বলিতেছেন যে তুমি বড়ই দমে গিয়েছ, তুমি আজ কোন কাজ করিতে পারিবে না, তোমার মন ভাল করিবার জন্য তিনি আজ তোমাকে কতকগুলি নূতন কাচ দেখাইতে লইয়া যাইবেন।" মিষ্টার বিব্বি যে আমার দুঃখে কম দুঃখিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার প্রকাশ করিবার ভঙ্গী ভিন্ন রকমের।

এই কারখানায় কাজ শিখিতে শিখিতে একটি প্রশ্ন আমার মনে সর্ব্বদা উদয় হইত, এই শ্রমজীবীদের সঙ্গে মিশিয়া পাছে আমি ভদ্রলোকদিগের সঙ্গে মিশিবার অনুপযুক্ত হইয়া পড়ি। অনেক দিন এই আশঙ্কা আমার মনে মনে জাগিয়াছিল, অবশেষে আমি ঠিক করিলাম, আমি কোনক্রমেই শ্রমজীবীদের সঙ্গে এইরূপ মেশামেশি হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না। দীর্ঘকালব্যাপী পরিচয়ের পরে তাহাদের ঔদার্য্য ও সহৃদয়তায় আমি এতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে ইংলণ্ডের অধিপতির সহিত করমর্দ্দনের পূর্ব্বেও তাহাদের শ্রমকর্কশ মলিন হস্তের স্পর্শের জন্য অধিক লালায়িত হইতাম।

শ্রীনীলকণ্ঠ ওয়াগ্‌লে।

মহর্ষির জন্মোৎসব।

[এই প্রবন্ধ পূজনীয় শ্রীমৎ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জন্মোৎসব উপলক্ষে আহূত আত্মীয় ও সুহৃৎ মণ্ডলীর নিকট পঠিত হয়। সুপ্রতিষ্ঠিত প্রবন্ধলেখক ও তাঁহার পিতৃদেব উভয়েই সাধারণ্যে বিশেষরূপ পরিচিত এবং এই প্রবন্ধে ভগবানের সহিত কর্ম্মশীল মানুষের যে নিত্যসম্বন্ধ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে বিষয়টি ব্যক্তিগত পারিবারিক ভক্তির গণ্ডী অতিক্রম করিয়া কতক পরিমাণে সর্ব্বজনীন কথার ভিত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এজন্য সাধারণের উদ্দেশ্যে লিখিত না হইলেও এই হিতকর ও সুখপাঠ্য প্রবন্ধটি আমরা সকলের গোচর করা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিতেছি। ভাঃ সং]।

পূজনীয় পিতৃদেবের আজ অষ্টাশীতিতম সাম্বৎসরিক জন্মোৎসব। এই উৎসবদিনের পবিত্রতা আমরা বিশেষভাবে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিব।

বহুতর দেশকে সঞ্জীবনস্পর্শে উর্ব্বর করিয়া, পুণ্যধারায় বহুতর গ্রামনগরীর পিপাসা মিটাইয়া, অবশেষে জাহ্নবী যেখানে মহাসমুদ্রের

প্রত্যক্ষ সম্মুখে আপন সুদীর্ঘ-পর্য্যটন, অতলস্পর্শ-শান্তির মধ্যে সমাপ্ত করিতে উদ্যত হয়, সেই সাগরসঙ্গমস্থল তীর্থস্থান। পিতৃদেবের পূতজীবন অদ্য আমাদের সম্মুখে সেই তীর্থস্থান অনাবৃত করিয়াছে। তাঁহার পুণ্যকর্ম্মরত দীর্ঘজীবনের একাগ্রধারা অদ্য যেখানে তটহীন, সীমাশূন্য, বিপুল বিরাম-সমুদ্রের সম্মুখীন হইয়াছে, সেইখানে আমরা ক্ষণকালের জন্য নতশিরে স্তব্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইব। আমরা চিন্তা করিয়া দেখিব, বহুকাল পূর্ব্বে একদিন স্বর্গ হইতে কোন্ শুভসূর্য্য-কিরণের আঘাতে অকস্মাৎ সুপ্তি হইতে জাগ্রত হইয়া কঠিন তুষার-বেষ্টনকে অশ্রুধারায় বিগলিত করিয়া এই জীবন আপন কল্যাণযাত্রা আরম্ভ করিয়াছিল—তখন ইহার ক্ষীণ স্বচ্ছধারা কখনও আলোক, কখনও অন্ধকার, কখনও আশা, কখনও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়া দুর্গম পথ কাটিয়া কাটিয়া চলিতেছিল। বাধা প্রতিদিন বৃহদাকার হইয়া দেখা দিতে লাগিল—কঠিন প্রস্তরপিণ্ডসকল পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল—কিন্তু সে সকল বাধায় স্রোতকে রুদ্ধ না করিতে পারিয়া দ্বিগুণ বেগে উদ্বেল করিয়া তুলিল—দুঃসাধ্য দুর্গমতা সেই দুর্ব্বার বলের নিকট মস্তক নত করিয়া দিল। এই জীবনধারা ক্রমশঃ বৃহৎ হইয়া বিস্তৃত হইয়া লোকালয়ের মধ্যে অবতরণ করিল, দুই কূলকে নবজীবনে অভিষিক্ত করিয়া চলিল, বাধা মানিল না, বিশ্রাম করিল না, কিছুতেই তাহাকে লক্ষ্য হইতে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিল না—অবশেষে আজ সেই একনিষ্ঠ অনন্যপরায়ণ জীবনস্রোত সংসারের দুই কূলকে আচ্ছন্ন করিয়া অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে—আজ সে তাহার সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত চাঞ্চল্যকে পরমপরিণামের সম্মুখে প্রশান্ত করিয়া পরিপূর্ণ আত্মবিসর্জ্জনের দিকে আপনাকে প্রসারিত করিয়াছে—অনন্ত জীবনসমুদ্রের সহিত সার্থক জীবনধারার এই সুগম্ভীর সম্মিলনদৃশ্য অদ্য আমাদের ধ্যাননেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়া আমাদিগকে ধন্য করুক।

অমৃতপিপাসা ও অমৃতসন্ধানের পথে ঐশ্বর্য্য একটা প্রধান অন্তরায়। সামান্য সোনার প্রাচীর উচ্চ হইয়া উঠিয়া আমাদের দৃষ্টি হইতে অনন্ত আকাশের অমৃত আলোককে রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইতে পারে। ধনসম্পদের মধ্যেই দীনহৃদয় আপনার সার্থকতা উপলব্ধি করিতে থাকে—সে বলে, এই ত আমি কৃতার্থ হইয়াছি, দশে আমার স্তব করিতেছে, দেশে আমার প্রতাপ বিকীর্ণ হইতেছে, বাহিরে আমার আড়ম্বর অভ্রভেদ করিতেছে, ঘরে আমার আরামশয়ন প্রতিদিন স্তরে স্তরে রাশিকৃত হইয়া উঠিতেছে, —আমার আর কি চাই! হায়রে দরিদ্র, নিখিল মানবের অন্তরাত্মা যখন ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছে, যাহাতে আমি অমর না হইব তাহা লইয়া আমি কি করিব—"যেনাহংনামৃতস্যাম্ কিমহং তেন কুর্য্যাম্"—সপ্তলোক যখন অন্তরীক্ষে উর্দ্ধকররাজি প্রসারিত করিয়া প্রার্থনা করিতেছে, আমাকে সত্য দাও, আলোক দাও, অমৃত দাও, অসতোমা সদ্গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মামৃতংগময়—তখন তুমি বলিতেছ আমার ধন আছে, আমার মান আছে, আমার আরাম আছে, আমি প্রভু, আমি অধিপতি, আমার আর কি চাই! ঐশ্বর্য্যের ইহাই বিড়ম্বনা—দীনাত্মার কাছে ঐশ্বর্য্যই চরম সার্থকতার রূপ ধারণ করে। অদ্যকার উৎসবে আমরা যাঁহার মাহাত্ম্য স্মরণ করিবার জন্য সমবেত হইয়াছি—একদা প্রথম যৌবনেই তাঁহার অধ্যাত্মদৃষ্টি এই কঠিন ঐশ্বর্য্যের দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া অনন্তের দিকে উন্মীলিত হইয়াছিল—যখন তিনি ধনমানের দ্বারা নীরন্ধ্র ভাবে আবৃত আচ্ছন্ন ছিলেন, তখনি ধনসম্পদের স্থূলতম আবরণ ভেদ করিয়া, স্তাবকগণের বন্দনাগানকে অধঃকৃত করিয়া, আরাম-আমোদ-আড়ম্বরের ঘন যবনিকা বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই অমৃতবাণী তাঁহার কর্ণে কেমন করিয়া প্রবেশলাভ করিল যে, ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং—যাহা কিছু সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছন্ন দেখিবে, ধনের দ্বারা নহে, স্বার্থের দ্বারা নহে, আত্মাভিমানের দ্বারা নহে

—যিনি ঈশানং ভূতভব্যস্ত—যিনি আমাদের অনন্তকালের ঈশ্বর, আমাদের ভূতভবিষ্যতের প্রভু—তাঁহাকে এই ধনিসন্তান কেমন করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে ঐশ্বর্য্যপ্রভাবের ঊর্দ্ধে সমস্ত প্রভুত্বের উচ্চে আপনার একমাত্র প্রভু বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে পারিলেন—সংসারের মধ্যে তাঁহার নিজের প্রভুত্ব, সমাজের মধ্যে তাঁহার ধনমর্য্যাদার সম্মান—তাঁহাকে অন্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না!

আবার যেদিন এই প্রভূত ঐশ্বর্য্য, অকস্মাৎ এক দুর্দ্দিনের বজ্রাঘাতে বিপুল আয়োজন-আড়ম্বর লইয়া তাঁহার চতুর্দ্দিকে সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—ঋণ যখন উপন্যাসের দানবের ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই বৃহদাকার ধারণ করিয়া তাঁহার গৃহদ্বার, তাঁহার সুখসমৃদ্ধি, তাঁহার অশনবসন সমস্তই গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল—তখনও—পদ্ম যেমন আপন মৃণালবৃন্ত দীর্ঘতর করিয়া জলপ্লাবনের ঊর্দ্ধে আপনাকে সূর্য্যকিরণের দিকে নির্ম্মল সৌন্দর্য্যে উন্মেষিত করিয়া রাখে, তেমনি করিয়া তিনি সমস্ত বিপদ্‌বন্যার ঊর্দ্ধে আপনার অম্লানহৃদয়কে ধ্রুব-জ্যোতির দিকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া রাখিলেন। সম্পদ্ যাঁহাকে অমৃত-লাভ হইতে তিরস্কৃত করিতে পারে নাই, বিপদও তাঁহাকে অমৃতসঞ্চয় হইতে বঞ্চিত করিতে পারিল না। সেই দুঃসময়কেই তিনি আত্ম-জ্যোতির দ্বারা সুসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন—যখন তাঁহার ধনসম্পদ্ ধূলিশায়ী, তখনই তিনি তাঁহার দৈন্যের ঊর্দ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া পরমাত্মসম্পদ্-বিতরণের উপলক্ষ্যে সমস্ত ভারতবর্ষকে মুহুর্মুহু আহ্বান করিতেছিলেন। সম্পদের দিনে তিনি ভুবনেশ্বরের দ্বারে রিক্তহস্তে ভিক্ষু হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিপদের দিনে তিনি আত্মৈশ্বর্য্যের গৌরবে ব্রহ্মসত্র খুলিয়া বিশ্বপতির প্রসাদসুধাবণ্টনের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঐশ্বর্য্যের সুখশয্যা হইতে তুলিয়া লইয়া ধর্ম্ম ইঁহাকে তাঁহার পথের

বদন্তি—কবিরা বলেন, সেই পথ ক্ষুরধারনিশিত অতি দুর্গম পথ। লোকাচারপ্রচলিত চিরাভ্যস্ত ধর্ম্ম, আরামের ধর্ম্ম, তাহা অন্ধভাবে জড়ভাবেও পালন করিয়া যাওয়া চলে এবং তাহা পালন করিয়া লোকের নিকট সহজেই যশোলাভ করিতে পারা যায়। ধর্ম্মের সেই আরাম, সেই সম্মানকেও পিতৃদেব পরিহার করিয়াছিলেন। ক্ষুরধারনিশিত দুরতিক্রম্য পথেই তিনি নির্ভয়ে পদনিক্ষেপ করিলেন। লোকসমাজের আনুগত্য করিতে গিয়া তিনি আত্মবিদ্রোহী আত্মঘাতী হইলেন না।

ধনিগৃহে যাঁহাদের জন্ম, পৈতৃককাল হইতেই সমাজের নিকট সম্মানলাভে যাঁহারা অভ্যস্ত, সমাজপ্রচলিত সংস্কারের নিবিড় ব্যূহ ভেদ করিয়া নিজের অন্তর্লব্ধ সত্যের পতাকাকে শত্রুমিত্রের ধিক্কার, লাঞ্ছনা ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে অবিচলিত দৃঢ়মুষ্টিতে ধারণ করিয়া রাখা তাঁহাদের পক্ষে কোনমতেই সহজ নহে—বিশেষতঃ বৈষয়িক সঙ্কটের সময় সকলের আনুকূল্য যখন অত্যাবশ্যক হইয়া উঠে তখন তাহা যে কিরূপ কঠিন সে কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সেই তরুণ বয়সে, বৈষয়িক দুর্যোগের দিনে, সম্ভ্রান্তসমাজে তাঁহার যে বংশগত প্রভূত প্রতিপত্তি ছিল, তাহার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, পিতৃদেব ভারতবর্ষের ঋষিবন্দিত চিরন্তন ব্রহ্মের, সেই অপ্রতিম দেবাধিদেবের আধ্যাত্মিক পূজা, প্রতিকূল সমাজের নিকট মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন।

তাহার পরে তাঁহার জীবনে আর এক গুরুতর সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইল। সকলেই জানেন, বৈচিত্র্যই জগতে ঐক্যকে প্রমাণ করে—বৈচিত্র্য যতই সুনির্দ্দিষ্ট হয়, ঐক্য ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ধর্ম্মও সেইরূপ নানাসমাজের ইতিহাসকে আশ্রয় করিয়া নানা বিভিন্ন-কণ্ঠে নানা বিচিত্র আকারে এক নিত্য সত্যকে চারিদিক্ হইতে সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। ভারতবর্ষ বিশেষসাধনায় বিশেষ-ভাবে যাহা লাভ করিয়াছে, তাহার ভারতবর্ষীয় আকার বিলুপ্ত করিয়া,

তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস হইতে উৎপাটিত করিয়া, তাহাকে অন্যদেশীয় আকৃতি-প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিলে জগতের ঐক্যমূলক বৈচিত্র্যের ধর্ম্মকে লঙ্ঘন করা হয়। প্রত্যেক লোক যখন আপনার প্রকৃতি অনুসারে পরিপূর্ণ উৎকর্ষলাভ করে তখনই সে মনুষ্যত্বলাভ করে—সাধারণ মনুষ্যত্ব ব্যক্তিগত বিশেষত্বের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্যত্ব হিন্দুর মধ্যে এবং খৃষ্টানের মধ্যে বস্তুতঃ একই, কিন্তু তথাপি হিন্দুবিশেষত্ব মনুষ্যত্বের একটি বিশেষ সম্পদ্, এবং খৃষ্টানবিশেষত্বও মনুষ্যত্বের একটি বিশেষলাভ; তাহার কোনটা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিলে মনুষ্যত্ব দৈন্যপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, য়ুরোপের যাহা শ্রেষ্ঠধন তাহাও সার্ব্বভৌমিক, কিন্তু তথাপিও ভারতবর্ষীয়তা এবং য়ুরোপীয়তা উভয়ের স্বতন্ত্র সার্থকতা আছে বলিয়া উভয়কে একাকার করিয়া দেওয়া চলে না। মেঘ আকাশ হইতে জলবর্ষণ করে এবং সরোবর ভূতলে থাকিয়া জলদান করে—যদিও দানের সামগ্রী একই তথাপি এই পার্থক্য বশতই মেঘ আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে ধন্য এবং সরোবরও আপন প্রকৃতি অনুসারে বিশেষভাবে কৃতার্থ। ইহারা উভয়ে এক হইয়া গেলে জলের পরিমাণ মোটের উপরে কমে না, কিন্তু জগতে ক্ষতির কারণ ঘটে।

তরুণব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এই কথা ভুলিয়াছিল, যখন ধর্ম্মের স্বদেশীয় রূপরক্ষা করাকে সে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত—যখন সে মনে করিয়াছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্য্যরক্ষা হয়, তখন পিতৃদেব সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার করিলেন

তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদস্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্ত্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহায়গণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজে সকল দিক হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে—যাঁহার অন্তকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝরধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।

ইঁহাকে যেমন আমরা সম্পদে-বিপদে অভয় আশ্রয়ে অবিচলিত দেখিয়াছি—তেমনি একবার বর্ত্তমান সমাজের প্রতিকূলে, আর একবার হিন্দুসমাজের অনুকূলে তাঁহাকে সত্যে-বিশ্বাসে দৃঢ় থাকিতে দেখিলাম—দেখিলাম উপস্থিত গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা তাঁহাকে টলাইতে পারিল না—হিন্দুসমাজের মধ্যে তিনি পরমদুর্দ্দিনেও একাকী দাঁড়াইয়াছিলেন, ব্রাহ্মসমাজে তিনি নব-আশা, নব-উৎসাহের অভ্যুদয়ের মুখে পুনর্ব্বার সমস্ত ত্যাগ করিয়া একাকী দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেবল এই প্রার্থনা রহিল, মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ—আমি ব্রহ্মকে ত্যাগ করিলাম না, ব্রহ্ম আমাকে ত্যাগ না করুন!

ধনসম্পদের স্বর্ণস্তূপরচিত ঘনান্ধকার ভেদ করিয়া, নবযৌবনের অপরিতৃপ্ত প্রবৃত্তির পরিবেষ্টনের মধ্যে দিব্যজ্যোতি যাঁহার ললাটস্পর্শ করিয়াছিল, ঘনীভূত বিপদের ভ্রূকুটী-কুটিল-রুদ্রচ্ছায়ায় আসন্ন দারিদ্র্যের উদ্যত-বজ্রদণ্ডের সম্মুখেও ঈশ্বরের প্রসন্নমুখচ্ছবি যাঁহার অনিমেষ অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে অচঞ্চল ছিল, দুর্দ্দিনের সময়েও সমস্ত লোকভয় অতিক্রম করিয়া যাঁহার কর্ণে ধর্ম্মের মাভৈঃবাণী সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছিল, বলবৃদ্ধি-দলপুষ্টির মুখে যিনি বিশ্বাসের বলে সমস্ত সহায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নিঃসঙ্কোচে পরমসহায়ের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহার পুণ্যচেষ্টাভূয়িষ্ঠ সুদীর্ঘ জীবনদিনের

সায়াহ্নকাল সমাগত হইয়াছে। অদ্য তাঁহার ক্লান্তকণ্ঠের স্বর ক্ষীণ, কিন্তু তাঁহার সম্পূর্ণপ্রায় জীবনের নিঃশব্দবাণী সুস্পষ্টতর, অদ্য তাঁহার ইহজীবনের কর্ম্ম সমাপ্ত, কিন্তু তাঁহার জীবনব্যাপী কর্ম্মচেষ্টার মূলদেশ হইতে যে একাগ্রনিষ্ঠা উর্দ্ধলোকে উঠিয়াছে তাহা আজ নিস্তব্ধভাবে প্রকাশমান। অদ্য তিনি তাঁহার এই বৃহৎ সংসারের বহির্দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু সংসারের সমস্ত সুখদুঃখ-বিচ্ছেদমিলনের মধ্যে যে অচলা শান্তি জননীর আশীর্ব্বাদের ন্যায় চিরদিন তাঁহার অন্তরে ধ্রুব হইয়াছিল, তাহা দিনান্তকালের রমণীয় সূর্য্যাস্তচ্ছটার ন্যায় অদ্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া উদ্ভাসিত। কর্ম্মশালায় তিনি তাঁহার জীবনেশ্বরের আদেশপালন করিয়া অদ্য বিরামশালায় তিনি তাঁহার হৃদয়েশ্বরের সহিত নির্বাধমিলনের পথে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছেন। এই পুণ্যক্ষণে আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিবার জন্য, তাঁহার সার্থক জীবনের শান্তিসৌন্দর্য্যমণ্ডিত শেষরশ্মিচ্ছটা মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিবার জন্য, এখানে সমাগত হইয়াছি।

বন্ধুগণ, যাঁহার জীবন আপনাদের জীবনশিখাকে ক্ষণে ক্ষণে উজ্জ্বল করিয়াছে, যাঁহার বাণী অবসাদের সময় আপনাদিগকে বল ও বিষাদের সময় আপনাদিগকে সান্ত্বনা দিয়াছে, তাঁহার জন্মদিনকে উৎসবের দিন করিয়া আপনারা ভক্তিকে চরিতার্থ করিতে আসিয়াছেন, এইখানে আমি আমার পুত্রসম্বন্ধ লইয়া এই উৎসবদিনে যদি ক্ষণকালের জন্য পিতার নিকট বিশেষভাবে উপস্থিত হই, তবে আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। সন্নিকটবর্ত্তী মহাত্মাকে সমগ্রভাবে সম্পূর্ণভাবে দেখিবার অবসর আত্মীয়দের প্রায় ঘটে না। সংসারের সম্বন্ধ বিচিত্র সম্বন্ধ, বিচিত্র স্বার্থ, বিচিত্র মত, বিচিত্র প্রবৃত্তি—ইহার দ্বারা বিচারশক্তির বিশুদ্ধতা রক্ষা করা কঠিন হয়, ছোট জিনিষ বড় হইয়া উঠে,

[illegible]

ঘাতপ্রতিঘাতে প্রকৃত পরিচয় প্রত্যহ খণ্ডিত হইয়া যায়—এই জন্যই পিতৃদেবের এই জন্মদিনের উৎসব তাঁহার আত্মীয়দের পক্ষে একটা বিশেষ শুভ অবসর—যে পরিমাণ দূরে দাঁড়াইলে মহত্ত্বকে আদ্যোপান্ত অখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়, অদ্যকার এই উৎসবের সুযোগে বাহিরের ভক্তমণ্ডলীর সহিত একাসনে বসিয়া আমরা সেই পরিমাণ দূরে আসিব, তাঁহাকে ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত তুচ্ছ সম্বন্ধজাল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিব, আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনের প্রাত্যহিক ব্যবহারোৎক্ষিপ্ত সমস্ত ধূলিরাশিকে অপসারিত করিয়া তাঁহাকে বৃহৎ আকাশের মধ্যে, নির্ম্মল শান্তির মধ্যে, দেব-প্রসাদের অক্ষুণ্ণ আনন্দরশ্মির মধ্যে, তাঁহার যথার্থ মহিমায় তাঁহাকে তাঁহার জীবনের নিত্যপ্রতিষ্ঠার উপরে সমাসীন দেখিব। সংসারের আবর্ত্তে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যত বিদ্রোহ, যত চপলতা, যত অন্যায় করিয়াছি, অদ্য তাহার জন্য তাঁহার শ্রীচরণে একান্তচিত্তে ক্ষমা প্রার্থনা করিব—আজ তাঁহাকে আমাদের সংসারের, আমাদের সর্ব্বপ্রয়োজনের অতীত করিয়া তাঁহাকে বিশ্বভুবনের ও বিশ্বভুবনেশ্বরের সহিত বৃহৎ নিত্যসম্বন্ধে যুক্ত করিয়া দেখিব এবং তাঁহার নিকট এই আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিব, যে, যে চিরজীবনের ধনকে তিনি নিজের জীবনের মধ্যে সঞ্চিত করিয়াছেন, সেই সঞ্চয়কেই যেন আমরা সর্ব্বপ্রধান পৈতৃক সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করি, তাঁহার জীবনের দৃষ্টান্ত যেন আমাদিগকে ধনসম্পদের অন্ধতা হইতে রক্ষা করে, বিপদের বিভীষিকা হইতে উদ্ধার করে, বিশ্বাসের দৃঢ়তার মধ্যে আমাদিগকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিনি ঋষিদের যে মন্ত্র আমাদের কর্ণে ধ্বনিত করিয়াছেন, তাহা যেন কোনও আরামের জড়ত্বে কোনও নৈরাশ্যের অবসাদে বিস্মৃত না হই —

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাম্ মা মা ব্রহ্মনিরাকরোৎ
অনিরাকরণমস্তু অনিরাকরণ মেঽস্তু।

বন্ধুগণ, ভ্রাতৃগণ, এই সপ্তাশীতিবর্ষীয় জীবনের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আনন্দিত হও, আশান্বিত হও। ইহা জান যে, সত্যমেবজয়তেনানৃতং— ইহা জান যে, ধর্ম্মই ধর্ম্মের সার্থকতা। ইহা জান যে আমরা যাহাকে সম্পদ বলিয়া উন্মত্ত হই তাহা সম্পদ্ নহে, যাহাকে বিপদ্ বলিয়া ভীত হই তাহা বিপদ নহে, আমাদের অন্তরাত্মা সম্পদবিপদের অতীত যে পরমা শান্তি তাহাকে আশ্রয় করিবার অধিকারী। ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ, সমস্ত জীবন দিয়া ভূমাকেই জানিতে ইচ্ছা কর, এবং সমস্ত জীবনের মধ্যে ভূমাকেই সপ্রমাণ কর। এই প্রার্থনা কর, আবিরাবীর্ম্ম এধি, হে স্বপ্রকাশ আমার নিকটে প্রকাশিত হও—আমার নিকটে প্রকাশিত হইলে সেই প্রকাশ আমাকে অতিক্রম করিয়া সমস্ত মানবের নিকট সহজে দীপ্যমান হইয়া উঠিবে—এইরূপে আমার জীবন সমস্ত মানবের নিত্যজীবনের মধ্যে উৎসর্গীকৃত হইয়া থাকিবে; আমার এই কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্য সার্থক হইবে!

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বদরি-নারায়ণে সূর্য্যোদয়।

তীক্ষ্ণরশ্মি-অসি-ধারে বিদারি আঁধার,
রুধির-ধারায় প্লাবি, উঠেনিক রবি,
প্রতাপ তাঁহার মাত্র হয়ে আগুসার
বিকম্পিছে ভীতি-শীর্ণ অন্ধকার ছবি;—
হেন কালে চেয়ে দেখি উত্তর-আকাশে,
তুষার-ভূষিত যেথা বদরি-ভূধর
সুদূর অনন্ত ম্লান কান্তি পরকাশে,
দিগন্তে বিলীন দেহ,—মহান্, ধূসর!
ধূম্র সাগরের যেন ঊর্ম্মি অচঞ্চল
মিশি নভে, ক্ষীণ-শুভ্র ফেনার কিরীটে!
বিপন্ন মহেন্দ্র কিম্বা, লগ্ন-শিরস্তল
ধ্যান-মগ্ন ধূর্জ্জটির বেদীপাদপীঠে!
কিম্বা, এ কি তমোমাঝে সত্ত্বের প্রয়াস?
নিরাশা-মজ্জিত, কিম্বা, শুভ্র উচ্চ আশ?

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

বেদান্ত।*

বেদ অর্থে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদের সংহিতা ভাগকে লক্ষ্য করেন, কিন্তু আমরা এদেশে বেদ বলিলে সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষৎ বেদের এই ভাগ চতুষ্টয় বুঝি।

পাশ্চাত্যেরা এবং তাঁহাদের মতানুবর্ত্তী প্রাচ্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বেদের সংহিতা বা মন্ত্রভাগ যখন রচিত হয়, তখন দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব ঋষি সমাজে প্রস্ফুটিত হয় নাই; তদনুসারে তাঁহারা বৈদিক সাহিত্যের যুগ-ভেদ করিয়াছেন। আমার মতে এই সিদ্ধান্ত সমীচীন নহে; আমার বিশ্বাস বৈদিক যুগের প্রারম্ভ হইতেই এদেশে অধ্যাত্মবিদ্যার প্রচলন ছিল। অতএব বেদ ও বেদান্তের পৌর্ব্বাপর্য্য আমি স্বীকার করি না। তবে যদি বেদান্ত অর্থে বেদান্ত দর্শন বা ব্রহ্মসূত্র প্রশ্নকর্ত্তার অভিপ্রেত হয়, এবং বেদ অর্থে তিনি বেদের সংহিতাভাগকে লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তবে অবশ্য বেদান্ত বেদের অনেক পরবর্ত্তী।

১। বেদের সহিত বেদান্তের সম্বন্ধ কি? বেদে ব্রহ্মজ্ঞানের যে অঙ্কুর লক্ষিত হয়, বেদান্তে তাহার পূর্ণ বিকাশ পাইয়াছে এই সিদ্ধান্ত সমীচীন কি না?

পুরাণে বেদ সঙ্কলনের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ দেখা যায়, তাহাতে জানা যায় যে কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস এই সঙ্কলন কার্য্য নিষ্পন্ন করেন। তিনি মহাভারতের যুদ্ধের সমসাময়িক। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই মতের সমর্থক; তাঁহারাও বলেন যে বেদ-মন্ত্রের সঙ্কলন কাল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সমসাময়িক। বেদব্যাস কেবল যে বেদমন্ত্রের সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি পুরাণ সংহিতা নাম দিয়া তৎকাল প্রচলিত আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধির সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

* বেদান্ত সম্বন্ধীয় আমাদের কতকগুলি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় এই প্রবন্ধটি আমাদের নিকট লিখিয়া পাঠাইয়া [illegible]

পুরাণ সংহিতাং চক্রে পুরাণার্থবিশারদঃ ॥

এই বিবরণ কাল্পনিক মনে করিবার কোন কারণ নাই। কারণ শতপথ, ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা এবং কল্পকে স্বাধ্যায়ের বিষয় (subjects of study) বলা হইয়াছে, এবং কৌষিতকী ব্রাহ্মণে আখ্যানবিদ্‌গণের (আখ্যানবিদঃ) উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদব্যাসের যে শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ বেদ সঙ্কলন কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন, পুরাণে তাঁহাদের নাম রক্ষিত হইয়াছে। বেদের যে সকল শাখার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, দেখা যায় সে সকল শাখা ইহাঁদেরই নামে প্রচলিত। ইহা দ্বারা পৌরাণিক বিবরণের সত্যতা সমর্থিত হইতেছে।

ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও প্রাচীনতম উপনিষৎ সমূহে যে সকল আধ্যাত্মিকতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশের প্রচারকও ব্যাসের ঐ শিষ্য প্রশিষ্যগণ। কিন্তু তাঁহারাই যে ঐ সকল তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তা এরূপ ধারণা অসঙ্গত; কারণ পাশ্চাত্যেরাই স্বীকার করেন যে, যে বিকশিত আকারে আমরা ঐ সকল তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাই, তাহা দীর্ঘকাল ব্যাপী পূর্ব্ব গবেষণার ফল। দ্বিতীয়তঃ ঐ সকল গ্রন্থেই পূর্ব্বাচার্য্য ও ঋষিগণের সম্প্রদায় পরম্পরার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ঐ পরম্পরাক্রমে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রচলন ছিল। বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্যগণ উহারই সংগ্রহ করিয়াছিলেন মাত্র। আমার মতে বেদান্ত ঐ ব্রহ্মবিদ্যারই অংশবিশেষ, উহা সুপ্রাচীন বিদ্যা।

ব্রাহ্মণও উপনিষদের আলোচনা করিলে দেখা যায়, যে স্থানে স্থানে বিবৃত তত্ত্বের সমর্থনের জন্য শ্লোক সমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে। ঐ সকল শ্লোকের ভাষা অনেক স্থলে সংহিতার ভাষার ন্যায় প্রাচীন,—অর্থাৎ আর্ষবৈদিক সংস্কৃতে রচিত; ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীনতম

ব্রাহ্মণ-উপনিষদের পূর্ব্বেও অধ্যাত্ম বিদ্যাবিষয়ক নানা শ্লোকাবলী ঋষি সমাজে প্রচলিত ছিল। ঐ সকল শ্লোক হইতে দেখা যায় যে অতি প্রাচীন কালেই ব্রহ্ম বিদ্যা বা বেদান্ত ঐরূপ শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছিল, অতএব বেদান্তকে আধুনিক বা বৈদিক যুগের উত্তর-কালবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত নহি।

পাশ্চাত্ত্যেরা ভাষার প্রাচীন আকারের উপর নির্ভর করিয়া এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সমীচীন মনে হয় না। বেদের মন্ত্রভাগকে আমি কৃষকের গান বা শিশু মানবের কবিতোচ্ছ্বাস বলিতে প্রস্তুত নহি। বৈদিক মন্ত্র স্বর ও বর্ণাত্মক, পর্য্যায়-নিবদ্ধ শব্দাবলী। ঋষিদিগের মতে সে স্বর বা বর্ণের কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিলে আর মন্ত্রের মন্ত্রত্ব থাকে না। সেইজন্য যখন যে বৈদিক মন্ত্র রচিত হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালেও তাহার ভাষা কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সেইজন্য তাহার আর্ষ সংস্কৃত অক্ষুণ্ণ আছে। গুরু শিষ্য পরম্পরাক্রমে যে সকল বাচনিক উপদেশ প্রাচীন ঋষি সমাজে প্রচলিত ছিল, তাহা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে সঙ্কলিত ও তদানীং প্রচলিত ভাষায় গ্রথিত হইয়াছে। অনেক বৈদিক মন্ত্র তাহার অনেক পূর্ব্বে রচিত, সেইজন্য তাহাদের ভাষা প্রাচীনতর; কিন্তু তাহাতে এরূপ প্রমাণিত হয় না যে, ব্রাহ্মণ—উপনিষদে গ্রথিত তত্ত্বাবলী বৈদিক যুগের পরকালবর্ত্তী; বিশেষতঃ যখন ঐ সকল গ্রন্থেই আর্ষিবৈদিক ভাষায় লিখিত অধ্যাত্ম বিদ্যা বিষয়ক শ্লোকাবলী উদ্ধৃত দেখা যাইতেছে।

বেদের মন্ত্রভাগের বিষয় প্রায় সর্ব্বত্র যজ্ঞীয় দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত বা যজ্ঞে ব্যবহার্য্য মন্ত্র সমূহ। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে কয়েকটি অধ্যাত্মবিদ্যা বিষয়ক ঋক্ সংগৃহীত হইয়াছে বটে, ঐ সকল ঋক্ পূর্ব্বে উল্লিখিত বৈদিকযুগে প্রচলিত আধ্যাত্মিক শ্লোকাবলী উহার মন্ত্র নহে। ব্রাহ্মণের আরণ্যক ও উপনিষদ অংশের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা শ্লোকাবলী

যাহার অন্তর্গত) অতএব বিষয় বিভাগে বেদ ও বেদান্ত পৃথক বস্তু হইতেছে। এক যে অপরের পূর্ব্ববর্ত্তী বা জনক স্থানীয় তাহার বিবেচনা করিবার যথেষ্ঠ হেতু আমি দেখি না।

দর্শনের মৌলিক অর্থ সাক্ষাৎকৃত সত্য অর্থাৎ অপরোক্ষ প্রত্যক্ষ লব্ধ জ্ঞান। এরূপ দর্শন "ঋষি" ভিন্ন অপরের অগম্য। 'ঋষি' অর্থে দ্রষ্টা (Seer)। পরবর্ত্তী কালে দর্শন শব্দ পাশ্চাত্য ফিলজফি শব্দের একার্থ বাচক হইয়াছে। সেই অর্থে চার্ব্বাক মতও দর্শন শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়াছে। হিন্দুদিগের যে ষড়্ দর্শন অর্থাৎ ছয় আস্তিক দর্শন (ন্যায়ও বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত (ইহারা সকলেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত নহে ইহাদের মধ্যে মীমাংসা ও বেদান্তই স্মৃতির মধ্যে গণ্য। বেদের দুই ভাগ; কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ কর্ম্মকাণ্ডের প্রতিপাদক; আরণ্যক ও উপনিষৎ জ্ঞানকাণ্ডের প্রতিপাদক। কর্ম্মকাণ্ড বেদের বিরুদ্ধাংশের সামঞ্জস্য বিধানই প্রধানতঃ মীমাংসাদর্শনের প্রতিপাদ্য; আর জ্ঞানকাণ্ড বেদের বিরোধ ভঞ্জন ও সমীকরণই বেদান্ত দর্শনের মুখ্য প্রতিপাদ্য। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য ও পাতঞ্জল স্থানে স্থানে শ্রুতির বিরোধী। ঐ ঐ দর্শনের সেই সকল অংশ অগ্রাহ্য; যেমন নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের অভিমত পরমাণুর নিত্যতা, কিংবা সাংখ্য ও পাতঞ্জলের অভিপ্রেত অচেতন প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ জগদ্রূপে বিপরিণাম। হিন্দুর দৃষ্টিতে মীমাংসা ও বেদান্তদর্শনে বেদের বিরুদ্ধ কোন কিছু নাই, সেই জন্য ঐ দুই দর্শনই সম্পূর্ণ গ্রাহ্য।

২। দর্শন সংজ্ঞাটি হিন্দুরা ধর্ম্মশাস্ত্রের অঙ্গীভূত মনে করেন কি না? চার্ব্বাকদর্শন বৌদ্ধদর্শন প্রভৃতি কথায় দর্শন শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত, বেদান্ত-দর্শনেও কি তাহাই? ম্যাক্সমুলার, সোপেনহায়ার ডাউসন্ প্রভৃতি বেদান্ত-ভক্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কি ঠিক হিন্দুর মতই বেদান্তের মর্ম্মগ্রহণ করিয়াছেন, না তাঁহাদের বুঝিবার প্রণালী স্বতন্ত্র?

আমরা এখন দর্শন শব্দে যাহা বুঝি, বেদান্ত দর্শন শুধু তাহাই নহে। বেদান্তে সৃষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, উপাসনাতত্ত্ব প্রভৃতি নানা তত্ত্বের সমাবেশ আছে, সে সকলেরই ভিত্তি উপনিষদে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বেদান্তের ব্রহ্ম প্রতিপাদক কয়েকটি তত্ত্বের মাত্র (যে সকল তত্ত্ব বেদান্তের দর্শনাংশ বা (Philosophy) আস্বাদন করিয়াছেন। তদতিরিক্ত যে বেদান্ত, তাহাকে রহস্য (Mysticism), বলিয়া পরিহাস করিতে বিরত হন নাই। মনীষী Maxmuller যিনি শেষ জীবনে বেদান্ত দর্শনের একজন পরম ভক্ত হইয়াছিলেন, তিনি উপনিষদের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে যেমন খনিতে বহু কাঁকর ধূলা কাদা মাটীর মধ্যে কোথাও কদাচ এক খণ্ড স্বর্ণ পাওয়া যায়, সেইরূপ উপনিষদের জঞ্জাল ও আবর্জ্জনার মধ্যে স্থানে স্থানে মাত্র তত্ত্বরত্নের সাক্ষাৎকার ঘটে। এরূপ সঙ্কুচিত প্রশংসার মর্ম্ম এই যে ম্যাক্সমূলার দর্শনাংশ ভিন্ন বেদান্তের অপর তত্ত্ব রাশি, হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। সেই জন্য দেখা যায়, অনেক স্থলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উপনিষদের ঋষির উপর শঙ্করাচার্য্যের আসন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শঙ্করকে কিন্তু সে আসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিলে তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। সম্পূর্ণ বেদান্ত ও ব্রহ্ম বিদ্যা অভিন্ন বস্তু, অতএব ব্রহ্ম বিদ্যার যথার্থ মর্ম্মগ্রহ না করিতে পারিলে বেদান্তের তত্ত্ব হৃদয়ে পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা নাই। ব্রহ্ম বিদ্যা আয়ত্ত করিবার উপযোগী ইন্দ্রিয় পণ্ডিত সমাজে এখনও বিকশিত হয় নাই, কারণ পণ্ডিতদিগের সম্বল বুদ্ধি মাত্র। বেদান্ত কিন্তু বুদ্ধি গ্রাহ্য নহে—বোধিগ্রাহ; intellect লভ্য নহে intuition লভ্য। অতএব পণ্ডিত সমাজ যে কখনও বেদান্তের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণে পারগ হইবেন, সে বিষয়ে আমার আশা অত্যল্প। সেই জন্য দেখা যায় যে বেদান্তের যে ভগ্নাংশ বুদ্ধির সাহায্যে কতকটা আয়ত্ত করা [illegible] বিশদ করিবার

চেষ্টা করিয়াছেন সেই অংশ মাত্র, পাশ্চাত্যদিগের চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হইয়াছে।

৩। বেদান্ত ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির পাঠ্য ছিল কি না?

প্রাচীন ভারতে কিন্তু অন্য প্রণালী অনুসৃত হইত। অধিকারী ভিন্ন যে সে বেদান্ত পাঠের সুযোগ পাইতেন না। যাঁহারা "সাধন-চতুষ্টয়" সম্পন্ন, অর্থাৎ বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, শান্তি, সমাধান; শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতি চিত্তসম্পদ যাঁহাদের আয়ত্ত হইয়াছে, তাঁহারাই বেদান্ত-পাঠের অধিকারী বিবেচিত হইতেন। কিন্তু তাহা বলিয়া বেদান্ত সম্প্রদায় বা শ্রেণী বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। আর্য্যজাতীয় ত্রিবর্ণের মধ্যে সকলেই যোগ্য হইলে বেদান্ত পাঠের অধিকারী হইতে পারিতেন। অনধিকারীর হস্তে যাহাতে বেদান্তের অমর্য্যাদা না হয়, অর্থাৎ উলুবনে যাহাতে মুক্তা ছড়ান না হয়, তদ্বিষয়ে প্রাচীনেরা সতর্ক থাকিতেন। এইরূপ সতর্কতা কেবল যে প্রাচীন ভারতে অবলম্বিত হইয়াছিল, এমত নহে; গ্রীক, য়িহুদী, চীন, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ—সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেই অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের (Exoteric এবং Esotericএর) প্রভেদ রক্ষিত হইত। উপনিষদ্ পাঠে জানা যায় যে অনেক স্থলে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্ম-বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ প্রাপ্ত হইতেন। অজাতশত্রু, অশ্বপতি, কৈকেয় প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ যোগ্য। বৃহদারণ্যকে দেখা যায় যে, ক্ষত্রিয় রাজা জনকের সভাপতিত্বে যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মবিদ্যার আলোচনা করিয়াছিলেন। আমার যতদূর স্মরণ আছে, একস্থলে মাত্র, শূদ্র রৈক্বকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে লিপ্ত দেখা যায়। প্রচলিত ব্রহ্মসূত্রে ঐ স্থলের শূদ্র শব্দের কষ্ট কল্পনা করিয়া অর্থান্তর সিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে বেদান্ত-দর্শন যখন বর্ত্তমান আকার ধারণ করে, তখন শূদ্রের বেদান্ত আলোচনা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ,

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সর্ব্বকালেই বেদান্ত-পাঠের অধিকার আছে ও ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বেদান্ততত্ত্ব বুদ্ধি গ্রাহ্য নহে—বোধি-প্রাপ্য।

৪। বেদান্ত "সাধারণের বলিয়া গৃহীত হইতে পারে কি না?

বেদান্তের রহস্যাংশ কখনই সাধারণের গম্য হইতে পারে না। দর্শনাংশও সুমার্জ্জিত বুদ্ধি ভিন্ন অপরের বোধসাধ্য নহে। আরো বক্তব্য এই যে, যাহার সহিত কেবল মাত্র বুদ্ধির সম্বন্ধ সে বিষয় কখনও ধর্ম্মের প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে পারে না। ধর্ম্ম-পিপাসা নিবারণ করিতে হইলে বুদ্ধির সহিত চিত্তের, জ্ঞানের সহিত ভক্তির ও বোধের সহিত ভাবের সম্মিলন হওয়া চাই। অদ্বৈত বেদান্তে কখন প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না। সেইজন্য আমার মনে হয় যে বেদান্তকে সাধারণের ধর্ম্মস্থানীয় করিবার চেষ্টা কেবল যে ব্যর্থ হইবে তাহা নহে, প্রত্যুতঃ ইহাতে প্রচুর অনিষ্টের বীজ নিহিত রহিয়াছে। এক সময় অপাত্রে অদ্বৈত-বেদান্ত প্রচারিত হইয়া নাস্তিকতা কঠোরতা ও আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতার উদ্দীপক হইয়াছিল। অদ্বৈত বেদান্তী জীবের হিতার্থে কর্ম্ম করা আবশ্যক মনে করিতেন না। নিজের মুক্তি সার করিয়া জগতের সহিত সম্পর্ক রহিত হইয়া তিনি "প্রত্যেক বুদ্ধত্বে"র নিন্দিত পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেন। জাতীয় জীবনের এই সঙ্কট অবস্থায় রামানুজ আচার্য্য বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ মতের পুনঃপ্রচার করিয়া ভক্তি-মিশ্রিত জ্ঞান এবং ঈশ্বর সম্পর্কিত সাধনা প্রতিষ্ঠিত করেন। তদবধি অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতের সংগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছে। উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য ব্রহ্মবিদ্যা বা প্রকৃত বেদান্ত, বিরোধ সংঘর্ষের বহু উচ্চে অবস্থিত। তথায় দ্বৈতাদ্বৈতের, জ্ঞান ভক্তির, সগুণ নির্গুণের, অপূর্ব্ব সমন্বয় ও সামঞ্জস্য। শঙ্করাচার্য্য রামানুজাচার্য্য উভয়েই [illegible] উপনিষদে সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ, সগুণ ও নির্গুণ

উভয়বিধ ব্রহ্মেরই উপদেশ আছে; তথাপি শঙ্করাচার্য্যের মতে সগুণ ব্রহ্ম এবং রামানুজের মতে নির্গুণ ব্রহ্ম অবাস্তর কাল্পনিক বস্তু। আচার্য্যদিগের এই মতদ্বৈধ স্থলে যে শ্রুতি বা উপনিষদ্ বাক্য তাঁহারা উভয়েই শিরোধার্য্য করিয়াছেন;—তাহারই আলোকে আমাদের পথ বাছিয়া লওয়া উচিত। যদি আমরা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহকারে সেরূপ করিবার প্রয়াসী হই; তবে অদ্বৈত ও বিশিষ্টাদ্বৈতের আপাততঃ প্রভেদ পরিহার করিয়া এতদুভয়ের মর্ম্মান্তিক ঐক্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

৫। বেদান্তের বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব কি?

জীব, জড় ও ব্রহ্ম এই তিন চরম পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধ ও সংস্থান ইহাই বেদান্তের প্রতিপাদ্য। এ সম্পর্কে যাহা চরম সিদ্ধান্ত, ঋষিরা জ্ঞান চক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া জীবের হিতার্থে বেদান্তে প্রচারিত করিয়াছেন। এ সকল তত্ত্বজ্ঞান মনুষ্যবুদ্ধির অতীত; অথচ উহাদেরই মীমাংসার উপর মানব-জীবন-সমস্যা নির্ভর করিতেছে। বেদান্ত সেই মীমাংসা আমাদের আয়ত্ত করিতেছেন। ইহাই বেদান্ত বা ব্রহ্মবিদ্যার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন। মনুষ্যের বুদ্ধি যতই প্রসারিত হইবে, মনুষ্যের ভাব যতই মার্জ্জিত হইবে, মনুষ্যের চিত্ত যতই বিকশিত হইবে, ততই বেদান্ততত্ত্ব তাহার নিকট স্ফুটতর হইবে। ততই সে চরম সত্যের সাক্ষাৎলাভ করিতে সমর্থ হইবে। যেমন দৃষ্টির প্রখরতার তারতম্য অনুসারে দর্শনীয় বস্তুর বিস্তার বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আমাদের আত্মবিকাশের তারতম্যানুসারে বেদান্তের অর্থের ও তত্ত্বের বিস্তৃতি সাধিত হয়।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নারায়ণী।

উনত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

রতনের অনন্তপুরে ফিরিতে ইচ্ছা ছিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, সুবর্ণরেখার তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া, তুলসীকে রাজার বাড়ীর পথ বলিয়া, নদীর এপার হইতেই ফিরিবে না। কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। এরূপ সময়ে সুন্দরী যুবতীকে তিনি কেমন করিয়া একা ছাড়িয়া দেন!

বিশেষতঃ অনন্তপুরের এখন আর পূর্ব্বাবস্থা নাই। এক সময়ে তিনিই সে নগরের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার ভয়ে নগরের কেহ কাহারও উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রমণীর মর্য্যাদানাশ সেত দূরের কথা। তখন রমণীকুল নির্ভয়ে নগরের নানা স্থানে যাতায়াত করিত।

সেই শান্তিপূর্ণ স্থান এখন একরূপ অরাজক হইয়াছে। দুই দিন পূর্ব্বে তিনি নিজেই পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়াছেন। তুলসী বিপন্না হইলে কে তাহাকে রক্ষা করিবে!

নদীতীরে আসিয়া ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সেটা বিশ্রামযোগ্য স্থান নয়। পশ্চাতে ঘন বন, সম্মুখে সুবর্ণরেখাপারে অনন্তপুর। অনন্তপুর দেখিয়াই ব্রাহ্মণের মনে সে দিনকার অপমানের কথাটা জাগিয়া উঠিল। পারে যাইলে আবার না জানি কি দুর্দ্দশা হইবে। ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

সুবর্ণরেখা পার্ব্বতীয়া নদী—অনেক সময়েই স্বল্পজলা, হাঁটিয়াই পার হওয়া যায়। ব্রাহ্মণকে পারে যাইতে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া,

[illegible]

তীর্থের পথ হইতে সে জোর করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়াছে। মন বুঝিবার জন্য সে জিজ্ঞাসা করিল।—

"নদীর পথ কি সুগম নয়?"

"এখনও সুগম আছে। এর পরে থাকিবে কি না বলিতে পারি না। এ সময় মাঝে মাঝে পাহাড়ে বৃষ্টি হয়। সুতরাং মাঝে মাঝে জল বাড়ে।"

"তবে আপনি দাঁড়াইয়া আছেন কেন?"

"তুমি এখন একা যাইতে পারিবে না?"

"অনন্তপুর কতদূর?"

"পারে। সোজা হইবে বলিয়া আমি বন পথ দিয়া আসিয়াছি। এ পথ সাধারণজনগম্য নয়। পারে, সম্মুখে ওই বনাংশ। ওইটা পার হইলেই রাজার বাড়ী দেখা যায়।"

তুলসী অন্য রমণীদিগের মত একান্ত অবলা নয়। বীর পুরুষ-যোগ্য সাহসের তার অভাব ছিল না। দশ বৎসর একটী কুটীরে সে একা বাস করিয়াছে। একটী বালকের অভিভাবিকা—তার প্রয়োজনের জন্য সে কতবার কত স্থানে সময়ে অসময়ে একা যাতায়াত করিয়াছে। একা অনন্তপুরের পথ চলিতে তার কোনও আপত্তি ছিল না। তথাপি সে যাইতে ইচ্ছা করিল না। তীর্থে যাইলে, ব্রাহ্মণ যে আর ফিরিবে, এটা তার বিশ্বাস হইল না। তুলসী স্থির করিল, দিন কয়েক গুরুজীর সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব। মনের কথা গোপন করিয়া সে বলিল—"সাহস হয় না।"

রতন বলিলেন—"তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, সঙ্গে এস।"

পার হইবা মাত্র, কতকগুলা সশস্ত্র পুলিশ প্রহরী বন হইতে বাহির হইয়া রতনকে ধরিল। রতন বলিলেন—"তুলসী! এই স্থান হইতেই আমার তীর্থ যাওয়া শেষ হইল। তুমি নিজে পথ চিনিয়া চলিয়া যাও।"

তুলসী বলিল—"কি করিলাম প্রভু! আপনার অনিচ্ছায় ফিরাইয়া আপনাকে পুলিশের হাতে ধরাইয়া দিলাম!"

"দুঃখ করিবার সময় নয় তুলসী! আঁধার বাড়াইয়া, আমার এতটা পরিশ্রম নিস্ফল করিও না। বিলম্ব করিলে হয়ত তোমারও আমার মত দশা হইবে।"

পুলিশ প্রহরীগুলার সঙ্গে তাহাদের দারোগা ছিল। সে তুলসীর মূর্ত্তিখানা দেখিল। ভাবিল, এমন সহজপ্রাপ্য রত্ন হাতছাড়া করি কেন? বলিল—"ও কোথায় যাইবে? ও আসামীকে আশ্রয় দিয়াছে। উহাকেও আদালতে হাজির হইতে হইবে।"

একটা প্রহরী তুলসীকে ধরিতে চলিল। তুলসী নারায়ণ স্মরণ করিল, ব্রাহ্মণও ভাবিলেন—"তাইত, আমার চোখের সামনে দুরাত্মারা মায়ের উপর অত্যাচার করিবে।"—কিন্তু প্রহরিগণ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার হাতে হাত কড়ি লাগাইয়াছিল। রতন বুঝিলেন, তিনি অকর্ম্মণ্য। শঙ্কটে ব্রাহ্মণও মধুসূদন স্মরণ করিলেন।

প্রহরিবর সমীপস্থ হইলে তুলসী বলিল—

"গায়ে হাত দিয়োনা। কি করিতে হইবে বল।"

"তোমাকে হুজুরের সঙ্গে যাইতে হইবে।"

"যাইতে প্রস্তুত আছি। তবে অমনি অমনি তোমার হুজুরের সঙ্গে যাইলে, লোকে কত কি কুভাবিবে। মনে করিবে, ব্রাহ্মণকে ধরাইয়া দিতে আমি তোমার মণিবের সহায়তা করিয়াছি। হয়ত মনে করিবে, তোমার হুজুরের সঙ্গে আমার কোনও দূষনীয় সম্বন্ধ আছে। ব্রাহ্মণের মত, আমারও হাত বাঁধিয়া লইয়া যাও। আমিও আসামীর সামিল হইয়া তোমাদের সঙ্গে যাই।"

কথাগুলা তুলসী নিতান্ত অনুচ্চস্বরে কহিল না, হুজুর তার সকল

করিতে ইচ্ছা হইল। বাক্যগুলায় কিছু হাস্যরস মিশ্রিত করিয়া বলিলেন—

"সুন্দরী! অলঙ্কার পরিবার কি বড়ই সাধ হইয়াছে?"

"হুজুরওত সুন্দরী লইয়া ঘর করেন। তার কিসে সাধ আপনার ত অবিদিত নাই?"

"গোলামের কাছে অলঙ্কার আছে, দিতে পারি। কিন্তু সেত ও মৃণালবাহুর যোগ্য নয়। সেটা লৌহনির্ম্মিত।"

"তাই আমি বহুমানে গ্রহণ করিব।"

"তাহ'লে গোলামকে অনুমতি হ'ক। সে নিজহাতে পরাইয়া দিক্।"

"সেটা আমি ভাগ্য বলিয়াই বোধ করিব।"

হুজুর তুলসীর কাছে চলিলেন। আর ভাবিলেন—আজ কার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছি। হাজার টাকা পুরস্কার; তার উপর একি! কাছে উপস্থিত হইতে না হইতেই, তুলসী হাত বাড়াইয়া দিল। মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া দারোগা পকেট হইতে হাতকড়ি বাহির করিল। বন্দী, প্রহরী সকলে নিশ্চল হইয়া, এই বন্ধন কার্য্যটা দেখিতে লাগিল। রতন ভাবিলেন তুলসী করে কি! প্রহরীগুলা ভাবিল—স্ত্রীলোকটার কিঞ্চিৎ বাতিকের ছিট আছে।

দারগার তরবারি কোষমুক্ত ছিল। সে তুলসীর সমীপস্থ প্রহরী-টাকে তরোয়ারটা ধরিতে বলিল। তুলসী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—কেন হুজুর! এই অবলাটাকি আপনার অস্ত্রখানা কাড়িয়া লইবে ভয় করেন। দারগার আর প্রহরীর হাতে অস্ত্র দেওয়া হইল না। একটু মৃদু হাসিয়া সে সেটাকে ভূমিতে রাখিল।

তুলসী সেই ভাবে হাতদুটী জোড় করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে, দারোগা হাতকড়ি তুলিয়া একবার সুন্দরীর অনুমতি প্রার্থনা করিল—"তবে অনুমতি কর সুন্দরী!"

মৃদু কঠোর কটাক্ষে ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গে যেই সুন্দরী অনুমতি প্রদান করিল, অমনি দারোগা প্রভুর হস্ত হইতে ঝনাৎ করিয়া আয়স শৃঙ্খলটা পড়িয়া গেল। অপ্রতিভ হইয়া প্রভু শৃঙ্খল কুড়াইয়া মাথা তুলিয়া দেখেন,—একি মূর্ত্তি! সেই কুন্দকুসুমসর্ম অনিন্দ্য মুখ, কিন্তু তাহাতে আর সে মৃদুহাস নাই। সেই ভ্রূলতাশোভিত ডাগর চোখ, কিন্তু তাহাতে আর সেই গ্রীবাভঙ্গাভিরাম বিলোল কটাক্ষ নাই। চক্ষের নিমেষে ভূপতিত তরবারি হস্তে তুলিয়া কুপিতা ফনিণীর ন্যায় তুলসী যেন ফনা তুলিয়া দাঁড়াইল।

সকলেই স্তম্ভিত, রতন বিস্ময়বিমুগ্ধ, দারোগা প্রভু কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়।

তুলসী বলিল—"শয়তান! এখনও কি আমার হাত বাঁধিতে ইচ্ছা আছে?"

দারোগা নীরব।

তুলসী বলিতে লাগিল—"কার হুকুমে তুই এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বাঁধিলি?"

দারোগা তথাপি কথা কহিল না। তুলসী মৃত্যুভয় দেখাইল, বলিল—"এখনি ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর্, নহিলে তোদের একটাকেও আমি প্রাণ লইয়া এস্থান ত্যাগ করিতে দিব না।"

যে কয়জন প্রহরী দারোগার সঙ্গে আসিয়াছিল, তাহারা নিতান্ত শক্তিহীন, অথবা ভীরু ছিল না, কেননা রতনকে বন্দী করিতে পুলিশ কর্ত্তা যাকে তাকে ধরিয়া পাঠায় নাই। বাছিয়া বাছিয়া যোগ্য লোকই পাঠাইয়াছিল। প্রাণ লইবার কথা উঠিতে তাহারা স্থির থাকিতে পারিল না। নিকটে যে প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল, সে বলিল, "হুজুর! বসিয়া কি করিতেছেন? হুকুম দিন, স্ত্রীলোকটার হাত হইতে তরোয়ারটা কাড়িয়া লই।"

দারোগার সাহস ফিরিল, বলিল—

"অস্ত্র পরিত্যাগ কর।"

"আগে ব্রাহ্মণকে মুক্ত কর্।"

"মুক্ত করিতে আমার অধিকার নাই। আমি মনিবের হুকুমে বৃদ্ধকে গ্রেপ্‌তার করিতে আসিয়াছি।"

"মনিব কে?"

"তোকে বলিবার আমার প্রয়োজন নাই।"

"মর্য্যাদা বুঝিয়া কথা ক'। তোর মত ছুশো গোলাম আমার বাড়ীতে গড়াগড়ি খাইতেছে।"

মন্ত্রে সর্প বশীভূত হয়। হৃদয় বলের কাছে পশু প্রকৃতি চিরদিনই মস্তক অবনত করে। তুলসীর শেষ কথায় সকলেই চমকিত হইয়া গেল। নিকটস্থ প্রহরী তাহাকে ধরিবার অবকাশ খুঁজিতেছিল। তাহার একটী ভ্রূভঙ্গে সে দুই হাত পিছাইয়া গেল। দারোগা বলিল—

"কে আপনি?"

"পরে বলিব। এখন বল. কার হুকুমে, এই ঋষির হস্তে শৃঙ্খল পরাইয়াছিস। আমার ত বিশ্বাস, এরূপ মহাপুরুষ অপরাধ করিতে পারে না"

"অপরাধ জানিবার আমার অধিকার নাই। পুলিশ সাহেবের হুকুম পাইয়াছি, ধরিতে আসিয়াছি।"

"গোলামীতে এরই মধ্যে এত অভ্যস্ত, সে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিবার শক্তি পর্য্যন্ত হারাইয়াছ! "দেখিতেছি হিন্দু—জাতি কি?"

"ছত্রি।"

"আর বাঁধিয়াছ যাহাকে সে ব্রাহ্মণ। গোলামী না শিখিলে, আজ তাঁহাকে দেখিবা মাত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম্ করিতে।"

তুলসী একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিল, প্রস্তর মূর্ত্তির মত

নিজ নিজ স্থান নিবদ্ধ হইয়া, নিশ্চল চক্ষুতে সকলে তাহার পানে চাহিয়া আছে। তুলসী বলিতে লাগিল শুধু পাঁচ ছয় বৎসরের ভিতরেই যখন তোমাদের এমন অবস্থা, তখন আর পাঁচ বৎসরে মনিবের হুকুমে তোমরা বাপকে জেলে দিতেও কুণ্ঠিত হইবে না। তখন একজন প্রহরী বলিয়া উঠিল—"হুজুর! আমি পণ্ডিতজীর হাত খুলিয়া দিই।"

দারোগা বলিল—"দাও।''

তুলসী তরবারি ফিরাইয়া দিল।—বলিল—"দারোগা সাহেব, আপনার অস্ত্র গ্রহণ করুন।''

দারগা অবনত মুণ্ডকে তরবারি গ্রহণ করিল। একজন প্রহরী বলিয়া উঠিল—"তবে যখন, কর্ত্তব্য কার্য্যের অবহেলার জন্য, মনিবের পদাঘাতে আমাদের দাঁত কটা ভাঙ্গিয়া যাইবে, তখন দেশের কে মা, বাপ্ আমাদের রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিবে?'

রতন বলিলেন—"না দারোগা সাহেব, তুমি কর্ত্তব্যে অবহেলা করিওনা। রাজার আদেশে তুমি আমাকে বাঁধিতে আসিয়াছ। রাজাজ্ঞা পালনই তোমার ধর্ম্ম। রাজা পাপ করেন, তিনিই তার ফলভোগী। তুলসী! তুমি ইহাকে কর্ত্তব্য হইতে নিরস্ত করিওনা। রাজার চক্ষে অপরাধী হইয়াছি। এ ব্যক্তি না ধরে, আর একজন ধরিবে। তুমি কয়দিন আমাকে রক্ষা করিবে? দারোগা সাহেব, তোমাকে মুক্তি দিয়াছেন, তুমি চলিয়া যাও। আমি অনন্তপুরে আসিবনা এই স্থির করিয়াছিলাম। পথের মধ্যে এক চটিতে চিঠিখানি লিখিয়া রাখিয়াছি—রাজাকে দেখাইও।''

তুলসী আর কোন কথা কহিল না। চোখে জল আসিতে লাগিল, সে তাই মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল। রতন দারোগাকে বলিলেন—"ভাই, সঙ্গে এস।"

অপরাধীর ন্যায় সকলে বন্দী ব্রাহ্মণের সঙ্গে চলিল।

ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

কোলাহল রাজারও কাণে পৌঁছিল। রাণীও শুনিলেন। রাজা জপে নিযুক্ত ছিলেন, তবে হাতের মালা হাতে আপনা আপনি ঘুরিতেছিল, কিন্তু মন পড়িয়াছিল নারায়ণীর উপর। ব্রাহ্মণের স্থান ত্যাগের পর হইতে নারায়ণী দিন দিন মলিন হইয়া যাইতেছে। বেশি কথা কহেনা, একা থাকিতে ভালবাসে। যে ছাদে উঠিলে ব্রাহ্মণের কুটির দেখিতে পাওয়া যায়, থাকে থাকে সেই স্থানে চলিয়া যায়।

সে সময়ও নারায়ণী সেই ছাদটাতে বসিয়াছিল।

রাজা ভাবিতেছিলেন, আমি মরিলে এ বালিকার কি হইবে। বাঁচিয়া থাকিতেই যখন তাহার ভিখারী কন্যার মত অবস্থা, তখন আমার অবর্ত্তমানে, নারায়ণীর পথে দাঁড়ান ভিন্ন আর কোনও অবস্থাত দেখিতে পাই না। কিন্তু আমার এ দেবতার সম্পত্তি রাক্ষসে অধিকার করিবে! ইহার কি প্রতীকার নাই! আমি বাঁচিয়া থাকিতেই যখন ম্লেচ্ছে আমার অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে সাহসী হইয়াছে, তখন আমি মরিলে, আমার ঘর যে পিশাচের নৃত্যশালা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে?

রাজা পূজা ভুলিয়া, জপ ভুলিয়া নারায়ণীর ভবিষ্যৎ চিন্তায় তন্ময় ছিলেন। এমন সময় কোলাহল তাঁহার কর্ণে পশিল। রাণী ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে কহিলেন—

"মহারাজ, গোলমাল শুনিতে পাইতেছেন কি?"

"ওরূপ গোলমাল নিত্যই শুনিতে হইবে। শুনিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"

"পণ্ডিতজীরত কোনও অনিষ্ট হইল না?"

"আশ্চর্য্য কি! তাহার ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।"

"দেবতা এ পাপ সহিবেন কি ?"

"কেমন করিয়া বলিব ? এতকালত সহিয়া আসিতেছেন। দেবতা কি সহিতে পারেন না পারেন জানিনা।

"দেবতা যদি এরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুমোদন করেন, তাহা হইলে এ পাপ পৃথিবীতে থাকিয়া লাভ।"

"দেবতার পূজায় বসিয়া আমিও তাই চিন্তা করিতেছিলাম। রাণী, লাভঅলাভ খতাইয়া ব্যবসা করিতে শিখি নাই বলিয়া বৃদ্ধ বয়সে মূল হারাইতে বসিয়াছি। আদরের নাতিনীকে পথের ভিখারীনী করিতে চলিয়াছি।"

"ইহার কি প্রতীকার নাই ?"

"আমিও তাই আপনাকে এতক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম। ইহার কি প্রতীকার নাই ? আর কয়দিনই বাঁচিব। নারায়ণীরও পথে বসিতে বড় বিলম্ব নাই। ঘরে ম্লেচ্ছ ঢুকিয়াছিল। কেন বুঝিতে পারিয়াছ কি ?"

রাণী শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"বংশ মর্য্যাদার যোগ্য পাত্র না পান, কোনও দরিদ্র সুপাত্রে নারায়ণীকে দান করুন না কেন ?"

রাজা শুধু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। উত্তর না পাইয়া রাণী বলিতে লাগিলেন—"আমার কাছে যা আছে, সে সমস্ত নারায়ণীর বিবাহে যৌতুক দিলে তার সুখে স্বচ্ছন্দে চলিবে।"

এ কথায়ও রাজা কোন উত্তর করিলেন না। রাণী বুঝিলেন, রাজা অন্যমনস্ক। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া রাণীর চক্ষে জল আসিল। তাঁহার বোধ হইল, তিনি যেন সমস্ত অবস্থা বুঝিতে পারেন নাই। বুঝি, নারায়ণীর বিবাহ দিলেও, তার দুরবস্থার প্রতীকার হইবে না। নারায়ণীর ভবিষ্যৎ বুঝি বড় অন্ধকার!

কোলাহল ক্ষীণ হইয়া আসিল, রাণী বুঝিলেন লোকজন সব

কাছারী বাড়ীর দিকে চলিয়াছে। তিনি ছাদে চলিলেন। দেখিলেন, নারায়ণী মাথা তুলিয়া এক দৃষ্টে কি দেখিতেছে।

"কি দেখিতেছ নারায়ণী ?"

"দাদার হাত বাঁধিয়া উহারা লইয়া চলিয়াছে।"

রাণীও আলিসার উপর মাথা তুলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তখন অন্ধকার,—দেখিতে পাইলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন—

"দাদা কেমন করিয়া জানিলি ?"

"সেই দীর্ঘদেহ, মাথায় শুভ্র উষ্ণীশ, কাঁধে মৃগচর্ম্ম ও লোকের উল্লাস—ও আর জানিতে হইবেনা।"

রাণী যেন পিতা মাতার শোক অনুভব করিলেন। বলিলেন—"নারায়ণী! এতদিনে পিতৃহীনা হইলাম।

রাণীর মুখে আর কথা সরিল না, গল্ গল্ করিয়া চক্ষু হইতে কেবল জল বাহির হইতে লাগিল। নারায়ণীর চক্ষে কিন্তু এক ফোঁটাও জল ছিল না। পিতামহীকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল "কাঁদ কেন মা।"

এই সময়ে রাজাও ছাদে আসিতেছিলেন। আসিতে আসিতে নারায়ণীর কথা তাঁহার কর্ণে গেল। তিনিও সেই কথায় যোগ দিয়া রাণীকে বলিলেন—"তাইত কাঁদিয়া লাভ কি ? সকলেই মরণের জন্য প্রস্তুত হও। সে দিন আসিতে আর বড় বিলম্ব নাই।"

রাজাকে দেখিয়া রাণী রতনের সম্বন্ধে কোন কথা কহিতে, নারায়ণীকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন।

রাজা বলিতে লাগিলেন—

"কর্ম্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তেমনসা স্মরণ।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥

মনে মনে লঙ্কা ভাগ করিলে, কালনেমির মত অবস্থা সকলেরই হয়। প্রতীকারের জন্য অনেকবার ব্রাহ্মণের কাছে পরামর্শ করিতে

গিয়াছিলাম। ব্রাহ্মণ ফুলের সাজি দেখাইত, পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেখাইত, আর যুক্তকর ঊর্দ্ধ করিয়া আকাশ দেখাইত। তাহার ফলে আজ তাহার নিষ্পাপ দেহ নরকতুল্য কারাগারে নিষ্পেষিত হইতে চলিয়াছে।

বলিতে বলিতে রাজা বালকের ন্যায় রোদন করিয়া উঠিলেন। রাজার রোদনে নারায়ণীও আর স্থির থাকিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

রাণী মনে করিলেন, রাজা বুঝি নারায়ণীর কথা অন্তরাল হইতে শুনিয়াছেন। তাই বলিলেন "ক্ষুদ্র বালিকা কি দেখিতে কি দেখিয়াছে। তার কথা শুনিয়া আপনি কাতর হইতেছেন কেন?"

নারায়ণী বলিল—"আমি ঠিক দেখিয়াছি।"

রাজা বলিলেন—"বৃদ্ধ দারবান আসিয়া আমাকে এই সংবাদ দিল।"

রাণী। কোন্ নিষ্ঠুর তাঁহাকে ধরাইয়া দিল?

রাজা। শুনিলাম, একটা স্ত্রীলোক।

রাণী। স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোকের ভিতরেও এমন হৃদয়হীনা থাকিতে পারে।

রাজা। অর্থলোভে মানুষে না করিতে পারে কি? ব্রাহ্মণকে ধরিবার জন্য পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছিল।

রাণী। কোথায় তাঁকে ধরিল?

রাজা। শুনিলাম, সে পাপিষ্ঠা তাঁহাকে ভুলাইয়া অনন্তপুরে আনিয়া ধরাইয়া দিয়াছে।

নারায়ণীর কি জানি কেন, সেই পাপিষ্ঠাকে দেখিতে বড় ইচ্ছা হইল। সে সাগ্রহে রাণীকে বলিল—"মা যদি আদেশ কর, তাহা হইলে আমি সে পাপিষ্ঠাকে একবার দেখিয়া আসি।

"সে পাপিষ্ঠা কালামুখ দেখাইতে আ[illegible] রাণী বুঝিলেন না।"

সবিস্ময়ে সকলেই চাহিয়া দেখিল, এক সুন্দরী যুবতী তাঁহাদিগের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সুন্দরী তুলসী। সে বরাবর রাজার কাছে আসিয়া, তাঁহাকে ও রাণীকে প্রণাম করিল। বিস্ময়বিমুগ্ধের ন্যায়, তাঁহারাও তুলসীর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ভাববিহ্বলার ন্যায় নারায়ণী ছুটিয়া তাহার হাত ধরিল। বলিল—"না না—তুমি কেন? তুমি যে আমার দাদাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছ।" নারায়ণীর দুগণ্ড বহিয়া জল ছুটিয়াছে।

তুলসী বুঝিল, এই আমার নারায়ণী। স্বতশ্চলিত হস্তে সে নারায়নীর হাত ধরিল। কিন্তু, নারায়নীর কথাটা সে ভাল বুঝিতে পারিল না; ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাহাদের কি সম্বন্ধ, সে কিছুই জানে না। ব্রাহ্মণ কাশীপুর হইতে অনন্তপুর সমস্ত পথটা তুলসীর সহিত গল্প করিতে করিতে আসিয়াছেন। কিন্তু রাজার সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ কি, ঘুণাক্ষরেও তাহা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং নারায়নীর 'দাদা' কথায় সে রাজাকেই বুঝিল। হাত ধরিয়া বলিল—ভগিনী! তোমার দাদা রাজ্যেশ্বর। আমি তাঁহাকে রক্ষা করিব কি? তবে আমি তোমাদের সংসারে দাসীত্ব গ্রহণ করিতে আসিয়াছি। তোমরা আমাকে দাসী বলিয়া গৃহে স্থান দাও—আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।

রাজা। তাহ'লে তুমিই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে ধরাইয়া দিয়াছ?

তু। কেমন করিয়া না বলি মহারাজ!

রাণী। এই রাণীর মূর্ত্তি লইয়া, এমন কার্য্য কেন করিলে মা!

তু। আকাঙ্ক্ষা মা! অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা।

রাণী। এতই যদি অর্থাভাব হইয়াছিল, তখন একবার আমাদের কাছে আসিলেনা কেন? তুচ্ছ অর্থের জন্য ব্রহ্মহত্যা করিলে!

রাজা। এত আকাঙ্ক্ষা লইয়া, আমার ঘরে [illegible]
তুমি অন্যত্র যাও।

নারায়নী তুলসীর হাত ছাড়িয়া দিল। কিন্তু বুঝিতে পারিল না, এমন সুন্দর, যার অঙ্গ স্পর্শে এত সুখ, তাহাকে কেমন করিয়া ঘৃণা করিব। তুলসী বুঝিল, তাহার কথা কেবল সেই বুঝিয়াছে, কিন্তু ইহারা কেহই বুঝিতে পারিলেন না। তখন সে বস্ত্রাঞ্চল হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া রাজার হস্তে দিল। পত্রখানি শৈলজানন্দ স্বহস্তে লিখিয়া রাজাকে দিতে দিয়াছিলেন।

রাজা পত্রপাঠ করিয়াই তুলসীর হাত ধরিলেন। বলিলেন—মা! না বুঝিয়া রূঢ়বাক্যে তোমার মনে কষ্ট দিলাম। কন্যারূপে যখন আমার গৃহে আসিয়াছ, তখন এ বৃদ্ধ পিতার কথায় রাগ করিওনা।

তুলসী রাজার পদধূলি গ্রহণ করিল। সাবিস্ময়ে রাণী বলিলেন—"মেয়েটী কে মহারাজ?"

রাজা। পরিচয় দিবার আমার সময় নাই। মা আমার তিন দিন ক্রমাগত পথ চলিতেছেন। শুশ্রূষায় আগে মাকে রক্ষা কর। তবে এইমাত্র বলি, ব্রাহ্মণ আমার পূর্ব্বজন্ম দত্ত ঋণ পরিশোধের উপায়ান্তর না দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থল শূন্য করিয়া আমাকে এই বৈদুর্য্যমণিটী পাঠাইয়া দিয়াছেন।—এই নাও ভগবতী তুমি এই মণিটী গ্রহণ কর।—রাজকন্যা স্বেচ্ছায় আজ তোমার দাসীত্ব করিতে আসিয়াছে।

রাজা রাণীর হাতে তুলসীকে অর্পণ করিলেন। এক হাত রাণী, অন্য হাত নারায়ণী ধরিয়া, তুলসীকে ঘরে লইয়া গেল।

একত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

অনন্তপুর হইতে রতন রাঁচিতে নীত হইলেন। সেখানে আদালতে তাঁহার অপরাধের বিচার হইল। হাকিম বুঝিলেন [illegible] সকল কথা

রাণী নিজের সঞ্চিত অর্থ হইতে উকীল নিয়োগের ব্যবস্থা কিছুতেই কিছু হইল না। কোম্পানার উকীল বাঙ্গালী বীরেন্দ্র চন্দ্র বাঙ্গালী রতনের জাতিগত এত দোষ বাহির করিয়া ফেলিলেন, যে হাকিম হগসন্ অবাক হইয়া অঞ্জমনস্কে সত্তর পাতা রায় লিখিয়া তবে কলম রক্ষা করেন। এবং সেই সঙ্গে দস্যু সহায় বীরচন্দ্র সাহীকেও তিনি আসামী শ্রেণীভুক্ত হইবার ভয় দেখান।

হার্‌লি ক্ষমা প্রার্থনার জন্য গোপনে কারাগারে যাইয়া রতনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এবং ব্রাহ্মণকে উপরিতন রাজপুরুষের কাছে দরখাস্ত করিতে অনুরোধ করেন। রতন শুনিয়া, হাসিতে হাসিতে সাহেবকে বলেন—"নীরবে প্রহার খাইবার ফলে এই সাত বৎসর। দরখাস্তের ফলে আবার কি দশ বৎসর বাড়িয়া যাইবে। এখনও তীর্থে মরিবার আশা আছে। দরখাস্ত করিলে সে আশাও নির্ম্মূল হইবে। সাহেব, তোমার দয়া হইতে আমাকে অব্যাহতি দাও।"

হার্‌লি বুঝিলেন, তাঁহার দোষে তাঁহার জাতির উপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। সে কারাগৃহ হইতে ফিরিবার সময়, তিনি মনের আবেগে উচ্চৈঃস্বরে ভগবানকে ডাকিয়া কহিলেন—"হে ঈশ্বর! এই যন্ত্রনাময় কারাগৃহে এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের জীবন রক্ষা কর।"

আনন্দ ও মুকুন্দ উভয়েই কোম্পানীর সাক্ষী ছিলেন। রতন হইতে উভয়েরই অল্পাধিক দৈহিক অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। আনন্দদেবের পৃষ্ঠের বেদনা আরোগ্য করিতে রাঁচির সিবিল সারজন তিন হাজার টাকার বিল করিয়াছিলেন। আর মুকুন্দের কব্জির ব্যথা, ডাক্তার

সাহেবের মতে দুশ্চারোগ্য হইলেও, মোকদ্দমার পরে, সকলেই তাহাকে হাতের বাড় খুলিতে দেখিয়াছিল।

যে দিন রতনের উপর কারাবাসের আদেশ হইল, সেই দিনেই গভীর রাত্রে মুকুন্দপত্নী জানকী বাড়ার ছাদের উপর একাকিনী বিচরণ করিতেছিল। সেদিন তার স্বামী ও শ্বশুর কেহই বাড়ীতে ছিল না। উভয়েই মোকদ্দমা উপলক্ষে রাঁচি গিয়াছিল। রাঁচিতে উৎসব করিবার জন্য বন্ধুবান্ধবেরা আনন্দদেবকে অনুরোধ করে। অনুরোধে বশবর্ত্তী হইয়া তাহাকে সপুত্র সে রাঁচিতেই থাকিতে হয়। সদাশিবে উপর সে রাত্রির জন্য গৃহরক্ষার ভার প্রদত্ত হয়।

সে দিন শুক্লাদশমী। ঘরের জানালা খুলিয়া জানকী দে... জ্যোছনা বাতাসের সঙ্গে ঢেউ খেলিয়া তাহার ঘরের ভিতরে প্রবে... করিতেছে। সে তরঙ্গের প্রভাব জানকার প্রাণটুকুকে ঈষৎ ঈষ... কাঁপাইয়া তুলিল। তাহার মনে হইল, যেন আকাশব্যাপিনী কৌমুদী মনের মতন সঙ্গিনী না পাইয়া, ভরাগাঙ্গের উচ্ছ্বাস লভিয়াও মনের মত খেলিবার অবসর পাইতেছে না। দৃষ্টিকে আশ্রয় করিয়াই রূপ। দেখিবার লোক না থাকিলে রূপ থাকিয়া লাভ কি। জানকী ভাবিল ছাদে উঠিয়া চাঁদকে একবার রূপটা দেখাইয়া আসি। একটু জ্যোছনা মাখিয়া চিন্তাদগ্ধ হৃদয়টাকে শীতল করিয়া লই।

জানকী ছাদে উঠিল। তাহাকে দেখিয়া চাঁদ হাসিল, কিন্তু জানকী সে হাসিতে সুখ পাইল না। জ্যোছনা তাহার গায়ে পূর্ণ আবেগে ঢলিয়া পড়িল, তাহার বস্ত্রে অঙ্গে মুখে চোখে মাখামাখি হইল। কি... জ্যোছনায় জানকী শীতলতা অনুভব করিল না। একটা কি অভাবক্লিষ্ট হইয়া সে চারিদিক নিরীক্ষণ করিল।

জানকী যেখানে দাঁড়াইয়াছিল, তাহারই নিম্নে উদ্যা... চাহিতে চাহিতে সুন্দরী মাথা নামাইয়া বাগানের দি... যেখানে আদাল... সকল কা...

যে, সেখানে মর্ম্মর বেদীর উপরে চাঁদের সমস্ত জ্যোছনাটা যেন জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া আছে। দেখিয়া যুবতী শিহরিয়া উঠিল। তখন চারিদিক একবার চাহিয় দেখিল, বোধ হইল যেন সব অন্ধকার।

দ্বাত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

মর্ম্মর বেদার উপর সদাশিব ঘুমাইতেছিল। অন্য দিবসে সে সতর্ক প্রহরী। প্রহরার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে, বিনিদ্র হইয়া প্রভুর গৃহরক্ষা করিত। এই গুণের জন্য সদাশিব আনন্দদেবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিল। তাহার সচ্চরিত্রতার উপর কাহারও সন্দেহ ছিল না। এইজন্য প্রহরীর কার্য্যে সদাশিবই যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া, আনন্দদেব আজিকার রাত্রিতে গৃহরক্ষার ভার তাহারই উপর দিয়া গিয়াছে।

কিন্তু সদাশিবের মনের অবস্থা আজ ভাল নয়। তাহার গুরুদেব আজ কারাগারে—আজ হইতে সাত বৎসর তাঁহাকে কারাযন্ত্রনা ভোগ করিতে হইবে। অপরাধ? সদাশিব আকাশপানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল, আর বলিল—"দেব তোমার কিরূপ লোকশিক্ষা! ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমরা, এরূপ কার্য্য ফলের দৃষ্টান্ত দেখিয়া, এসংসারে কোন পথ অবলম্বন করি? ক্ষুদ্রবুদ্ধি, অনধীত শাস্ত্র, দোহাই দেবতা আমরা কি করিব বলিয়া দাও।"

দেবতা অবশ্য এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, সদাশিবেরও চিন্তার বিরাম রহিল না। বেদীর উপর বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে সদাশিবের তন্দ্রা আসিল। যুবক ঔদাস্যে আলস্যে সেই বেদীর উপর শুইয়া ঘুমাইল।

সৌন্দর্য্য পূর্ণতা লাভ করিতে বুঝি স্থান ও সময়ের অপেক্ষা করে; কত সুন্দর কতবার তোমার চোখের সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করিয়াছে, তুমি দেখিয়াও তাহাকে পাও নাই। সহজ প্রাপ্য সহজ দৃষ্ট বস্তুর আদর কই? যাহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলেও সহজে দেখা যায় না; পাইবার

প্রত্যাশা করিলেই পাওয়া যায় না, লোকঅগোচরে রূপ বুঝি তাহারই অঙ্গে জড়াইয়া রয়। অন্যের দুর্ব্বোধ্য হইলেও, সে বুঝি তোমার চক্ষে সবার চেয়ে সুন্দর।

জানকী সদাশিবকে বড়ই সুন্দর দেখিল। চাঁদ তার চোখের উপর পড়িয়া, হাসিয়া হাসিয়া বলিল—তুমি ঠিক দেখিয়াছ। কৌমুদী-স্নাত উদ্যানের ছোট ছোট গাছগুলি, যেন হাসিয়া হাসিয়া ঢলিয়া ঢলিয়া তাহাকে বুঝাইল—এতকাল জানকী রূপ চিনিতে পারে নাই। জানকী তখন বুঝিল, ঐশ্বর্য্যেই মানুষের সুখ হয় না। মুকুন্দও ত সুন্দর। কিন্তু তার সুন্দর মুখখানা সদাশিবের রূপের অন্তরালে পড়িয়া আজি জ্যোতিহীন। তারপর ছাদের উপরে অবস্থিত হইয়াও, সে যখন আপনাকে বুঝিল বন্দিনী, যখন বুঝিল, ইচ্ছা করিলেই ও রূপ-নদীর ধারে বসিয়া, শীতল হইবার উপায় নাই, তখন তাহার বোধ হইল, যেন সে রূপ-নদীতে বান ডাকিয়াছে।

আরও একটু কাছ হইতে দেখিবার জন্য জানকী নীচে নামিল। জানকী জানিত অন্তঃপুরের দ্বার ভিতর হইতে রুদ্ধ-অর্গল বদ্ধ। তথাপি সে কেন নামিল সেই বলিতে পারে। বাড়ীর মধ্যে সকলেই নিদ্রিত, একা জানকী জাগিয়া। নীচে আসিতে তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। যদি কেহ জাগিয়া দেখে, তাহা হইলে কি মনে করিবে? কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও সে গতির নিবৃত্তি করিতে পারিল না। অন্তঃপুরদ্বার সমীপে আসিয়া দেখিল, কে যেন আজ তার জন্য দ্বার খুলিয়া রাখিয়াছে।

এমন সময়ে দ্বার কে খুলিয়াছে, কেন খুলিয়াছে; জানিবার তাহার অবসর হইল না। জানকী তড়িচ্চালিতা পুত্তলিকার ন্যায়, নিজের অবস্থা ভুলিয়া, মর্য্যাদা ভুলিয়া, কর্ত্তব্য পাশরিয়া, সেই গভীর রজনীতে অভিসারিকার বেশে গৃহত্যাগ করিল।

যখন বোধ ফিরিল, তখন সে ঘর ছাড়িয়া অনেক দূরে। তখনও

সদাশিব নিদ্রিত। জানকী দেখিল দীর্ঘ যষ্টিধারী খর্ব্বাকৃতি এক কৃষ্ণকায় পুরুষ, কোথা হইতে আসিয়া নিদ্রিত যুবকের পার্শ্বে বসিল।

তখন আর পলাইবার উপায় নাই। পলাইতে গেলেই সে তাহার চক্ষে পড়িবে। তাড়াতাড়ি জানকী পার্শ্বস্থ লতাকুঞ্জে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন লজ্জাভয় চারিদিক হইতে বালিকাকে ঘেরিয়া ধরিয়াছে। জানকী আপনাকে শতধিক্কার দিয়া বলিল—"কি করিলাম!"

কৃষ্ণকায় পুরুষ মুন্না। মুন্না, সদাশিবের পায়ে হাত দিয়া ঘুম ভাঙ্গাইল। চকিতের ন্যায় সদাশিব উঠিয়া বসিল। দেখিল পার্শ্বে কে বসিয়া আছে। ঘুমের ঘোরটা তখনও ছাড়ে নাই বলিয়া, প্রথমটা সদাশিব মুন্নাকে চিনিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল—"কে তুমি?"

"যেই হই, কিন্তু আপনার প্রহরিকার্য্যের প্রশংসা করিতে পরিলাম না।" সদাশিব এইবারে মুন্নাকে চিনিল। বলিল—"ওঃ! কতকাল পরে!"

মুন্না। তবু গোলামের সৌভাগ্য। এতকাল পরেও তাহাকে চিনিতে পারিয়াছেন।

সদা। মৃতের নিরর্থক চক্ষু লইয়াও বোধ হয় তোমায় চিনিতে পারিতাম।

মুন্না। তারপর, আপনারই কাছে। শুনিয়াছিলাম, আপনি চাকর হইবারও যোগ্য নয়, এমন একটা লোকের ঘরে প্রহরীর কার্য্য করিতেছেন। তাই আপনাকে একবার দেখিতে আসিলাম, আসিয়া, আপনার প্রহরীর কার্য্য দেখিয়া, হাসি রাখিতে পারিলাম না। আপনারই সম্মুখ দিয়া বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলাম, খিড়কীর দোর খুলিয়া রাখিলাম, উপরে উঠিলাম, কিন্তু বাপ্ বেটার কাহাকেও দেখিলাম না। তাদের বড় পুণ্যের জোর তারা আজ বাড়ীতে

নাই। নহিলে, আপনার প্রভুভক্তির পুরস্কার স্বরূপ, কোন কালে সেই দুটী মুণ্ড আপনার পদপ্রান্তে রক্ষিত হইত।

সদা। মুন্না! ঈশ্বর তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন।

মুন্না। তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে, বাড়ীর এমন স্থান নাই যে, সে দুটার সন্ধান করি নাই। সর্ব্বত্রই কেবল স্ত্রীলোক দেখিলাম। ছাদে উঠিয়া দেখি, সেখানেও একটা স্ত্রীলোক। দেখিলাম, সে নীচে আপনার পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, বুঝিলাম আপনার রূপ দেখিতেছে। মনে করিলাম, তাহাকে সেইস্থান হতেই আপনার কাছে পাঠাইয়া দিই। কিন্তু ওবয়সে স্ত্রীহত্যা করিতে আর মন সরিল না।

লতান্তরালে জানকী শিহরিয়া উঠিল। দারুণ ভয়ে অপগত শক্তি বালিকা ভূমিতে বসিয়া পড়িল।

সদা। আমি জাগিয়া থাকিলে তোমাকে বাধা দিতাম। এ দস্যুর কার্য্য তোমাকে করিতে দিতাম না।

মুন্না। আপনাদের সাধুদিগের যা কার্য্য তাতো দেখিলাম। তার চেয়ে, আমাদের কার্য্যে অনেকটা মনুষ্যত্ব আছে। ছাগ আহারে রুচি হইলে, আমরাও লোক দেখান দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করি। বলি কি অপরাধে আজ আপনার গুরুর জেল হইয়াছে?

সদাশিব দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। মুন্নাও অবকাশ পাইয়া আবার বলিল—"কি বলিব, বিধাতা সদয়, নহিলে আজই আমি ব্রাহ্মণের শাস্তির প্রতিফল দিয়া যাইতাম।

সদা। মুন্না ভাই! ইহাদের কথা ছাড়িয়া দাও। আমি ইহাদের নিমক খাইয়াছি।

মুন্না। আজ যখন অকৃতকার্য্য, তখনই ইহাদের কথা ছাড়িয়াছি।

[illegible]

লইয়া আমি এতদূর আসি নাই। ওটা শুধু মাঝখানে বুদ্‌বুদ্‌ স্বরূপ জাগিয়াছিল মাত্র। আসিয়াছি আপনাকে লইয়া যাইতে।

সদা। কোথায়?

মুন্না। সেকথা এখানে বলিতে পারিব না। আপনি রাজা, সেপাই হইয়া রাত্রিতে পাহারা দেওয়া কি আপনার কাজ? আজিকার ঘটনাতেই তা বুঝিলেনত!

সদাশিব ক্ষণেক নীরব রহিল। তারপর বলিল—

"সময় কি আসিয়াছে?

"নহিলে, এই বার বৎসর পরে আপনার কাছে আসিলাম কেন?"

কানে কানে মুন্না সদাশিবকে কি বলিল। যেন গাছপালা গুলাকেও সেকথা শুনাইতে সে সাহসী হইল না।

সদাশিব দাঁড়াইল বলিল—"শীঘ্র খিড়কীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া আইস।"

এইবারেই জানকী ফাঁফরে পড়িল। মুন্না সদাশিবের আদেশমত প্রস্থান করিলে, বুঝিল, দ্বার বন্ধ করিয়া মুন্না ফিরিলেই, রাত্রির মত সে আর গৃহে প্রবেশ করিতে পারিবে না। প্রভাতে একথা লোকের কর্ণগোচর হইলে, তাহার আর মুখ দেখাইবার উপায় থাকিবে না। বিপদে পড়িয়া জানকীর সাহস আসিল। উভয়ের মধ্যে যে যে কথা হইয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। বুঝিয়াছিল এই প্রহরিবেশী সুন্দর যুবক, কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়। কি প্রয়োজন সাধনের জন্য সে তাহার শ্বশুরের গৃহে সামান্য ভৃত্যের কার্য্য করিতেছে। তাহার কথা শুনিয়া জানকীর বিশ্বাস হইয়াছিল, এ যুবা হইতে তাহার কোনও অনিষ্ট হইবেনা।—যে মনের ভাব লইয়া জানকী সে বাগানে আসিয়াছিল, এখন আর সে ভাব নাই। ঘটনাবৈচিত্র্যে তাহার মনের অবস্থা অন্যরূপ হইয়াছে। সৌন্দর্য্য দেখিবার অদম্য লালসা এখন প্রাণরক্ষা ভয়ে পরিণত। অবগুণ্ঠনবতী হইয়া জানকী

কম্পিত হৃদয়ে, কম্পিত পদে, ধীরে ধীরে সদাশিবের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সদাশিব তাহাকে দেখিয়াই সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল—"কে আপনি ?"

অবগুণ্ঠনের ভিতর হইতেই জানকী বলিল—"অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাকে বাড়ীর ভিতরে রাখিয়া আসুন।"

কে আপনি, কেন আসিয়াছেন, এ সকল প্রশ্নের একটীও সদাশিব জিজ্ঞাসা করিল না। রমণীর উত্তরেই বুঝিল, মুন্না দ্বাররুদ্ধ করিয়া ইহাকে বিপন্ন করিয়াছে। কেবল বলিল—"ক্ষণেক অপেক্ষা করুন, ভৃত্যটা ফিরিয়া আসুক।"

সময় বুঝিয়া মুন্নাটা আসিতে বড়ই বিলম্ব করিতে লাগিল।

উপরে সঞ্চরমাণ খণ্ডমেঘগুলির মধ্যে, ধীরগতিশীল চন্দ্রমা, নিম্নে মৃদু বায়ুতে আন্দোলিত ফুলভারাবনত পুষ্পলতা, তরু অন্তরালে শ্রোতার হৃদয়ের সঙ্গে সুর মিলাইয়া প্রচ্ছন্নাবস্থিতা ঝিল্লী, চারিদিক বেড়িয়া কৌমুদীবসনা উল্লাসময়ী প্রকৃতি—মধ্যে চন্দ্র কিরণে প্রতিফলিত মর্ম্মর বেদীর একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া একটী সুন্দর যুবক, আর একটী যুবতী বসনাবরণে তার কত রূপই না লুকান আছে! উভয়েই নীরব, উভয়েই বিপদগ্রস্ত।

জানকী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মর্ম্মরবেদীর উপর বসিল, সদাশিব কি করিবে বুঝিতে না পরিয়া পাদচরণ আরম্ভ করিল।

তবুও মুন্না ফিরিল না।—সদাশিব আর থাকিতে পারিল না, বলিল—"হতভাগাটা করে কি ?"

জানকীও কথা কহিবার অবকাশ পাইল, বলিল—"লোকে দেখিলে কি মনে করিবে ?"

জানকী। কিন্তু আপনি ভৃত্য ন'ন, আপনি কোন রাজপুত্র। কি জানি কেন, ভৃত্যের বেশ ধরিয়া আছেন।

সদাশিব বুঝিল স্ত্রীলোকটা তাহাদের কথা শুনিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কোথায় ছিলেন?

জানকী। ওই কুঞ্জমধ্যে।

কথাগুলিতে যেন বীণায় ঝঙ্কার উঠিতেছিল। কুঞ্জমধ্যে!—সদাশিব ত তাহারই অতি নিকটে বেদীর উপর নিদ্রিত ছিল! এই পঞ্চম সংবাদিনী বাণীর ঈশ্বরী, সুষুপ্ত সদাশিবের পার্শ্বে বুঝি একবার দাঁড়াইয়াছিল! একবার বুঝি তার নিশ্বাস, অতি কোমল স্পর্শে, সদাশিবের হৃদয়ে অতিধীর কম্পন তুলিয়া, বড় সুখের ঘুমে তাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল।

পরিক্রমণ করিতে করিতে সদাশিব একবার দাঁড়াইল; এতক্ষণ মাথা হেঁট করিয়াছিল, এখন একবার মাথাটা তুলিল।

সসম্ভ্রমে জানকী উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল "আপনি ক্লান্ত, ক্ষণেক বেদীতে উপবেশন করুন।" অবগুণ্ঠনটা একটু সরিয়া গেল। মুগ্ধ যুবক শিহরিয়া উঠিল। সুন্দর ছোট মুখখানিতে দুইটী উজ্জ্বল ডাগর চক্ষু! এত সুন্দর যেন কনককমল মাঝে কাল ভুজঙ্গিনী শ্রীযুত সঞ্জনের সঙ্গে খেলা করিতেছে।

সদাশিব আবার মাথা হেঁট করিল, বলিল—"আপনি বসিয়া থাকুন, আমি বেশ আছি।" যুবক কিন্তু বেশ ছিল না, তাহার বুক কাঁপিতেছিল, তাহার বসিবার প্রয়োজন হইয়াছিল।

জানকী দাঁড়াইয়া রহিল। অগত্যা সদাশিব বেদীর এক প্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া, জানকীকে অন্য প্রান্তে বসিতে অনুরোধ করিল।

বসিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া বলিতে লাগিল—"আপনাদের সমস্ত কথা আমি অনিচ্ছায় শুনিয়াছি। তবে ভৃত্যটা কাণে কাণে যা বলিল, সেইটাই কেবল শুনিতে পাই নাই।"

সদাশিব ওকথা তুলিতে নিষেধ করিল। বলিল, "বুঝি ফিরিতেছে। আপনি শুনিয়াছেন শুনিলে, বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। ও কঠোর মূর্খের কাছে সৌন্দর্য্যের আদর নাই।"

জানকী বলিল—"মৃত্যুকেও আর ভয় করি না।"

মুন্না ফিরিল দেখিল প্রভুর পার্শ্বে সুন্দরী।

"তুমিই না ছাদের উপর দাঁড়াইয়াছিলে?"

"ছিলাম।"

"কেন, প্রভুকে দেখিতে?"

সদাশিব বলিল—"যদি দুয়ার বন্ধ করিয়া থাক, তাহা হইলে আবার খুলিয়া, ইহাকে বাটীর ভিতরে রাখিয়া আইস।"

মুন্না। মিছামিছি আমি বারবার প্রাচীর ডিঙ্গাইতে পারি না।

জানকী। ছাদের উপর হইতে ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলে, সে ইচ্ছা অসম্পূর্ণ থাকে কেন? এইখানেই আমাকে মারিয়া রাখিয়া যাও।

মুন্না। কতবার মরিবে?

সদা। একি মুন্না! মর্য্যাদা রাখিয়া কথা কও। উনি আমার প্রভুপুত্রের সহধর্ম্মিনী।

জানকী চমকিয়া উঠিল—"আমি কি তবে পূর্ব্বেই ইহার চোখে পড়িয়াছি!" সুন্দরী লজ্জায় আবার অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিল। মুন্না বিরক্তির সহিত বলিল—"তবে এস আমার সঙ্গে।"

একটী ঘনবিকম্পিত দীর্ঘশ্বাস সদাশিবের কাণের কাছে আসিয়া মিলাইয়া গেল। মোহজাল টুটিল, কুলকামিনী আবার আপনাকে দেখিতে পাইল। মানসিক যন্ত্রণায় তাহার মর্ম্ম কাঁদিয়া উঠিল।

উভয়ে অদৃশ্য হইলে, সদাশিব কাঁপিতে কাঁপিতে একবার ভগবানকে ডাকিল—নারায়ণ! আমাকে রক্ষা কর। মনটাকে সবলে নিষ্কর্ষণ করিয়া, সেই বার বৎসর পূর্ব্বের তুলসীর দিকে ফিরাইতে চেষ্টা করিল।

প্রেমহীন, দৃষ্টিহীন। প্রাণের যাতনায় সদাশিব আর একবার ভগবানকে ডাকিল।

"ভয় কি!"—পশ্চাৎ হইতে শান্তিদায়িনী সান্ত্বনা দিল।

সদাশিব চকিতের ন্যায় পশ্চাতে ফিরিয়া, চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া সংজ্ঞা হারাইল।

মুন্না ফিরিয়া, তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া বলিল—"আজ প্রভুর এত ঘুম কোথা হইতে আসিল?"

সদাশিবের সংজ্ঞা ফিরিয়াছে। যুবক উঠিয়া, চোখ মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল—"মুন্না! তুলসীর খবর কি?"

মুন্না। দিদির সংবাদ আপনি বলিতে পারেন। সে ত এতক্ষণ আপনার মাথার শিয়রে বসিয়াছিল।

"সেকি!"—বলিয়াই সদাশিব আশ্বাসবাণী মূর্ত্তির অন্বেষণে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় ছুটিল।

মুন্নাও ছুটিবে মনে করিয়াছিল, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে কোমল করস্পর্শে সে ফিরিয়া চাহিল।—"এটা কি রকম হইল দিদি!"

"মুন্না! আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয়।"

"হুজুর যে তোমাকে খুঁজিতে চলিয়া গেল!"

"তা হোক তুই আমাকে বাড়ী রাখিয়া আয়। শুধু রাণীকে বলিয়া আসিয়াছি। রাজা জানিলে লজ্জায় পড়িব।"

"দেরী হইলে যে আমার কার্য্যের ক্ষতি হইবে।"

"তা হোক—দোর খোলা। আমাকে এখনি বাড়ী রাখিয়া আয়।"

তুলসী আর কোন কথা না বলিয়া, মুন্নার হস্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিল। প্রতিবাদ করা নিষ্ফল বুঝিয়া, মুন্না প্রভুকন্যার সঙ্গে চলিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ভাষার ইঙ্গিত।

বাংলা ব্যাকরণের কোনও কথা তুলিতে গেলে গোড়াতেই দুই একটা বিষয়ে বোঝাপড়া স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়। বাংলা ভাষা হইতে তাহার বিশুদ্ধ সংস্কৃত অংশকে কোন মতেই ত্যাগ করা চলে না এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। মানুষকে তাহার বেশ ভূষা বাদ দিয়া আমরা ভদ্রসমাজে দেখিতে ইচ্ছা করি না। বেশ ভূষা না হইলে তাহার কাজই চলে না, সে নিষ্ফল হয়—কি আত্মীয়সভায়, কি রাজসভায়, কি পথে, মানুষকে যথোপযুক্ত পরিচ্ছদ ধারণ করিতেই হয়।

কিন্তু একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষ যদিও বরঞ্চ দেহত্যাগ করিতে রাজি হইবে তবু বস্ত্রত্যাগ করিতে রাজি হইবে না—তবু বস্ত্র তাহার অঙ্গ নহে—এবং তাহার বস্ত্রতত্ত্ব ও অঙ্গতত্ত্ব একই তত্ত্বের অন্তর্গত নহে।

সংস্কৃত ভাষার যোগ ব্যতীত বাংলার ভদ্রতা রক্ষা হয় না এবং বাংলা তাহার অনেক শোভা ও সফলতা হইতে বঞ্চিত হয় কিন্তু তবু সংস্কৃত বাংলার অঙ্গ নহে, তাহা তাহার আবরণ—তাহার লজ্জা রক্ষা, তাহার দৈন্য গোপন, তাহার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনসাধনের বাহ্য উপায়।

অতএব, মানুষের বস্ত্রবিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞান যেমন একই কথা নহে তেমনি বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণ এবং নিজ বাংলার ব্যাকরণ এক নহে। আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এই সামান্য কথাটাও প্রকাশ করিতে প্রচুর পরিমাণে বীররসের প্রয়োজন হয়।

বাংলার সংস্কৃত অংশের ব্যাকরণটি কিঞ্চিৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত

দিয়া মহম্মদঘোরী বাবর হুমায়ুনের ইতিহাস পড়ি তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ ভারতবর্ষ মিশ্রিত থাকে তেমনি আমরা বাংলা ব্যাকরণ নাম দিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়া থাকি তাহাতে অতি অল্প পরিমাণ বাংলার গন্ধ থাকে মাত্র। এরূপ বেনামীতে বিদ্যালাভ ভাল কি মন্দ তাহা প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে বলিতে সাহস করি না, কিন্তু ইহা যে বেনামী তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কেবল দেখিয়াছি শ্রীযুক্ত নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার রচিত বাংলা ব্যাকরণে বাংলা ভাষার বাংলা ও সংস্কৃত দুই অংশকেই খাতির দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতে তিনি পণ্ডিত সমাজে সুস্থ শরীরে শান্তি রক্ষা করিয়া আছেন কি না সে সংবাদ পাই নাই।

এই যে বাংলায় আমরা কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি—ইহাকে, বুঝিবার সুবিধার জন্য প্রাকৃত বাংলা নাম দেওয়া যাইতে পারে। যে বাংলা ঘরে ঘরে মুখে মুখে দিনে দিনে ব্যবহার করা হইয়া থাকে—বাংলার সমস্ত প্রদেশেই সেই ভাষার অনেকটা ঐক্য থাকিলেও সাম্য নাই। থাকিতেও পারে না। সকল দেশেরই কথিত ভাষায় প্রাদেশিক ব্যবহারের ভেদ আছে।

সেই ভেদগুলি কি ঠিক হইয়া গেলে, ঐক্যগুলি কি বাহির করা সহজ হইয়া পড়ে। বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত প্রাকৃত ভাষাগুলির একটি তুলনামূলক ব্যাকরণ যদি লিখিত হয়, তবে বাংলা ভাষা বাঙ্গালীর কাছে ভাল করিয়া পরিচিত হইতে পারে। তাহা হইলে বাংলা ভাষার কারক, ক্রিয়া ও অব্যয় প্রভৃতির উৎপত্তি ও পরিণতির নিয়ম অনেকটা সহজে ধরা পড়ে।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে উপকরণ সংগ্রহ করা চাই। নানা দিক হইতে সাহায্য পাইলে তবেই ক্রমে ভাবী ব্যাকরণকারের পথ সুগম হইয়া উঠিবে।

ভারতীতে "ভাষাপ্রসঙ্গ" বিভাগে আমরা এ সম্বন্ধে বাঙ্গলার নানা প্রদেশের পাঠকের সহায়তা প্রার্থনা করি। এখানে ধারাবাহিক ব্যাকরণের প্রত্যাশা আমরা করি না। প্রাকৃত বাঙ্গালার ভাষা বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে কোনও তথ্য বা তত্ত্ব কাহারও মনে উদয় হইবে তাহা ভারতীর এই বাংলা ভাষাপ্রসঙ্গ বিভাগে সঞ্চয়ের জন্ত যদি পাঠাইয়া দেন তবে বাঙ্গালার ভাবী বৈয়াকরণকে ঋণে বদ্ধ করিবেন।

ভাষার অমুক ব্যবহার বাঙ্গালার পশ্চিমে আছে পূর্ব্বে নাই, বা পূর্ব্বে আছে পশ্চিমে নাই এরূপ একটা ঝগড়া যেন না ওঠে। এই সংগ্রহে বাংলার সকল প্রদেশকেই আহ্বান করা যাইতেছে। পূর্ব্বেই আভাস দিয়াছি ঐক্য নির্ণয় করিয়া বাঙ্গলা ভাষার নিত্য প্রকৃতিটি বাহির করিতে হইলে প্রথমে তাহার ভিন্নতা লইয়া আলোচনা করিতে হইবে।

আমরা কেবলমাত্র ভাষার দ্বারা ভাব প্রকাশ করিয়া উঠিতে পারি না—আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে সুর থাকে, হাত মুখের ভঙ্গী থাকে—এমনি করিয়া কাজ চালাইতে হয়। কতকটা অর্থ এবং কতকটা ইঙ্গিতের উপরে আমরা নির্ভর করি।

আবার আমাদের ভাষারও মধ্যে সুর এবং ইসারা স্থানলাভ করিয়াছে। অর্থবিশিষ্ট শব্দের সাহায্যে যে সকল কথা বুঝিতে দেরি হয় বা বুঝা যায় না তাহাদের জন্য ভাষা বহুতর ইঙ্গিত বাক্যের আশ্রয় লইয়াছে। এই ইঙ্গিত বাক্যগুলি অভিধান ব্যাকরণের বাহিরে বাস করে কিন্তু কাজের বেলা ইহাদিগকে নহিলে চলে না।

বাংলা ভাষায় এই ইঙ্গিত বাক্যের ব্যবহার যত বেশি এমন আর কোনো ভাষায় আছে বলিয়া আমরা জানি না।

বর্ত্তমান লেখক বাঙ্গলার এই ইঙ্গিত ভাষা লইয়া ইতিপূর্ব্বে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় আলোচনা করিয়াছেন—"বাঙ্গলা শব্দদ্বৈত" ও "ধ্বন্যাত্মক শব্দ" নামক দুইটি প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যে সকল শব্দ ধ্বনিব্যঞ্জক, কোন অর্থসূচক ধাতু হইতে যাহাদের উৎপত্তি নহে তাহাদিগকে ধ্বন্যাত্মক নাম দেওয়া গেছে। যেমন ধাঁ, সাঁ, চট্, খট, ইত্যাদি।

এইরূপ ধ্বনির অনুকরণমূলক শব্দ অন্য ভাষাতেও ব্যবহৃত হয়—কিন্তু বাংলার বিশেষত্ব এই যে এগুলি সকল সময় বাস্তবধ্বনির অনুকরণ নহে অনেক সময়ে ধ্বনির কল্পনা মাত্র। মাথা দব্‌দব্ করিতেছে, টন্‌টন্ করিতেছে, কন্‌কন্ করিতেছে প্রভৃতি শব্দে বেদনা বোধকে কাল্পনিক ধ্বনির ভাষায় তর্জ্জমা করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। "মাঠ ধূ ধূ করিতেছে, রৌদ্র ঝাঁঝাঁ করিতেছে, শূন্য ঘর গম্‌গম্ করিতেছে, ভয়ে গা ছম্‌ছম্ করিতেছে, এগুলিকে অন্য ভাষায় বলিতে গেলে বিস্তারিত করিয়া বলিতে হয়—এবং বিস্তারিত করিয়া বলিলেও ইহার অনির্ব্বচনীয়তাটুকু হৃদয়ের মধ্যে তেমন অনুভবগম্য হয় না—এরূপ স্থলে এই প্রকার অব্যক্ত অস্ফুট ভাষাই ভাবব্যক্ত করিবার পক্ষে বেশি উপযোগী। একটা জিনিষকে লাল বলিলে তাহার বস্তুগুণ সম্বন্ধে কেবলমাত্র একটা খবর দেওয়া হয় কিন্তু "লাল টুক্‌টুক্ করিতেছে" বলিলে সেই লাল রং আমাদের অনুভূতির মধ্যে কেমন করিয়া উঠিয়াছে তাহাই একটা অর্থহীন কাল্পনিক ধ্বনির সাহায্যে বুঝাইবার চেষ্টা করা যায়। ইহা ইঙ্গিত—ইহা বোবার ভাষা।

বাংলা ভাষায় এইরূপ অনির্ব্বচনীয়তাকে ব্যক্ত করিবার চেষ্টায় এই প্রকারের অব্যক্ত ধ্বনিমূলকশব্দ প্রচুররূপে ব্যবহার করা হয়।

ভাল করিয়া ছবি আঁকিতে গেলে শুধু গোটাকতক মোটা রং লইয়া বসিলে চলে না, নানা রকমের মিশ্র রং সূক্ষ্ম রঙের দরকার হয়। বর্ণনার ভাষাতেও সেইরূপ বৈচিত্র্যের প্রয়োজন। শরীরের গতি সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় কত কথা আছে ভাবিয়া দেখিবেন—Walk, run, hobble, waggle, wade, creep, crawl ইত্যাদি—বাংলা লিখিত

ভাষায় কেবল দ্রুতগতি ও মন্দগতি দ্বারা এই সমস্ত অবস্থা ব্যক্ত করা যায় না। কিন্তু কথিত ভাষা লিখিত ভাষার মত বাবু নহে, তাহাকে যেমন করিয়া লোক প্রতিদিনের নানান্ কাজ চালাইতে হয়—যতদিন বোপদেব পাণিনি অমরকোষ ও শব্দকল্পদ্রুম আসিয়া তাহাকে পাশ ফিরাইয়া না দেন ততক্ষণ কাত হইয়া পরিয়া থাকিলে তাহার চলে না—তাই সে নিজের বর্ণনার ভাষা নিজে বানাইয়া লইয়াছে তাই তাহাকে কখনো সাঁ করিয়া, কখনো গট্‌গট্ করিয়া, কখনো খুটুস্ খুটুস্ করিয়া, কখনো নড়্বড় করিতে করিতে, কখনো সুড়্সুড় করিয়া, কখনো থপথপ এবং কখনো থপাস্ থপাস্ করিয়া চলিতে হয়। ইংরাজ ভাষা laugh, smile, grin, simper, chuckle করিয়া নানাবিধ আনন্দ কৌতুক ও বিদ্রূপ প্রকাশ করে—বাংলা ভাষা খলখল করিয়া, খিলখিল্ করিয়া, হোহো করিয়া, হিহি করিয়া, ফিক্ ফিক্ করিয়া, ফিক্ করিয়া, এবং মুচ্‌কিয়া হাসে। মুচ্‌কে হাসির জন্য বাংলা অমরকোষের কাছে ঋণী নহে। মচ্‌কান শব্দের অর্থ বাকানো—বাঁকাইতে গেলে যে মচ্ করিয়া ধ্বনি হয় সেই ধ্বনি হইতে এই কথার উৎপত্তি। উহাতে হাসিকে ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া মচ্‌কাইয়া রাখিলে তাহা মুচ্‌কে হাসিরূপে একটু বাঁকাভাবে বিরাজ করে।

বাংলা ভাষার এই শব্দগুলি প্রায়ই জোড়াশব্দ। এগুলি জোড়াশব্দ হইবার কারণ আছে। জোড়াশব্দে একটা কালব্যাপকত্বের ভাব আছে। ধুধু করিতেছে, ধবধব করিতেছে বলিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া একটা ক্রিয়ার ব্যাপকত্ব বোঝায়। যেখানে ক্ষণিকতা বোঝায় সেখানে জোড়া কথার চল্ নাই। যেমন, ধাঁ করিয়া, সাঁ করিয়া ইত্যাদি।

যখন "ধাঁ ধাঁ," "সাঁ সাঁ" বলা যায় তখন ক্রিয়ার পুনঃপুনকত্ব বুঝায়। "এ" প্রত্যয় যোগ করিয়া এই জাতীয় শব্দগুলি হইতে বিশেষণ তৈরি হইয়া থাকে। যেমন ধব্‌ধবে, টক্‌টকে ইত্যাদি।

টকটক ঠকঠক প্রভৃতি কয়েকটি ধ্বন্যাত্মক শব্দের মাঝখানে আকার যোগ করিয়া উহারি মধ্যে একটুখানি অর্থের বিশেষত্ব ঘটান হইয়া থাকে। যেমন, কচাকচ, কটাকট, কড়াক্কড়, কপাকপ, খচাখচ, খটাখট খপাখপ, গপাগপ, ঝনাজ্‌ঝন, টকাটক, টপাটপ, ঠকাঠক, ধড়াধ্বড়, ধপাধপ, ধমাধ্বম, পটাপট, ফসাফস।

কপ কপ এবং কপাকপ, ফসফস এবং ফসাফস, টপটপ এবং টপাটপ শব্দের মধ্যে কেবলমাত্র আকার যোগে অর্থের যে সূক্ষ্ম বৈলক্ষণ্য হইয়াছে তাহা কোনো বিদেশীকে অর্থবিশিষ্ট ভাষার সাহায্যে বোঝান শক্ত। ঠকাঠক বলিলে এই বুঝায় যে, একবার ঠক্ করিয়া তাহার পরে বল সঞ্চয় পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দ্বিতীয়বার ঠক্ করা—মাঝখানের সেই উদ্যত অবস্থার যতিটুকু আকারযোগে আপনাকে প্রকাশ করে। এইরূপে বাংলা-ভাষা যেন অ আ ই উ স্বরবর্ণ কয়টাকে লইয়া সুরের মত ব্যবহার করিয়াছে। সে সুর যাহার কানে অভ্যস্ত হইয়াছে সেই তাহার সূক্ষ্মতম মর্ম্মটুকু বুঝিতে পারে।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে লক্ষ্য করিবার বিষয় আর একটি আছে। আদ্যক্ষরে যেখানে অকার আছে সেইখানে পরবর্ত্তী অক্ষরে আকার যোজন চলে অন্যত্র নহে।

যেমন টকটক হইতে টকাটক হইয়াছে, কিন্তু টিকটিক হইতে টিকাটিক বা ঠুকঠুক হইতে ঠুকাঠুক হয় না। এইরূপে মনোযোগ করিলে দেখা যাইবে বাংলা ভাষার উচ্চারণে স্বরবর্ণগুলির কতকগুলি কঠিন দণ্ডবিধি আছে।

স্বরবর্ণ আকারকে আবার আর এক জায়গায় প্রয়োগ করিলে আর এক রকমের সুর বাহির হয়। তাহার দৃষ্টান্ত :—টুকটাক, ঠুকঠাক, খুটখাট, ভুটভাট, ছুড়দাড়, কুপকাপ, গুপগাপ, ঝুপঝাপ, টুপটাপ, ধুপধাপ, হুপহাপ, দুমদাম, ধুমধাম, ফুসফাস, হুসহাস।

এই শব্দগুলি দুই প্রকারের ধ্বনিব্যঞ্জন করে—একটি অস্ফুট একটি স্ফুট। যখন বলি টুপটাপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে তখন বুঝায় যে ছোট ফোঁটাটি টুপ করিয়া এবং বড় ফোঁটাটি টাপ করিয়া পড়িতেছে—ঠুকঠাক শব্দের অর্থ একটা শব্দ ছোট, আর একটা বড়—উকারে অব্যক্তপ্রায় প্রকাশ, আকারে পরিস্ফুট প্রকাশ।

আমরা এতক্ষণ যে সকল জোড়া কথার দৃষ্টান্ত লইয়া আলোচনা করিলাম তাহারা বিশুদ্ধ ধ্বন্যাত্মক। আর এক রকমের জোড়া কথা আছে তাহার মূল শব্দটি অর্থসূচক এবং দোসর শব্দটি মূল শব্দের অর্থহীন বিকার। যেমন চুপচাপ ঘুষঘাষ, তুকতাক ইত্যাদি। চুপ ঘুষ এবং তুক এ তিনটে শব্দ আভিধানিক—ইহারা অর্থহীন নহে—ইহাদের সঙ্গে "চাপ" "ঘাষ" ও "তাক" এই তিনটে অর্থহীন শব্দ শুদ্ধমাত্র ইঙ্গিতের কাজ করিতেছে।

জলের ধারেই যে গাছটা দাঁড়াইয়া আছে সেই গাছটার সঙ্গে সঙ্গে তাহার সংলগ্ন বিকৃত ছায়াটাকে একত্র করিয়া দেখিলে যেমন হয়, বাঙ্গালা ভাষার এই কথাগুলাও সেইরূপ; চুপ কথাটার সঙ্গে "চাপ" একটা বিকৃত ছায়া যোগ করিয়া দিয়া চুপচাপ হইয়া গেল। ইহাতে অর্থেরও একটু অনির্দ্দিষ্টভাবের বিস্তৃতি হইল। যদি বলা যায় কেহ চুপ করিয়া আছে তবে বুঝায় সে নিঃশব্দ হইয়া আছে—কিন্তু যদি বলি চুপচাপ আছে তবে বোঝায় লোকটা কেবলমাত্র নিঃশব্দ নহে একপ্রকার নিশ্চেষ্ট হইয়াও আছে। একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থের পশ্চাতে একটা অনির্দ্দিষ্ট আভাস জুড়িয়া দেওয়া এই শ্রেণীর জোড়া কথার কাজ।

ছায়টা আসল জিনিষের চেয়ে বড়ই হইয়া থাকে। অনির্দ্দিষ্টটা নির্দ্দিষ্টের চেয়ে অনেক মস্ত। আকার-স্বরটাই বাঙ্গলায় বড়ত্বের সুর লাগাইবার জন্য আছে। আকার স্বরবর্ণের যোগে ঘুষঘাষের ঘাষ

তুকতাকের তাক ঘুষ অর্থ ও তুক্ অর্থকে কল্পনাক্ষেত্রে অনেকখানি বাড়াইয়া দিল অথচ স্পষ্ট কিছুই বলিল না।

কিন্তু যেখানে মূল শব্দে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে এ নিয়ম খাটে না, পুনর্ব্বার আকার যোগ করিলে কথাটা দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। কিন্তু দ্বিগুণিত করিলে তাহার অর্থ অন্য রকম হইয়া যায়। যদি বলি গোলগোল, তাহাতে, হয়, একাধিক গোল পদার্থকে বুঝায়, নয়, প্রায় গোল জিনিষকে বুঝায়। কিন্তু গোলগাল বলিলে গোল আকার ত বুঝায় সেই সঙ্গে পরিপুষ্টতা প্রভৃতি আরো কিছু অনির্দ্দিষ্ট ভাব মনে আনিয়া দেয়।

এইজন্য এই প্রকার অনির্দ্দিষ্ট ব্যঞ্জনার স্থলে দ্বিগুণিত করা চলে না, বিকৃতির প্রয়োজন। তাই গোড়ায় যেখানে আকার আছে সেখানে দোসর শব্দে অন্য স্বরবর্ণের প্রয়োজন। তাহার দৃষ্টান্ত :—

দাগদোগ, ডাকডোক, বাছবোছ, সাজসোজ, ছাঁটছোঁট, চালচোল, ধারধোর, সাফসোফ।

অন্যরকম :—কাটাকোটা, খাটাখোটা, ডাকাডোকা, ঢাকাঢোকা, ঘাঁটাঘোঁটা, ছাঁটাছোঁটা, ঝাড়াঝোড়া, চাপাচোপা, ঠাসাঠোসা, কালোকোলো।

এইগুলির রূপান্তর :—কাটাকুটি, ডাকাডুকি, ঢাকাঢুকি, ঘাঁটাঘুঁটি, ছাটাছুটি, কাড়াকুড়ি ছাড়াছুড়ি, ঝাড়াঝুড়ি, ভাজাভুজি, তাড়াতুড়ি, টানাটুনি, চাপাচুপি ঠাসাঠুসি। এইগুলি ক্রিয়াপদ হইতে উৎপন্ন—বিশেষ্যপদ হইতে উৎপন্ন শব্দ :—কাঁটাকুঁটি ঠাট্টাঠুট্টি, ধাক্কাধুক্কি।

শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বে আকার ও পরে ইকার থাকিলে মাঝখানের ওকারটি উচ্চারণের সুবিধার জন্য উকাররূপ ধরে। শুদ্ধমাত্র "কোটি" উচ্চারণ সহজ, কিন্তু "কোটাকোটি" দ্রুত উচ্চারণের পক্ষে ব্যাঘাতজনক। চাপাচোপি, ডাকাডোকি ঘাঁটাঘোঁটি উচ্চারণের

চেষ্টা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে—অথচ চুপি, ভুকি ঘুঁটি উচ্চারণ কঠিন নহে।

তাহা হইলে মোটের উপরে দেখা যাইতেছে, যে যোড়া কথাগুলির প্রথমাংশের আদ্যক্ষরে যেখানে ই, উ বা, ও আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে আকার-স্বর যুক্ত হয়—যেমন, ঠিকঠাক, মিটমাট, ফিটফাট, ভিড়ভাড়, ঢিলেঢালা, ঢিপঢাপ ইত্যাদি। কুচোকাচা, গুঁড়োগাঁড়া, গুঁতোগাঁতা, কুটোকাটা, ঘুষোঘাষা, ফুটোফাটা, ভুজংভাজাং, টুক্‌রোটাক্‌রা, হুকুম হাকাম, শুক্‌নো শাক্‌না।—গোলগাল যোগযাগ, সোরসার, রোথরাথ, খোঁচখাঁচ, গোছগাছ, মোটমাট, খোপথাপ, খোলাথালা, জোগাড়-জাগাড়।

কিন্তু যেখানে প্রথমাংশের আত্মক্ষরে আকার যুক্ত আছে সেখানে দ্বিতীয়াংশে ওকার জুড়িতে হয়। ইহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে—"জোগাড়" শব্দের বেলায় হইল জোগাড়জাগাড়, ডাগর শব্দের বেলায় হইল ডাগরডোগর। একদিকে দেখ, টুকরোটাকরা, হুকুমহাকাম,—অন্যদিকে হাপুস্‌হুপুস, নাদুসনুদুস। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে আকারে ওকারে একটা বোঝপাড়া আছে। ফিরিঙ্গি যেমন ইংরাজের চালে চলে, আমাদের সঙ্কর জাতীয় অ্যাকারও এখানে আকারের নিয়ম রক্ষা করেন যথা:—ঠ্যাকাঠোকা, গ্যাঁটাগোটা, ল্যাদাগোলা।

উল্লিখিত নিয়মটি বিশেষ শ্রেণীর কথা সম্বন্ধেই খাটে—অর্থাৎ যে সকল কথায় প্রথমার্দ্ধের অর্থ নির্দ্দিষ্ট ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের অর্থ অনির্দ্দিষ্ট। যেমন, ঘুষোঘাষা। কিন্তু "ঘুষোঘুষি" কথাটার ভাব অন্য রকম—তাহার অর্থ দুই পক্ষ হইতে সুস্পষ্ট ঘুষি চালাচালি। ইহার মধ্যে আভাস ইঙ্গিত কিছুই নাই। এখানে দ্বিতীয়াংশের আত্মক্ষরে সেইজন্য

এইরূপ "ঘুষাঘুষি" দলের কথাগুলি সাধারণতঃ অন্যোন্যতা বুঝাইয়া থাকে—"কানাকাণি"র মানে, এর কাণে ও বলিতেছে ওর কাণে এ বলিতেছে। গলাগলি বলিতে বুঝায় এর গলা ও ধরিয়াছে ওর গলা এ ধরিয়াছে। এই শ্রেণীর শব্দের তালিকা এই খানেই দেওয়া যাক :—

কষাকষি, কচলাকচলি, গড়াগড়ি, গলাগলি, চটাচটি, চটকাচটকি, ছড়াছড়ি, জড়াজড়ি, টক্করাটক্করি, ডলাডলি, ঢলাঢলি, দলাদলি, ধরাধরি, ধস্তাধস্তি, বকাবকি, বলাবলি।

আঁটাআঁটি, আঁচাআঁচি, আড়াআড়ি, আধাআধি, কাছাকাছি, কাটাকাটি, ঘাঁটিঘাঁটি, চাটাচাটি, চাপাচাপি, চালাচালি, চাওয়া-চাওয়ি, ছাড়াছাড়ি, জানাজানি, জাপ্টাজাপ্টি টানাটানি, ডাকাডাকি, ঢাকাঢাকি, তাড়াতাড়ি, দাপাদাপি, ধাক্কাধাক্কি, নাচানাচি, নাড়ানাড়ি, পাল্টাপাল্টি, পাকাপাকি, পাড়াপাড়ি, পাশাপাশি, ফাটফাটি, মাথা-মাথি, মাঝামাঝি, মাতামাতি, মারামারি, বাছাবাছি, বাঁধাবাঁধি, বাড়া-বাড়ি, ভাগাভাগি, রাগারাগি, রাতারাতি, লাগালাগি, লাঠালাঠি, লাথালাথি, লাফালাফি, সাম্নাসাম্নি, হাঁকাহাঁকি, হাঁটাহাঁটি, হাতা-হাতি, হানাহানি, হারাহারি। (হারাহারি ভাগ করা) খ্যাঁচাখেঁচি, খ্যাম্চাখেম্চি, ঘ্যাঁষাঘেঁষি, ঠ্যাসাঠেসি, ঠেলাঠেলি, ঠ্যাকাঠেকি, ঠ্যাঙা-ঠেঙি, দ্যাখাদেখি, ব্যাঁকাবেঁকি, হ্যাঁচকাহেচকি, ল্যাপালেপি।

কিলোকিলি, পিঠেপিঠি, (ভাইবোন)।

খুনোখুনি, গুঁতোগুঁতি, ঘুষোঘুসি, চুলোচুলি, ছুটোছুটি, ঝুলোঝুলি, মুখোমুখি, সুমুখোসুমুখি।

টেপাটিপি, পেটাপিটি, লেখালিখি, ছেঁড়াছিঁড়ি।

কোণাকুনি, কোলাকুলি, কোস্তাকুস্তি, খোঁচাখুঁচি, খোঁজাখুঁজি খোলাখুলি, গোড়াগুড়ি, ঘোরাঘুরি, ছোঁড়াছুঁড়ি, ছোঁওয়াছুঁয়ি, কোলা-

কুলি, ঠোকাঠোকি, ঠোকাঠুকি, দোলাদুলি, যোকাযুকি, রোখারুখি, লোকালুকি, শোঁকাশুঁকি, দৌড়োদৌড়ি।

এই শ্রেণীর জোড়া কথা তৈরির নিয়মে দেখা যাইতেছে—প্রথমার্দ্ধের শেষে আ ও দ্বিতীয়ার্দ্ধের শেষে ই যোগ করিতে হয়। যেমন, ছড় ধাতুর উত্তরে একবার আ ও একবার ই যোগ করিয়া ছড়াছড়ি, বল ধাতুর উত্তরে আ এবং ই যোগ করিয়া বলাবলি ইত্যাদি।

কেবল ক্রিয়াপদের ধাতু নহে, বিশেষ্য শব্দের উত্তরেও এই নিয়ম খাটে, যেমন রাতারাতি, হাতাহাতি, মাঝামাঝি ইত্যাদি।

কিন্তু যেখানে আদ্যক্ষরে ইকার উকার বা ঔকার আছে সেখানে আ প্রত্যয়কে তাহার বন্ধু ওকারের শরণাপন্ন হইতে হয়। যেমন, কিলোকিলি, খুনোখুনি, দৌড়োদৌড়ি।

ইহাতে প্রমাণ হয় ইকার ও উকারের পরে আকার অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। অন্যত্র তাহার দৃষ্টান্ত আছে—যথা যেখানে লিখিত ভাষায় লিখি—"মিলাই, মিশাই, বিলাই," সেখানে কথিত ভাষায় উচ্চারণ করি, "মিলোই, মিশোই, বিলোই"—"ডিবা"কে বলি ডিবে, "চিনাবাসন"কে বলি "চিনে বাসন"। "ডুবাই" "লুকাই" "জুড়াই"কে বলি "ডুবোই" "লুকোই" "জুড়োই," "কুলা" বলি "কুলো," "ধূলা"কে বলি ধূলো ইত্যাদি। অতএব এখানে নিয়মের যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তাহা উচ্চারণ বিধিবশতঃ।

যেখানে আদ্যক্ষরে অ্যাকার, একার বা ওকার আছে সেখানে আবার আর একদিকে স্বরব্যত্যয় ঘটে—নিয়মমত "ঠ্যালোঠ্যালি" না হইয়া ঠ্যালাঠেলি "টপাটেপি" না হইয়া টেপাটিপি" এবং "কোণা-কোণি" না হইয়া কোণাকুণি" হয়।

শ-ওয়ালা কথায় একারের কোনও বৈলক্ষণ্য ঘটে না। বাঙ্গলা উচ্চারণ বিধির এই সকল রহস্য আলোচনার বিষয়।

আমরা শেষোক্ত তালিকাটিকে বাঙ্গালার ইঙ্গিত বাক্যের মধ্যে ভুক্ত করিলাম কেন তাহা বলা আবশ্যক।—"কানাকানি করিতেছে" বা "বলাবলি করিতেছে" বলিলে যে সকল কথা উহ্য থাকে তাহা কেবল কথার ভঙ্গীতে ব্যক্ত হইতেছে। "পরস্পর পরস্পরের কানে কথা বলিতেছে" বলিলে প্রকৃত ব্যাপারটাকে অর্থবিশিষ্ট কথায় ব্যক্ত করা হয়, কিন্তু "কান" কথাটাকে দুইবার বাঁকাইয়া বলিয়া একটা ইঙ্গিতে সমস্তটা সংক্ষেপে সারিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শূন্যবাদ।*

[বৌদ্ধ দর্শন।]

ভূমিকা।

ভারতের দার্শনিকবৃন্দ প্রায়শঃ আস্তিক ও নাস্তিক এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। অনেকের ধারণা যাঁহারা আস্তিক নন, তাঁহারাই নাস্তিক; এবং যাঁহারা নাস্তিক নন, তাঁহারাই আস্তিক। তাঁহাদের মতে আস্তিক ও নাস্তিক এই দুইটী শব্দ পরস্পর বিরোধী অর্থাৎ ইহাদের একের সত্ত্বায় অপরের অভাব এবং একের অভাবে অপরের সত্তা সূচিত হয়। তাঁহারা মনে করেন বিশ্বসংসারে যত কিছু

---

* গীতা সভায় ১১ই জুন তারিখে পঠিত। স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় অদ্বৈতবাদ ও শূন্যবাদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই ইহা স্বীকার করেন। তথাপি তিনি শূন্যবাদের অসারত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক ব্রহ্মবাদের উৎকর্ষ প্রমাণ করিয়া এক প্রবন্ধ প্রকাশ করিবেন, এরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। প্রঃ লেঃ।

দার্শনিক মত আছে উহা অবশ্যই আস্তিক ও নাস্তিক এই দুইটী প্রধান মতের কোনটীর অন্তর্গত হইবে। কিন্তু তাঁহাদের এই সংস্কার ভ্রান্তি-মূলক। অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে এমন একটী সম্প্রদায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন যাঁহারা আস্তিকও নহেন, নাস্তিকও নহেন। এই সম্প্রদায়ের নাম শূন্যবাদী বৌদ্ধ। শূন্যবাদই বৌদ্ধ-দর্শনের মূলতত্ত্ব, শূন্যতা-সাক্ষাৎকারই বৌদ্ধগণের পরম নির্ব্বাণ

নাস্তিক।

নাস্তিক এই অনাদি ও অপরিসীম বিশ্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভগ্নহৃদয়ে নিরাশ অন্তঃকরণে বলিয়া থাকেন এই সংসারের কোন অস্তিত্ব, সত্তা বা সত্যত্ব নাই। ঘটপটাদি অচল পদার্থ, বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ পদার্থ, মনুষ্যাদি জীব, গ্রহতারা বিরাজিত নভোমণ্ডল, ধনধান্য-পূর্ণ পৃথিবী, সুগভীর সমুদ্র ইত্যাদি যাহা কিছু দৃষ্ট হইতেছে, উহা সমস্তই মিথ্যা। উহাদের কোনটীরই ত্রৈকালিক সত্তা নাই। কোন পদার্থ অতীত কালে ছিল কিন্তু এখন নাই, কোনটী বা এখন আছে ভবিষ্যতে থাকিবে না এবং অপর কোনটী বা ভবিষ্যতে জন্মলাভ করিবে কিন্তু এখন উহার কোন চিহ্নই নাই। এইরূপে অত্যল্প কালের জন্য পদার্থ সমূহের সমুদ্ভব হইতেছে। যদি পদার্থ সমূহ ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান তিন কালেই সমভাবে থাকিত তাহা হইলে উহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতাম। কিন্তু এই সংসারে এমন একটী পদার্থও নাই যাহা ত্রিকালে সমানভাবে থাকে। কোন পদার্থ মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, কোনটী বা কয়েক দিন পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইয়া বিনাশ লাভ করে। শত শত সহস্র সহস্র কোটী কোটী বৎসরও কোন পদার্থ বিদ্যমান থাকে বটে কিন্তু পরিণামে উহার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। নদ নদী

যাইবে। অতএব এই সকল ধ্বংসশীল নিঃসত্ত অভাবাত্মক পদার্থে আস্থা স্থাপন করিয়া বা উহাদের উপর নির্ভর করিয়া প্রতারিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই।

অতীত ও ভবিষ্যতের কথা ছাড়িয়া দাও, বর্ত্তমানেই বা পদার্থ-সমূহের সত্তা কোথায়? এই যে ঘট দেখিতেছ, উহার কোন প্রকৃত সত্তা নাই। আকার, গভীরতা, বর্ণ, গুরুত্ব, আস্বাদ, গন্ধ ইত্যাদি গুণসমষ্টিকে আমরা ঘট বলিয়া বিশ্বাস করিতেছি। এই গুণগুলিকে ঘট হইতে পৃথক্ করিয়া লও, তখন আর ঘটের অস্তিত্ব থাকিবে না। তখন ঘট অভাব পদার্থ বলিয়া প্রতীত হইবে। আবার এই গুণগুলিরই বা প্রকৃত সত্তা কোথায়? আকার, গভীরতা, গুরুত্ব ইত্যাদি গুণ দ্রব্যের সহ সম্বন্ধ বিহীন হইয়া থাকিতে পারে না। কেহ কি কখনও ঘটাদি দ্রব্য ত্যাগ করিয়া আকার গভীরতা গুরুত্ব ইত্যাদি গুণ কল্পনা করিতে পারেন? দ্রব্যবিহীন গুণ নাই এবং গুণবিহীন দ্রব্য নাই অতএব দ্রব্য নাস্তি বা অসত্য পদার্থ, গুণও নাস্তি বা অসত্য পদার্থ। দ্রব্য ও গুণের যে সম্বন্ধ তাহাও অসত্য পদার্থ। এই প্রণালীতে বিশ্বসংসার বিশ্লেষণ কর,—দেখিবে দ্রব্য ও গুণ, অবয়ব ও অবয়বী, সমুদায় ও সমুদায়ী, সামান্য ও বিশেষ ইত্যাদি সমস্ত পদার্থই অলীক, অসত্য বা মিথ্যা। শুধু জড়জগৎ কেন, বিজ্ঞানজগৎ বিশ্লেষণ কর, তাহাতেও দেখিবে সমস্ত পদার্থ অভাবাত্মক। আমাদের আভ্যন্তরীণ বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, ছন্দঃ, স্পর্শ, মতি, স্মৃতি, শ্রদ্ধা, হ্রী, প্রমাদ, ক্রোধ, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি যে সকল চৈতসিক ধর্ম্ম বা বিজ্ঞান পদার্থ আছে, তাহার কোন্‌টী চিরস্থায়ী? এই সকল মানসিক বৃত্তি সময়ে সময়ে বিরাট মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পরক্ষণেই বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই সকল চৈতসিক বৃত্তির সমষ্টির নাম "আমি।" "আমি" পদার্থেরও কোন পৃথক অস্তিত্ব নাই। এই চৈতসিক বৃত্তি

নিচয়ের আবির্ভাবেই "আমার" আবির্ভাব এবং উহাদের ধ্বংসেই "আমার" ধ্বংস।

এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমি স্বল্প কালের জন্য আবির্ভূত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছি। আমার ন্যায় কত কোটী কোটী জীব এই সংসারে জন্মলাভ করিয়া বিস্মৃতিসাগরে ডুবিয়া গিয়াছে। পুনরায় কোটী কোটী জীব আবির্ভূত হইবে, তাহাদেরও এই দশা ঘটিবে। এ সংসারে কাহারও স্থায়িত্ব নাই। সংসারের সকলই অশাশ্বত, অধ্রুব ও অলীক। নটের অভিনয়ের ন্যায় এই সংসারে অসংখ্য পদার্থের আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। বস্তুতঃ এই আবির্ভাব ও তিরোভাব, এই প্রকাশ ও অপ্রকাশ, এই জন্ম ও মরণ রূপ প্রবাহের নামই সংসার। এই জন্ম-মরণ প্রবাহ কখন আরম্ভ হইয়াছে, ইহার পরিণাম কি, তাহা কেহই বলিতে পারে না। অতএব এই নিরালম্ব, নিঃসত্ত, অভাবাত্মক সংসারে কোন পদার্থের উপর আস্থা স্থাপন করিও না, আজ যাহাকে ধ্রুব বলিয়া আশ্রয় করিতেছ, কাল সে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। আজ যেখানে সুখ দেখিতেছ, কাল সেখানে দুঃখ দেখিতে পাইবে, আজ যাহা জ্ঞানের আধার, কাল তাহা অজ্ঞান-পরিপূর্ণ দেখিবে। জড় জগৎ ও বিজ্ঞান জগৎ ইহার কোথায়ও আশ্রয় লইতে যাইও না, যাহাকে তুমি আশ্রয় করিতে যাইবে, সে তোমাকে নিশ্চিতই বিড়ম্বিত করিবে। আর তোমার আশ্রয়েরই বা প্রয়োজন কি? তুমি চিরস্থায়ী নও। জলবুদ্বুদের ন্যায় তুমি ক্ষণকালের জন্য আবির্ভূত হইয়াছ, অচিরেই তোমার তিরোভাব ঘটিবে। তুমি ও তোমার সংসার উভয়ই অনিত্য। উভয়ই শরৎকালীন মেঘের ন্যায় অধ্রুব, নভঃস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চপল, উদকচন্দ্র বা মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় অলীক। যিনি এই সংসারকে "নাস্তি," "অভাব" বা "অসত্য" পদার্থ

আস্তিক।

নাস্তিকের উল্লিখিত আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া নানা শ্রেণীর আস্তিক আসিয়া নানা ভাবে তাঁহাকে সান্ত্বনা করেন। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের সংস্থাপয়িতা গোতম ও কণাদ এক শ্রেণীর আস্তিক, সাংখ্য ও যোগ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কপিল ও পতঞ্জলি অন্য শ্রেণীর আস্তিক, বেদান্ত দর্শনের সংস্থাপক মহর্ষি ব্যাস আর এক শ্রেণীর আস্তিক। প্রথম শ্রেণীর আস্তিক বলেন—"হে নাস্তিক, তুমি নিরাশ হইও না, সংসার অলীক নহে। তুমি সংসারে প্রত্যেক বস্তু তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়াছ বটে কিন্তু উহাদের আভ্যন্তরীণ অস্তিত্ব বা সত্তা উপলব্ধি করিতে পার নাই। এই যে সমক্ষে ঘট দেখিতেছ উহা অনিত্য বটে কিন্তু উহার অভ্যন্তরে নিত্য সত্তা বিদ্যমান আছে। ঘটকে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত কর। উহার প্রত্যেক খণ্ড আবার লক্ষ খণ্ডে বিভক্ত কর, তাহার প্রত্যেক খণ্ড আবার কোটী খণ্ডে বিভক্ত কর। পরিণামে তুমি কতকগুলি পরমাণুতে যাইয়া পঁহুছিবে, ঐ সকল পরমাণু নিত্য, শাশ্বত ও ধ্রুব। এইরূপে তুমি সমগ্র জড়জগৎ বিশ্লেষণ কর, দেখিবে উহা কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। এই পরমাণুসমূহ অনাদি ও অনন্ত, উহাদের ত্রৈকালিক সত্তা আছে; উহারা অতীতেও ছিল, বর্ত্তমানেও আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে। উহারা অজর ও অমর। হে নাস্তিক, শুধু জড় জগতে নয়, বিজ্ঞান জগতেও তুমি নিত্যবস্তু দেখিতে পাইবে। আমাদের জ্ঞানপ্রবাহ অনিত্য বটে কিন্তু উহাদের অভ্যন্তরে যে আত্মা আছেন তিনি অনিত্য নহেন। শস্ত্র তাঁহাকে ছেদন করিতে পারে না,* অগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল তাঁহাকে ক্লিন্ন করিতে

* নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ॥ ২৪॥ (গীতা)।

না এবং বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। তিনি অচ্ছেদ্য, দাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, অচল ও সনাতন।

"হে নাস্তিক, তুমি যে দ্রব্যবিহীন গুণ বা গুণবিহীন দ্রব্য স্বীকার কর না—ইহা তোমার ভ্রান্তি। ঘট একটী দ্রব্য। গুরুত্ব, আকার, গভীরতা ইত্যাদি ইহার গুণ। এই গুণগুলিকে এক কথায় ঘটত্ব বলিতে পারা যায়। তুমি ঘটবিহীন ঘটত্ব বা ঘটত্ববিহীন ঘট স্বীকার কর না কেন? দেখ, জ্ঞান দুই প্রকার, নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক। যখন আমরা ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন প্রথমে ঘটত্ববিহীন ঘট ও ঘট-বিহীন ঘটত্ব উভয়ই পৃথক্‌ভাবে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়। এই জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। ইহা অতীন্দ্রিয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া ইহাকে একেবারে অপলাপ করা যায় না। যোগিগণ ইহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান জন্মিবার পরেই সবিকল্পক জ্ঞান জন্মে। তখন আমরা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট ও ঘটনিষ্ঠ ঘটত্ব প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ তখন গুরুত্ব, আকার, গভীরতা ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ঘট আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। এই প্রত্যক্ষ সবিকল্পক, ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর। অতএব হে নাস্তিক তোমাকে অবশ্যই গুণহীন দ্রব্য ও দ্রব্যবিযুক্ত গুণ স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রণালীতে তুমি বুঝিবে জ্ঞান-সুখাদির অতীত আত্মা নামক দ্রব্য আছে। জ্ঞান-সুখাদি আত্মার গুণ।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর আস্তিক অর্থাৎ কপিল আসিয়া বলিতেছেন—"হে নাস্তিক, তুমি ভগ্নহৃদয় হইও না, সংসার মিথ্যা নহে। ঘটপটাদি দ্রব্য অলীক বটে, এই অনুভূয়মান ব্যক্ত জগৎ অলীক বটে, কিন্তু উহার অন্তরে এক মূলপ্রকৃতি আছেন—তিনি নিত্য, তাঁহার বিকার নাই।

করিতেছেন। বিজ্ঞান জগতের অভ্যন্তরেও পুরুষ বা আত্মা নামক পদার্থ আছে। উহা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অপরিণামী, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব। এই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের নামই সংসার। পুরুষ যখন প্রকৃতিব বন্ধন ছেদন করিতে পারিবেন, তখন এই সংসার প্রকৃতিতে লীন হইবে এবং পুরুষ মুক্তিলাভ কবিবেন। বন্ধনদশায়ই থাকুন আব মুক্ত্যবস্থায়ই থাকুন, পুরুষ নিত্য। তিনি সদ্ বস্তু, তাঁহার সত্তা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না।”

তৃতীয় শ্রেণীব আস্তিক অর্থাৎ বৈদান্তিক আসিয়া বলিতেছেন—“হে নাস্তিক, তুমি দৌর্মনস্য ত্যাগ কব। এই সংসারপ্রবাহ অনিত্য বটে—জড় ও বিজ্ঞান জগৎ অসৎ বটে—কিন্তু উহার অভ্যন্তরে এক মহাসত্তা বিদ্যমান আছে, তাহার নাম ব্রহ্ম। তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ। তিনি অস্থূল, অচক্ষুঃ, অমনাঃ, অকর্ত্তা, চিন্মাত্র ও চৈতন্যস্বরূপ। তিনি শ্রোত্রেব শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু। সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ কবিতে পারে না, চন্দ্র তারকা ও বিদ্যুৎ তাঁহাকে প্রকাশ কবিতে পাবে না, সামান্য অগ্নি তাঁহাকে কি করিয়া প্রকাশ কবিবে? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই ইহারা সকলে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার দীপ্তিতে ইহাবা সকলে দীপ্তিমান্ হইতেছে*। বাক্, মনঃ ও চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অস্তীতি† অর্থাৎ “তিনি আছেন” এই কথা বলা ভিন্ন অন্য কোন্ উপায়ে তাঁহাকে লাভ করা যায়?

---

* শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং। সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ। প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি ॥ (কেনোপনিষদ্) ॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি ॥ (কেনোপনিষদ) ॥

† নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ (কেনোপনিষদ্) ॥

পারে না এবং বায়ু তাঁহাকে শুষ্ক করিতে পারে না। তিনি অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য এবং অশোষ্য; তিনি নিত্য, সর্ব্বগত, স্থির, অচল ও সনাতন।

"হে নাস্তিক, তুমি যে দ্রব্যবিহীন গুণ বা গুণবিহীন দ্রব্য স্বীকার কর না—ইহা তোমার ভ্রান্তি। ঘট একটী দ্রব্য। গুরুত্ব, আকার, গভীরতা ইত্যাদি ইহার গুণ। এই গুণগুলিকে এক কথায় ঘটত্ব বলিতে পারা যায়। তুমি ঘটবিহীন ঘটত্ব বা ঘটত্ববিহীন ঘট স্বীকার কর না কেন? দেখ, জ্ঞান দুই প্রকার, নির্ব্বিকল্পক ও সবিকল্পক। যখন আমরা ঘট প্রত্যক্ষ করি, তখন প্রথমে ঘটত্ববিহীন ঘট ও ঘট-বিহীন ঘটত্ব উভয়ই পৃথক্‌ভাবে আমাদের সমক্ষে উপস্থিত হয়। এই জ্ঞানকে নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান বলে। ইহা অতীন্দ্রিয়। আমাদের ইন্দ্রিয়ের অগোচর বলিয়া ইহাকে একেবারে অপলাপ করা যায় না। যোগিগণ উহা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। নির্ব্বিকল্পক জ্ঞান জন্মিবার পরেই সবি-কল্পক জ্ঞান জন্মে। তখন আমরা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট ও ঘটনিষ্ঠ ঘটত্ব প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ তখন গুরুত্ব, আকার, গভীরতা ইত্যাদি গুণ-বিশিষ্ট ঘট আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হয়। এই প্রত্যক্ষ সবিকল্পক, ইহা আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর। অতএব হে নাস্তিক তোমাকে অবশ্যই গুণহীন দ্রব্য ও দ্রব্যবিযুক্ত গুণ স্বীকার করিতে হইবে। এই প্রণালীতে তুমি দেখিবে জ্ঞান-সুখাদির অতীত আত্মা নামক দ্রব্য আছে। জ্ঞান-সুখাদি ঐ আত্মার গুণ।"

দ্বিতীয় শ্রেণীর আস্তিক অর্থাৎ কপিল আসিয়া বলিতেছেন—"হে নাস্তিক, তুমি ভগ্নহৃদয় হইও না, সংসার মিথ্যা নহে। ঘটপটাদি দ্রব্য নশ্বর বটে, এই অনুভূয়মান ব্যক্ত জগৎ অলীক বটে, কিন্তু উহার অভ্যন্তরে এক মূলপ্রকৃতি আছেন—তিনি নিত্য, তাঁহার বিকার নাই।

করিতেছেন। বিজ্ঞান জগতের অভ্যন্তরেও পুরুষ বা আত্মা নামক পদার্থ আছে। উহা নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অপরিণামী, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত স্বভাব। এই পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগের নামই সংসার। পুরুষ যখন প্রকৃতির বন্ধন ছেদন করিতে পারিবেন, তখন এই সংসার প্রকৃতিতে লীন হইবে এবং পুরুষ মুক্তিলাভ করিবেন। বন্ধনদশায়ই থাকুন আর মুক্ত্যবস্থায়ই থাকুন. পুরুষ নিত্য। তিনি সদ্ বস্তু, তাঁহার সত্তা কখনও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না।"

তৃতীয় শ্রেণীর আস্তিক অর্থাৎ বৈদান্তিক আসিয়া বলিতেছেন—"হে নাস্তিক, তুমি দৌর্মনস্য ত্যাগ কর। এই সংসারপ্রবাহ অনিত্য বটে—জড় ও বিজ্ঞান জগৎ অসৎ বটে—কিন্তু উহার অভ্যন্তরে এক মহাসত্তা বিদ্যমান আছে,. তাহার নাম ব্রহ্ম। তিনি সৎ চিৎ ও আনন্দ-স্বরূপ। তিনি অস্থূল, অচক্ষুঃ, অমনাঃ, অকর্ত্তা, চিন্মাত্র ও চৈতন্যস্বরূপ। তিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের. মন, বাক্যের বাক্, প্রাণের প্রাণ ও চক্ষুর চক্ষু। সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকা ও বিদ্যুৎ তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, সামান্য অগ্নি তাঁহাকে কি করিয়া প্রকাশ করিবে? তিনি প্রকাশমান বলিয়াই ইহারা সকলে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার দীপ্তিতে ইহারা সকলে দীপ্তিমান্ হইতেছে*। বাক্, মনঃ ও চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অস্তাতি† অর্থাৎ "তিনি আছেন" এই কথা বলা ভিন্ন অন্য কোন্ উপায়ে তাঁহাকে লাভ করা যায়?

---

* শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচো হ বাচং। সউ প্রাণস্য প্রাণশ্চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধীরাঃ। প্রেত্যাস্মাল্লোকাদমৃতা ভবন্তি॥ (কেনোপনিষদ্)॥

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥ (কেনোপনিষদ)॥

† নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে॥ (কেনোপনিষদ্)॥

তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, অগন্ধ, অনাদি, অনন্ত ও বুদ্ধির অতীত কিন্তু ধ্রুব অর্থাৎ সত্যবস্তু।* তাঁহাকে জানিয়া লোক অমৃত অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স লাভ করে।

এইরূপে নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসক, বৈদান্তিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের আস্তিকই স্ব স্ব সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া নাস্তিককে সান্ত্বনা করিলেন। সকলেই "আত্মা বারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যশ্চ" এই শ্রুতি বাক্যের উল্লেখ করিয়া দেখাইলেন "আত্মা", "পুরুষ" বা ব্রহ্ম" পদবাচ্য এক বা বহু নিত্য পদার্থ আছেন। তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই জ্ঞানপ্রবাহ চলিতেছে। জ্ঞান প্রবাহের ধ্বংসে তাঁহার ধ্বংস হয় না।

শূন্যবাদী।

নাস্তিকের নৈরাশ্যকাতর স্বর ও আস্তিকের হর্ষোদাত্ত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলিতেছেন—হে নাস্তিক, তুমি ঘোর ভ্রান্ত, হে আস্তিক তুমিও ভ্রান্ত। "অস্তি" ও "নাস্তি" উভয়ই মিথ্যা। যাঁহারা বলেন সংসার নিত্য অর্থাৎ সংসারে নিত্যবস্তু আছে তাঁহারা ভ্রান্ত; আর যাঁহারা বলেন সংসার অনিত্য অর্থাৎ সংসারে নিত্যবস্তু নাই তাঁহারাও ভ্রান্ত। "সংসার আছে" একথাও বলা যায় না; "সংসার নাই"—এ কথাও বলা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে "আছে" ও "নাই", "অস্তি" ও "নাস্তি," "ভাব" ও "অভাব"—এই সকল শব্দ পরস্পর সাপেক্ষ। ইহাদের একের সম্বন্ধে অপরের জন্ম। ইঁহাদের কোনটীর যদি গূঢ় তত্ত্ব জানিতে চাও তাহা হইলে অপরটীর সহ উহার সম্বন্ধের বিষয় ভাবিও না। দেখ নিঃসম্বন্ধ "অস্তি" বা "ভাব" এবং নিঃসম্বন্ধ "নাস্তি" বা "অভাব" আছে কি না? গভীর চিন্তা করিয়া দেখিবে ভাবের

---

* অশব্দমস্পর্শ মরূপ মব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তৎ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥ (উপনিষদ্)।

সহিত সম্বন্ধ বিরহিত অভাব এবং অভাবের সহিত সম্বন্ধ বিরহিত ভাব—এতদুভয়ই শূন্যের নামান্তর।

গণিতশাস্ত্রে যেমন positive quantity ও negative quantity অর্থাৎ ধন সংখ্যা ও ঋণ সংখ্যা এতদুভয়ের মধ্যস্থলে শূন্য বিরাজমান, শূন্যের উর্দ্ধে যত সংখ্যা সমস্তই ধন সংজ্ঞক বা positive এবং শূন্যের অধোদিকে যত সংখ্যা সমস্তই ঋণ সংজ্ঞক বা negative ; বৌদ্ধ দর্শনেও তেমনই ভাব ও অভাব এতদুভয়ের অন্তরালে শূন্য ধরিয়া লওয়া হয়। যেমন শূন্যের সহ তুলনায়ই ধন সংখ্যা ও ঋণ সংখ্যার মূল্য নিরূপিত হইয়া থাকে কিন্তু শূন্য স্বয়ং অমূল্য ; ভাব ও অভাবের মর্য্যাদাও সেইরূপ শূন্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধার্য্য হইয়া থাকে। শূন্য দুই ধারায় বিভক্ত হইয়া ভাবও অভাবরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এই দুইটী স্রোতঃ অতিক্রম না করিলে শূন্যে পঁহুছিতে পারিবে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ভাব ও অভাব এই দুইটী সামান্য স্রোতঃ নহে, ইহা সংসার মহাসমুদ্রের উর্দ্ধ ও অধঃ প্রবাহ। যদি ভবসাগর পার হইতে চাও, তাহা হইলে এই দুইটী প্রবাহ অতিক্রম কর।

জীবমাত্রই দুইটী মিথ্যা দৃষ্টির বশে সংসারে অন্ধভাবে বিচরণ করিতেছে। একটীর নাম শাশ্বত দৃষ্টি, অপরটীর নাম উচ্ছেদ দৃষ্টি। শাশ্বত দৃষ্টি দ্বারা অভিভূত হইয়া আমরা মনে করি—এই অনুভূয়মান সংসার অবশ্যই কোন নিত্যবস্তুকে আশ্রয় করিয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে। সেই নিত্যবস্তু কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না সুতরাং সংসারের অস্তিত্ব অর্থাৎ ত্রৈকালিক সত্তা অবশ্যই আছে। আর উচ্ছেদ দৃষ্টির দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আমরা মনে করি—এ সংসারের মূলে কোন নিত্যবস্তু নাই। অভাব বা অসত্তাই এ সংসারের প্রকৃত স্বভাব। শূন্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা সম্যক্সংবুদ্ধ শাক্যমুনি এই শাশ্বত ও উচ্ছেদ দৃষ্টি নিবারণের জন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রিয়শিষ্য কাশ্যপকে

সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—হে কাশ্যপ, "সংসার আছে" একথা বলাও একদেশ দর্শিতা, "সংসার নাই" এ কথা বলাও একদেশ দর্শিতা। একদেশ দর্শিতা অবশ্যই বর্জ্জনীয়।

সংসার পরিশ্রান্ত জীবগণকে সম্বোধন করিয়া শাক্যমুনি বলিয়াছেন—"হে ভবাব্ধিভ্রমণ শ্রান্ত পথিকগণ তোমরা ভাব ও অভাব এই দুই অন্তে অবস্থিত হইয়া চরম লক্ষ্য দেখিতে পাইতেছ না। আমি তোমাদিগকে মধ্যম মার্গ* প্রদর্শন করিতেছি। তোমরা এই মধ্যপথ অবলম্বন কর। এই পথে গমন করিয়া তোমরা যেখানে পঁহুছিবে সেখানে ভাবও নাই, অভাবও নাই; সেখানে ভাব ও অভাবের সমন্বয়। সেখানে উৎপত্তি ও বিনাশ, ক্ষণিকত্ব ও নিত্যত্ব, একত্ব ও নানাত্ব, আগমন ও নির্গমন এই সকল আপাত বিরুদ্ধ ধর্ম্ম পরস্পরের সহ বিরোধ ত্যাগ করিয়া অবস্থিত আছে। যে স্থানে ভাব ও অভাবের সমন্বয়, যেখানে উৎপত্তি ও বিনাশের সামঞ্জস্য, যেখানে ক্ষণিকত্বের সহ নিত্যত্বের বিরোধ নাই, যেখানে একত্ব ও নানাত্বের মিলন, যেখানে আগমন ও নির্গমন ক্রিয়া এক ভাবে নিষ্পন্ন হয়—সেই স্থানটীর কি কোন নাম আছে? তাহা অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত ও অবিজ্ঞপ্তিক। মনুষ্য তাহার কোন নাম দিতে পারে নাই। শূন্য এই নাম দ্বারা তাহার দিঙ্‌মাত্র প্রদর্শন করিতে পারা যায়। বাস্তবিক পক্ষে—"অনক্ষরস্য ধর্ম্মস্য শ্রুতিঃ কা দেশনা চ কা?" যে পদার্থ অক্ষর দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তাহার নামই বা কি, আর বর্ণনাই বা কি?

আমরা বুঝিতে পারিলাম—ভাব ও অভাব এই দুইটী অলীক

---

* তেন ভগবতা ভাবাভাববিভাবিনা যস্মাদস্তিত্বঞ্চ নাস্তিত্বঞ্চ উভয়মেতৎ প্রতিষিদ্ধং তস্মান্ন যুক্তং ভাবাভাবদর্শনত্বমিত্যাস্থাতুম্। তথা অস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকোঽন্তো নাস্তীতি কাশ্যপ অয়মেকান্তঃ। যদেতদুভয়োরন্তয়োর্মধ্যং তদবাচ্যমনিদর্শনমপ্রতিষ্ঠমনাভাসমনিকেতমবিজ্ঞপ্তিকমিদমুচ্যতে কাশ্যপ মধ্যমা প্রতিপদ্ধর্ম্মাণাং ভূতপ্রত্যবেক্ষা। (মাধ্যমিকা, ১৫ অঃ)।

পদার্থ আমাদের জ্ঞানকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যদি আমরা সংসার হইতে ভাব ও অভাব নামক দুইটী অলীক পদার্থকে পৃথক করিয়া লই, তাহা হইলে সংসার শূন্য বলিয়া উপলব্ধ হইবে। সেইহেতু তথাগত বলিয়াছেন—

শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্।
ন বিদ্যতে সোঽপি কশ্চিদ্ যো ভাবয়তি শূন্যতাম্॥
(মাধ্যমিকা, অঃ ১৮)।

"আভ্যন্তর জগৎ শূন্য বলিয়া জান, বাহ্য জগৎ শূন্য বলিয়া দেখ, যিনি শূন্যতা ভাবনা করিতেছেন তিনিও শূন্য"। বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থে শান্তিদেব বলিয়াছেন—

"তস্মান্নির্বিচিকিৎসেন ভবানীয়ৈব শূন্যতা*"—অতএব নিঃসন্দেহ চিত্তে এই শূন্যতা ভাবনা কর। "শূন্যতা দুঃখশমনী ততঃ কিং জায়তে ভয়ম্"—শূন্যতাই সকল দুঃখের প্রমোচিকা, শূন্যতাজ্ঞান হইলে আর কিসের ভয়?

প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থে† তথাগত স্বীয় প্রিয়শিষ্য সুভূতিকে বলিয়াছেন —"গম্ভীরমিতি সুভূতে শূন্যতায়া এতদধিবচনম্"—হে সুভূতে "গম্ভীর" এইটী শূন্যতারই নাম। "শূন্যতায়া এতদধিবচনং যদপ্রেমেয়মিতি"—অপ্রমেয় এইটী শূন্যতারই নাম। "যে চ সুভূতে শূন্যা অক্ষয়া অপি তে —হে সুভূতে অক্ষয় ও শূন্য ইহারা একই পদার্থ।

এইরূপে শূন্যবাদী নাস্তিকের হাহারব ও আস্তিকের হো হো ধ্বনি নিবারণ করিয়া বলিলেন—হে নৈয়ায়িক তুমি যে পরমাণুর কথা বলিতেছ উহা তোমার কল্পনামাত্র। কোন বস্তু কি কখনও পরমা আকারে বিদ্যমান ছিল, না আছে? সংসার অনাদি, ইহার ক্রিঃ

* শান্তিদেবের বোধিচর্য্যাবতার, প্রজ্ঞাপারমিতা পরিচ্ছেদ।
† অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, ১৮ অঃ।

প্রবাহ ও অনাদি। আমরা এমন কোন অবস্থাই মনে করিতে পারি না যখন সংযোগধর্ম্মী বস্তু ছিল না, কেবল নিরবচ্ছিন্ন পরমাণু ছিল। আর তুমি বলিতেছ—পরমাণু রূপাদি গুণবিশিষ্ট, ইহা পরিমণ্ডলাকৃতি ইত্যাদি। পরমাণুর যদি গুণ থাকে তাহা হইলে পরমাণু অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর বস্তু আছে ইহা তোমাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব পরমাণুতে আমাদের চিন্তার বিশ্রাম হয় না। ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থ ভাবিতে পারা যায়। বস্তুতঃ যখন কোন পদার্থের রূপ থাকিবে না, গুণ থাকিবে না, ক্রিয়া থাকিবে না, যখন ইহাকে অস্তি ও নাস্তি বলিয়া বুঝা যাইবে না, তখনই কেবল আমাদের উক্ত বস্তু বিষয়ক চিন্তার বিশ্রাম হইবে। যাহা অনুভূতির অতীত, যাহা চিন্তার অতীত, যাহা ভাব ও অভাব পদবাচ্য নহে, তাহাকে শূন্য ভিন্ন আর কি বলিতে পারা যায়?

হে সাংখ্য তুমি ব্যক্ত জগতের অভ্যন্তরে যে মূল প্রকৃতি স্বীকার করিতেছ তাহারই বা সম্ভব কিরূপে হইতে পারে? এই সংসার কি কখনও নির্ব্বিকার বা নিষ্ক্রিয় ভাবে অবস্থিত ছিল, সংসার প্রবাহ যখন অনাদি, তখন ইহার নিষ্ক্রিয় অবস্থা কল্পনা করা যুক্তি বিরুদ্ধ। আর যদি প্রকৃতিকে আদিতে নিষ্ক্রিয় বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় তাহা হইলে উহাতে প্রথম ক্রিয়ার সঞ্চার কিরূপে হইয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় না। পুরুষের অদৃষ্ট ভিন্ন উহার সহ প্রকৃতির সংযোগ হইতে পারে না, আর প্রকৃতির সহ সংযোগ না হইলে পুরুষে অদৃষ্ট জন্মিতে পারে না। সুতরাং পুরুষের অদৃষ্টের উপর প্রকৃতির ক্রিয়া নির্ভর করিতেছে এবং প্রকৃতির ক্রিয়ার উপর পুরুষের অদৃষ্ট নির্ভর করিতেছে। এই অন্যোন্যাশ্রয় দোষ বশতঃ এমন কোন অবস্থাই আমরা কল্পনা করিতে পারি না, যখন প্রকৃতি নিষ্ক্রিয়ভাবে ছিলেন। আর যদি বল অতীতে কোন সময়েই

প্রকৃতি নিষ্ক্রিয় ছিলেন না বটে কিন্তু ভবিষ্যতে তিনি নিষ্ক্রিয় হইবেন—ভবিষ্যতে পুরুষের অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে প্রকৃতি বিশ্রাম লাভ করিবেন। তাহা হইলে উহার উত্তর এই যে—যে অবস্থায় প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিশ্রাম লাভ করিবেন, যখন তাঁহাতে ক্রিয়া থাকিবে না, যখন তাঁহার তিন গুণের কোনটীরই প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হইবে না,—তখন তিনি শূন্যে পর্য্যবসিত হইবেন, তখন প্রকৃতি শূন্যেরই একটী নামান্তর হইবে।

হে আস্তিকগণ তোমরা আত্মা, পুরুষ বা ব্রহ্ম নামে যে পদার্থ কল্পনা করিতেছ—তিনিও ধ্রুব অর্থাৎ ভাব পদার্থ নহেন। মুক্ত্যবস্থায় যখন তিনি বাসনাহীন হইবেন এবং তাঁহাতে কোন গুণই থাকিবে না, তখন উহাঁকে ভাব পদার্থ কিরূপে বলিতে পারা যায়? নির্গুণ পদার্থ কি কখনও ভাবসংজ্ঞার অন্তর্গত হইতে পারে? হে বৈদান্তিক তুমি বলিতেছ অবিদ্যার ধ্বংস হইলে সংসার প্রবাহের উচ্ছেদ হইবে এবং "অহং ব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞান জন্মিবে। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিশ্বাস করিয়া তুমি বলিতেছ—পরমার্থতঃ তুমি ও ব্রহ্ম একই পদার্থ। এ বিষয়ে তোমার সহ আমার মত ভেদ নাই কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমার ব্রহ্ম কিরূপ? তিনি নির্গুণ। তুমি ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিতেছ, অথচ তাঁহাতে সৎ চিৎ ও আনন্দ এই ত্রিবিধ গুণ আরোপ করিতেছে, ইহার কারণ কি? বুঝিয়াছি তুমি এই মায়াময় সংসারে বাস করিয়া ইহার রূপরসাদিতে এমনই বিমুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছ যে, এই সংসার ত্যাগ করিয়া যাইবার সময়েও সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনটী গুণ সঙ্গে লইয়া যাইতে চাও। তোমার সত্তা (existence) পাছে নষ্ট হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া তুমি বলিতেছ—"ব্রহ্ম নির্গুণ বটে, কিন্তু তিনি সৎ (existent)"। তুমি যে জ্ঞানের প্রভাবে ঘটপটাদি বস্তু প্রত্যক্ষ করিতেছ, সেই জ্ঞান পাছে অন্তর্হিত হয় এই ভয়ে ভীত হইয়া বলিতেছ—"ব্রহ্ম নির্গুণ বটে, কিন্তু তিনি চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ।"

সারে আনন্দ এতই ভাল বাস যে, "ব্রহ্মে আনন্দ নাই"—
াষণ করিতে তোমার ভয় হইতেছে। কিন্তু হে বৈদান্তিক
রমে সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে পশ্চাৎপদ হইতেছ
ৎ চিৎ আনন্দ এই তিনটী গুণের মায়া ছেদন করিতে তোমার
ছে না কেন? তুমি যদি সাহস করিয়া সৎচিৎ ও আনন্দ
া গুণ ছেদন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার নির্গুণ
ারই নামান্তর হইবে। তোমার ব্রহ্মের সহ শূন্যতার কোন
াকিবে না। আর হে বৈদান্তিক "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে
মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শূন্যের সম্বন্ধেই প্রযুজ্যমান হয়।
চিৎ ও আনন্দে উহার প্রয়োগ হইতে পারে না। শূন্য এই নামে
তোমাদের রুচি নাই বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ মানবভাষায় ইহার
অপেক্ষা যোগ্যতর শব্দ আর নাই। শূন্যতায় লীন হইলে তোমার
সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ থাকিবে "না"—এ কথা আমি বলিতেছি না।
বস্তুতঃ তখন তোমাতে সত্তা ও অসত্তা, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং আনন্দ
ও অনানন্দ এ সকলের সমন্বয় হইবে। তখন এই তিনটী গুণ কেন
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার সম্বন্ধে "আছে" ও "নাই" এর অতীত হইয়া
যাইবে। যেমন শূন্য দ্বারা গুণ করিলে ধনসংখ্যা ও ঋণসংখ্যা (plus ও
minus quantity) উভয়েই শূন্যতায় পরিণত হয় অর্থাৎ ধন ও ঋণ
(plus ও minus) উভয়েই শূন্যে যাইয়া সমন্বয় লাভ করে, সেইরূপ
শূন্যে পঁহুছিলে তোমাতে সর্ব্ব বিষয়ের সমন্বয় হইবে। সৎ ও অসৎ
এতদুভয়ের পার্থক্য দূরীভূত হইবে। চিৎ ও অচিৎ উভয়েরই মূল্য
এক প্রকার হইবে, আনন্দ ও অনানন্দ উভয়ই তুল্য বলিয়া প্রতিভাত
হইবে।

হে আস্তিকগণ তোমরা যে গুণহীন দ্রব্যকেও "আছে" বলিতেছ
এবং দ্রব্যহীন গুণকেও "আছে" বলিতেছ, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আর হে নাস্তিকগণ তোমরা যে গুণহীন দ্রব্য এবং দ্রব্যহীন গুণকে "নাই" বলিতেছ ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। "আছে" ও "নাই" এই উভয় মতই ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃত প্রস্তাবে গুণের সম্বন্ধে দ্রব্য আছে, দ্রব্যের সম্বন্ধে গুণ আছে, নিঃসম্বন্ধ দ্রব্য বা গুণ নাই। অতএব সম্বন্ধের কথা ত্যাগ করিলে দ্রব্য ও গুণকে "আছে" বা "নাই" ইহার কিছুই বলা যায় না। এইরূপে অবয়ব অবয়বী, সমুদায় সমুদায়ী, বিশেষ্য বিশেষণ, ভাব অভাব ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ বিচার করিতে হইবে। বস্তুতঃ পদার্থ সমূহের পরস্পর সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা উহাদিগকে "আছে" বা "নাই" বলিতেছি। এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে [illegible]রা "আছে" ও "নাই" এর অতীত হইয়া যাইবে অর্থাৎ উহাদিগকে [illegible] ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইবে না।

বৌদ্ধ-দর্শনে প্রধানতঃ চারি প্রকার* সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে, যথা—হেতু, আলম্বন, অনন্তর ও আধিপত্যেয়। বীজের সহ অঙ্কুরের হেতু সম্বন্ধ, চক্ষুর সহ রূপের আধিপত্যেয় সম্বন্ধ, ইন্ধনের সহ অগ্নির আলম্বন সম্বন্ধ এবং পূর্ব্বের সহ পরের অনন্তর সম্বন্ধ। সংসারের অনন্ত সম্বন্ধ এই চারিটী প্রধান সম্বন্ধের অন্তর্গত। সম্বন্ধগুলিরও আবার স্বসত্তা অর্থাৎ স্বভাব নাই†। উহাদিগকে "আছে"ও বলিতে পারা যায় না, "নাই"ও বলিতে পারা যায় না। ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শূন্য মাত্র।

সম্বন্ধগুলির স্বভাব যাহাই হউক না কেন, উহাদের বশেই এই সংসার জন্মলাভ করিয়াছে, সম্বন্ধনিচয়ই সংসারের বৈচিত্র্যের কারণ।

---

* চত্বারঃ প্রত্যয়া হেতুশ্চালম্বনমনন্তরম্।
তথৈবাধিপত্যেয়ং যৎ প্রত্যয়ো নাস্তি পঞ্চমঃ॥ (মাধ্যমিক, ১ প্রকরণ)।

† ভাবানাং নিঃস্বভাবানাং ন সত্তা বিদ্যতে যতঃ।
সতীদমস্মিন্ ভবতীত্যেতন্নৈবোপপদ্যতে॥ (মাধ্যমিকা ১ প্রঃ)।

তুমি এই সংসারে আনন্দ এতই ভাল বাস যে, "ব্রহ্মে আনন্দ নাই"—এ কল্পনা পোষণ করিতে তোমার ভয় হইতেছে। কিন্তু হে বৈদান্তিক তুমি যখন চরমে সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে পশ্চাৎপদ হইতেছ না, তবে সৎ চিৎ আনন্দ এই তিনটী গুণের মায়া ছেদন করিতে তোমার সাহস হইতেছে না কেন? তুমি যদি সাহস করিয়া সৎচিৎ ও আনন্দ এই তিনটী গুণ ছেদন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার নির্গুণ ব্রহ্ম শূন্যতারই নামান্তর হইবে। তোমার ব্রহ্মের সহ শূন্যতার কোন পার্থক্য থাকিবে না। আর হে বৈদান্তিক "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য শূন্যের সম্বন্ধেই প্রযুজ্যমান হয়। সৎ চিৎ ও আনন্দে উহার প্রয়োগ হইতে পারে না। শূন্য এই নামে তোমাদের রুচি নাই বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখ মানবভাষায় ইহার অপেক্ষা যোগ্যতর শব্দ আর নাই। শূন্যতায় লীন হইলে তোমার সত্তা জ্ঞান ও আনন্দ থাকিবে "না"—এ কথা আমি বলিতেছি না। বস্তুতঃ তখন তোমাতে সত্তা ও অসত্তা, জ্ঞান ও অজ্ঞান এবং আনন্দ ও অনানন্দ এ সকলের সমন্বয় হইবে। তখন এই তিনটী গুণ কেন অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমার সম্বন্ধে "আছে" ও "নাই" এর অতীত হইয়া যাইবে। যেমন শূন্য দ্বারা গুণ করিলে ধনসংখ্যা ও ঋণসংখ্যা (plus ও minus quantity) উভয়েই শূন্যতায় পরিণত হয় অর্থাৎ ধন ও ঋণ (plus ও minus) উভয়েই শূন্যে যাইয়া সমন্বয় লাভ করে, সেইরূপ শূন্যে পঁহুছিলে তোমাতে সর্ব্ব বিষয়ের সমন্বয় হইবে। সৎ ও অসৎ এতদুভয়ের পার্থক্য দূরীভূত হইবে। চিৎ ও অচিৎ উভয়েরই মূল্য এক প্রকার হইবে, আনন্দ ও অনানন্দ উভয়ই তুল্য বলিয়া প্রতিভাত হইবে।

হে আস্তিকগণ তোমরা যে গুণহীন দ্রব্যকেও "আছে" বলিতেছ এবং দ্রব্যহীন গুণকেও "আছে" বলিতেছ, ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে।

আর হে নাস্তিকগণ তোমরা যে গুণহীন দ্রব্য এবং দ্রব্যহীন গুণকে "নাই" বলিতেছ ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। "আছে" ও "নাই" এই উভয় মতই ভ্রান্তিমূলক। প্রকৃত প্রস্তাবে গুণের সম্বন্ধে দ্রব্য আছে, দ্রব্যের সম্বন্ধে গুণ আছে, নিঃসম্বন্ধ দ্রব্য বা গুণ নাই। অতএব সম্বন্ধের কথা ত্যাগ করিলে দ্রব্য ও গুণকে "আছে" বা "নাই" ইহার কিছুই বলা যায় না। এইরূপে অবয়ব অবয়বী, সমুদায় সমুদায়ী, বিশেষ্য বিশেষণ, ভাব অভাব ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ বিচার করিতে হইবে। বস্তুতঃ পদার্থ সমূহের পরস্পর সম্বন্ধের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই আমরা উহাদিগকে "আছে" বা "নাই" বলিতেছি: এই সম্বন্ধ ত্যাগ করিলে উহারা "আছে" ও "নাই"এর অতীত হইয়া যাইবে অর্থাৎ উহাদিগকে শূন্য ভিন্ন আর কিছুই বলা যাইবে না।

বৌদ্ধ-দর্শনে প্রধানতঃ চারি প্রকার* সম্বন্ধ স্বীকৃত হইয়া থাকে, যথা—হেতু, আলম্বন, অনন্তর ও আধিপত্যেয়। বীজের সহ অঙ্কুরের হেতু সম্বন্ধ, চক্ষুর সহ রূপের আধিপত্যেয় সম্বন্ধ, ইন্ধনের সহ অগ্নির আলম্বন সম্বন্ধ এবং পূর্ব্বের সহ পরের অনন্তর সম্বন্ধ। সংসারের অনন্ত সম্বন্ধ এই চারিটী প্রধান সম্বন্ধের অন্তর্গত। সম্বন্ধগুলিরও আবার স্বসত্তা অর্থাৎ স্বভাব নাই†। উহাদিগকে "আছে"ও বলিতে পারা যায় না, "নাই"ও বলিতে পারা যায় না। ইহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শূন্য মাত্র।

সম্বন্ধগুলির স্বভাব যাহাই হউক না কেন, উহাদের বশেই এই সংসার জন্মলাভ করিয়াছে, সম্বন্ধনিচয়ই সংসারের বৈচিত্র্যের কারণ।

---

* চত্বারঃ প্রত্যয়া হেতুশ্চালম্বনমনন্তরম্।
তথৈবাধিপতেয়ং যৎ প্রত্যয়ো নাস্তি পঞ্চমঃ॥ (মাধ্যমিক, ১ প্রকরণ)।

† ভাবানাং নিঃস্বভাবানাং ন সত্তা বিদ্যতে যতঃ।
সতীদমস্মিন্ ভবতীত্যেতন্নৈবোপপদ্যতে॥ (মাধ্যমিক ১ প্রঃ)।

সম্বন্ধ আছে বলিয়াই সংসার আছে। সম্বন্ধের কথা ত্যাগ কর, তাহা হইলে সংসারকে "আছে"ও বলিতে পারিবে না, "নাই"ও বলিতে পারিবে না, উহা শূন্যতায় পর্য্যবসিত হইবে। সম্বন্ধগুলির সমষ্টির নাম মায়া। সম্বন্ধময় অর্থাৎ মায়াময় সংসারকে শাক্যমুনি "প্রতীত্য সমুৎপাদ" নামে অভিহিত করিয়াছেন, কিন্তু নিঃসম্বন্ধ অর্থাৎ মায়াবিমুক্ত সংসারকে তাঁহার মতে অবশ্যই শূন্য বলিতে হইবে।

পদার্থ মাত্রকেই আমরা তিন প্রকারে চিনিতে পারি; যথা—(১) পরিকল্পিত লক্ষণ, (২) পরতন্ত্র লক্ষণ ও (৩) পরিনিষ্পন্ন লক্ষণ। যখন আমরা দ্রব্যে গুণ আরোপ করিয়া গুণগুলিকে দ্রব্য বলিয়া ভাবি, তখন ঐ দ্রব্যকে পরিকল্পিত লক্ষণক বলে। যেমন ঘটের আকার, গুরুত্ব ইত্যাদিকে ঘট বলিয়া ভাবিলে ঐ ঘটকে পরিকল্পিতলক্ষণক ঘট বলা যায়। আর যখন দ্রব্যে গুণ আছে এইরূপ ভাবি, তখন ঐ দ্রব্যকে পরতন্ত্রলক্ষণক বলা যায়। যেমন আকার, গুরুত্ব ইত্যাদি বিশিষ্ট পদার্থই ঘট। আর যখন দ্রব্যকে গুণ হইতে পৃথক্ করিয়া এবং গুণকে দ্রব্য হইতে পৃথক্ করিয়া উহাদের প্রত্যেকের স্বভাব চিন্তা করি, তখন ঐ দ্রব্যকে পরিনিষ্পন্নলক্ষণক বলা যায়। যেমন আকার গুরুত্ব ইত্যাদি গুণ বিহীন দ্রব্যের নাম শূন্যতা। শূন্যতাই ঘটের পরিনিষ্পন্ন লক্ষণ। শূন্যবাদী, আস্তিক ও নাস্তিককে বলেন—তোমরা বস্তুর পরিকল্পিত লক্ষণ বা পরতন্ত্র লক্ষণে আস্থা স্থাপন করিও না। উহার পরিনিষ্পন্ন লক্ষণ ভাবনা কর। পরিকল্পিত ও পরতন্ত্রলক্ষণক সংসারের অপর নাম মায়া বা প্রতীত্য সমুৎপাদ। ইহাই আমাদের ব্যাবহারিক জগৎ। বৌদ্ধদর্শনে যে সংবৃতি সত্যের* কথা আছে ইহাই সেই সাংবৃতিক বা ব্যাবহারিক সত্য। আর পরিনিষ্পন্ন

* দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা।
লোকসংবৃতি সত্যঞ্চ সত্যঞ্চ পরমার্থতঃ॥ (মাধ্যমিক সূত্র)

লক্ষণক সংসারের অপর নাম শূন্যতা। বৌদ্ধশাস্ত্রে যে পারমার্থিক সত্যের উপদেশ আছে, ইহা সেই পারমার্থিক সত্য। অতএব হে আস্তিক ও নাস্তিকগণ তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে এই সংসারকে প্রতীত্য সমুৎপাদ বলিয়া অবগত হও এবং শূন্যতাকে পারমার্থিক সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে চেষ্টা কর। শূন্যতা সাক্ষাৎকারই জীবের পরম পুরুষার্থ। শূন্যতাই দৃষ্টিদোষ বিবর্জ্জিত, আস্তিক ও নাস্তিকের সুদুর্লভ, পারমার্থিক পদার্থ। হে আস্তিক ও নাস্তিক তোমাদিগকে সেই পারমার্থিক সত্য প্রদর্শন করিবার জন্যই আমি ভাব ও অভাব নামক দুই অন্ত বর্জন করিয়া মধ্যম মার্গের ব্যবস্থা করিলাম। তোমরা এই মধ্যপথ অনুসরণ কর।

নৈরাত্ম্য তত্ত্ব।

প্রতীত্য সমুৎপাদ অর্থাৎ মায়াময় সংসার বা ব্যাবহারিক জগত্‌কে আমরা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি—যথা "আমি" ও "তুমি"। "আমি"র অপর নাম "আত্মা" এবং "তুমি"র অপর নাম "বাহ্য-জগৎ"। সমস্ত সংসার যদি শূন্য হইল, তাহা হইলে "আমি" বা "আত্মা" পদার্থও যে শূন্য—একথা আর পৃথক বলিবার আবশ্যক নাই। নাস্তিকগণ বস্তুর পরিকল্পিত লক্ষণে বিশ্বাস করিয়া বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ ইত্যাদি বিজ্ঞানকেই আত্মা বা আমি বলিয়া ভাবিয়া থাকেন। আস্তিকগণ পরতন্ত্র লক্ষণে বিশ্বাস করিয়া ঐ সকল গুণ বিশিষ্ট এক স্বতন্ত্র বস্তু কল্পনা করিয়া উহাকে আত্মা বা আমি নামে অভিহিত করেন। কিন্তু যাঁহারা পরিনিষ্পন্ন লক্ষণ বুঝিয়াছেন তাঁহারা অবশ্যই বলিবেন—বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ ইত্যাদি পরমার্থতঃ আত্মা নহে এবং ঐ সকলের আশ্রয়ীভূত কোন স্বতন্ত্র পদার্থও নাই। শূন্যবাদী বৌদ্ধগণ এই প্রকারে পরনিষ্পন্নলক্ষণে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থতঃ আত্মাকে শূন্য বলিয়া ভাবেন বলিয়া তাঁহাদের আত্মতত্ত্ব বিষয়ক

মতকে নৈরাত্মবাদ বলে। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা আত্মা স্বীকারও করেন না, অস্বীকারও করেন না, তাঁহাদের আত্মা অস্তি ও নাস্তির অতীত এক বিলক্ষণ পদার্থ অর্থাৎ শূন্যতা।

আকার গুরুত্ব বর্ণ আস্বাদ ইত্যাদি গুণকে পরিত্যাগ করিলে যেমন ঘট নামক কোন পৃথক্ দ্রব্য থাকে না, সেইরূপ বুদ্ধি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন ইত্যাদি বিজ্ঞান রাশিকে পৃথক্ করিয়া লইলে আত্মা নামক কোন স্বতন্ত্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে না। বস্তুতঃ বিজ্ঞান রাশিই আমাদের "অহং" এর ব্যবহার নিষ্পন্ন করিয়া থাকে। বিজ্ঞান দুই প্রকার—প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও আলয়-বিজ্ঞান। বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমি যাহা আছি, তাহা পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমি যাহা ছিলাম তাহারই ফল, এবং পর মুহূর্ত্তে আমি যাহা হইব তাহা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে আমি যাহা আছি তাহারই পরিণাম। অর্থাৎ পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের জ্ঞান বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের জ্ঞানের কারণ এবং বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের জ্ঞান পর মুহূর্ত্তের জ্ঞানের কারণ। এইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে যে জ্ঞানরাশি জন্মিতেছে তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে। আর বহু মুহূর্ত্তের জ্ঞানের যে ধারাবাহিকত্ব তাহাকে আলয়-বিজ্ঞান বলে। অর্থাৎ ধারাবাহিক জ্ঞান প্রবাহের নাম আলয়-বিজ্ঞান। সমুদায়ের সহ অংশের যে সম্বন্ধ আলয়-বিজ্ঞানের সহ প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানেরও সেইরূপ সম্বন্ধ। যেমন সমুদায়কে ছাড়িয়া অংশ থাকিতে পারে না এবং অংশকে ছাড়িয়া সমুদায় থাকিতে পারে না, সেইরূপ আলয়-বিজ্ঞানকে ছাড়িয়া প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান থাকিতে পারে না এবং প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ছাড়িয়া আলয় বিজ্ঞান থাকিতে পারে। আলয় বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ইহারা পরস্পরের সহ সম্বন্ধবশতঃ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

জন্মান্তর।

দেহ বা জড়ের সহ বিজ্ঞানের সম্বন্ধের নাম জন্ম। ঐ সম্বন্ধের

তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রকৃত প্রস্তাবে বিজ্ঞান পৃথক বস্তু উহা দেহে থাকে না, দেহদ্বারা উহার প্রকাশ হয়। চক্ষুর দ্বারা দর্শন নামক বিজ্ঞানের প্রকাশ হয়, কর্ণ দ্বারা শ্রবণ নামক বিজ্ঞানের প্রকাশ হয়। নাসিকা দ্বারা গন্ধ বিজ্ঞান প্রকাশ লাভ করে। জিহ্বা দ্বারা রস বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ত্বক্ স্পর্শবিজ্ঞানকে প্রকাশ করে। মনঃ সংকল্পবিজ্ঞানের প্রকাশক। মৃত্যুকালে দেহের সহ বিজ্ঞানের সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়, সুতরাং দর্শনাদি বিষয়-বিজ্ঞান জন্মে না। কিন্তু তখনও নির্বিষয়ক বিজ্ঞান ও উহার ধারা অক্ষতভাবে বিগুমান থাকে। যদি বল মৃত্যুর পর বিজ্ঞান কোথায় থাকে ? ইহার উত্তর—উহা বিজ্ঞানেই থাকে। জড় পদার্থ যেমন দেশবিশেষকে ব্যাপিয়া থাকে, বিজ্ঞান পদার্থ সেইরূপ কোন দৈশিক আশ্রয় চায় না। পুনরায় দেহবিশেষের সহ সম্বন্ধ হইলে, বিজ্ঞান আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশমান হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ দেহের সহ বিজ্ঞানের সম্বন্ধ ঘটে ও পুনরায় ঐ সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হয়। এইরূপ সম্বন্ধকে জন্ম মরণ বলে।

নির্ব্বাণ।

আমরা উপরে বিজ্ঞানের দুই প্রকার জন্ম দেখিলাম। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের বিজ্ঞান পর পর মুহূর্ত্তে সংক্রান্ত হয়। ইহা বিজ্ঞানের এক প্রকার জন্ম। ইহাকে ক্ষণিক জন্ম বলে। আর পূর্ব্ব দেহ ত্যাগ করিয়া পর দেহে সংক্রান্ত হয়, ইহা বিজ্ঞানের দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ দৈহিক জন্ম। কর্ম্মই বিজ্ঞানের এতদুভয়বিধ জন্মের হেতু। কর্ম্মই বিজ্ঞানকে সঞ্চালিত করে। কর্ম্মই ক্ষণিক বিজ্ঞান রাশিকে একোতী ভাবে বদ্ধ করে। যখন কর্ম্মের ক্ষয় হইবে তখন ধারাবাহিক ক্ষণিক বিজ্ঞান রাশি বা আলয় বিজ্ঞানের একোতীভাব ছিন্ন হইবে। তখন আর পুনরায় প্রবৃত্তি বিজ্ঞান জন্মিবে না এবং আলয় বিজ্ঞানও তখন

"অস্তি" ও "নাস্তি"র অতীত হইয়া যাইবে। আলয় বিজ্ঞানের এইরূপ অবস্থার নাম নির্ব্বাণ। এই অবস্থায় রূপরসাদি বিষয়ের অবভাস হইবে না, বুদ্ধি সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষ যত্ন ইত্যাদি জ্ঞান ও প্রকাশিত হইবে না, এবং ভাব ও অভাব উভয়ই পরস্পর মিলিয়া যাইবে। তখন সংসার ও আমি উভয়েই শূন্যে মিশিয়া যাইব। তখন জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই তিনের সমন্বয় হইবে। ইহাই শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের নির্ব্বাণ।

হিন্দুদার্শনিকগণের মুক্তির অপেক্ষা শূন্যবাদী বৌদ্ধগণের মুক্তি (অর্থাৎ নির্ব্বাণ) উচ্চতর শিখরে অধিরূঢ়। ভট্ট প্রভাকরাদি মীমাংসকগণ বলেন নিত্যসুখ সাক্ষাৎকারের নাম মুক্তি। এই মতে মুক্তি একটী ভাব-পদার্থ। নৈয়ায়িক প্রভৃতির মতে দুঃখের ধ্বংসের নাম মুক্তি। এই মতে মুক্তি অভাব-পদার্থ। শূন্যবাদীর মুক্তি ভাবপদার্থও নহে, অভাবপদার্থও নাহ। উহা ভাবাভাব বিনির্মুক্ত। এইহেতু রত্নাবতী গ্রন্থে লিখিত আছে—

> ন চাভাবোঽপি নির্ব্বাণং কুত এবাস্য ভাবতা।
> ভাবাভাবপরামর্শক্ষয়ো নির্ব্বাণ মুচ্যতে॥
>
> (মাধ্যমিকা, ২৫ অঃ)।

নির্ব্বাণ এইটী ভাব পদার্থ ও নহে, অভাব পদার্থও নহে। ভাবাভাব বিচারের নিবৃত্তির নাম নির্ব্বাণ। কেহ বলিয়াছেন *—নির্ব্বাণকালে ভবসন্ততি অর্থাৎ সংসারপ্রবাহের উচ্ছেদ হয়। কেহ বলিয়াছেন †—রাগ দ্বেষ ও মোহের ক্ষয়ে পরিনির্ব্বাণ লাভ হয়। কেহ বলিয়াছেন ‡—তৃষ্ণার ক্ষয়ই নির্ব্বাণ। কাহারও মতে §—সর্ব্ব-

* মাধ্যমিক সূত্র, ২১ প্রঃ

† রত্নকূটসূত্র, মাঃ ১২০ পৃঃ।

‡ [illegible]

§ বোধিচর্য্যাবতার।

ত্যাগের নাম নির্ব্বাণ। কেহ বলিয়াছেন*—শূন্যতাই নির্ব্বাণ। এই-রূপে নির্ব্বাণ সম্বন্ধে নানা প্রকার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে নির্ব্বাণ পদার্থ বর্ণনাতীত। নির্ব্বাণ সাক্ষাৎকার হইলে অশেষ প্রপঞ্চ ও অশেষ কল্পনার নিবৃত্তি হইবে। ক্লেশ একেবারেই থাকিবে না†, তখন সৎকার বা অবমাননা অসম্ভব হইবে। সুখ ও দুঃখ, প্রিয় ও অপ্রিয়, তখন কোথায় থাকিবে? তৎকালে লাভ ও ক্ষতির বিচার চলিবে না। সেই সময়ে জ্ঞাতা জ্ঞেয় ও জ্ঞান এ তিনের সমন্বয় হইবে। যখন "আমি" ও "তুমি" অর্থাৎ আত্মা ও সংসার এতদুভয়ই ভাবাভাবের অতীত হইয়া যাইবে, সেই অবস্থা কি কোন প্রকারে বর্ণনা করিতে পারা যায়। শাক্যমুনি যখন নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল শ্রবণ করুন। তিনি সমাধিনিমগ্ন হইয়া প্রথমে রূপজগতে বিহার করিয়াছিলেন, তদনন্তর ক্রমশঃ আকাশানন্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যায়তন আকিঞ্চন্যায়তন ও নৈবসংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে বিহার করেন। তদনন্তর জ্ঞান ও জ্ঞাতা এতদুভয়ের নিরোধে তাঁহার নির্ব্বাণ লাভ হইয়াছিল। সমাধির প্রারম্ভে তিনি অভ্যন্তরে ও বাহিরে উভয়ত্রই রূপরসাদির বিষয় অনুভব করিয়াছিলেন। তদনন্তর তাঁহার অভ্যন্তর হইতে রূপরসাদি তিরোহিত হইল, কিন্তু বাহিরে ঐ সকল দেখিতে পাইলেন। তাহার পর তাঁহার অভ্যন্তরে রূপরসাদি প্রত্যক্ষ হইল কিন্তু বাহ্যজগতে ঐ সকল পদার্থ বিদমান থাকিল না। তদনন্তর তিনি অভ্যন্তরে ও বাহিরে উভয়ত্রই রূপজগৎকে শূন্য দেখিলেন। তদনন্তর আকাশ অনন্ত এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশের শূন্যত্ব উপলব্ধি করিলেন। ক্রমে তাঁহার নিকট বিজ্ঞানও শূন্য বলিয়া প্রতীত হইল। ইহার পরেই আকিঞ্চন্যায়তন অর্থাৎ অভাব পদার্থও তাঁহার নিকট শূন্য

* শতক, মাঃ ১২৬ পৃঃ।　　† মাধ্যমিকা বৃত্তি, ১৮ প্রকরণ।

বলিয়া প্রত্যক্ষ হইল। তাহার পরেই তিনি নিজকে শূন্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলেন তাহার পর তাঁহার যাহা হইল তাহা বাক্য ও মনের অগোচর। তাঁহার সেই অবস্থা আমরা নির্ব্বাণ নামে অভিহিত করি। আমরা আমাদের অস্ফুট ভাষায় বলি তিনি শূন্যতায় লীন হইলেন।

নির্ব্বাণ কি পদার্থ তাহা বুদ্ধদেব স্বয়ং শ্রেষ্টিপুত্র উগ্রসেনকে উপদেশ প্রদান কালে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি উগ্রসেনকে বলিয়াছিলেন—

মুঞ্চ পুরে মুঞ্চ পচ্ছতো মজ্ঝে মুঞ্চ ভবস্স পারগূ।
সব্বত্থ বিমুত্তমানসো ন পুনং জাতিজরং উপেহিসি॥

"সম্মুখে পশ্চাতে বা মধ্যভাগে তোমার যাহা কিছু আছে তাহা ত্যাগ কর। এই সকল ত্যাগ করিয়া সংসারের পরপারে গমন কর। সর্ব্ব বিষয়ে বিমুক্তচিত্ত হইলে পুনরায় তোমাকে জন্ম ও জরা ভোগ করিতে হইবে না।" বস্তুতঃ যিনি ভাবাভাবের অতীত হইয়াছেন, তাঁহার শোকই বা কোথায়?—মোহই বা কোথায়?—এবং তাঁহার ভয়ই বা কিসের?

শ্রীসতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বরষা।

বিশ্বের দুয়ারে, অয়ি আবিলনয়নে!
অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা কোন্ লইয়ে অন্তরে
ফিরে আস আস বর্ষে বর্ষে মন্থর চরণে?
—উচ্ছ্বসিত আঁখিজলে কি মাধুরী ঝরে!

সৃষ্টির প্রথম বর্ষে,—অশুভ লগনে,
হে আত্মবিহ্বলে, তব চঞ্চল নয়নে
সেই অশ্রু ঝরেছিল; কতদিন হ'ল
আজিও রয়েছে দেখি সিক্ত ধরাতল!

তারপর গেছে কত সৃষ্টি কত লয়,
অশ্রুর উচ্ছ্বাসে কত হিমালয় ক্ষয়,
জন্ম পেলে শত শত মহান্ সাগর
তবু তব ঘুচিলনা নয়নের লোর!

কোন্ মহা প্রলয়ের শেষে, লো বরষে,
ফুল্ল মুখে দেখা দিবে, হাসিয়ে হরষে?

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

———

বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ।

গত ২৬মে শুক্রবার ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের গৃহে সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয় "ভাষার ইঙ্গিত" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।*

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় প্রবন্ধকারের সুন্দর ও সুনিপুণ প্রবন্ধের সবিশেষ প্রশংসা করিয়া কোন কোন বিষয়ে তাঁহার মতের অনৈক্য জ্ঞাপন করিলেন। তিনি প্রবন্ধ শুনিয়া এই বুঝিলেন যেন বঙ্গভাষার বর্ত্তমান নেতাগণের মধ্যে দুইটি দল আছে,—একদল বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃতের অনুযায়ী ব্যাকরণে আবদ্ধ করিতে চেষ্টিত, অপর দল কথিত, অপপ্রয়োগদুষ্ট কথাগুলি লইয়া একটা স্বতন্ত্র ব্যাকরণের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক, রবীন্দ্র বাবু শেষোক্ত দলের নেতা। বিদ্যাভূষণ মহাশয় আরও বলিলেন যে রবিবাবু খুঁটিনাটি করিয়া যে সকল তুচ্ছ কথা হইতে সুনিপুণ শিল্পীর ন্যায় নানারূপ সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন, সে সকল কথাকে ভাষার বুদ্বুদ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহারা নগণ্য ও ক্ষণস্থায়ী, এবং বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন আকারে বিরাজিত, সেগুলি কথনও ব্যাকরণ লিখিত ভাষায় স্থান পাইবার যোগ্য নহে,—সংস্কৃতের রামায়ণ মহাভারতাদি পুস্তকেও ধ্বন্যাত্মক শব্দের দৃষ্টান্ত অতি বিরল; সুতরাং এই সকল কথা লইয়া প্রবন্ধকার যে আলোচনা করিলেন, তাহাতে তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও কবিত্ব প্রকাশ পাইলেও তাহাদের দ্বারা লিখিত বঙ্গভাষার বিশেষ কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, এরূপ আশা করা

---

* তাহার প্রথমাংশ ভারতীর এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল, দ্বিতীয়াংশ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে। ভাঃ সঃ।

যায় না। এই বলিয়া প্রবন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ধন্যবাদ দিয়া বিদ্যাভূষণ মহাশয় স্থান গ্রহণ করিলে সভায় বিষয়টি লইয়া বেশ একটু মুখরোচক আন্দোলন হইয়াছিল। প্রবন্ধকার স্বয়ং বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের জবাব দিয়াছিলেন এবং অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রতিকূলে ও রবীন্দ্রবাবুকে সমর্থন করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন।

ধনীব্যক্তির সুসজ্জিত গৃহের পরিষ্কার ফরাসে ধূলিমাখা পা লইয়া কোন ইতর বক্তি প্রবেশ করিলে—সভ্যগণ যেরূপ বিরক্ত ও বিস্মিত হন,—অনেক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত চলিত বাঙ্গলা ভাষার কোন রূপ প্রশ্রয় দেখিলে তেমনই চমৎকৃত ও বিরক্ত হইয়া উঠেন, এ ক্ষেত্রে কিন্তু বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সংস্কৃত ব্যাকণের সাপক্ষতা করিতে যাওয়া নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছিল। প্রবন্ধকার এ কথা বলেন নাই যে তিনি কলাপ পাণিনি উড়াইয়া দিয়া অভিধানের দৃঢ় দুর্গগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছেন, তিনি কতকগুলি উপকরণ লইয়য়া বৈজ্ঞানিকের ন্যায় তাহা হইতে সূত্র উদ্ধারের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। আধুনিক বৈয়াকরণের সম্পূর্ণ অলক্ষিত ভাবে একটা সজীব ভাষার প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, তাহার গতি কৌতুহলোদ্দীপক, সুন্দর ও প্রাণের হিল্লোলে তরঙ্গিত, তাহা নিজের প্রণালীতে নিজে ধরা দিয়াছে, সেই প্রবাহটির প্রতি লক্ষ্য করিয়া কি নিয়মে তাহা চলিতেছে প্রবন্ধকারী তাহাই দেখাইয়া ছিলেন। আমাদের সর্ব্বদা উপেক্ষিত সহজ কথাগুলি, যাহার সহায়তা ভিন্ন পণ্ডিত মহাশয়েরও বাক্য নিষ্পত্তির উপায় নাই, বাণভট্ট পড়িবার সময় তাহাদের প্রয়োজন না হইতে পারে, কিন্তু ঘরে ছেলের সঙ্গিন্ত ভাই ভগ্নির সহিত, সমস্ত পরিবারবর্গ ও জনসাধারণের সহিত কথোপ-কথন কালে যাহাদের সহায়তা ভিন্ন গত্যন্তর নাই তাহাদের প্রতি নিমকহারামি করিলে আমাদের চলিবে কেন? সংস্কৃতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

ব্যাকরণকার যখন শত শত চলিত কথার উপকরণ সঙ্কলন করিয়া ধাতুগুলির আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তখন তিনি কোন কথা তুচ্ছ বা নগণ্য বলিয়া উপেক্ষা করেন নাই, তিনি কখনও মনে করেন নাই, ব্যাকরণের সহিত ভাষার প্রভুভৃত্য সম্বন্ধ, তিনি জানিতেন ভাষা মহারাজ্ঞীর পদানুসরণ করিয়া কোন্ পথে তাঁহার গতি, তাহাই নিরূপণ করা ব্যাকরণের প্রধান কার্য্য, প্রকৃতীকে শাসন করিয়া ভাষার প্রতিভা কি সেই দিকে লক্ষ্য বদ্ধ রাখিবার জন্য ব্যাকরণের সমস্ত সূত্র সঙ্কলনের চেষ্টা।

একথা বোধ হয় বুঝিতে কোন গোলই নাই, যে বঙ্গভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে, বাঙ্গলার বিভক্তিবিধান স্বতন্ত্র, ক্রিয়াগুলি স্বতন্ত্র, এবং শত শত কথায় প্রতিদিন বাঙ্গালা ভাষা পাণিনীকে অগ্রাহ্য করিয়া স্বেচ্ছামত চলিয়া থাকে ;—বাঙ্গলা ভাষা সংস্কৃতের মত সমৃদ্ধশালিনী নহে, কিন্তু স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে যে ইহা স্বাধীন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পণ্ডিত মহাশয় যে বাঙ্গালায় স্বীয় উচ্চ অভিপ্রায়গুলি লিপিবদ্ধ করেন, তাহার প্রত্যেক ছত্রটিতে তিনি বারংবার পাণিনী অমরকোষের মতের বিরুদ্ধে কার্য্য করিয়া অপরাধী হইয়া থাকেন।

এমত অবস্থায় বাঙ্গলাভাষা যে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইবার কারণ নাই।

যদি তাহাই হয়, তবে এই ভাষার প্রতিভা নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের পক্ষে একমাত্র পন্থা—কথিত ভাষার প্রতি লক্ষ্য করা, কথিত ভাষায় ব্যকরণের উপকরণ পড়িয়া আছে, কোন বৈয়াকরণের প্রতীক্ষা না করিয়াই কথিত ভাষা নিজে শত শত সূত্রের মধ্যে ধরা দিয়াছে, বৈয়াকরণের কার্য্য হইবে তাহা আবিষ্কার করা। বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক চলিত কথার মধ্যে অনেক অনৈক্য আছে, কিন্তু সেই সেই প্রদেশের কথার যথেষ্ট উপকরণ সংগৃহীত ও নিয়মাবলী সঙ্কলিত

হইলে নির্ণয় করা সুবিধা হইবে, যে এই ভাষার কোন্ সূত্রগুলি সাধারণ,—অনৈক্যের প্রতি লক্ষ করিলে ঐক্য ধরা পড়িয়া যাইবে।

প্রবন্ধকার স্বয়ং ও হীরেন্দ্র বাবু সভাগৃহে প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, যে সকল কথাকে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ভাষার ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ বলিয়া তুচ্ছ করিয়াছেন তাহারাই স্থায়ী,—বড় বড় শব্দের ভাগ্য অপেক্ষাকৃত অল্পস্থায়ী, এক গৃহে লক্ষ্মী বেশী দিন থাকেন না বলিয়া অপবাদ আছে;—সমৃদ্ধিশালী শব্দগুলি বরং শীঘ্র শীঘ্র রূপান্তর ও অর্থান্তর পরিগ্রহ করিতে থাকে, কিন্তু ক্ষুদ্র শব্দগুলি স্বীয় জীর্ণ কন্থা লইয়া বহুকাল টিঁকিয়া যাইতেছে, ঘূর্ণমাণ জিনিষ "বোঁ করিয়া" কতকাল চলিতেছে, গমনশীল ব্যক্তি "শাঁ করিয়া" কতদিন হইতে ছুটিয়া যাইতেছে, তাহা কে নির্ণয় করিবে।

গুরুদাস বাবু ও হীরেন্দ্র বাবু উভয়ে দেখাইলেন, নাটক সাহিত্যে ছোট লোকের কথায় কথিত ভাষার চলিতরূপ রক্ষা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই,—ব্যাকরণ যদি সেগুলিকে উপেক্ষা করিয়া যায়, তবে ভবিষ্যতে তাহা দুর্বোধ হইবে, সংস্কৃত প্রায় সমস্ত নাটকে জনসাধারণের চলিত কথা স্থান পাইয়াছে, তাহাদের অর্থের জন্য অভিধান ও সূত্র উদ্ধারের জন্য ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে, বঙ্গভাষাসেবী পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে অমনোযোগী হইলে তাঁহাদের কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিবে।

আমরা দেখিতে পাই, কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা সাধু সমাজে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি চলিত কথাতেই তাঁহার উপদেশ দিয়া যান, সেই চলিত কথার মধ্যে একটা জান থাকে,—তাহা যদি সাধুভাষায় রূপান্তরিত করা যায়, তবে যেন সেই জান চলিয়া যায়,—পরমহংস রামকৃষ্ণের উপদেশ গুলি অতি সাধারণ চলিত কথাতেই লিপিবদ্ধ হইয়াছে—তাঁহার ভক্তমণ্ডলী সেই ভাষার অর্থ সঙ্কলনের চেষ্টা করিবেন,—তাঁহাদের মধ্যে তাহা পূজা পাইবে।

বাঙ্গালা ভাষার সঙ্গে জগতের অপরাপর ভাষার স্বতন্ত্রতা কোনখানে, তাহার একটা পরিচয়ের আবশ্যক,—এই ভাষার কোন রূপ স্থানে কি বিশেষত্ব তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাকরণের সৃষ্টি করিতে হইবে। ব্যাকরণ কোন কথা নূতন সৃষ্টি করিতে পারে না, ইহা শুধু দেখিয়া যাইবে, দেখাই ইহার কাজ, ভাষার শতমুখী গতি, কোন কোন পথ দিয়া চলিতেছে, ইহা তাহাই আবিষ্কার করিবে। বঙ্গ ব্যকরণকে কখনই পাণিনির নকল করিয়া লইলে চলিবে না, পাণিনি জীবিত থাকিলে তাহা কখনই হইতে দিতেন না,—তাঁহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্বান্বেষী চক্ষু ভাষার অতি তুচ্ছ হইতে অতি সাধু কথা—সমস্ত দেখিয়া লইয়াছিল, তিনি কিছুই উপেক্ষা করেন নাই। যাঁহাদিগের সাহায্য আমাদের দিনে দণ্ডে শতবার গ্রহণ করিতে হইতেছে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া আমরা যাহা করিব, তাহা কৃত্রিম হইবে। স্বভাব তাহাকে স্বীয় সামগ্রী বলিয়া চিনিতে পারিবে না। সংস্কৃত বঙ্গভাষাকে শোভা সম্পদ দান করিবে। সংস্কৃত বঙ্গভাষার শিরোরত্ন, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার স্বাধীন উদ্দাম গতি, ও লীলা যে ক্ষেত্রে হইতেছে, যে স্থানে ইহা ধনবান আত্মীয়ের পরিচয়ে নিজেকে পরিচিত না করিয়া, মৃদুস্বরে নিজের পরিচয় নিজে দিতেছে, সমস্ত উপাধি ও আবরণ পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিতেছে, ইহার ভক্ত ও প্রেমিক সেই নিভৃত স্থানে ইহাকে দেখিয়া ইহার স্বরূপ জানিবেন, তাহা ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

প্রবন্ধকার যে ভাবে কথা সংগ্রহ করিয়াছেন, আমাদের সবিনয় নিবেদন, তুচ্ছ না করিয়া বিভিন্ন প্রদেশের চলিত কথা সেইভাবে সংগৃহীত হইয়া আলোচনার জন্য তাহা সুধীমণ্ডলীর নিকট উপস্থিত করা হয়।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

সাময়িক কথা।

হিন্দু ও বৌদ্ধজগত।

তিব্বতের নিরীহ ধর্ম্মযাজকদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ অভিযানে ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবর্ষে একটি অন্তঃসলিল সহানুভূতির ভাব প্রবাহিত হইতেছে। বাণিজ্যের দুরধিগম্য, অনুর্ব্বর, পার্ব্বত্যরাজ্যের প্রতি ইংলণ্ডের লোলুপ-দৃষ্টি—নির্দ্দোষ অধিবাসীগণের সঙ্গে যুদ্ধের অভিনয় করিয়া তাহাদিগের বধসাধন,—আমাদের নিকট তেজস্বী, সভ্যাভিমানী, ন্যায়ের পক্ষপাতী, বলদৃপ্ত ইংরেজ জাতির অযোগ্য কাজ বলিয়া মনে হয়।

সত্য বটে তিব্বতের উপান্তে রুশের ক্রমবর্দ্ধিষ্ণু প্রভাব ইংরেজের পক্ষে আশঙ্কার বিষয়, এবং সেই আশঙ্কা নিরাসনের জন্যই এই অভিযান প্রয়োজনীয় এতদিন এই কথা শুনা যাইতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি ইংলণ্ডের কোন কোন পত্রিকায় এতৎসম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায় এই অভিযানের কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই তিব্বতে রুষের প্রভাব নিতান্তই ক্ষীণ; নানা কারণে তিব্বতবাসীরা রুষের উপর অসন্তুষ্ট ছিল। সুতরাং এই নিরর্থক উপদ্রবের কোন সঙ্গত কারণ দৃষ্ট হয় না।

যে জাতি এক সময়ে আমেরিকায় দাসব্যবসায়ের প্রতিকূলে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইয়া বিশ্বপ্রীতির দৃষ্টান্তস্থলীয় হইয়াছিলেন, গ্রীকদিগের স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টায় সহায়তা করিয়াছিলেন, আর্ত্তকে রক্ষা ও অশিক্ষিতকে শিক্ষার আলোক প্রদান যাহাদের জাতীয় ব্রত, তাহাদের বর্ত্তমান নৃশংসতা জাতীর অবনতির লক্ষণ।

কিন্তু তিব্বত ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে ভারতবাসীর সর্ব্বতোভাবে ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই,—এই অশুভ ব্যাপারের মধ্যেও দুই একটি শুভ আশার রশ্মি আমাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতেছে। এই উপলক্ষে ভারতবাসীর চাকরীর ক্ষেত্র সুপ্রসারিত হইবে আমার সেই স্বার্থজড়িত স্বপ্নে উল্লাসিত হই নাই—আমাদিগের লক্ষ্য অন্যদিকে।

বর্ত্তমান এসিয়ার পাঁচটি স্থূল ধর্ম্মজগতের কেন্দ্র স্বরূপ,—জেরুজালেম, মক্কা, বেনারস, বুদ্ধগয়া ও লাসা,—এই পাঁচটি স্থান জগতের তীর্থ,—তাহাদের মধ্যে দুইটি ভারতবর্ষের গণ্ডীর মধ্যে বিদ্যমান, তিব্বত ভারতের অন্তর্ভুক্ত হইলে তিনটিই আমাদের দেশে হইবে। এই তিনটির মধ্যে দুইটি বৌদ্ধ জগতের প্রধানতম তীর্থ।

আমরা এই উপলক্ষে বৌদ্ধজগতের সঙ্গে নানা প্রকারে সংশ্লিষ্ট হইবে। যে ধর্ম্ম, হিন্দু-ধর্ম্ম হইতে উদ্ভূত এবং যে ধর্ম্মের প্রতি কথা হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র সুপরিচিত, তাহারই দুই প্রধানতম জয়পতাকার অধিষ্ঠানভূমি ভারতবর্ষের গণ্ডীর মধ্যে পড়িবে, এই সূত্রে চীন ও জাপানবাসীদের সঙ্গে আমাদের যে ঐকান্তিকী প্রীতি ও প্রগাঢ়-বন্ধন স্থাপিত হইবে তাহা পরস্পরের পক্ষে অশেষরূপে কল্যাণকর হইবে। এক সময়ে ভারতবর্ষ বৌদ্ধজগতের শিক্ষার কেন্দ্রছিল, বৌদ্ধ বিহারগুলি হইতে জগতের সর্ব্বস্থলে শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোত প্রসারিত হইত, আবার ভারতবর্ষ সেই গৌরব জনক স্থানে অধিষ্ঠিত হইবার সুখ-স্বপ্ন গঠিত করিতে পারিবে। এবার ভারতবর্ষ সর্ব্বস্থলে শিক্ষকের স্থানে সমাসীন হইতে পারিবে না,—তাহাতে ক্ষোভের বিষয় নাই, এবার ভারতবর্ষ ছাত্ররূপে জ্ঞানের পথে পথে ভিক্ষা করিতে প্রয়াসী, হৃতভাগ্যের দ্বার সর্ব্বত্র রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে, এখন য়ুরোপ হউক এসিয়া হউক যে দেশেরই লোক সদয় চিত্তে তাহার এই জ্ঞানতৃষ্ণা পূরণ করিবেন, ভারতবাসী তাহারই শরণাপন্ন হইয়া কৃতার্থ হইবে। বৌদ্ধ জগতের দুইটি প্রধান ধর্ম্মের কেন্দ্র ভৌগলিক ভারতসীমায় প্রতিষ্ঠিত হইলে এসিয়ার বৌদ্ধগণের সাহায্যে তাহারা নবজীবন লাভ করিতে পারিবে, এই দুর্দ্দিনের মধ্যে সেই ক্ষীণ আশা আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছে। যদি অশুভ নিশ্চয়ই সংঘটিত হয় তাহা প্রত্যাহার করিবার যখন আমাদের শক্তি নাই, তখন এই অশুভকে দোহন করিয়া যাহা কিছু শুভ আমরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহাই আমাদের অবলম্বনীয়,—এই সূত্রে বৌদ্ধ জগতের সঙ্গে আমাদের প্রত্যাশিত সৌহার্দ্দ্য ও প্রগাঢ় প্রীতির বন্ধনই আমরা যথেষ্ট লাভ মনে করিব।

বিদ্যাপতির নূতন পদসংগ্রহ।

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত মহাশয় বিদ্যাপতির এক নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিতেছেন। তৎসম্বন্ধে আমরা যে সম্বাদ লাভ করিয়াছি নিম্নে বিবৃত হইতেছে। কয়েক মাস অতীত হইল মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয় দারভাঙ্গার মহারাজার নিকট হইতে বিদ্যাপতির মিথিলা প্রচলিত ১৫২টি পদ প্রাপ্ত হন, এবং

এই উপকরণ লইয়া বিদ্যাপতির একটি নূতন সংস্করণ প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তাঁহার অবসর অল্প সুতরাং এই কার্য্যের ভার কোন যোগ্য হস্তে ন্যস্ত করিবার জন্য তিনি সাহিত্যপরিষদে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন; নগেন্দ্র বাবু বিদ্যাপতির পদের সেই খাতাখানি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে মিথিলা প্রচলিত পদের সঙ্গে বঙ্গদেশীয় পদের প্রভেদ এবং মৌলিক পদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়া—এই বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বহুদিন উত্তর পশ্চিমে ছিলেন, তাঁহার হিন্দী ও মৈথিল ভাষায় ব্যুৎপত্তি দুরূহ স্থলের অর্থনির্ণয়ে বিশেষরূপে সহায় হইয়াছে। এতদ্দেশীয় টীকাকারগণ মৈথিল ভাষায় অজ্ঞতা নিবন্ধন অনেক স্থলে কষ্ট কল্পনা করিয়া যে সকল অর্থ করিয়াছেন, তাহার ভ্রম নগেন্দ্র বাবু অনায়াসে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন। বাঙ্গলা তু এবং উ প্রাচীন অক্ষরে প্রায় একরূপ দেখায়, এজন্য লিপিকর কৃত "উষসি" শব্দের স্থলে "তুষসি" পদ লইয়া টীকাকারগণ যে কত মাথা খুঁড়িয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। মৈথিল "পয়" শব্দ পাদপূরণার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এই শব্দটি "চ, বৈ, তু হি" র ন্যায় একটি অর্থশূন্য অব্যয় শব্দ। এই "পয়" শব্দের প্রয়োগানভিজ্ঞ টীকাকারগণ "গণ্ড" "শব্দের সঙ্গে উহার একটা বিকৃতরূপ জুড়িয়া দিয়া কষ্ট-কল্পিত "পৌগণ্ড" শব্দের সৃষ্টি পূর্ব্বক অমরকোষ হইতে অর্থ নির্ণয় করিয়াছেন। মৈথিল "দম্‌সিল" শব্দের অর্থ পদদলিত করা, এই শব্দটি না জানা থাকায় লিপিকারগণ "দমসল" শব্দকে বিকৃত করিয়া "করিয়া "দংশল"লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বাঙ্গালী টীকাকার "মদনলতা জনু দংশল হাতি" এই পদে হস্তীর শুণ্ড দ্বারা দংশনের ব্যবস্থা না করিয়া করিবেন কি?

ইহাছাড়া পদকল্পতরু, পদকল্পলতিকা, গীতচিন্তামণি প্রভৃতি সংগ্রহ পুস্তকের অনেকগুলি ভণিতাশূন্য পদে বিদ্যাপতির পরিচিত মৈথিল শব্দগুলির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া নগেন্দ্র বাবু তাহাদিগকে বিদ্যাপতির পদ বলিয়া অনুমান করিয়া ছিলেন, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পরে তিনি মিথিলা হইতে দারভাঙ্গা রাজার অনুগ্রহে বিদ্যাপতির যে পুঁথিখানি পাইয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পদসমূহের অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে, এ দেশে যে পদের ভণিতা নাই, সে দেশে সেই সকল পদের ভণিত আছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে গোল চুকিয়া গিয়াছে।

বাঙ্গালা প্রাচীন পদসংগ্রহপুস্তকে "সিংহ ভূপতি"র ভণিতায় যে সকল পদ পাওয়া যায়,—তাহার সমস্তগুলিই বিদ্যাপতিরচিত, "শিব সিংহ ভূপতির" শেষ দুইটি শব্দ

রক্ষিত হইয়াছে, মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির কোন কোন পদে তিনি শুধু রাজার নামটি দিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর এই সকল আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ অনুধাবন করিবেন।

এপর্য্যন্ত বিদ্যাপতির কিঞ্চিদধিক ২০০ পদ বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর নিকট পরিজ্ঞাত আছে, তাহা ছাড়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত স্বল্প সংখ্যক পদ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। গ্রীয়ারসন সাহেব মিথিলা হইতে ৮২টি মাত্র পদ সংগ্রহ করিয়া জানাইয়াছিলেন,—তাহাই মিথিলা প্রচলিত সমস্ত পদ। নগেন্দ্র বাবু এ পর্য্যন্ত ৩০০ শতের অধিক পদ মিথিলা হইতে পাইয়াছেন, তাঁহার সংস্করণে বিদ্যাপতির অন্যূন ৫০০ পদ থাকিবে।

মিথিলার জনৈক ব্রাহ্মণের ঘরে বিদ্যাপতির ৬০০ পদ সংগৃহীত ছিল, ২০ বৎসর হইল অগ্নিদাহে সেই পুঁথিখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় দারভাঙ্গার রাজা এই পদসংগ্রহ ব্যাপারে সহায়তা না করিলে নগেন্দ্র বাবুর পক্ষে এই কার্য্য দুরূহ হইত। শুনিতেছি নগেন্দ্র বাবু দারভাঙ্গায় নিজে যাইয়া বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নানারূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইবেন।

নগেন্দ্র বাবু যে ভাবে পদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়, তাঁহার ব্যাখ্যাগুলি সহজ ও সুস্পষ্ট হইতেছে, এইজন্য তিনি জার্ম্মান পণ্ডিতের মত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, দুরূহ স্থানগুলির পাশ কাটিয়া সহজ স্থানের বিস্তৃত ব্যাখ্যারদ্বারা তিনি পাণ্ডিত্য দেখাইতে ইচ্ছুক নহেন, এই ব্যাখ্যা কার্য্যে মিথিলার কয়েকজন রাজ সভার পণ্ডিত, বিশেষতঃ চণ্ডেশ্বর ঝাঁর নিকট হইতে তিনি বিশেষ সাহায্য পাইতেছেন। আমরা শীঘ্রই বিদ্যাপতির এই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি প্রকাশিত দেখিতে ব্যগ্র রহিলাম।

ভারতীয় কার্পাসের উন্নতি।

মিষ্টার জে, এন, তাতার মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাতার স্মৃতির সঙ্গে আমাদের ভারতীয় শিল্প ও শিক্ষার একটা বিরাট উদ্যমের কথা মনে উদয় হয়,—ভারতবর্ষের ভাবী উন্নতির একটা বিরাট মন্দির যেন তাঁহার মৃত্যুতে

ধসিয়া পড়িতেছে—দেশের সর্ব্ববিধ শুভ উদ্যম যেন এই আঘাতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে—তাঁহার মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একটা আশঙ্কা মনে উদয় হয়।

তাতার শিল্প সম্বন্ধীয় নানারূপ অনুষ্ঠান, ভারতীয় যুবকবৃন্দের বিদেশে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বৃত্তি স্থাপন, বিদেশীয় বণিকবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার সফল প্রতিযোগিতা, তাঁহার বিশাল কল-কারখানা ও বোম্বাইয়ের সমুদ্র তীরে তাজমহল প্রতিষ্ঠা—এ সমস্ত দিক হইতেই আমরা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে উদ্যত হস্তের পরিচয় পাই। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট কার্পাস তুলা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা এই শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে এস্থলে কিছু অলোচনা করিব।

অনেকেই হয়ত অবগত নহেন, যে ভারতবর্ষের কার্পাসে ৪০ নম্বরের সুতার উপযোগী তুলার অপেক্ষা সূক্ষ্মতর তুলা প্রস্তুত হয় না। অপেক্ষাকৃত অল্প দরের মোটাকাপড় এদেশে বেশ প্রস্তুত হইতে পারে এবং তৎক্ষেত্রে মাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে আমাদের দেশীয় মিলের প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মসূত্র বয়ণ করিতে হইলে এদেশে মার্কিন কিম্বা মিসরের কার্পাস জন্মাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবর্ষে উক্ত প্রকারের তুলা জন্মাইবার জন্য মিষ্টার তাতা এদেশজাত সর্ব্বপ্রকার তুলা পরীক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে "তাতা কোম্পানী"র কার্পাস বিভাগের অধ্যক্ষ নিম্নোদ্ধ বিবরণী আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"একথা ঠিক যে আমরা যদি প্রথম শ্রেণীর তুলা এদেশে জন্মাইতে পারি, তবে মানচেষ্টারকে সহজেই হটাইতে পারা যায়। কিন্তু এসম্বন্ধে কতকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ মার্কিণ ও মিসরী কার্পাসের বীজ ভারতবর্ষে বপন করিলে প্রথম দুই এক বৎসর উৎকৃষ্ট ফসল হয়। কিন্তু এতদ্দেশে উৎপন্ন উক্ত কার্পাস বীজ ক্রমে মাটীর গুণে খারাপ হইতে থাকে. প্রথম প্রথম দোয়াঁসলা গোছের এক রকম কার্পাস উৎপন্ন হয়, ক্রমে তাহা ঠিক স্থানীয় কার্পাসে পরিণত হয়,—সুতরাং যদি মিসরী বীজ একবার সমস্ত ভারতবর্ষময় বপন করা যায়, তবে পাঁচটি বৎসর পরে দেশের সর্ব্বত্র এক জাতীয় কার্পাস না পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ঠিক এখনকারমত স্থানীয় কার্পাসই প্রাপ্ত হইব। এইরূপ ভাবে জাত কার্পাস দৈর্ঘ্যে ও দৃঢ়তায়

রক্ষিত হইয়াছে, মিথিলায় প্রচলিত বিদ্যাপতির কোন কোন পদে তিনি শুধু রাজার নামটি দিয়াছেন। নগেন্দ্র বাবুর এই সকল আবিষ্কারের গুরুত্ব পাঠকগণ অনুধাবন করিবেন।

এপর্য্যন্ত বিদ্যাপতির কিঞ্চিদধিক ২০০ পদ বঙ্গীয় পাঠক মণ্ডলীর নিকট পরিজ্ঞাত আছে, তাহা ছাড়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সংগৃহীত স্বল্প সংখ্যক পদ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। গ্রীয়ারসন সাহেব মিথিলা হইতে ৮২টি মাত্র পদ সংগ্রহ করিয়া জানাইয়াছিলেন,—তাহাই মিথিলা প্রচলিত সমস্ত পদ। নগেন্দ্র বাবু এ পর্য্যন্ত ৩০০ শতের অধিক পদ মিথিলা হইতে পাইয়াছেন, তাঁহার সংস্করণে বিদ্যাপতির অন্যূন ৫০০ পদ থাকিবে।

মিথিলার জনৈক ব্রাহ্মণের ঘরে বিদ্যাপতির ৬০০ পদ সংগৃহীত ছিল, ২০ বৎসর হইল অগ্নিদাহে সেই পুঁথিখানি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র মহাশয়ের চেষ্টায় দারভাঙ্গার রাজা এই পদসংগ্রহ ব্যাপারে সহায়তা না করিলে নগেন্দ্র বাবুর পক্ষে এই কার্য্য দুরূহ হইত। শুনিতেছি নগেন্দ্র বাবু দারভাঙ্গায় নিজে যাইয়া বিদ্যাপতি সম্বন্ধে নানারূপ তত্ত্ব নির্ণয় করিতে চেষ্টা পাইবেন।

নগেন্দ্র বাবু যে ভাবে পদ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা বিশেষ প্রশংসনীয়, তাঁহার ব্যাখ্যাগুলি সহজ ও সুস্পষ্ট হইতেছে, এইজন্য তিনি জার্ম্মান পণ্ডিতের মত অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, দুরূহ স্থানগুলির পাশ কাটিয়া সহজ স্থানের বিস্তৃত ব্যাখ্যারদ্বারা তিনি পাণ্ডিত্য দেখাইতে ইচ্ছুক নহেন, এই ব্যাখ্যা কার্য্যে মিথিলার কয়েকজন রাজ সভার পণ্ডিত, বিশেষতঃ চণ্ডেশ্বর ঝাঁর নিকট হইতে তিনি বিশেষ সাহায্য পাইতেছেন। আমরা শীঘ্রই বিদ্যাপতির এই পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি প্রকাশিত দেখিতে ব্যগ্র রহিলাম।

ভারতীয় কার্পাসের উন্নতি।

মিষ্টার জে, এন, তাতার মৃত্যুতে সমস্ত ভারতবর্ষ শোকাচ্ছন্ন হইয়াছে। তাতার স্মৃতির সঙ্গে আমাদের ভারতীয় শিল্প ও শিক্ষার একটা বিরাট উদ্যমের কথা মনে উদয় হয়,—ভারতবর্ষের ভাবী উন্নতির একটা বিরাট মন্দির যেন তাঁহার মৃত্যুতে

ধসিয়া পড়িতেছে—দেশের সর্ব্ববিধ শুভ উদ্যম যেন এই আঘাতে কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছে—তাঁহার মৃত্যুসংবাদের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ একটা আশঙ্কা মনে উদয় হয়।

তাতার শিল্প সম্বন্ধীয় নানারূপ অনুষ্ঠান, ভারতীয় যুবকবৃন্দের বিদেশে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য বৃত্তি স্থাপন, বিদেশীয় বণিকবৃন্দের সঙ্গে তাঁহার সফল প্রতিযোগিতা, তাঁহার বিশাল কল-কারখানা ও বোম্বাইয়ের সমুদ্র তীরে তাজমহল প্রতিষ্ঠা—এ সমস্ত দিক হইতেই আমরা তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা ও সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে উদ্যত হস্তের পরিচয় পাই। ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট কার্পাস তুলা জন্মাইবার উদ্দেশ্যে তিনি কত চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমরা এই শেষোক্ত বিষয় সম্বন্ধে এস্থলে কিছু অলোচনা করিব।

অনেকেই হয়ত অবগত নহেন, যে ভারতবর্ষের কার্পাসে ৪০ নম্বরের সুতার উপযোগী তুলার অপেক্ষা সূক্ষ্মতর তুলা প্রস্তুত হয় না। অপেক্ষাকৃত অল্প দরের মোটাকাপড় এদেশে বেশ প্রস্তুত হইতে পারে এবং তৎক্ষেত্রে মাঞ্চেষ্টারের সঙ্গে আমাদের দেশীয় মিলের প্রতিযোগিতা চলিতে পারে। কিন্তু সূক্ষ্মসূত্র বয়ণ করিতে হইলে এদেশে মার্কিন কিম্বা মিসরের কার্পাস জন্মাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভারতবর্ষে উক্ত প্রকারের তুলা জন্মাইবার জন্য মিষ্টার তাতা এদেশজাত সর্ব্বপ্রকার তুলা পরীক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। এতৎসম্বন্ধে "তাতা কোম্পানী"র কার্পাস বিভাগের অধ্যক্ষ নিম্নোদ্ধ বিবরণী আমাদিগকে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

"একথা ঠিক যে আমরা যদি প্রথম শ্রেণীর তুলা এদেশে জন্মাইতে পারি, তবে মানচেষ্টারকে সহজেই হটাইতে পারা যায়। কিন্তু এসম্বন্ধে কতকগুলি অন্তরায় আছে। প্রথমতঃ মার্কিণ ও মিসরী কার্পাসের বীজ ভারতবর্ষে বপন করিলে প্রথম দুই এক বৎসর উৎকৃষ্ট ফসল হয়। কিন্তু এতদ্দেশে উৎপন্ন উক্ত কার্পাস বীজ ক্রমে মাটীর গুণে খারাপ হইতে থাকে. প্রথম প্রথম্ দোয়াঁসলা গোছের এক রকম কার্পাস উৎপন্ন হয়, ক্রমে তাহা ঠিক স্থানীয় কার্পাসে পরিণত হয়,—সুতরাং যদি মিসরী বীজ একবার সমস্ত ভারতবর্ষময় বপন করা যায়, তবে পাঁচটি বৎসর পরে দেশের সর্ব্বত্র এক জাতীয় কার্পাস না পাইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় ঠিক এখনকারমত স্থানীয় কার্পাসই প্রাপ্ত হইব। এইরূপ ভাবে জাত কার্পাস দৈর্ঘ্যে ও দৃঢ়তায়

বাঙ্গালা হইতে ব্রোচ পর্য্যন্ত এবং বাঙ্গলা হইতে কম্পটা পর্য্যন্ত বিচিত্র আকারে উৎপন্ন হইবে—তাহারা যে এক বীজের বংশধর তাহার কোন পরিচয় চিহ্নই থাকিবে না।

স্বভাবের এই প্রতিকূলতা রোধের একমাত্র উপায়—প্রত্যেক দ্বিতীয় বৎসরে, আমেরিকা বা মিসর হইতে নূতন বীজ আনিয়া বপন কর। কিন্তু এ বিষয়ে ভারতীয় কৃষকের স্থিতিশীলতা ও কুসংস্কার দ্বিতীয় এবং গুরুতর অন্তরায়—তাহারা কোনরূপ সংস্কার ও উন্নতির কথারকর্ণপাত করিবে না। এই জন্য যে সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে হইবে তাহাতে তাহারা কুণ্ঠিত—"কাহণ কাণা কড়ায় কুশল"—এই নীতি তাহাদের অবলম্বন। অতিরিক্ত একটু পরিশ্রম করিলেই এ বিষয়ে তাহাদের ষোল আনা লাভ দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু তাহারা ইহা বুঝে না। আপনারা ইহা শুনিয়া কি মনে করিবেন যে কোন কোন জেলার কৃষকেরা তাহাদের ফসলের কোনরূপ উন্নতি সাধন করিতে অগ্রসর হইতে চায় না, ইহার কারণ এই দেখায় যে তাহারা বংশানুক্রমে যেরূপ ভাবে চাষাবাদ করিয়া আসিতেছে, তাহা হইতে ভাল ফসল উৎপন্নের চেষ্টা করা তাহাদের রীতিবিরুদ্ধ। গুজরাটে ব্রুচের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কৃষকেরা যদি তাহাদের কার্পাস গুলি ভালরূপ পক্ক হইবার পূর্ব্বে না তুলিয়া ফেলে—তবে অনেক গুণে উত্তম ফসল পাইতে পারে—অথচ তাহারা চিরাগত রীতি ত্যাগ করিয়া এই টুকু সবুর সহিয়া কার্পাস গুলি ভালরূপ পক্ক হইবার অবসর দিতে প্রস্তুত নহে। খান্দেস জেলার কৃষকেরা যদি গাছ হইতে কার্পাস গুলি পড়িয়া নষ্ট হইতে না দেয় এবং ক্ষেত্রে ভাল করিয়া ঝাঁট দিতে পারে তবে এখনকার চেয়ে ঢের ভাল ফললাভ করিতে পারে—কিন্তু প্রাচীন রীতি ছাড়িয়া এতটুকু নূতন পন্থা তাহার অনুসরণ করিবে না।

বিদেশ হইতে বীজ আনার কথা ছাড়িয়া দিন। এ দেশের কৃষকেরা বাজার হইতে যে বীজ ক্রয় করে—তাহাতেই যদি একটু নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতার পরিচয় দেয় তবুও অনেক সুবিধা হইতে পারে—ভাঙ্গা বীজ গুলি ফেলিয়া শুধু ভাল বীজ গুলি যদি তাহারা কিনিয়া লয়, যদি তাহারা এক একটি স্থানে ৪।৫টি করিয়া এক সঙ্গে বপন করে—এবং যখন চারা হইতে থাকে—তখন শীর্ণ চারা গুলি ফেলিয়া ভাল গুলি রক্ষা করে—তাহা হইলে অনেক উন্নতি হইতে পারে' ভূমি উর্ব্বর করিবার জন্য সামান্য কিছু অর্থের প্রয়োজন—কৃষকগণ সচরাচর এই ব্যয় বহন

করিতে কুণ্ঠিত। তারপর কার্পাস জন্মিলে প্রথমতঃ নিম্নদিকের ফসল—তৎপর মধ্যভাগের ও সর্ব্বশেষ উর্দ্ধতম কার্পাস তুলিলে সবগুলি পরিপক্ব অবস্থায় পাইতে পারে—কিন্তু তাহারা ইহা না করিয়া একবারেই কাঁচা পাকা সমস্ত কার্পাস গাছ হইতে তুলিয়া লয়—অতি সামান্য যত্ন, শ্রম ও ব্যয় স্বীকার করিলেই দেশীয় বীজ হইতেই এখনকার অপেক্ষা অনেক ভাল কার্পাস পাওয়া যাইতে পারে,—কিন্তু কৃষকদের এই কাজে প্রবর্ত্তিত করিবে কে?

আমার পূজনীয় মাতুল স্বর্গীয় ভাতা মহোদয়ের সঙ্গে এবিষয়ে আমার অনেক সময় কথা হইয়াছে; তিনি বলিতেন, কোন ব্যবসায় বা স্বদেশহিতৈষীর চেষ্টায় ইহা হইবার নহে, কৃষকদিগের এই জড়তা ও সংস্কার দূরীভূত করিতে একমাত্র গভর্ণমেণ্ট সক্ষম। "গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে পাঁচটি বৎসরের মধ্যে স্বীয় উন্নতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ কৃষকদিগের দৃষ্টিশক্তি উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারেন।"

মার্কিন কিম্বা মিসরী বীজ যদি এদেশে দুই বৎসরের মধ্যে শ্রীহীন হইয়া পড়ে—সেগুলি যদি স্থানীয় বীজের নিকৃষ্টতা প্রাপ্ত হয়—তবে প্রতি দুই বৎসর পরে নূতন বীজ বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া ভারতীয় কার্পাসের উৎকর্ষ জাগ্রত রাখা—কার্য্যক্ষেত্রে কতদূর সম্ভব তাহা বলা যায় না।

কিন্তু ভারতবর্ষের সমস্ত প্রদেশ কি এই সম্বন্ধে পরীক্ষিত হইয়াছে? আমাদের বিশ্বাস সমগ্র ভারতে এমন অনেক স্থান আছে—যেখানে কার্পাসের উৎকৃষ্ট ফসল জন্মিতে পারে। চট্টগ্রাম, বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্পাস-ভূমি, তথাকার উৎপন্ন কার্পাসে প্রসিদ্ধ ঢাকার মসলিন প্রস্তুত হইত,—এইস্থানে মিসর বা মার্কিনের বীজ বপন করিলে কিরূপ ফল দাঁড়ায়—তাহা পরীক্ষনীয়।

দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়ী বা স্বদেশহিতৈষীর বাগ্মিতায় কৃষকদের কুসংস্কার দূর না হইতে পারে কিন্তু আমরা গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে একবার, জমিদারগণ ও দেশীয় রাজন্যবর্গকে—কৃষকের জড়তা দূর করিবার জন্য সচেষ্ট হইতে প্রার্থনা করিতে পারি। কৃষিসম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদিগের মতামত লইয়া দেশের বড় লোকগণ যদি স্বীয় অধিকারভুক্ত প্রজামণ্ডলীকে শিক্ষা দিতে কৃতসংকল্প হন ও তাহাদের নিজের স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন, তবে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।

হিন্দু ও মুসলমান।

সম্প্রতি ক্লাসিক থিয়েটারে শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সৎনাম অভিনয়োপলক্ষে কলিকাতার মুসলমান সম্প্রদায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার দল বাঁধিয়া এই অভিনয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, তাঁহাদের ক্রুদ্ধ দাবী উক্ত থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। সৎনামের উপর নাকি রঙ্গভূমির শেষ যবনিকার পতন হইয়াছে—উহা আর অভিনীত হইবে না,—এই আশ্বাস পাইয়া মুসলমানগণের উত্তেজনা প্রশমিত হইয়াছে, সুতরাং "সৎনাম" গিরীশবাবুর সৎনাম অর্জ্জন করিতে পারে নাই।

হিন্দু মুসলমান এখন এক মাতৃভূমির সন্তান—এই সম্বন্ধটি গাঢ়রূপে উপলব্ধি না করিতে পারিলে পরস্পরের কল্যাণ নাই। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণের পদাঙ্ক অনুসরণে এ পর্য্যন্ত হিন্দু লেখকগণ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অনেক প্রকার কটূক্তি বর্ষণ করিয়াছেন—ইহা বিদ্বেষ হইতে যতটা না হইয়াছে, অন্ধ অনুকরণ স্পৃহা হইতে তদপেক্ষা অধিকতররূপে হইয়াছে। আমাদের প্রতিবাসী সুহৃদ্দিগের—এক মাতৃভূমির ক্রোড়ে লালিত ভ্রাতাদিগের হৃদয়ে এরূপ আঘাত দেওয়া আমাদের পক্ষে অনুচিত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য। "যবন" শব্দ পূর্ব্বকালে 'গ্রীক'দিগের প্রতি ব্যবহৃত হইত, প্রাচীন ইতিহাসে এই শব্দ অর্থ-দুষ্ট হয় নাই, এই যুক্তির বলে এখন ইহা যে বিদ্বিষ্ট অর্থবাচক হইয়াছে তাহা অস্বীকার করিবার কোনই উপায় নাই। "নেটিভ" শব্দের মৌলিক যে অর্থই থাকুক না কেন, তাহা এখন ঘৃণার অর্থে পরিণত হইয়াছে, বর্ত্তমান অভিধানে "যবন" শব্দটির এইরূপ অর্থ বিকৃতি ঘটিয়াছে সুতরাং হিন্দু লেখকগণ এই শব্দটির প্রতি মমতা ত্যাগ করিয়া মুসলমানগণের প্রতি কিছু মমতা দেখাইলে যে তাঁহাদের শব্দভাণ্ডার শূন্য হইয়া পড়িবে এমন আশঙ্কা নাই। দুই জাতির পরস্পরের প্রতি প্রীতিবর্দ্ধন পক্ষে "যবন," "কাফের" প্রভৃতির প্রয়োগ উঠাইয়া দিলে কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নাই।

তারপর প্রাচীন ইতিহাসের কথা—যে সমস্ত প্রসঙ্গে সম্প্রদায়গত উৎপীড়ন বা অত্যাচারের কথা আছে, সে সকল প্রসঙ্গ সতর্কতার সহিত আলোচনা করিলে কুফল প্রসূত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। কাল ভিষকের ন্যায় আমাদের অনেক ক্ষত আরোগ্য [illegible] য়াছে, এতদিন পরে আবার তীক্ষ্ণধার ছুরি হস্তে ইতিহাস [illegible] অল্প সামান্য কিছু [illegible] জাগাইয়া তুলিবে কেন? ভাঙ্গা মন্দির ও

নষ্ট বিগ্রহের কথায় এখন আর ততটা উত্তেজনা প্রকাশের কারণ কি? আমাদের নিজেদের মধ্যেই ত এখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কতপ্রকার উত্তেজিত অনুষ্ঠান চলিতেছে। ইতিহাস প্রবীনের ন্যায় বিষয়গুলির আলোচনা করিবে, তাহার পদে পদে বিচলিত হইলে চলিবে কেন? আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি, হিন্দু মুসলমানে এখন প্রকৃতপক্ষে কোন বিদ্বেষই নাই, প্রতি পল্লীতে পল্লীতে পরস্পরের সম্বন্ধ আলোচনা করিলে আমাদের কথা প্রমাণিত হইবে—এই প্রীতির ক্ষেত্রে লেখনী লইয়া একটা কাল্পনিক বিদ্বেষের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা কি উচিত?

এক সময়ে ইংলণ্ডের রোমান ক্যাথালিক সম্রাজ্ঞী প্রোটেস্টেণ্টদিগকে পশুর ন্যায় বধ্যভূমিতে হনন করিয়াছিলেন। প্রোটেসটেণ্টগণও রক্তাক্ত করে তাহার প্রতিশোধ তুলিতে ছাড়েন নাই। ইংরেজ জাতির এই দুই সম্প্রদায় এখন বিদ্বেষের সীমা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন। এখন ইহাঁরা উভয় সম্প্রদায় মিলিয়া কিরূপে একনিষ্ঠ দেশবৎসল, দৃঢ়সংশ্লিষ্ট ইংরেজ জাতি গঠন করিয়াছেন, পরস্পরের রক্তানুরঞ্জিত কর প্রসারণ করিয়া এই দুই শ্রেণী স্বদেশের উন্নতির মহাব্রতকল্পে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন—সেই দৃষ্টান্ত আমাদের চোখের সাম্‌নে রাখা উচিত ও তাহাই আমাদের ভাবী অনুষ্ঠানগুলির নিয়ামক বলিয়া গণ্য করা উচিত।

মুসলমানদিগকেও আমাদের দুই একটি কথা বলিবার আছে, যে স্থানে প্রীতিভরে নায়ক নায়িকা পরস্পরকে আত্মসমর্পণ করেন, সেখানে হিন্দুমুসলমানের প্রভেদ প্রেমের নিকট হতবল হইয়া পড়ে—তাহা লইয়া তাঁহাদের এতটা উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ দৃষ্ট হয় না। তাঁহারা হিন্দুলেখকগণের হিন্দুনায়ক ও মুসলমান নায়িকার প্রসঙ্গে যতটা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কল্পনা করেন, আমরা তাহা করি না। পূজনীয় জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর "অশ্রুমতী" নাটকে রাজকন্যা অশ্রুমতী বাদসাহপুত্র সেলিমকে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এক্ষেত্রে হিন্দুলেখককে তাঁহারা কোনই প্রশংসা করেন নাই। রবীন্দ্রবাবুর "কাহিনী" গ্রন্থে "সতী" শীর্ষক কাব্যে ব্রাহ্মণ বিনায়কের কন্যা অমাবাই মুসলমান নায়ককে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন তাহা বর্ণিত হইয়াছে—অমাবাই বলিয়াছিলেন "পূর্ণ ভক্তিভরে করেছি পতির পূজা, হয়েছি যবনী পবিত্র অন্তরে, নহি পতিতা রমণী"! এই সকল স্থানে হিন্দুলেখকগণ কোন প্রকারের সমাজদ্রোহিতা করিয়াছেন বলিয়া আমরা মনে করি না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ও সামাজিক নিয়মের উর্দ্ধে বিশ্ব-বিজয়িনী প্রীতি স্বীয় পতাকা ধরিয়া দাঁড়াইয়াছেন—

সেখানে হিন্দুসমাজ ও মুসলমানসমাজ নির্ভয়ে নায়কা নায়িকা পাঠাইতে পারেন—চিরন্তন প্রেমের জয়কাহিনী সেখানে ধ্বনিত হইতেছে—ক্ষুদ্র সামাজিক ভেদবুদ্ধির স্বর তথায় পৌঁছে না। যদি বিদ্বেষের ভাব হইতে এরূপ নায়ক নায়িকার কল্পনা হয়—আমরা তাহা কখনই অনুমোদন করিব না, কিন্তু প্রতিভা যেখানে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া প্রীতির তরঙ্গে সামাজিক গণ্ডী ভাসাইয়া দেয়, সেখানে সাহিত্যে আমরা অন্যরূপ অনুশাসন মান্য করিব না।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বাঙ্গালা সাহিত্যের মাসিক বিবরণী।

সাহিত্য (৭) চরিত-শাখা।

আমার জীবন। শ্রীমতী রাসসুন্দরী লিখিত। পৌত্র-পৌত্রী-দৌহিত্রী ও তাঁহাদেরও পুত্রকন্যাগণ পরিবৃতা সর্ব্বভূতে দয়াময়ী গৃহের প্রাচীনা অধিষ্ঠাত্রীগণ বঙ্গের ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারা এক একখানি মূর্ত্তিমতী প্রত্নতত্ত্বস্বরূপিনী। তাঁহারা যদি সকলেই বাঙ্ময়ী হইয়া স্ব স্ব জীবন চরিত লিখিতেন তবে বঙ্গের বিগত রীতিনীতি আচার ব্যবহারের সুন্দর আলেখ্যমালা সঞ্চিত হইতে পারিত। "আমার জীবন" এইরূপ একখানি দুর্মূল্য আলেখ্য। লেখিকা ইহার প্রথম ভাগ তাঁহার ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম কালে রচনা করেন এবং শেষভাগ ১৩০৩ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে রচিত হয়। এখন রাসসুন্দরী ৯২ বৎসর বয়স্কা।

চৌরঙ্গীর জাদুঘরে ভারতীয় শিল্পের নিদর্শনাবলী যেমন চিত্তাকর্ষক এই বর্ষীয়সী বঙ্গমহিলার স্বলিখিত জীবনচরিতখানিও তদ্রূপ। যদিও নিজের জীবন চরিত লেখা এবং গদ্যে লেখা ও প্রকাশ করা, এ সকলই খুব আধুনিকতা—তাহা হইলেও গ্রন্থের ভিতরের কারুকার্য্যগুলি একেবারেই প্রাচীনতাময়। ইহার প্রথম পৃষ্ঠা খানি খুলিলেই যে মঙ্গলাচরণের সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং প্রতি অধ্যায়ের পূর্ব্বে যাহা ফিরিয়া ফিরিয়া দেখা দেয়, তাহা প্রাচীন সৌন্দর্য্যবত্তায় বিশেষ মনোহারী, সেগুলি অতীতের বিলুপ্ত সাহিত্য-রচনাপদ্ধতির এক একখানি সরস নমুনা, তাহাতে লেখক ও পাঠকের সহিত ভগবানের যোগে পরিচয়টি প্রগাঢ় হয়। লেখিকার ভাষা প্রাঞ্জল ও প্রাচীনতার সৌরভময় এবং যে যে ভাব ও ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুরমণীর সুসম্বৃত শীলতা জাজ্জ্বল্যমান হইয়াছে। ইহা যেন কোন্ ব্যক্তি-বিশেষের জীবন চরিত নয়,—ইহাতে হিন্দু সমাজের কন্যা বধূ ও গৃহিনী প্রভৃতিদিবসের ক্ষুদ্র, নিরাড়ম্বর ও তুচ্ছ ঘটনামালায় সামজিক আদর্শের পরিপূর্ণ শোভনতায় ফুটিয়া উঠিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বিদেশীয় ভাষায় ভাষান্তরিত হইলে আমাদের অন্তরঙ্গ প্রকৃত পরিচয়ে বিদেশীয়েরা ধন্য হইবেন।

সাহিত্য (১১) সন্দর্ভশাখা।

রামায়ণী কথা। শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত। ইহাতে বাল্মীকি রামায়ণের

সাতখানি চরিত্রচিত্র আছে।* চিত্রনে লেখক এত কুশলতা, এত সূক্ষ্ম নিরীক্ষণ-ক্ষমতা, এত প্রীতি, এত ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন যে পড়িতে পড়িতে মনে হয় গ্রন্থখানি অফুরান হউক; রামায়ণের সকল চরিত্রগুলি আধুনিক বঙ্গীয় লেখকের মনোতুলিকায় এমনি করিয়া ফুটিয়া উঠুক। দশরথ, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, কৌশল্যা, সীতা, হনুমান এই সকলেরই প্রতিকৃতিতে তিনি এমন নূতন কিছু ধরিতে পারিয়াছেন ও পাঠক সাধারণকে ধরিয়া দেখাইয়াছেন যাহা বাল্মীকির হইলেও লেখকের নিজস্ব, কারণ তাহা যদি কবির দান হইলেও মহাধনীর অজস্র হরির লুটের ন্যায় বহু বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহার ভক্ত সাধারণের চোখ এড়াইয়াছিল।

দশরথ কেন রামকে বনবাসের আজ্ঞা দিলেন? তাহা কি স্ত্রৈণতাবশতঃ? কখনই তাহা নহে। যে পিতৃসত্যপালনের মহিমায় রাম মহিমান্বিত, সেই সত্যপ্রতিজ্ঞতার প্রথম রশ্মিচ্ছটা রাজা দশরথের বৃদ্ধভালে শোভিয়াছিল, তাহার প্রতি চাহিয়া দেখিতে আমরা ভুলিয়া যাই। রামের বনগমনের পর দশরথ কৈকেয়ীকে বলিলেন "আমি পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম, আজ তোমাকে ত্যাগ করিলাম। তুমি আজ হইতে আমার স্ত্রী নহ।"

সূক্ষ্মদর্শী দীনেশ বাবু ঠিকই বলিতেছেন:—"দশরথে বরদান ব্যাপারে স্ত্রৈণতা বিশেষ দৃষ্ট হয় না। তিনি সত্যসন্ধ ছিলেন, সত্যরক্ষা করিতে যাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন, কৈকেয়ীর বর যাচ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতি রাজার সমস্ত ভালবাসা শেষ হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি অনায়াসে কৈকেয়ীকে তাড়াইয়া দিয়া রামকে রাজ্যাভিষেক করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি ঘোর স্ত্রৈণতার অপবাদ স্কন্ধে লইয়া প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবা করিয়াছিলেন।"

ভক্তিভাবে ও সস্নেহে রামের চরিত্রের কত দিক আহরণ করিয়া লেখক তাঁহাকে মানবসুলভ মানসিক ঐশ্বর্য্যও দৈন্যের সমাবেশে শোভিত দেখাইয়া আমাদের প্রিয়তর করিয়াছেন। সীতার কোমলতাগর্ভ দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা, কৌশল্যার ধর্ম্মনিষ্ঠা, অনার্য্য হনুমানের আর্য্য-সাধারণ-দুর্লভ পাণ্ডিত্য, কর্ত্তব্যবুদ্ধি, বিপৎ কালে ধৈর্য্য ও তেজ, ভরতের মৌন আর্ত্ত সৌভ্রাত্র, লক্ষ্মণের তেজ ও বিনয়, ক্রোধ ও ভক্তির দ্বন্দ্ব যেমন করিয়া লেখক খুঁটিয়া খুঁটিয়া সাজাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে কোন্ চরিত্রটির প্রতি বেশী আকর্ষণ হয় বলা শক্ত, যখন যাহার কথা পড়া যায় তখন তাহারই প্রতি

যেন মমতা বাড়ে। কিন্তু ইহা শুধু চরিত্রবর্ণনা নহে। রামায়ণ মহাকাব্যের স্বভাব বর্ণনার সৌন্দর্য্যও ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে প্রতিফলিত হইয়াছে।

গ্রন্থের একটি ত্রুটী উল্লেখযোগ্য। রামায়ণী কথা কহিতে কহিতে লেখক কোন কোন অধ্যায়ের পরিশেষে পাদরীর পদবী গ্রহণ করিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। সেখানে রসভঙ্গ হইয়াছে, সাহিত্যকলায় কারুকুশলতার ব্যত্যয় হইয়াছে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই সামান্য ত্রুটী পরিহার করিলে গ্রন্থখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। এই পুস্তকটি বালক বালিকাদের পাঠ্য হওয়ার একান্ত দাবী রাখে। গ্রন্থের ভূমিকায় পূজনীয় রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাকাব্যের যে সংজ্ঞা বিবিক্ত করিয়াছেন তাহা অভিনব ও বিষয়টীর উপর আলোকপ্রপাত বর্ষণ করিয়া তাহাকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে।

সাহিত্য (৬) উপন্যাস শাখা।

তিন বন্ধু। শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত। ইহা একখানি উপন্যাস। আরম্ভেই পাওয়া গেল—"রাজপুত্র, উজিরের পুত্র ও কোটালের পুত্র তিন বন্ধু দেশ ভ্রমণে চলিলেন।"—একটা সেকালের রূপকথার—ঘটনায় ও ভাবায় অলৌকিকতার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু নিবৃত্ত হইল না। প্রাচীন গল্পের নায়কেরা অত্যন্ত আধুনিক ভাবে চলাফেরা, কথাবার্ত্তা, খাওয়া দাওয়া করিয়া লেখকের লেখনীর অকুশলতা ব্যক্ত করিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে লেখকের বাঙ্গালায় প্রাদেশিকতার বাহুল্যে রচনাকাননটি কণ্টকিত দেখাইয়া দিল।

রাণী দুর্গাবতীর প্রাসাদে সুলেখার আখ্যায়িকা হইতে কিন্তু লেখকের সকল অকুশলতা দূর হইতে থাকিল। ঐ আখ্যায়িকাটিকে উপান্যাসখানির খিলান বলা যাইতে পারে। তিন বন্ধুর তিন প্রকার চরিত্রবৈলক্ষণ্য ও ভাবী ঘটনাবৈচিত্র্যের সূচনা এইখান হইতে। ক্রমে "দশকুমারচরিত"এর ন্যায় এই তিন বন্ধুর চরিতঘটিত উপাখ্যান গুলি এক একটি স্বতন্ত্র ছোট উপন্যাসরূপে প্রীতিপ্রদ ও কৌতুকাবহ হইয়া উঠে। লেখকের লিপিকুশলতা, কাল্পনিককে বাস্তবিকের সহজতায় পরিণত করিবার ক্ষমতা উত্তরোত্তর পরিস্ফুট হইয়া উঠে। ইহার প্রধান নায়ক রাজপুত্রকে লেখক যে ত্যাগের, যে বন্ধুপ্রীতির, যে মহত্বের শিখরাসীন করিয়াছেন তাহা অতিশয় চিত্তহারী ও লোভনীয়। সাহিত্যের চরম উদ্দেশ্য এই গ্রন্থে সাধিত হইয়াছে, নীতিবেত্তার উপদেশে যে সকল সাধনা অত্যন্ত কঠোর ও শুষ্করূপে পরিদৃশ্যমান হয়, সুতরাং মন যাহাদের অনুশীলনে স্বতশ্চালিত হয় না, ইহাতে সেগুলিকে নানা বর্ণে ভাবে রসে

সুন্দর করিয়া তুলিয়া তাহাদের লাভচেষ্টার একটি প্রলোভন জাগাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গল্পগুলি সরস এবং পাঠান্তে মনে শেষ যে ভাব স্থায়ী হয় তাহা মহত্ত্বের অভিমুখী। সুতরাং নানা দিক দিয়া পুস্তকখানি উপাদেয় হইয়াছে।

সাহিত্য (৮) চরিত-শাখা।

শঙ্করাচার্য্য। শ্রীযুক্ত শরৎ চন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত। যাঁহারা ভারতীয় ধর্ম্ম-চিন্তার নেতা, শঙ্করাচার্য্য তাঁহাদের অন্যতম। অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যে শঙ্করের একখানি জীবন চরিতও রচিত হয় নাই, ইহা একটি পরিতাপের বিষয় ছিল, শাস্ত্রী মহাশয় সেই অভাব পূরণ করিয়াছেন,—এজন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বহু বৎসর পূর্ব্বে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় ভারতী ও নব্যভারত পত্রিকায় শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে কতকগুলি ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন,—কিন্তু তাহা পুস্তকাকারে সন্নিবদ্ধ হয় নাই। শাস্ত্রীমহাশয় প্রণীত এই পুস্তক খানি বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলীর নিকট আদর লাভ করিবে—ইহাই আমাদের ধারণা। শঙ্করাচার্য্যের কালসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, নিখিল বাবু সম্প্রতি এতৎ সম্বন্ধে জগৎগুরুদিগের মঠ হইতে যে তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, কিন্তু তাহা ঐতিহাসিকগণ গণ্য করিবেন কিনা,—শাস্ত্রী মহাশয় ভূমিকায় তাহার উল্লেখমাত্র করিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্যের জন্ম শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয় সম্বন্ধেই অনেক গবেষণা চলিতে পারে। শাস্ত্রী মহাশয় প্রত্নতত্ত্বের কণ্টকিত ও দুর্গম পন্থায় একবারেই পদক্ষেপ করেন নাই তিনি সহজ ভাষায়, সরল বিশ্বাস ও প্রাণের ভক্তিতে শঙ্কর জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, উহা এইজন্য সকল সম্প্রদায়ের নিকটই উপাদেয় হইবে, ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞের জন্য এই পুস্তক রচিত হয় নাই—কিন্তু শঙ্করভক্ত শত শত হিন্দুর নিকট পুস্তকখানি আদর লাভ করিবে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

গান।

ঝুম—কাওয়ালি

আজি যত তারা তব আকাশে,
সবে মোর প্রাণ ভরি প্রকাশে।

নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া,
মোর মাঝে আজি পড়েছে টুটিয়া হে,
তব নিকুঞ্জের মঞ্জরী যত
আমারি অঙ্গে বিকাশে।

দিকে দিগন্তে যত আনন্দ
লভিয়াছে এক গভীর গন্ধ হে,
আমার চিত্তে মিলি একত্রে
তোমার মন্দিরে উছাসে।

আজি কোনোখানে কারেও না জানি,
শুনিতে না পাই আজি কারো বাণী হে,
অখিল নিশ্বাস আজি এ বক্ষে
বাঁশরীর সুরে বিলাসে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাপ্পাদিত্য।

তুঁষের আগুণ যেমন প্রথমে ধিকি, ধিকি শেষে হঠাৎ ধুধু করে জ্বলে ওঠে তেমনি গোহের পর থেকে রাজপুতদের উপর ভীলদের রাগ ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বাড়তে বাড়তে একদিন দাউ দাউ করে পাহাড়ে পাহাড়ে, বনে বনে দাবানলের মত জ্বলে উঠল। গোহের সুন্দর মুখ, অসীম দয়া, অটল সাহসের কথা মনে রেখে ভীলেরা আট-পুরুষ পর্য্যন্ত রাজপুত রাজাদের সমস্ত অত্যাচার সহ্য করেছিল; যদি কোন রাজপুত রাজা শিকারে যেতে পথের ধারে কোন ভীলের কালো গায়ে বল্লমের খোঁচায় রক্তপাত ক'রে চলে যেতেন, তবে তার মনে পড়ত—রাজা গোহ একদিন তাদেরই বংশের একজনকে বাঘের মুখ থেকে বাঁচিয়ে এনে নিজের হাতে তার বুকের রক্ত মুছে দিয়েছিলেন—যখন কোন রাজকুমার, কোন একদিন সখ্ করে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে তামাসা দেখতেন, তখন তাদের মনে পড়ত—এক বছর দুর্ভিক্ষের দিনে রাজা গোহ তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ি পরিপূর্ণ ধানের গোলা, আশ্রয়হীন দীন দুঃখী ভীল প্রজাদের জন্যে সারা বৎসর খুলে রেখেছিলেন;—ভাগ্য দোষে যুদ্ধে জয় না হলে, যেদিন কোন কাপুরুষ যুবরাজ বিশ্বাস-ঘাতক বলে ভীল সেনাপতিদের মাথা একটির পর একটি, হাতীর পায়ের তলায় চূর্ণ করে ফেলতেন, সেদিন সমস্ত ভীল-বাহিনী চক্ষের জল মুছে ভাবত, হায়রে হায় মহারাজ গোহ ছিলেন, যিনি যুদ্ধের সময় ভায়ের মত তাদের যত্ন করতেন, মায়ের মত তাদের রক্ষা করতেন, বীরের মত সকলের আগে চলতেন। এত অত্যাচার, এত অপমান! তবু সেই বিশ্বাসী ভীল প্রজাদের সরল প্রাণ আট পুরুষ

পিতা নাগাদিত্য রাজসিংহাসনে বসে ঘোর অত্যাচার আরম্ভ করলেন, যখন গরীব প্রজাদের গ্রাম জ্বালিয়ে ক্ষেত উজাড় করে তাঁর মন সন্তুষ্ট হলনা, তিনি যখন হাজার হাজার ভীলের মেয়ে দাসীর মত রাজপুতের ঘরে ঘরে বিলিয়ে দিতে লাগলেন; যখন প্রতিদিন নূতন নূতন অত্যাচার না হলে রাত্রে তাঁর ঘুম হতনা, শেষে সমস্ত ভীলের প্রাণের চেয়ে প্রিয় তাদের একমাত্র আমোদ—বনে বনে পশু শিকার, যে দিন নাগাদিত্য নূতন আইন করে একবারে বন্ধ করলেন, সেদিন তাদের ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। নাগাদিত্য ভীল প্রজাদের উপর এই নূতন আইন জারি করে সমস্ত রাত্রি সুখের স্বপ্নে কাটিয়ে সকালে উঠে দেখলেন, দিনটা বেশ মেঘলা মেঘলা, ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছে, কোন দিকে ধূলো নেই শিকারের বেশ সুবিধা—নাগাদিত্য তৎক্ষণাৎ হাতী সাজিয়ে দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন; সেদিন রাজার সঙ্গে কেবল রাজপুত! দলের পর দল বড় বড় ঘোড়ায় চড়ে রাজপুত! সামান্য ভীলের একটি ছোট ছেলে পর্য্যন্ত যাবার হুকুম নাই! শিকার দেখলে খাঁচার ভিতর চিতা-বাঘ যেমন ছট্ ফট্ করে, আজ এমন শিকারের দিনে ঘরের ভিতর বসে থেকে ভীলদের প্রাণ তেমনিই ছট্ ফট্ করছে। এই কথা ভেবে নিষ্ঠুর নাগাদিত্যের মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। মহারাজ নাগাদিত্য দল বল নিয়ে ভেরী বাজিয়ে হৈ হৈ শব্দে পর্ব্বতের শিখরে চড়লেন; বজ্রের মত ভয়ঙ্কর সেই ভেরীর আওয়াজ শুনে অন্যদিন মহিষের পাল জল ছেড়ে উঠে পালাত, বনের পাখী বাসা ছেড়ে আকাশে উঠত, হাজার হাজার হরিণ প্রাণ ভয়ে পথ ভুলে ছুটতে ছুটতে যেখানে শিকারী সেইখানেই এসে উপস্থিত হত, ঘুমন্ত সিংহ জেগে উঠত, বাঘ হাঁকার দিত; শিকারীরা কেউ বল্লম হাতে মহিষের পিছনে, কেউ খাঁড়া হাতে সিংহের সন্ধানে ছুটে চলত। কিন্তু নাগাদিত্য আজ বারবার ভেরী বাজালেন, বারবার শিকারীর দল চীৎকার করে উঠল, তবু সেই প্রকাণ্ড

বনে একটিও বাঘের গর্জ্জন, একটিও পাখীর ঝটাপট্ কিম্বা হরিণের ক্ষুরের খুট্ খাট্ শোনা গেল না! মনে হল সমস্ত পাহাড় যেন ঘুমিয়ে আছে! রাগে নাগাদিত্যের দুই চক্ষু লাল হয়ে উঠল। তিনি দল বলের দিকে ফিরে বল্লেন "ঘোড়া ফেরাও। অসন্তুষ্ট ভীল প্রজা এ বনের সমস্ত পশু অন্য পাহাড়ে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে! চল আজ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে, পশুর সমান ভীলের দল শীকার করিগে।" মহারাজার রাজহস্তী শুঁড় দুলিয়ে কান কাঁপিয়ে পাহাড়ের উপর ইদরপুরের দিকে ফিরে দাঁড়াল, তখন পিঠের উপর সোনার হাওদা জরীর বিছানা হীরের মত জ্বলে উঠল, তার চারিদিকে ঘোড়ায় চড়া রাজপুতের দুশো বল্লম সকালের আলোয় ঝক্ মক্ করতে লাগল! নাগাদিত্য হুকুম দিলেন "চালাও!" তখন কোথা থেকে গভীর গর্জ্জনে সমস্ত পাহাড় যেন ফাটিয়ে দিয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো বাঘ যেন একজন ভীল সেনাপতির মত সেই অত্যাচারী রাজার পথ আগ্‌লে পাহাড়ের সুঁড়ি পথে রাজ হস্তীর সম্মুখে এসে দাঁড়াল! নাগাদিত্য মহা আনন্দে ডান হাতে বল্লম নিয়ে হাতীর পিঠে ঝুঁকে বসলেন। কিন্তু তাঁর হাতের বল্লম হাতেই রইল; বনের অন্ধকার থেকে কালো চামরে সাজান প্রকাণ্ড একটা তীর তাঁর বুকের একদিক থেকে আর একদিক ফাটিয়ে দিয়ে শন্ শন্ শব্দে বেরিয়ে গেল। অত্যাচারী নাগাদিত্য ভীলদের হাতে প্রাণ হারালেন। তারপর চারিদিক থেকে হাজার হাজার কালো বাঘের মত কালো কালো ভীল, ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে রাজপুতের রক্তে পাহাড়ের গা রাঙ্গা করে তুল্লে। একজনও রাজপুত বেঁচে রইল না কেবল সোনার সাজ পরা মহারাজ নাগাদিত্যের কালো একটা পাহাড়ী ঘোড়া অন্ধকার সমুদ্রের সমান ভীল সৈন্যের মাঝ দিয়ে ঝড়ের মত রাজ বাড়ীর দিকে বেরিয়ে গেল। রাজমহিষী তখন ইদরপুরে কেল্লার ছাদে [illegible] বেড়াচ্ছিলেন

আর এক একবার যে পাহাড়ে মহারাজ শিকারে গিয়েছেন সেই দিকে চেয়ে দেখছিলেন। এক সময়ে হঠাৎ পাহাড়ের দিকে একটী গোলমাল উঠল তারপর রাণী দেখলেন সেই পাহাড়ে রাস্তায় বনের অন্ধকার থেকে মহারাজার কালো ঘোড়াটী তীরের মত ছুটে বেরিয়ে ঝড়ের মত কেল্লার দিকে ছুটে আসতে লাগল, পিছনে তার শত শত ভীল, কারো হাতে বল্লম কারো হাতে বা তীর ধনুক—মহারাণী দেখলেন কালো ঘোড়ার মুখথেকে সাদা ফেণা চারিদিকে মুক্তোর মত ঝড়ে পড়ছে, তার বুকের মাঝ থেকে রক্তের ধারা রাস্তার ধুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে, তারপর দেখলেন আগুনের মত একটী তীর তার কালোচুলের ভিতর দিয়ে ধনুকের মত তার সুন্দর বাঁকা ঘাড় সজোরে বিঁধে ঘোড়াটাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেল্লে, রাজার ঘোড়া কেল্লার দিকে মুখ ফিরিয়ে ধূলার উপর ধড় ফড় করতে লাগল, ঠিক সেই সময় মহারাণীর মাথার উপর দিয়ে একটা বল্লম শন্ শন্ শব্দে কেল্লার ছাতের উপর এসে পড়ল; রাজমহিষী ঘুমন্ত বাপ্পাকে ওড়নার আড়ালে ঢেকে তাড়াতাড়ি উপর থেকে নেমে এলেন, চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনি আর যুদ্ধের চীৎকার উঠল, সূর্য্যদেব মালিয়া পাহাড়ের পশ্চিম পারে অস্ত গেলেন। সেরাত্রি কি ভয়ানক রাত্রি? সেই মালিয়া পাহাড়ের উপর অসংখ্য ভীল, তার মাঝে গুটিকতক রাজপুত্র প্রাণপণে যুদ্ধ করতে লাগলেন আর অন্ধকার রাজপুরে নাগাদিত্যের বিধবা মহিষি পাঁচ বৎসরের রাজকুমার বাপ্পাকে বুকে নিয়ে নির্জ্জন ঘরে বসে রইলেন; তিনি কত বার কত দাসীর নাম ধরে ডাকলেন, কারো সাড়া শব্দ নাই! মহারাজের খবর জানবার জন্য তিনি কতবার কত প্রহরীকে চীৎকার করে ডাকলেন কিন্তু তারা সকলেই যুদ্ধে ব্যস্ত, মহারাণীর ঘরের ভিতর দিয়ে ছুটে গেল তবু তাঁর কথায় কর্ণপাতও করলে না! রাণী তখন আকুল হৃদয়ে কোলের বাপ্পাকে ছোট একখানি উটের কম্বলে ঢেকে নিয়ে

অন্দর মহলের চন্দন কাঠের প্রকাণ্ড দরজা সোনার চাবি দিয়ে খুলে বাইরে উঁকি মেরে দেখলেন রাত্রি অন্ধকার, রাজপুরী অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান তার মাঝে গজদন্তের কায করা বড় বড় দরজা খোলা হাঁ হাঁ করছে, অত বড় রাজপুরীতে যেন জনমানব নাই! মহারাণী অবাক হয়ে এক হাতে বাপ্পাকে বুকে ধরে আর হাতে সোনার চাবির গোছা নিয়ে খোলা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল—চামড়ার জুতোপরা রাজপুত-বীরের মচ্ মচ্ পায়ের শব্দ নয়! রূপার বাঁকি পরা রাজদাসীর ঝিনি ঝিনি পায়ের শব্দ নয়! কাঠের খড়ম পরা পঁচাশি বৎসরের বুড়ো রাজ-পুরোহিতের খটাখট্ পায়ের শব্দ নয়, এ যেন চোরের মত, সাপের মত খুস্ খাস্ খিট্ খাট্ পায়ের শব্দ! মহারাণী ভয় পেলেন; দেখতে দেখতে অসুরের মত একজন ভীল সর্দ্দার তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হল মহারাণী জিজ্ঞাসা করলেন "কে তুই কি চাস?" ভীল সর্দ্দার বাঘের মত গর্জ্জন করে বল্লে "জানিসনে আমি কে? আমি সেই দুঃখী ভীল যার মেয়েকে তোর মহারাজা দাসীর মত চিতোরের রাজাকে দিয়ে দিয়েছে। আজ কি সুখের দিন এই হাতে নাগাদিত্যের বুকে বল্লম বসিয়েছি, আজ এই হাতে তার ছেলে সুদ্ধ মহারাণীকে দাসীর মত বেঁধে নিয়ে যাব।" মহারাণীর পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত কেঁপে উঠল; তিনি —ভগবান রক্ষা কর—বলে সেই নিরেট সোনার বড় বড় চাবি গোছা সজোরে ভীল সর্দ্দারের কপালে ছুঁড়ে মারলেন, দুরন্ত ভীল "মারে" বলে চীৎকার করে ঘুরে পড়ল, মহারাণী কচি বাপ্পাকে বুকে ধরে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন; তাঁর প্রাণের আধখানা মহারাজ নাগাদিত্যের জন্য হাহাকার করতে লাগল আর আধখানা এই মহাবিপদে প্রাণের বাপ্পাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল রাণী পথ চল্‌তে লাগলেন—পাথরে পা কেটে গেল, শীতে হাত জ

গেল, অন্ধকারে বার বার পথ ভুল হতে লাগল তবু রাণী পথ চল্লেন—কতদূর কতদূর! পাহাড়ের পথ কতদূর কোথায় চলে গেছে, তার যেন শেষ নাই! রাণী কত পথ চল্লেন তবু সে পথের শেষ নাই; ক্রমে ভোর হয়ে গেল, রাস্তার আশে পাশে বীরনগরের দু একটী ব্রাহ্মণের বাড়ি দেখা দিতে লাগল; পাহাড়ি হাওয়া বরফের মত ঠাণ্ডা, পাখিরাও তখন জাগেনি এমন সময় নাগাদিত্যের মহিষী রাজপুত্র বাপ্পাকে কোলে নিয়ে সেই বীরনগরের ব্রাহ্মণী কমলাবতীর বাড়ির দরজায় ঘা দিলেন। আটপুরুষ আগে এক দিন, শিলাদিত্যের মহিষী পুষ্পবতী প্রাণের কুমার গোহকে এই বীরনগরের কমলাবতীর হাতে সঁপে গিয়েছিলেন আর আজ আবার কত কাল পরে সেই কমলাবতীর নাতির নাতি বৃদ্ধ রাজপুরোহিতের হাতে গোহর বংশের গিহ্লোট রাজকুমার বাপ্পাকে সঁপে দিয়ে নাগাদিত্যের মহিষী চিতার আগুণে ঝাঁপ দিলেন। সকালে বৃদ্ধ পুরোহিত রাজপুত্রকে আশ্রয় দিলেন আর সেইদিন সন্ধ্যার সময় একটি ভীলের মেয়ে ছোট দুটি ছেলে কোলে তাঁরই ঘরে আশ্রয় নিলে; এদেরই পূর্ব্বপুরুষ সব প্রথমে নিজের আঙ্গুল কেটে রাজপুত গোহের কপালে রক্তের রাজতিলক টেনে দিয়েছিল, আজ রাজপুত রাজার সঙ্গে তাদেরও সর্ব্বনাশ হয়ে গেল; বিদ্রোহী ভীলরা তাদেরও ঘর দুয়োর জ্বালিয়ে দিয়ে তাদের তিনটিকে পাহাড়ের উপর থেকে দূর করে দিলে। রাজপুরোহিত সেই তিনটি ভীল আর রাজকুমার বাপ্পাকে নিয়ে বীরনগর ছেড়ে ভাণ্ডীরের কেল্লায় যদুবংশের আর এক ভীলের রাজত্বে কিছু দিন কাটালেন; কিন্তু সেখানেও ভীলরাজা, সেখানেও ভয় ছিল—কোন্ দিন কোন্ ভীল মা-হারা বাপ্পাকে খুন্ করে—ব্রাহ্মণ যে মহারাণীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন বিপদে সম্পদে অনাথ বাপ্পাকে রক্ষা করবেন—তিনি একেবারে ভীলরাজত্ব ছেড়ে তাদের কটিকে নিয়ে নগেন্দ্রনগরে চলে

গেলেন। একদিকে সমুদ্রের তিনটে ঢেউয়ের মত ত্রিকূট পাহাড় আর একদিকে মেঘের মত অন্ধকার পরাশর অরণ্য, মাঝখানে নগেন্দ্র নগর; কাছাকাছি শোলাঙ্কি বংশের একজন রাজপুত রাজার রাজবাড়ি। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সেই নগেন্দ্রনগরে ব্রাহ্মণ পাড়ার গা ঘেঁসে ঘর বাঁধলেন। সেই ভীলের মেয়ে তাঁর ঘরের সমস্ত কায করতে লাগল আর রাজপুত্র বাপ্পা সেই দুটি ভাই ভীল বালিয় আর দেবকে নিয়ে মাঠে মাঠে বনে বনে গরু চরিয়ে রাখাল বালকদের সঙ্গে রাখালের মত খেলে বেড়াতে লাগলেন। রাজপুরোহিত কারো কাছে প্রকাশ করলেন না যে বাপ্পা রাজার ছেলে, কেবল একটি তামার কবচে আগাগোড়া সমস্ত পরিচয় নিজের হাতে লিখে বাপ্পার গলায় বেঁধে দিলেন; তাঁর মনে বড় ভয় ছিল পাছে কোন ভীল বাপ্পার সন্ধান পায়। ক্রমে বাপ্পা যখন বড় হয়ে উঠলেন, যখন মাঠে মাঠে খোলা হাওয়ায় ছুটোছুটি করে, পাহাড়ে পাহাড়ে ওঠা নামাতে রাজপুত্র বাপ্পার সুন্দর শরীর দিন দিন লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল, যখন তিনি ক্ষেপা মোষ এক হাতে ঠেকিয়ে রাখতে পারতেন, সমস্ত রাখাল বালক যখন রাজপুত্র বলে না জেনেও রাজার মত বাপ্পাকে ভয় ভক্তি সেবা করতে লাগল তখন ব্রাহ্মণ অনেকটা নিশ্চিন্ত হলেন, তিনি তখন বাপ্পার শরীরের সঙ্গে মনকেও গড়ে তুলতে লাগলেন; তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় একলা ঘরে বাপ্পার কাছে বসে সেই মালিয়া পাহাড়ের গল্প, সেই ভীল বিদ্রোহের গল্প সেই রাণী পুষ্পবতী মহারাজ শীলাদিত্য রাজকুমার গোহ তাঁর প্রিয় বন্ধু মাণ্ডলিকের কথা—একে একে বলতে লাগলেন; শুনতে শুনতে কখন বাপ্পার চোখে জল আসত কখন বা রাগে মুখ লাল হয়ে উঠত কখন ভয়ে প্রাণ কাঁপত; বাপ্পা সারা রাত্রি কখন সূর্য্যের রথ, কখন পাহাড়ে ভীলের যুদ্ধ স্বপ্নে দেখে জেগে উঠতেন, মনে ভাবতেন—আমি কবে হয়তো রাজা হব লড়াই করব। এমনি ভাবে দিন কাটছিল, সে

সময় একদিন শ্রাবণ মাসে নতুন নতুন ঘাসের উপর গোরু গুলিকে চরতে দিয়ে বনের পথে বাপ্পাদিত্য একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন; সেদিন ঝুলন পর্ব্ব, রাজপুতদের বড় আনন্দের দিন; সকাল না হতে দলে দলে রাখাল নতুন কাপড় পোরে, কেউ ছোট ভাই বোনকে কোলে করে কেউ বা দৈয়ের ভার কাঁধে নিয়ে একজন তামাশা দেখতে অন্য জন বা পয়সা করতে নগেন্দ্র নগরের রাজপুত রাজার বাড়ির দিকে মেলা দেখতে ছুটল। বাপ্পা প্রকাণ্ড বনে একা রইলেন, তাঁর প্রাণের বন্ধু দুটি ভাই ভীল বালিয় আর দেব দিদির হাত ধরে এই আনন্দের দিনে বাপ্পাকে কতবার ডাকলে "ভাই তুই কি রাজবাড়ি যাবি?" বাপ্পা শুধু ঘাড় নাড়লেন "না যাবনা।" হয়ত তাঁর মনে হয়েছিল—আমার ভাই নেই, বোন নেই, মা নেই, আমি কার হাত ধরে কাকে নিয়ে আজ কিসের আনন্দে মেলা দেখতে যাব?--কিন্তু যখন বালিয় আর দেব ভীলনী দিদির সঙ্গে সঙ্গে হাসতে হাসতে চলে গেল, যখন সকালের রোদ মেঘের আড়ালে ঢেকে গেল, বাপ্পার একটি মাত্র গাই চরতে চরতে যখন মাঠের পর মাঠ পার হয়ে বনের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল, যখন বনে আর সাড়া শব্দ নেই কেবল মাঝে মাঝে ঝিঁঝিঁর ঝিনি ঝিনি পাতার ঝুরু ঝুরু, সেই সময় বাপ্পার বড়ই একা একা ঠেকতে লাগল; তিনি উদাস প্রাণে ভীলনী দিদির মুখে শোনা ভীল রাজত্বের একটি পাহাড়ী গান ছোট একটি বাঁশের বাঁশীতে বাজাতে লাগলেন, সে গানের কথা বোঝা গেলনা কেবল ঘুমপাড়ানি গানের মত তার বুনো সুরটা মেঘলা দিনে বাদলার হাওয়ায় মিশে স্বপ্নের মত বাপ্পার চারিদিকে ভেসে বেড়াতে লাগল; আজ যেন তাঁর মনে পড়তে লাগল—ঐ পশ্চিম দিকে যেখানে মেঘের কোলে সূর্য্যের আলো ঝিকিমিকি জলছে যেখানে কালো কালো মেঘ পাথরের মত জমাট বেঁধে রয়েছে সেইখানে সেই অন্ধকার আকাশের নীচে তাঁদের যেন বাড়ি ছিল, সেই বাড়ির

ছাতে চাঁদের আলোয় তিনি মায়ের হাত ধরে বেড়িয়ে বেড়াতেন, সে বাড়ী কি সুন্দর! সে চাঁদের কি চমৎকার আলো! মায়ের কেমন হাসি মুখ! সেখানে সবুজ ঘাসে হরিণ-ছানা চরে বেড়াত, গাছের উপর টিয়ে পাখী উড়ে বসত, পাহাড়ের গায়ে ফুলের গোছা ফুটে থাকত, তাদের কি সুন্দর রং, কি সুন্দর খেলা!—বাপ্পা সজল নয়নে মেঘের দিকে চেয়ে চেয়ে বাঁশের বাঁশীতে ভালের গান বাজাতে লাগলেন; বাঁশীর করুণ সুর কেঁদে কেঁদে কেঁপে কেঁপে বন থেকে বনে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সেই বনের একধারে আজ ঝুলন পূর্ণিমায় আনন্দের দিনে শোলাঙ্কিবংশের রাজার মেয়ে সখীদের নিয়ে খেলে বেড়াচ্ছিলেন। রাজকুমারী বল্লেন "শুনেছিস্ ভাই বনের ভিতর রাখাল রাজা বাঁশী বাজাচ্ছে!" সখীরা বল্লে "আয় ভাই সকলে মিলে চাঁপাগাছে দোলা খাটিয়ে ঝুলনো খেলা খেলি আয়!" কিন্তু দোলা খাটাবার দড়ি নাই যে? সেই বৃন্দাবনের মত গহন বন, সেই বাদলা দিনের গুরু গর্জ্জন, সেই দূর বনে রাখালরাজের মধুর বাঁশী, সেই সখীদের মাঝে শ্রীরাধার সমান রূপবতী রাজনন্দিনী, সবি আজ যুগ যুগান্তর আগেকার বৃন্দাবনে কৃষ্ণ রাধার প্রথম ঝুলনের মত! এমন দিন কি ঝুলনা বাঁধার একগাছি দড়ির অভাবে বৃথা যাবে? রাজনন্দিনী গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন, আবার সেই বাঁশী পাখীর গানের মত বনের এ পার থেকে ওপার আনন্দের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বেজে উঠল। রাজকুমারী তখন হীরে জড়ান হাতের বালা সখীর হাতে দিয়ে বল্লেন "যা ভাই এই বালার বদলে ঐ রাখালের কাছ থেকে এক গাছা দড়ি নিয়ে আয়," রাজকুমারীর সখী সেই বালা হাতে বাপ্পার কাছে এসে বল্লে "এই বালার বদলে রাজকুমারীকে একগাছা দড়ি দিতে পার?" হাসতে হাসতে বাপ্পা বল্লেন "পারি যদি রাজকুমারী আমায় বিয়ে করেন।" সেইদিন সেই নির্জ্জন বনে, রাজকুমারীর হাতে সেই হীরের বালা পরিয়ে

দিয়ে রাজকুমার বাপ্পা চাঁপাগাছে ঝুলনা বেঁধে দিয়ে রাজকন্যার হাত ধরে বসলেন। চারিদিকে যত সখী দোলার উপর বরকোনেকে ঘিরে ঘিরে ঝুলনের গান গেয়ে ফিরতে লাগল—'আজ কি আনন্দ, আজ কি আনন্দ!'—খেলা শেষ হল, সন্ধ্যা হল, রাজকুমারী বনের রাখালকে বিয়ে করে রাজবাড়িতে ফিরে গেলেন। আর বাপ্পা ফুলে ফুলে প্রফুল্ল চাঁপার তলায় বসে ঝুলন পূর্ণিমার প্রকাণ্ড চাঁদের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—আজ কি আনন্দ, আজ কি আনন্দ!—হঠাৎ একটুখানি পূবের হাওয়া গাছের পাতা কাঁপিয়ে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে হুহু শব্দে পশ্চিমদিকে চলে গেল, সেই সঙ্গে বড় বড় দুটি বৃষ্টির ফোঁটা টুপ্ টাপ্ করে চাঁপা গাছের সবুজ পাতায় ঝরে পড়ল; বাপ্পা আকাশের দিকে চেয়ে দেখলেন—পশ্চিমদিক থেকে একখানা কালো মেঘ ক্রমশঃ পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে গুরু গুরু গর্জ্জন আর ঝিকিমিকি বিদ্যুৎ হানছে—বাপ্পা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, মনে পড়ল ঘরে ফিরতে হবে! দুধের মত সাদা তাঁর ধবলি গাই বনের মাঝে ছাড়া আছে—তিনি চাঁপাগাছ থেকে ছাঁদন দড়ি খুলে নিয়ে ধবলি গাইটির সন্ধানে চল্লেন। তখন চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে মাঝে গাছে গাছে রাশি রাশি জোনাকি পোকা হীরের মত ঝক্ ঝক্ করছে, আর জায়গায় জায়গায় ভিজে মাটির নরম গন্ধ বনস্থল পরিপূর্ণ করেছে; বাপ্পা সেই অন্ধকার বনের পথে পথে ধবলির সন্ধানে ফিরতে লাগলেন। হঠাৎ এক জায়গায় ঘন বেত বনের আড়ালে বাপ্পা দেখলেন—এক তেজোময় ঋষি ধ্যানে বসে আছেন, ঠিক তাঁর সম্মুখে মহাদেবের নন্দের মত বাপ্পার ধবলি গাই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আর সেই সাদা গাইয়ের গাঢ় দুধ সুধার মত একটি শ্বেত পাথরের শিবের মাথায় আপনা আপনি ঝরে পড়ছে। বাপ্পা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্রমে ধ্যানভঙ্গে মহর্ষির দুটি চোখ সকাল বেলায় পদ্মের পাপড়ির মত ধীরে ধীরে খুলে গেল, মহর্ষি

মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন
তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বল্লেন, "শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত
তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও
তোমার ধবলি দুধের ধারায় আজ আমাকে বড়ই তুষ্ট করেছে; আ:
আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষ দিনে তোমায় আর কি দেব
এই ভগবতী ভবাণীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর, এই খাঁড়া পাহাড়
বিদীর্ণ করে. এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়। এই দুটি তুমি ল:
আর বৎস ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেত পাথরের মূর্ত্তিটি তুমি স(
রেখ, সর্ব্বদা এর পূজা করবে। আজ থেকে তোমার নাম হল-
একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নাম নিঃ
সিংহাসনে বসবে।" তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়
পৈতা জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে দেখতে তঁ
পবিত্র শরীর আগুণের মত ধূধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা—কোম
খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের পাথরের মূর্ত্তি ধরে ধব
গাইয়ের পিছনে পিছনে ফিরে চল্লেন, মেঘের গুরু গুরু দেবতার দুন্দু
মত সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল। তখন ভোর হয়েছে, ে
শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে. বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘ
ফিরলেন। কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্র নগর ছেড়ে যেতে হ
ঝুলন পূর্ণিমায় খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ ে
রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপ
হলেন, সেইদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্র নগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রা
রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন আগেই নাকি কোন বিদে
সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে, আজ রাজার গুপ্তচর (
বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে. রাজা তার মাথা আনতে হু
দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাব

ভাবনায় সমস্ত রাত কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বল্লেন, "পিতা আমায় বিদায় দাও, আমিতো এখন বড় হয়েছি! আমার জন্য তোমরা কেন বিপদে পড়? ব্রাহ্মণ বল্লেন "বৎস তুমি জাননা তুমি কে? তুমি রাজপুত্র তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন, আমি আজ এই অল্প বয়সে একা ভিখারীর মত তোমাকে কেমন করে বিদায় করব?" বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বল্লেন "পিতা বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী।" ব্রাহ্মণ তখন মহা আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কল্লেন "যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে রাজারই মত ধনুঃশর হাতে পেয়েছ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করছি পৃথিবীর রাজা হও, যদি কেউ তোমার পরিচয় চায় তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন্ পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন! যাও বৎস সুখে থাক!" ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীলনী দিদির কাছে বিদায় হতে চল্লেন, কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হলনা। অনেক কাঁদা কাটার পর ভীলনী দিদি বল্লেন "বাপ্পারে যদি যাবি তবে তোর দুটি ভাই বালিয় দেবকে সাথে নে? ওরে বাপ্পা তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন কেমন করে যে?" তারপর তিন জনের হাতে তিন তিন খানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনী দিদি তিনটি ভাইকে বিদায় কল্লেন। বাপ্পা বালিয় দেবকে সঙ্গে নিয়ে গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড় বড় পাথরে থামের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজাগর স্থির হয়ে পড়ে, কোথাও বাঘের গর্জ্জন, কোথাও বা

মহাদেবকে প্রণাম করে এক অঞ্জলি দুধের ধারা পান করলেন। তারপর বাপ্পার দিকে ফিরে বল্লেন, "শোনো বৎস, আমি মহর্ষি হারীত, তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি, তুমি দীর্ঘজীবী হও, পৃথিবীর রাজা হও; তোমার ধবলি দুধের ধারায় আজ আমাকে বড়ই তুষ্ট করেছে; আজ আমার মহাপ্রস্থানের দিন, এই শেষ দিনে তোমায় আর কি দেব? এই ভগবতী ভবাণীর খাঁড়া, এই অক্ষয় ধনুঃশর, এই খাঁড়া পাহাড়ও বিদীর্ণ করে, এই ধনুঃশর পৃথিবী জয় করে দেয়। এই দুটি তুমি লও, আর বৎস ভগবান একলিঙ্গের এই শ্বেত পাথরের মূর্ত্তিটি তুমি সঙ্গে রেখ, সর্ব্বদা এর পূজা করবে। আজ থেকে তোমার নাম হল— একলিঙ্গকা দেওয়ান। তোমার বংশে যত রাজা, এই নাম নিয়েই সিংহাসনে বসবে।" তারপর নিজের হাতে বাপ্পার গলায় চামড়ার পৈতা জড়িয়ে দিয়ে মহর্ষি সমাধিতে বসলেন। দেখতে দেখতে তাঁর পবিত্র শরীর আগুণের মত ধূধূ করে জ্বলে গেল। বাপ্পা—কোমরে খাঁড়া, হাতে ধনুঃশর, মাথায় একলিঙ্গের পাথরের মূর্ত্তি ধরে ধবলি গাইয়ের পিছনে পিছনে ফিরে চল্লেন, মেঘের গুরু গুরু দেবতার দুন্দুভির মত সমস্ত আকাশ জুড়ে বাজতে লাগল। তখন ভোর হয়েছে, মেলা শেষে মলিন মুখে যে যার ঘরে ফিরছে, বাপ্পা সেই যাত্রীদের সঙ্গে ঘরে ফিরলেন। কিছুদিন পরেই বাপ্পাকে নগেন্দ্র নগর ছেড়ে যেতে হল। ঝুলন পূর্ণিমায় খেলাচ্ছলে দুজনে বিয়ে হবার পর বিদেশ থেকে রাজকুমারীর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এক ব্রাহ্মণ রাজসভায় উপস্থিত হলেন, সেইদিন সন্ধ্যাবেলা নগেন্দ্র নগরে রাষ্ট্র হয়ে গেল যে ব্রাহ্মণ রাজকন্যার হাত দেখে গুণে বলেছেন আগেই নাকি কোন বিদেশীর সঙ্গে রাজকুমারীর বিয়ে হয়ে গেছে, আজ রাজার গুপ্তচর সেই বিদেশীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, রাজা তার মাথা আনতে হুকুম দিয়েছেন। কথাটা শুনে বাপ্পার মন অস্থির হয়ে উঠল, ভাবনায়

ভাবনায় সমস্ত রাত কাটিয়ে ভোরে উঠে তিনি দেশ ছেড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। যাবার সময় বাপ্পা তাঁর পালক পিতা পঁচাশি বৎসরের সেই রাজপুরোহিতের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে বল্লেন, "পিতা আমায় বিদায় দাও, আমিতো এখন বড় হয়েছি! আমার জন্য তোমরা কেন বিপদে পড়?" ব্রাহ্মণ বল্লেন "বৎস তুমি জাননা তুমি কে? তুমি রাজপুত্র তোমার মা তোমাকে আমার হাতে সঁপে গেছেন, আমি আজ এই অল্প বয়সে একা ভিখারীর মত তোমাকে কেমন করে বিদায় করব?" বাপ্পা তখন ভগবতীর সেই খাঁড়া আর অক্ষয় ধনুঃশর দেখিয়ে বল্লেন "পিতা বিদেশে এরাই আমার সহায়, আর আছেন একলিঙ্গজী।" ব্রাহ্মণ তখন মহা আনন্দে দুই হাত তুলে আশীর্ব্বাদ কল্লেন "যাও বৎস, তুমি রাজার ছেলে রাজারই মত ধনুঃশর হাতে পেয়েছ! আমি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করছি পৃথিবীর রাজা হও, যদি কেউ তোমার পরিচয় চায় তবে গলার কবচ খুলে দেখিয়ে দিও কোন্ পবিত্র বংশে তোমার জন্ম, তোমার পূর্ব্বপুরুষেরা কোন্ রাজসিংহাসন উজ্জ্বল করে গেছেন! যাও বৎস সুখে থাক!" ব্রাহ্মণের কাছে বিদায় হয়ে বাপ্পা ভীলনী দিদির কাছে বিদায় হতে চল্লেন, কিন্তু সেখানে বিদায় নেওয়া ততটা সহজ হলনা। অনেক কাঁদা কাটার পর ভীলনী দিদি বল্লেন "বাপ্পারে যদি যাবি তবে তোর দুটি ভাই বালিয় দেবকে সাথে নে? ওরে বাপ্পা তোকে একা ছেড়ে দিতে প্রাণ আমার কেমন কেমন করে যে?" তারপর তিন জনের হাতে তিন তিন খানি পোড়া রুটি দিয়ে ভীলনী দিদি তিনটি ভাইকে বিদায় কল্লেন। বাপ্পা বালিয় দেবকে সঙ্গে নিয়ে গহন বনে চলে গেলেন। সেখানে বড় বড় পাথরে থামের মত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি আকাশের দিকে ঠেলে উঠেছে, কোথাও ময়ূর ময়ূরী বন আলো করে উড়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও আস্ত ছাগল গিলে প্রকাণ্ড একটা অজাগর স্থির হয়ে পড়ে, কোথাও বাঘের গর্জ্জন, কোথাও বা

পাখির গান; এক জায়গায় সবুজ ঘাষে সোনার রোদ, আর জায়গায় কাজলের সমান নীল অন্ধকার! বাপ্পা বালিয় দেবকে সঙ্গে নিয়ে কখন বনের মনোহর শোভা দেখতে দেখতে কখন মহা মহা বিপদের মাঝখান দিয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া হাতে নির্ভয়ে চল্লেন। সেই প্রকাণ্ড পরাশর অরণ্য পার হতে তাঁর তিন দিন তিন রাত্রি কেটে গেল; রাজপুত্র বাপ্পা সেই তিন দিন তিন খানি পোড়া রুটী খেয়ে কাটিয়ে দিলেন। তারপর গ্রামের পর গ্রাম, দেশের পর বিদেশ পার হয়ে কত বর্ষা, কত শীত পথে পথে কাটিয়ে বাপ্পা মেবারে মৌর্য্যবংশীয় রাজা মানের রাজধানী চিতোর নগরে উপস্থিত হলেন। সেখানে তখন মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের মহা আয়োজন হচ্ছে; হাতির পিঠে, উটের উপরে গোলা গুলি, চাল, ডাল, তাম্বু, কানাত, গোরুর গাড়িতে অস্ত্র শস্ত্র, খাবার দাবার, বড় বড় জালায় খাবার জল, রাঁধবার ঘি তোলা হচ্ছে। রাস্তায় রাস্তায় রাজপুত সৈন্য মাথায় পাগড়ি হাতেবল্লম ঘুরে বেড়াচ্ছে, চারিদিকে রাজার চর মুসলমানের সন্ধানে সন্ধানে ফিরছে; মহারাজা মান নিজে সামন্ত রাজাদের নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন দেখে বেড়াচ্ছেন, চারিদিকে হৈ হৈ পড়ে গেছে। এত গোলমাল এত লোকজন এমন প্রকাণ্ড নগর এত বড় বড় পাথরের বাড়ি বাপ্পা এ পর্য্যন্ত কখন দেখেন নি! নগেন্দ্র নগরে বাড়ি ছিল বটে কিন্তু তার মাটির দেওয়াল! সেখানেও মন্দির ছিল কিন্তু সে কত ছোট! বাপ্পা আশ্চর্য্য হয়ে রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন, বালিয় আর দেব বড় বড় হাতি দেখে অবাক হয়ে হাঁ করে রইল। সেই সময় রাজা মান ঘোড়ায় চড়ে সেই রাস্তায় উপস্থিত হলেন—সাদা ঘোড়ার সোনার সাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে, মাথায় রাজছত্র ঝলমল করছে, দুইদিকে দুইজন ময়ূর পাখার চামর ঢোলাচ্ছে! বাপ্পা ভাবলেন—রাজার সঙ্গে দেখা করবার এই ঠিক সময়—তিনি তৎক্ষণ া

বালিয়দেবের হাত ধরে রাস্তার মাঝে উপস্থিত হয়ে ভগবতী ভবানীর খাঁড়া কপালে স্পর্শ করে মহারাজকে প্রণাম করলেন; রাজা মান জিজ্ঞাসা করলেন "কে তুমি কি চাও?" বাপ্পা বল্লেন "আমি রাজপুত রাজার ছেলে আপনার আশ্রয়ে রাজার মত থাকতে চাই?"—"এই ভিখারী আবার রাজার ছেলে?"—চারিদিকে বড় বড় সর্দ্দার মুখ টিপে হাসতে লাগলেন, কিন্তু রাজা মান বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর, সুন্দর মুখ, অক্ষয় ধনুঃশর আর সেই ভবানীর খাঁড়া দেখেই বুঝেছিলেন—এ কোন ভাগ্যবান, ভগবান কৃপা করে এই মুসলমান-যুদ্ধের সময় এই বীর পুরুষকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন—মানরাজা তৎক্ষণাৎ নিজের জরীর শাল বাপ্পার গায়ে পরিয়ে দিয়ে একটা কালো ঘোড়া বাপ্পার জন্যে আনিয়ে দিলেন; বাপ্পা বল্লেন "মহারাজ আমার ভীল ভাইদের জন্যে ঘোড়া আনিয়ে দিন?" তারপর বালিয় দেবকে ঘোড়ায় চড়িয়ে বাপ্পা সেই কালো ঘোড়ায় উঠে বসলেন—সমস্ত সৈন্য সামন্ত সেনাপতির মাথার উপর বাপ্পার প্রকাণ্ড শরীর সমুদ্রের মাঝে পাহাড়ের মত প্রায় আধখানা জেগে রইল, তখন রাস্তার লোক দেখে বলতে লাগল—হাঁ বীর বটে! যেমন চেহারা তেমনি শরীর! চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল, কেবল রাজার যত সেনাপতি মাথার উপরে রাজবেশ মোড়া সেই ভিখারীকে দেখে মান রাজার উপর মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেন। রাজা দিন দিন বাপ্পাকে যতই সুনয়নে দেখতে লাগলেন, যতই তাকে আদর অভ্যর্থনা করতে লাগলেন, ততই সেনাপতিদের মন হিংসার আগুনে পুড়তে লাগল। ক্রমে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধের দিন উপস্থিত হল, সেইদিন রাজসভায় দেশ বিদেশের যত সামন্ত রাজা, যত বুড়ো বুড়ো সেনাপতি একমত হয়ে মান রাজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্লেন—"মহারাজ! আমরা অনেক সময় অনেক যুদ্ধে তোমার জন্যে প্রাণ দিতে গিয়েছি, সে কেবল তুমি আমাদের ভালবাসতে বলে, আমাদের বিশ্বাস

করতে বলে ; যদি মহারাজ আজ তুমি সেই ভালবাসা ভুলে একজন পথের ভিখারাকে আমাদের সকলের উপরে বসালে, বাপ্পা আজ যদি তোমার প্রাণের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে বিশ্বাসী হল—তবে আমাদের আর কায কি ? বাপ্‌পাকেই এই মুসলমান যুদ্ধে সেনাপতি কর ; আমাদের বীরত্ব তো অনেকবার দেখা আছে, এবার নতুন সেনাপতি কেমন করে যুদ্ধ করেন দেখা যাক !” মহারাজ মান চিরবিশ্বাসী রাজভক্ত সর্দ্দারদের মুখে হঠাৎ এই নিষ্ঠুর কথা শুনে বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন, তাঁর আর কথা বলবার শক্তি থাকল না। তখন সেই প্রকাণ্ড রাজসভায় সেই বিদ্রোহী সর্দ্দারদের মধ্যস্থলে পোনের বৎসরের বীর বালক বাপ্পাদিত্য উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন, “শুনুন মহারাজ ! আজ রাজস্থানের প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা রাজসভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন—এ ঘোর বিপদের সময় বাপ্পাই এবার সেনাপতি হয়ে যুদ্ধ চালান ; তবে তাই হোক !” রাজা মান হতাশের মত চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর ধীরে ধীরে বল্লেন “তবে তাই হোক”। তারপর একদিক দিয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় মান রাজা চাকরের কাঁধে ভর দিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন, আর একদিক দিয়ে বাপ্পাদিত্য সৈন্য সাজাতে বাহির হলেন। বিদ্রোহী সর্দ্দারদের মাথা হেঁট হল, তাঁরা মনে ভেবেছিলেন যে পোনের বৎসরের বালক বাপ্পা যুদ্ধে যেতে কখনই সাহস পাবে না—সভার মাঝে অপমান হবে। কিন্তু যখন সেই বীর বালক নির্ভয়ে হাসি মুখে এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের ভার রাজার কাছে চেয়ে নিলে তখন তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইলনা। তাঁরা আরও আশ্চর্য্য হলেন, যখন সেই বাপ্পা—যাকে তাঁরা একদিন পথের ভিখারী বলে ঘৃণা করেছেন—পোনের বৎসরের সেই বালক বাপ্‌পা যুদ্ধ জয় করে কোটি কোটি রাজপুত প্রজার আশীর্ব্বাদ জয় জয়কারের মধ্যে একদিন শুভদিনে শুভক্ষণে সমস্ত রাজস্থানের রাজমুকুটের সমান রাজপুতের

রাজধানী চিতোর নগরে ফিরে এলেন—সেদিন সমস্ত রাজস্থান জুড়ে কি আনন্দ কি উৎসাহ!

নতুন সেনাপতি বাপ্পা সমস্ত রাজস্থানকে ভয়ঙ্কর মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করে যেদিন চিতোর নগরে ফিরে এলেন সেইদিন রাজা-মানের বুড়ো বুড়ো সর্দ্দারেরা ক্ষুণ্ণ মনে রাজসভা ছেড়ে গেলেন। মহা-রাজ মান তাঁদের ফিরিয়ে আনতে কতবার কত চেষ্টা করলেন, কাকুতি মিনতি এমন কি শেষে, রাজগুরুকে পর্য্যন্ত তাঁদের কাছে পাঠালেন কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না; সর্দ্দারেরা দূতের মুখে বলে পাঠালেন—"আমরা মহারাজের নিমক খেয়েছি এক বৎসর পর্য্যন্ত আমরা শত্রুতা করব না, বৎসর শেষ হলে যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে"—সেই এক বৎসর কত ভীষণ ষড়যন্ত্র কত ভয়ঙ্কর পরামর্শে কেটে গেল! এক বৎসর পরে সেই বিদ্রোহী সর্দ্দারদের দুষ্ট পরামর্শে রাজা মানকে ভুল বুঝে বাপ্পা তাঁদের সকলের সেনাপতি হয়ে যুদ্ধে চললেন। রাজা মান যখন শুনলেন বাপ্পা তাঁর রাজসিংহাসন কেড়ে নিতে আসছেন, যখন শুনলেন যে বাপ্পাকে তিনি পথের ধূলা থেকে একদিন রাজসিংহাসনের দিকে তুলে নিয়েছিলেন, যার দীন হীন বেশ একদিন তিনি রাজবেশ দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলেন, যাকে তিনি প্রাণের চেয়ে প্রিয় ভেবেছিলেন—হায়রে! সেই অনাথ আজ সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে তাঁরই রাজছত্র কেড়ে নিতে আসছে, তখন তাঁর দুই চক্ষে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। তিনি সেই বৃদ্ধ বয়সে একা একদল রাজভক্ত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধে গেলেন, সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ হল। যুদ্ধক্ষেত্রে বাপ্পার হাতে মানরাজা প্রাণ দিলেন। ষোল বৎসরে বাপ্পা দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে হিন্দুমুকুট, হিন্দুসূর্য্য, রাজগুরু, চাকুয়া উপাধি নিয়ে চিতোরের রাজসিংহা-সনে বসলেন। বালিয় দেব দুটি ভাই ভীল বাপ্পার কপালে রাজতিলক টেনে দিয়ে দুখানা গ্রাম বখশিস্ পেলে; বাপ্পা সেইদিন থেকে নিয়ম করে

দিলেন যে তাঁর বংশের যত রাজা সকলকেই এই ছুই ভীলের বংশাবলীর হাতে রাজটীকা নিয়ে সিংহাসনে বসতে হবে, আজও সেই নিয়ম চলে আসছে। এই নতুন নিয়ম বাপ্‌পা রাজস্থানে যখন প্রচলিত কল্লেন, তখন যে এই ভীলের হাতে রাজটিকা নেবার কথা শুনলে, সেই মনে ভাবলে নতুন রাজার এ একটা নতুন খেয়াল—কিন্তু মান রাজার সভা পণ্ডিতেরা ভাবলেন ইনি কি তবে গিহ্লোট রাজকুমার গোহের বংশীয় ? সূর্য্যবংশেই তো ভীলের হাতে রাজটীকা নেবার নিয়ম ছিল জানি! মহারাজ বাপ্পা নাগাদিত্যের মহিষি চিতোর রাজকুমারীর ছেলে নয়তো! রাজা মান বাপ্‌পার মায়ের ভাই মামা নয়তো? ছি ছি! বাপ্‌পা কি অধর্ম্ম কল্লেন, চোরের মত মামার সিংহাসন আপনি নিলেন? এমন নিষ্ঠুর রাজার রাজত্বে থাকাও যে মহাপাপ! পণ্ডিতেরা আর রাজসভার মুখো হলেন না, একে একে চিতোর ছেড়ে অন্য দেশে চলে গেলেন— হায় তাঁরা যদি জানতেন বাপ্‌পা কত নির্দ্দোষ বাপ্পা স্বপ্নেও ভাবেননি রাজা মান তাঁর মামা। তিনি তাঁর পালক পিতা—সেই বৃদ্ধ রাজ-পুরোহিতের কাছে ভীল বিদ্রোহ, রাজা গোহ, গায়েব গায়েবীর গল্প শুনতেন বটে, কিন্তু তিনি জানতেন না যে যার নিষ্ঠুর অত্যাচারে সরল ভীলরা এক দিন ক্ষেপে উঠেছিল, সেই মহারাজ নাগাদিত্য তাঁর পিতা, তিনি জানতেন না যে তাঁরই পূর্ব্বপুরুষ রাজকুমার গোহ—যাঁকে রাণী পুষ্পবতী ব্রাহ্মণী কমলাবতীর হাতে সঁপে দিয়ে চিতার আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। বাপ্‌পা ভাবতেন তিনি কোন সামান্য রাজ্যের রাজপুত্র। রাজা হবার পর বাপ্পা যখন দেববন্দরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন, তখন বাণমাতাদেবীর সোণার মূর্ত্তি সঙ্গে এনেছিলেন; চিতোরের রাজপ্রাসাদে শ্বেত পাথরের মন্দিরে সোণার সেই দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করে বাপ্পা প্রতিদিন দুই সন্ধ্যা পূজো করতেন; অনেক দিন কেটে গেছে বাপ্পা প্রায় বুড়ো হয়েছেন সেই সময় একদিন ভক্তিভরে

বাপ্পা মাতাকে প্রণাম করে ওঠবার সময় বাপ্পার গলা থেকে ছেলেবেলার সেই তামার কবচ ছিঁড়ে পড়ল, বাপ্পা বড় হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু সুতায় বাঁধা সেই তামার কবচটি তাঁর গলায় যেমন তেমনিই ছিল; অনেক দিনের অভ্যাসে মনেই পড়তনা যে গলায় একটা কিছু আছে; আজ যখন হীরামোতির কুড়িগাছা হারের নীচে থেকে সেই পুরোনো কবচ খানি পায়ের তলায় ছিঁড়ে পড়ল তখন বাপ্পা চমকে উঠে ভাবলেন— "একি! এতদিন আমার মনেই ছিল না? এতে যে লেখা আছে আমি কে কোথায় ছিলুম, আজ সব সন্ধান পাওয়া যাবে"—বাপ্পা প্রফুল্ল মুখে সেই তামার কবচ মহারাণীর হাতে এনে দিয়ে বল্লেন "পড়ত শুনি"—বাপ্পা নিজে এক অক্ষরও পড়তে জানতেন না— মহারাণী বাপ্পার পায়ের কাছে বসে পড়তে লাগলেন; কবচের একপিঠে লেখা রয়েছে—বাসস্থান ত্রিকূট পর্ব্বত, নগেন্দ্রনগর, পরাশর অরণ্য— বাপ্পা হাসি মুখে রাণীর কাঁধে হাত রেখে বল্লেন "এই আমার ছেলে-বেলার দেশ, এইখানে কত খেলা খেলেছি! সেই ত্রিকূট পাহাড়, সেই আশি বৎসরের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের গম্ভীর মুখ, নগেন্দ্রনগরের ঝুলন পূর্ণিমায় সেই জ্যোৎস্না রাত্রি, সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারীর মধুর হাসি স্বপ্নের মত আমার এখনো মনে আসে, আমি কতবার কত লোককে জিজ্ঞাসা করেছি—কিন্তু পৃথিবীতে তিনটে চুড়ো পাহাড় কত আছে কে তার সন্ধান পাবে! আমি যদি বলতে পারতেম যে সেই মেঘের মত তিনটে পাহাড়ের ঢেউকে 'ত্রিকূট' বলে, যদি বলতে পারতেম সেই ছোট সহরের নাম নগেন্দ্র নগর, যদি জানাতে পারতেম, সেই ঘন বন যেখানে আমি রাখালদের সঙ্গে খেলে বেড়াতেম, যেখানে ঝুলন পূর্ণিমায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেম সেটি পরাশর অরণ্য, তবে কোন গোলই হতনা; হায় হায়! জন্মাবধি লেখা পড়া না শিখে এই ফল! এতকাল পরে কি আর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, সেই শোলাঙ্কি রাজ-

নন্দিনীকে ফিরে পাব? পড়ত শুনি আর কি লেখা আছে"? রাণী কবচের আর এক পিঠ উল্টে পড়তে লাগলেন—জন্মস্থান মালিয়া পাহাড়, পিতা নাগাদিত্য, মাতা চিতোর কুমারী, নাম বাপ্পা। মহারাণীর বড় বড় চোখ মহাবিস্ময়ে আরও বড় হয়ে উঠল—তিনি তামার সেই কবচ হাতে বাপ্পার পায়ের তলায় ফুলের বিছানার মত সুন্দর গালিচায় অবাক হয়ে বসে রইলেন, আর গজদন্তের পালঙ্কের উপর বাপ্পা ডান হাতের আঙ্গুলে এক ফোঁটা রক্তের মত বড় একখানা লালের আঙ্গুঠীর দিকে চেয়ে ভাবতে লাগলেন—হায় হায়! কি পাপ করেছি এই হাতে পিতৃহন্তা ভীলদের শাসন না করে আমার প্রাণহন্তা হয়ে আমি সিংহাসনে বসেছি; মহারাণী আমি মহাপাপী, আমি চিতোরের সিংহাসনে বসবার উপযুক্ত নই। এখন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ আর আত্মীয়বধের প্রায়শ্চিত্ত আমার জীবনের ব্রত হল"—একলিঙ্গের দেওয়ান বাপ্পা সেই দিনই সকলের কাছে বিদায় নিয়ে, দশ হাজার দেওয়ানি ফৌজ নিয়ে চিতোর থেকে বার হলেন; তাঁর সমস্ত রাগ মালিয়া পাহাড়ে ভীল রাজত্বের উপর গিয়ে পড়ল, বাপ্পা মালিয়া পাহাড় জয় করে ভীল রাজত্ব ছারখার করে চলে গেলেন; তার পর দেশ বিদেশ; কাশ্মীর, কাবুল, ইস্পাহান, কান্দাহার, ইরাণ, তুরাণ জয় করলেন। বাপ্পার সকল সাধ পূর্ণ হল, মালিয়া পাহাড় জয় করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধের সাধ পূর্ণ হল, আধখানা পৃথিবী চিতোর সিংহাসনের অধীনে এনে আত্মীয়বধের কষ্ট অনেকটা দূর হল—কিন্তু তবু মনের শান্তি প্রাণের আরাম কোথায় পেলেন? বাপ্পা যখন সমস্ত দিন যুদ্ধের পর, শ্রান্ত হয়ে নিজের শিবিরে বসে থাকতেন, যখন নিস্তব্ধ যুদ্ধক্ষেত্র কোন দিন পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় আলোময় হয়ে যেত, তখন বাপ্পার সেই ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রে চাঁপাগাছের ঝুলনায় শোলাঙ্কি রাজকুমারীর হাসি মুখ মনে পড়ত; যখন কোন নূতন দেশ জয় করে বাপ্পা সেখানকার নূতন

রাজপ্রাসাদে সোনার পালঙ্কে নহবতের মধুর সুর শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন সেই পূর্ণিমার রাতে চাঁপাগাছের চারিদিক ঘিরে ঘিরে রাজকুমারীর সখীদের সেই ঝুলন গান স্বপ্নের সঙ্গে বাপ্পার প্রাণে ভেসে আসত; শেষে যে দিন তিনি নগেন্দ্রনগরে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাতার কুটীর মাটির দেওয়াল মাটির সঙ্গে মিশে গেছে, যখন দেখলেন শোলাঙ্কি রাজার রাজবাড়ী জনশূন্য নিস্তব্ধ অন্ধকার হয়ে পড়ে আছে, সে রাজকুমারীও নেই সে সখীও নেই! তখন বাপ্পার মন একেবারে ভেঙ্গে গেল; তিনি শান্তিহারা পাগলের মত সেই দিগ্বিজয়ী সৈন্য নিয়ে শান্তির আশায় এদেশ ওদেশ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন; চিতোরের প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ শূন্য সিংহাসন আর একা অন্দরে মহারাণীকে নিয়ে পড়ে রইল।

এই রকম দেশে বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে বাপ্পা একদিন বল্লভীপুরে গায়নী নগরে—যেখানে দুটি ভাই বোন গায়েব গায়েবী পৃথিবীর আলো প্রথম দেখেছিলেন সেইখানে—উপস্থিত হলেন। এক দিন ষোল বৎসর বয়সে রাজামানের সেনাপতি হয়ে বাপ্পা মুসলমান সুলতান সেলিমের সমস্ত সৈন্য এই গায়নী নগর থেকে তাড়িয়ে দিয়ে চিতোরে ফিরে গিয়েছিলেন, আজ কত বৎসর পরে যখন কালো চুলে পাক ধরেছে, যখন চোখের কোলে কালি পড়েছে, গায়ের মাংস লোল হয়েছে, পৃথিবী যখন তাঁর কাছে অনেকটা পুরোনো হয়ে এসেছে, সেই সময় বাপ্পা আর একবার সেই গায়নীনগরে ফিরে এলেন। গায়নীনগর দেখে বাপ্পার সেই দুটী ভাই বোন গায়েব গায়েবীর গল্প মনে পড়ল, বাপ্পাদিত্য সেই সূর্য্যকুণ্ডের জলে সূর্য্য পূজা করে, গায়নীর রাজপ্রাসাদে শ্বেত পাথরের শয়ন মন্দিরে বিশ্রাম করতে গেলেন। হঠাৎ অর্দ্ধেক রাত্রে কার একটী মধুর গান শুনতে শুনতে বাপ্পার ঘুম ভেঙ্গে গেল; তিনি শয়ন মন্দির থেকে

পাথরের ছাতে বেরিয়ে দাঁড়ালেন—সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মস্‌জিদ্ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপ্ ধপ্ করছে, আকাশে আধখানি চাঁদ, চারিদিক নিস্তুতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন, তাঁর মনে হল এ গান যেন কোথায় শুনেছেন, হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন—আজ কি আনন্দ, ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ—এ যে সেই গান? নগেন্দ্রনগরে রাজপুত রাজ-কুমারীর ঝুলন গান! বাপ্পা ছাতের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন, নীচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে—আজি কি আনন্দ—বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন, সেই চাঁদের আলোয় নির্জ্জন শ্বেত পাথরের ছাতে পথের ভিখারিণী রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন "কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি রাজকুমারী? তুমি কি কখন ঝুলন পূর্ণিমায় এক রাখাল বালককে বিয়ে করেছিলে?" ভিখারিণী অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটু খানি হেসে বল্লে "মহারাজ অর্দ্ধেক রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে এ কি তামাসা!" বাপ্পা বল্লেন "তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?" ভিখারিণী নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "আমি এক দিন রাজকুমারী ছিলাম বটে আজ ভিখারিণী, মহারাজ আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা, একদিন পোনের বৎসর বয়সে তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সে দিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাতের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলেম—কি সুন্দর মুখ কি প্রকাণ্ড শরীর? আর আজ তোমায় কি দেখছি? সে শরীর নাই সে হাসি নাই, এমন দশা তোমার কে কল্লে? কোন্ রাজপুত কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মত দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ?" বাপ্পা বল্লেন "সে কথা থাক্, তুমি আবার সেই গান গাও"।

ভিখারিণী গাইতে লাগল—"আজি কি আনন্দ ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ"
াপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।
ান শেষ হল, বাপ্পা বল্লেন "নবাবজাদী তোমায় কি দেব বল?"
ভিখারিণী বল্লে "আমার যদি রাজ্য থাকতো তবে তোমায় বলতেম—
তোমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর—কিন্তু সে আশা এখন নাই, এখন
আমি ভিখারিণী যে! আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে কাছে রাখ।"
বাপ্পা বল্লেন "তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব,
তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।" তারপর দিন সেই
মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা, খোরাসান দেশে চলে গেলেন।
সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির
পেয়ালা হাতে বেগম সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই
হিন্দুস্থানের ঝুলন গান শুনতে শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম মনের
শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে?

এক শত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল—পূর্ব্বদিকে হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষি হিন্দু প্রজারা, পশ্চিমে ইরাণীস্থানে তাঁর মুসলমানি বেগম আর পাঠানের দল—হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের মত কবর দিতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন এক পিঠে সূর্য্যের স্তব আর এক পিঠে আল্লার দোয়া লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার উপর থেকে খুলে নেওয়া হল তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না, কেবল রাশি রাশি পদ্ম ফুল আর গোলাপ ফুল! চিতোরের মহারাণী সেই পদ্ম ফুল বানমাতাজীর মন্দিরে মানস সরোবরের জলে রেখে দিলেন, ইরাণী বেগম একটী গোলাপ ফুল, সখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে, গোলাপ জলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন। আর সেই দিন হিন্দুস্থান ইরাণীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের

পাথরের ছাঁতে বেরিয়ে দাঁড়ালেন—সম্মুখে মুসলমানদের প্রকাণ্ড মস্‌জিদ্ জ্যোৎস্নার আলোয় ধপ্ ধপ্ করছে, আকাশে আধখানি চাঁদ, চারিদিক নিস্থতি। বাপ্পা জ্যোৎস্নার আলোয় দাঁড়িয়ে গান শুনতে লাগলেন, তাঁর মনে হল এ গান যেন কোথায় শুনেছেন, হঠাৎ দক্ষিণের হাওয়ায় গানের কথা আরো স্পষ্ট হয়ে বাপ্পার কানের কাছে ভেসে এল; বাপ্পা চমকে উঠে শুনলেন—আজ কি আনন্দ, ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ—এ যে সেই গান? নগেন্দ্রনগরে রাজপুত রাজ-কুমারীর ঝুলন গান! বাপ্পা ছাতের উপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন, নীচে দেখলেন এক ভিখারিণী রাস্তায় দাঁড়িয়ে গাইছে—আজি কি আনন্দ—বাপ্পা তৎক্ষণাৎ সেই ভিখারিণীকে ডেকে পাঠালেন, সেই চাঁদের আলোয় নির্জ্জন শ্বেত পাথরের ছাতে পথের ভিখারিণী রাজ্যেশ্বর বাপ্পার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। বাপ্পা জিজ্ঞাসা করলেন "কে তুমি? তুমি কি নগেন্দ্রনগরের শোলাঙ্কি রাজকুমারী? তুমি কি কখন ঝুলন পূর্ণিমায় এক রাখাল বালককে বিয়ে করেছিলে?" ভিখারিণী অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে বাপ্পার মুখের দিকে চেয়ে রইল, তারপর একটু খানি হেসে বল্লে "মহারাজ অর্দ্ধেক রাত্রে ভিখারিণীকে ডেকে একি তামাসা!" বাপ্পা বল্লেন "তবে কি তুমি রাজকুমারী নও?" ভিখারিণী নিশ্বাস ফেলে বল্লে, "আমি এক দিন রাজকুমারী ছিলাম বটে আজ ভিখারিণী, মহারাজ আমি মুসলমান নবাব সেলিমের কন্যা, একদিন পোনের বৎসর বয়সে তুমি আমাদের রাজ্য কেড়ে নিয়েছিলে, সে দিন আমি এই রাজপ্রাসাদের এই ছাতের উপর থেকে তোমায় দেখেছিলেম—কি সুন্দর মুখ কি প্রকাণ্ড শরীর? আর আজ তোমায় কি দেখছি? সে শরীর নাই সে হাসি নাই, এমন দশা তোমার কে কল্লে? কোন্ রাজপুত কুমারীর আশায় তুমি পাগলের মত দেশে বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ?" বাপ্পা বল্লেন "সে কথা থাক্, তুমি আবার সেই গান গাও"।

ভিখারিণী গাইতে লাগল—"আজি কি আনন্দ ঝুলত ঝুলনে শ্যামর চন্দ" বাপ্পা সমস্ত দুঃখ ভুলে সেই ভিখারিণীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। গান শেষ হল, বাপ্পা বল্লেন "নবাবজাদী তোমায় কি দেব বল?" ভিখারিণী বল্লে "আমার যদি রাজ্য থাকতো তবে তোমায় বলতেম—আমায় বিয়ে করে তোমার বেগম কর—কিন্তু সে আশা এখন নাই, এখন আমি ভিখারিণী যে! আমাকে তোমার বাঁদী করে কাছে কাছে রাখ।" বাপ্পা বল্লেন "তুমি বাঁদী হবার যোগ্য নও, আমি তোমায় বেগম করব, তুমি চিরদিন আমার কাছে বসে এই গান গাইবে।" তারপর দিন সেই মুসলমান কন্যাকে বিয়ে করে বাপ্পা, খোরাসান দেশে চলে গেলেন। সেখানে গুলবাগে খাসমহলে গোলাবের ফোয়ারার ধারে সিরাজির পেঁয়ালা হাতে বেগম সাহেবার মুখে আরবী গজল আর সেই হিন্দুস্থানের ঝুলন গান শুনতে শুনতে বাপ্পা প্রাণের আরাম মনের শান্তি পেয়েছিলেন কিনা কে জানে?

এক শত বৎসর বয়সে বাপ্পার মৃত্যু হল—পূর্ব্বদিকে হিন্দুস্থানে তাঁর হিন্দু মহিষি হিন্দু প্রজারা, পশ্চিমে ইরাণীস্থানে তাঁর মুসলমানি বেগম আর পাঠানের দল—হিন্দুরা তাদের মহারাজকে চিতায় তুলে দিতে চাইলে, আর নৌসেরা পাঠানের দল তাঁকে মুসলমানের মত কবর দিতে ব্যস্ত হল। শেষে যখন এক পিঠে সূর্য্যের স্তব আর এক পিঠে আল্লার দোয়া লেখা প্রকাণ্ড কিংখাবের চাদর বাপ্পার উপর থেকে খুলে নেওয়া হল তখন সেখানে আর কিছুই দেখা গেল না, কেবল রাশি রাশি পদ্ম ফুল আর গোলাপ ফুল! চিতোরের মহারাণী সেই পদ্ম ফুল বানমাতাজীর মন্দিরে মানস সরোবরের জলে রেখে দিলেন, ইরাণী বেগম একটী গোলাপ ফুল, সখের গুলবাগে খাসমহলের মাঝে, গোলাপ জলের ফোয়ারার ধারে পুঁতে দিলেন। আর সেই দিন হিন্দুস্থান ইরাণীস্থানের মধ্যস্থলে হিন্দুকুশ পর্ব্বতের

শিখরে হীরে জহরতে মোড়া এক রাজার শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বল্লেন, "সখী তোরা সেই গান গা"! চারিদিকে চার সন্ন্যাসিনী ঘিরে ঘিরে গাইতে লাগল—"আজি কি আনন্দ" —সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারী, আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ! দুজনে চিরদিন দুজনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গ-ভাষার ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি।*

বর্দ্ধিষ্ণু-বস্তুর একটা জঠরাবস্থা থাকে, প্রকৃতি যখন অনু-পরমাণু হইতে বীজের মধ্যে তরুটি গঠন করিয়া তোলেন, সেই প্রক্রিয়া কাহাকেও দেখিতে দেন না, অনুপরমানু হইতে যখন শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠিত হয়, তাহাও নর চক্ষুর অন্তরালে ঘটিয়া থাকে। যখন জিনিষটি বাহিরের রৌদ্র, বৃষ্টি ও হাওয়া সহ্য করিবার মতন হয়, তখন কোন শুভ লগ্নে তাহা বাহিরে আসিয়া ধরা দেয়।

বঙ্গভাষা কতকগুলি অপরিহার্য্য কারণে লিখিত আকারে পরিনত হইবার উপযোগী বলসঞ্চয় করিতেছিল, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃষ্টির অগোচরে ইহা বাহিরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য পুষ্ট হইতেছিল, সেই সকল অপরিহার্য্য কারণ কি তাহা এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

* "গরীব লাইব্রেরীর" বিংশ অধিবেশনে সাহিত্য পরিষদ-গৃহে পঠিত।

সংস্কৃতের সঙ্গে যখন কথিত ভাষার ব্যবধান অত্যন্ত বেশী হইল এবং দেব ভাষার মার্জ্জিত সাহিত্য বুঝিবার যোগ্য লোকের গণ্ডী ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইল, তখন কথিত প্রাকৃত লিখিত হইয়া দাঁড়াইয়া সাহিত্যেরসের রুদ্ধপ্রায় উৎস জন সাধারণের জন্য খুলিয়াদিল। সেই ভাবে কালক্রমে পিঙ্গলাচার্য্য প্রভৃতির অলঙ্কার শাস্ত্রে ও যাস্ক শকটায়ণ, ববরুচি প্রভৃতির ব্যাকরণ দ্বারা প্রাকৃত ভাষা যতই শৃংখলা-বদ্ধ শোভান্বিত ও কতক পরিমাণে কৃত্রিম হইতে লাগিল, ততই লিখিত প্রাকৃত সাধারণের উপভোগ হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে লাগিল এবং সংস্কৃতের সঙ্গে প্রায় এক পংক্তিতে যাইয়া আসন গ্রহণ করিল, জন সাধারণ আবার সাহিত্যরস হইতে বঞ্চিত হইবার পথে দাঁড়াইল। এদিকে বৌদ্ধগণের পরাভব ও হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানে সংস্কৃত সাহিত্যের নানা বিভাগ সুপ্রসার প্রাপ্ত হইয়া উঠিল, এবং হিন্দু পুরোহিতকে ধর্ম্মের মর্ম্ম প্রচারের জন্য জন সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতে হইল, ব্রতকথা লইয়া তাহাকে কুটীরে কুটীরে আনাগোনা করিতে হইল, সুতরাং এই দুই কারণে বাঙ্গলা ভাষার সমাজ হইতে আহ্বান পড়িল।

বঙ্গ ভাষা ইতি পূর্ব্বে কৃষকগণের গানে ও কৃষি সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা সূচক সূত্র ও বচনের মধ্যে ধরা দিয়া ছিল, সংগীত—সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ অংশ, কিন্তু লোকে কথিত ভাষায়ই গান রচনা করিয়া থাকে। মনের কথা ব্যক্ত করিতে হইলেই কথিত ভাষার শরণ লইতে হয়, আমরা কল্পনা করিতে পারি, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের সভায় বসিয়া সংস্কৃতে রাধাকৃষ্ণের গান রচনা করিতেছিলেন, তখনও বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে, ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে পল্লীবাসিগণ মেঠোসুরে রাই কানুর কথা সরল বাঙ্গলায় রচনা করিয়া অবেগপূর্ণ কণ্ঠস্বরে গগণ পরিপ্লাবিত করিতেছিল, চণ্ডীদাসের অপূর্ব্ব পদাবলী সেই শত শত গানের প্রতিভা স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে। কৃষকের চিরসঞ্চিত

গান ডাক ও খনার বচনে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই সকল গান ও গীতিকথায় বাঙ্গলা ভাষা অলক্ষিত ভাবে বল সঞ্চয় করিতেছিল। তাহা ছাড়া ছোট ছোট ব্রত কথা বাঙ্গলার এই অবস্থার নিদর্শন বলিয়া প্রাচীন সাহিত্যে একটা স্থান প্রাপ্ত হইবে।

বৌদ্ধগণ স্বীয় পালি ও সংস্কৃত গ্রন্থনিচয় কুক্ষিগত করিয়া চীন জাপান ব্রহ্মদেশে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ ও ত্যাগীদিগের ও বৃত্তান্ত তখনও সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণগণ সেগুলিকে একবারে লোপ করিয়া ফেলিলেন। লাউসেনের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ, রঞ্জাবতীর তপস্যা, কালীপা, হাড়িপা প্রভৃতি ডোমাচার্য্যগণের তন্ত্রসিদ্ধি। যোগীপাল, গোপীপাল, মহীপাল প্রভৃতি বিক্রান্ত গৌড়েশ্বরগণের প্রতাপকাহিনী আর কে জনসাধারণকে শুনাইবে! বঙ্গদেশের জন সাধারণ এই সমস্ত কাহিনী বিস্মৃতির সাগরে নিক্ষেপ করিতে প্রস্তুত ছিল না। শিক্ষিত সম্প্রদায় তাহাদিগকে উপেক্ষা করিলেন, কিন্তু অশিক্ষিত জন-সাধারণ নিজেদের ভাষায় বৌদ্ধ কাহিনীগুলি পালা করিয়া গ্রামে গ্রামে গাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে লাগিল। একাদশ শতাব্দীতে বাইতি জাতীয় রামচন্দ্র ধর্ম্ম পূজার পদ্ধতি প্রণয়ণ করেন ও তৎপর ময়ূরভট্ট প্রভৃতি কবিগণ ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়া বঙ্গ ভাষায় বৌদ্ধ-সংবাদ আনায়ন করিয়াছিলেন। প্রাগুক্ত পুস্তকগুলিতে হাড়িপা, কালিপা প্রভৃতি ডোমাচার্য্যদের বৃত্তান্ত—"ধর্ম্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে"—"সিংহলে শ্রীধর্ম্মরাজ বহুত সম্মান," "হাড়িপা বলেন বাপু শুন গোবিন্দাই, অহিংসা পরম ধর্ম্ম যার পর নাই"—এইরূপ নানা উক্তিতে বৌদ্ধধর্ম্মের ক্ষীণ প্রাণের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন, পুরীর জগন্নাথ মন্দির পূর্ব্বে বৌদ্ধ মন্দির ছিল, হিন্দুগণ তাহাতে হিন্দুর নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। গৌড়ের মসজিদগুলির ইষ্টক খুলিয়া দেখা

গিয়াছে, সেগুলি পূর্ব্বে হিন্দুমন্দিরের অঙ্গীয় ছিল। অনেক দেবদেবীর ছবি তাহাতে অঙ্কিত আছে। মসজিদ গঠনের সময় সেই ইটগুলির মুখ ফিরাইয়া সংলগ্ন করা হইয়াছে, কিন্তু ভগ্ন মসজিদ গুলি হইতে এই তত্ত্বন্ত ধরা পড়িয়া যাইতেছে। তাহাই যদি হয়, তবে বঙ্গসাহিত্যের পাঠক শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন না, যে ক্রমে ক্রমে হিন্দু পুরোহিতগণ ধর্ম্ম মঙ্গলের পুঁথি আয়ত্ব করিয়া তাহা হিন্দু ভাব্যপন্ন করিয়াছেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে ধর্ম্ম মঙ্গল অনিসন্ধিৎসু পাঠকের সংশয়ের লেশ থাকিবে না, যে পুঁথির মাল মসলা সকলই যে, বৌদ্ধযুগের। মহা মহোপাধ্যায় হর প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এই তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

তাহা হইলে বঙ্গ ভাষার এই কয়েকটি প্রার্থমিক উপদান পাওয়া গেল, ইহাকে এ সময় ভাষার জঠরাবস্থা বলিয়া গণনা করা যায়, সে উপদানগুলি এই,—১। ডাক ও খণার বচন ২। রাইকানুর গান, ৩। ধর্ম্মপদ্ধতি ও ধর্ম্মমঙ্গল, ৪। যোগীপাল, মহীপাল প্রভৃতি বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের গান, ৫। কতকগুলি ব্রত কথা—যথা সত্য নারায়ণের পাঁচালী, শণির পাঁচালী, মনসার পাঁচালী, মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী। পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দাতে চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস এই সকল উপাদানের অনেকগুলির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অলক্ষিতে বাঙ্গলা ভাষা অনির্ব্বার্য্য প্রভৃতিক কারণে ভিতরে ভিতরে এই গুপ্ত বল সঞ্চয় করিয়া আত্ম প্রকাশের জন্য একটা সুযোগের প্রতিক্ষা করিতেছিল, সেই সুযোগ কি ভাবে সঙ্ঘটিত হইল? এই ভাষাকে কে ফুল মাল্য ও চন্দন দিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বরণ করিয়া লইবে,—কে ইহাকে পণ্ডিতের সভায়, ভক্তের পুস্তকাগারে সসম্মানে স্থান দিবে! এই ব্যাপার এক আশ্চর্য্য দৈব বিধানে ঘটিয়াছিল, তাহা কি নিম্নে লিখিত হইতেছে।

সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত, প্রাচীন পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যসমূহে সেই সমুদ্রের অভিযানকাহিনী অতিরঞ্জিত ও রূপান্তরিত হইলেও সত্যের ক্ষীণ দেহকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বঙ্গদেশের সেই অতীত গৌরব এখন স্বপ্নের ন্যায় অলীক, বিদেশী ঐতিহাসিকগণ হয়ত তাহাতে অনুমাত্রও আস্থা স্থাপন করিবেন না। তৎপর এদেশে সর্ব্ববিষয়ে অবনতির সূচনা হইল, বলবীর্য্য, বানিজ্য সর্ব্বস্ব চলিয়া গেল,—মুসলমান প্রভাবের অন্তরালে হিন্দুর যশোঃসূর্য্যের ভাতি ম্লান হইয়া আত্মগোপন করিল, কিন্তু একটি বিষয়ে বাঙ্গালী অযাচিতভাবে লাভবান হইয়া উঠিল। এই মুসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইল, এবং ইহা মুসলমানশাসনেরই ফল বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পরদেশী শাসনকর্ত্তারা আমাদিগের উন্নতি সাধনকল্পে বঙ্গভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। ইহা আশ্চর্য্য অবস্থার বিধানে সংঘটিত হইল, এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি আমাদের পক্ষে ভগবানের প্রত্যক্ষদান—ইহা অন্য কোন ব্যাখ্যার প্রতীক্ষা করে না।

হিন্দু রাজন্য-বর্গের সভায় সংস্কৃতজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের একাধিপত্য ছিল। তাঁহারা সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দের বিপুল মাল্য গাঁথিয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেন, অতি জটিল পারিভাষিক শব্দপূ

বিচারে ন্যায় দর্শনের উন্নতি সাধন করিতেন, তাহারা কেন দীন হীন জনসাধারণ কথিত, অপ-প্রয়োগ দুষ্ট বাঙ্গালা কথিত ভাষার প্রশ্রয় দিতে যাইবেন! বহুকাল পরে যখন কৃত্তিবাস রামায়ণের ও কাশীদাস মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তখনও তাহারা ঈর্ষা-পূর্ণ দৃষ্টিতে এইভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে জ্ঞান দুঃসাহসের অর্গলবদ্ধ ভাণ্ডারে সংরক্ষিত ছিল, তাহা সাধারণের অধিগম্য হইল দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধনেত্রে যে সকল শ্লোকরচনা করিছিলেন, তন্মধ্যে একটি এই,—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রবাদ বাক্যটি রচনা করিয়া বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়াছিলেন,—

"কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁসে
এই তিন সর্ব্বনেশে।"

২০০ বৎসরের প্রাচীন কবি মাণিকগাঙ্গুলী বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া পাছে সামাজিক নিগ্রহ প্রাপ্ত হন—এই ভয়ে নজির খুঁজিয়া ভয়ে ভয়ে কৃতকর্ম্মের সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যদি হিন্দুরাজত্ব থাকিত, তবে দীনা হীনা বঙ্গভাষার ক্ষীনকণ্ঠ কখনই রাজদ্বারে পৌঁছিত না,—সংস্কৃত পণ্ডিতগণের বিদ্বেষ পূর্ণ ঘৃণার দৃষ্টিতে ইহা মৃতপ্রায় হইয়া থাকিত। এস্থলে বলা উচিত আমরা বিস্মৃত নহি বাঙ্গালা ভাষাকে ব্রাহ্মণগণই বিশেষরূপে পুষ্ট করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম ভারতচন্দ্র, দাশরথী, রামমোহন সকলেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত চেষ্টার কথা বলিতেছি না। সম্প্রদায়িকভাবের প্রতি আমার লক্ষ্য। যে অনিবার্য্য কারণে বঙ্গভাষাকে তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইল,

গত এক সহস্র বৎসরাবধি বঙ্গদেশের নানা প্রকার ভাগ্যবিপর্য্যয় হইয়া আসিতেছে, এক সময় বঙ্গদেশের নৌসৈন্য দুর্জ্জয় প্রতাপে জাবা ও বালিদ্বীপে, চীনে ও জাপানে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, বালি দ্বীপে এখনও ভারতবর্ষবাচক শব্দ "বাঙ্গালা,"—ইহাতে বঙ্গ-দেশীয় প্রাধান্য নিশ্চিতরূপে সূচিত হইতেছে। জাপানের ধর্ম্মগ্রন্থ প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে লিখিত, এখনও পুরোহিত শ্রেণীর মধ্যে তদ্দেশে সেই প্রাচীন অক্ষর ধর্ম্মের পবিত্রতা অঙ্গে মাখিয়া লোক-ভক্তির বিষয়ীভূত হইয়া আছে। তমলুক ও চট্টগ্রাম হইতে বঙ্গদেশের সমর-তরণী জগতের সর্ব্বত্র যাতায়াত করিত, প্রাচীন পদ্মাপুরাণ ও চণ্ডীকাব্যসমূহে সেই সমুদ্রের অভিযানকাহিনী অতিরঞ্জিত ও রূপান্তরিত হইলেও সত্যের ক্ষীণ দেহকেই আশ্রয় করিয়া আছে। বঙ্গদেশের সেই অতীত গৌরব এখন স্বপ্নের ন্যায় অলীক, বিদেশী ঐতিহাসিকগণ হয়ত তাহাতে অনুমাত্রও আস্থা স্থাপন করিবেন না। তৎপর এদেশে সর্ব্ববিষয়ে অবনতির সূচনা হইল, বলবীর্য্য, বানিজ্য সর্ব্বস্ব চলিয়া গেল,—মুসলমান প্রভাবের অন্তরালে হিন্দুর যশোঐশ্বর্য্যের ভাতি ম্লান হইয়া আত্মগোপন করিল, কিন্তু একটি বিষয়ে বাঙ্গালী অযাচিতভাবে লাভবান হইয়া উঠিল। এই মুসলমান শাসনের প্রারম্ভ হইতেই বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি আরম্ভ হইল, এবং ইহা মুসলমানশাসনেরই ফল বলিয়া স্বীকার করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। পরদেশী শাসনকর্ত্তারা আমাদিগের উন্নতি সাধনকল্পে বঙ্গভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। ইহা আশ্চর্য্য অবস্থার বিধানে সংঘটিত হইল, এই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি আমাদের পক্ষে ভগবানের প্রত্যক্ষদান—ইহা অন্য কোন ব্যাখার প্রতিক্ষা করে না।

হিন্দু রাজন্য-বর্গের সভায় সংস্কৃতজ্ঞ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণের একাধিপত্য ছিল। তাঁহারা সমাসবহুল সংস্কৃত শব্দের বিপুল মাল্য গাঁথিয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করিতেন, অতি জটিল পারিভাষিক শব্দপূর্ণ

বিচারে ন্যায় দর্শনের উন্নতি সাধন করিতেন, তাঁহারা কেন দীন হীন জনসাধারণ কথিত, অপ-প্রয়োগ দুষ্ট বাঙ্গালা কথিত ভাষার প্রশ্রয় দিতে যাইবেন! বহুকাল পরে যখন কৃত্তিবাস রামায়ণের ও কাশীদাস মহাভারতের অনুবাদ করিয়াছিলেন, তখনও তাহারা ইর্ষা-পূর্ণ দৃষ্টিতে এইভাষার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যে জ্ঞান সংস্কৃতসাহিত্যের অর্গলবদ্ধ ভাণ্ডারে সংরক্ষিত ছিল, তাহা সাধারণের লোকের অধিগম্য হইল দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধনেত্রে যে সকল শ্লোকরচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি এই,—

"অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্য চরিতানিচ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥

তাঁহারা বাঙ্গালা ভাষায় এই প্রবাদ বাক্যটি রচনা করিয়া বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিয়াছিলেন,—

"কৃত্তিবেসে, কাশীদেসে আর বামুন ঘেঁসে
এই তিন সর্ব্বনেশে।"

২০০ বৎসরের প্রাচীন কবি মাণিকগাঙ্গুলী বঙ্গভাষায় গ্রন্থ লিখিতে যাইয়া পাছে সামাজিক নিগ্রহ প্রাপ্ত হন—এই ভয়ে নজির খুঁজিয়া ভয়ে ভয়ে কৃতকর্ম্মের সমর্থন করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যদি হিন্দুরাজত্ব থাকিত, তবে দীনা হীনা বঙ্গভাষার ক্ষীনকণ্ঠ কথনই রাজদ্বারে পৌঁছিত না,—সংস্কৃত পণ্ডিতগণের বিদ্বেষ পূর্ণ ঘৃণার দৃষ্টিতে ইহা মৃতপ্রায় হইয়া থাকিত। এস্থলে বলা উচিত আমরা বিস্মৃত নহি বাঙ্গালা ভাষাকে ব্রাহ্মণগণই বিশেষরূপে পুষ্ট করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ঘনরাম ভারত-চন্দ্র, দাশরথী, রামমোহন সকলেই ব্রাহ্মণ। কিন্তু আমি ব্যক্তিগত চেষ্টার কথা বলিতেছি না। সাম্প্রদায়িকভাবের প্রতি আমার লক্ষ্য, যে অনিবার্য্য কারণে বঙ্গভাষাকে তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হইল,

ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ তাহারা বিরোধীছিলেন, কিন্তু যখন বাধা দেওয়া সাধ্যের অতীত হইল, তখন তাহারাই আলোবর্ত্তিকা ধারণ করিয়া ইহার উপেক্ষিত রত্নভাঁণ্ডার লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের এরূপভাবে বঙ্গভাষাকে উপেক্ষা করা স্বাভাবিক কারণ তখন এই ভাষা প্রকৃতই অতি দীনা ছিল, বিশেষ, চণ্ড-কথিত পৈশাচিক ভাষার অনেকগুলি লক্ষণ ইহাতে বিদ্যমান থাকায় ইহার প্রতি শিক্ষিত সমাজের একটা ঘৃণার ফাব থাকা স্বাভাবিক ছিল।

বঙ্গদেশে যে দিন বক্তিয়ার পদার্পন করেন, সে দিন বঙ্গলক্ষ্মী অশ্রুপূর্ণ চক্ষু অঞ্চলে মুছিয়া এই শস্তশালিনী শ্যামাঙ্গী ভূমিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, কিন্তু সেদিন বঙ্গভাষার পক্ষে শুভ দিন, সেদিন বঙ্গীয় সরস্বতীর উৎফুল্ল চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল,—ইহাকেই বলে ভগবানের নির্ব্বন্ধ, তিনি অতি বিরুদ্ধ অবস্থা দোহন করিয়া কল্যাণের সৃষ্টি করেন, ও অশুভকে শুভ ফলের জনয়িতা করিয়া জগতে তাঁহার মহিমা প্রদর্শন করেন।

মুসলমান সম্রাটগণ এদেশের অধিবাসী হইয়া পড়িলেন, উচ্চ পদস্থ মুসলমানগণেরও কথিত ভাষা বাঙ্গালাই হইয়া দাঁড়াইল, সুতরাং যখন হুসেন সাহা, নসরত সাহ, প্রভৃতি সম্রাটগণ হিন্দুদিগের ধর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও সাহিত্যাদির বিষয় জানিতে চাহিলেন, তখন আর সংস্কৃত ব্যাখ্যাকারক ও টীকাকারদের প্রয়োজন হইল না, তাঁহারা সংস্কৃতের প্রতি বিন্দুমাত্র ও ভক্তি পোষণ করিতেন না, সুতরাং হিন্দুরাজন্য বর্গের আদর্শে তাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা সভা মুখরিত করিলেন না। পাণ্ডিত্যের জন্য আরবী ও পারশী ভাষার মৌলভিরা দরবারে আসিয়া দীর্ঘ শশ্রু দোলাইয়া বসিলেন, মুসলমাণ সম্রাটগণ হিন্দুর শাস্ত্র বাঙ্গালায় অনুবাদ করিবার জন্য হিন্দু পণ্ডিত নিযুক্ত করিলেন। এখনও ইংরেজরা যেরূপ আমাদিগের সকল বিষয় অনুবাদ করিয়া জানিতেছেন, মুসলমান-

গণেরও সেইরূপ প্রয়োজন পড়িয়াছিল, তাঁহাদের কথিত ভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে শাস্ত্রের অনুবাদ বাঙ্গালাতেই সঙ্কলিত হইল, নসরত সাহার আদেশে সমস্ত মহাভারত অনুবাদিত হইয়া গেল, হুসেন সাহা মালাধর বসুকে ভাগবতে অনুবাদের পুরস্কার স্বরূপ 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করিলেন, পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের যুদ্ধপর্ব্ব পর্য্যন্ত এক বিরাট অনুবাদ প্রণয়ণ করিলেন, ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দী নামক কবিকে অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদ সঙ্কলন করিতে নিয়োগ করিলেন। এই কথার বিরুদ্ধে এই তর্ক উত্থাপিত হইতে পারে যে, প্রাচীন যতগুলি অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কৃত্তিবাসের অনুবাদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেই কৃত্তিবাস হিন্দুরাজার উৎসাহে অনুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই হিন্দুরাজার সভা ও মুসলমানপ্রভাব চিহ্নিত ছিল, তাহা রাজকর্ম্মচারীদের খাঁ উপাধি প্রভৃতি নিদর্শনেই জানা যায়। মুসলমান সম্রাটগণ প্রবর্ত্তিত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন অনুবাদগুলি পাওয়া যায় না। নসরত খাঁর আদেশে মহাভারত অনুবাদিত হইয়াছিল, ইহা জানা যাইতেছে কিন্তু সেই অনুবাদখানি পাওয়া যায় নাই। বিদ্যাপতি শিবসিংহের সঙ্গে "প্রভু গ্যাসদেব সুলতানেরও বন্দনা করিয়াছেন। অনুবাদের অনুপ্রাণনা যে মুসলমানগণের চেষ্টায় প্রথমত প্রারব্ধ হইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্তের অনুকূলে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বিদেশীয় সম্রাটগণের এতদ্দেশীর আচার পদ্ধতি ও ধর্ম্মনীতি জানিবার প্রয়োজন পড়িয়াছিল। হিন্দুরাজগণের সেরূপ প্রয়োজন ছিল না, এই প্রয়োজন পূর্ণ করিতে অনুবাদ সাহিত্যের প্রথম অভ্যুদয় হওয়া স্বাভাবিক।

মুসলমান সম্রাটগণ যে ভাষার প্রতি সানুকম্প দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার শ্রীবৃদ্ধি না হইয়া যায় না, শাসনকর্ত্তাদের দৃষ্টান্তে অনুকরণ অনিবার্য্য, এস্থলে প্রবল প্রতাপান্বিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ আর দীনাহীনা বঙ্গভাষার বিরুদ্ধে রাজদ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া রাখিতে

রাখেন, তাহারাও জানেন মুসলমান সম্রাটগণ ও হিন্দুরাজগণের অবিরত উৎসাহেই বঙ্গভাষা অচিরাৎ উন্নতিপথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব কবিগণ ভিন্ন প্রাচীন প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কবিগণই কোন রাজা বা নবাবের অনুগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিয়া স্বকীয় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।

বঙ্গভাষার দ্বিতীয়-সহায়-ধর্ম্ম কলহ। শৈবধর্ম্ম স্বীয় উন্নত পতাকা দীর্ঘকাল উন্নিত রাখিতে পারে নাই। "শিবোহং" কথা অদ্বৈত বাদীয়, অদ্বৈতবাদ মূলক শৈব ধর্ম্মে সাধারণ লোকের ধর্ম্ম পিপাসা মিটিবে কিসে! শাক্তধর্ম্ম ইহার মূলে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে বিশ্বাস শাক্তধর্ম্মের মজ্জাগত উপাদান, আমরা চণ্ডীকাব্য ও মনসাকাব্যে দেখিতে পাই, শৈব চাঁদ এবং শৈব ধনপতি সদাগর কত বিপদে ও লাঞ্ছনায় পতিত হইয়াছেন, তাহারা স্বীয় ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া শক্তির বিরুদ্ধে যে দুঃসহ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অটল সংকল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, কিন্তু শিব তাহাদিগকে কিঞ্চিমাত্র ও সহায়তা করেন নাই, অথচ শক্তির উপাসকগণ বিপদে সম্পদে সর্ব্বত্র স্বীয় উপাস্য দেবতার অনুকম্পা প্রাপ্ত হইতেছেন শিবের এই নিশ্চেষ্টতার ভিত্তি "সোহং" বাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মবুদ্ধি। যেখানে ভগবানও জীব স্বতন্ত্র নহে, কিম্বা ভগবান শক্তি বা গুণহীন, সেখানে সহায়তার কথা উঠেই হইতে পারে না, এদিকে শাক্ত ধর্ম্মের মজ্জাগত বিশ্বাস বিশ্বকর্ত্রী ঈশ্বরী আমাদিগের জননীর ন্যায় পালিকা, জননীর ন্যায় আমাদের প্রতি পক্ষপাতিনী, তাহার ক্রোড়ে থাকিলে আমরা নিঃশঙ্ক; তিনি তাহার স্নেহাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দিতেছেন—যে অকৃতী তাহার অজ্ঞ, মূর্খ অক্ষম ও পাপীর প্রতিই তাহার বেশী দয়া। "সোহং" বাদে সমস্ত উন্নতির মূলে স্বীয় চেষ্টা, শাক্ত ধর্ম্মের সমস্ত উন্নতির মূলে—তাঁহার দয়া, এই প্রত্যক্ষ ভগবানের বিশ্বাস যখন শুধু ভক্তির উচ্ছ্বাসে আসিয়া

উঠিল, তখন তাহার নাম হইল বৈষ্ণব ধর্ম্ম, আর যখন উহা প্রতি কর্ম্মে ভগবানের সহায়তার ভাব আয়ত্ত করিল, তখন উহার নাম হইল শাক্ত ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য জন সাধারণ দুরূহ শৈব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভক্তি ও প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের ধর্ম্মের প্রতি বেশী আস্থাপরায়ণ হইল, এবং এই শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের চেষ্টায় বঙ্গভাষার অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি সাধিত ... চণ্ডীকাব্যে বা পদ্মপুরাণে চণ্ডী ও মনসার সাহায্যের যেরূপ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা অমার্জ্জিত, কিন্তু উহার মূলে ...ণ, অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে সগুণ প্রত্যক্ষ নিত্য সহায় ঈশ্বরের বিশ্বাস নিহিত। শৈব ধর্ম্ম উত্তরকালে রূপান্তরিত হইয়া শাক্তধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু যখন দুই ধর্ম্মে ঘোর প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছিল, তখন বঙ্গভাষার প্রথম পুষ্টির উপকরণের সংঘটন হইয়াছিল।

ধর্ম্মকলহ ও রাজানুগ্রহ বঙ্গভাষাকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু যাহা কলহে বা অনুগ্রহে সৃষ্ট হয়—তাহা সাম্প্রদায়িক বা লোকবিশেষের মতের গণ্ডীতে নিপীড়িত থাকে,—তাহা আশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু বহু উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, শ্রেণীবিশেষের চিন্তার সংকীর্ণতা ও ভিক্ষুকের দৈন্যে তাহা কতকটা কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে বাধ্য—স্বাধীন ভাবে অলৌকিক সাহসিকতার সহিত, আত্ম-ক্ষমতার পূর্ণ আস্থার দর্পে, ভিক্ষুকের দৈন্য ত্যাগ করিয়া স্বীয় বিজয় পন্থা আবিষ্কার করিতে হইলে, দেবদত্ত ক্ষমতা লইয়া কোন পুরুষবরের আবির্ভাবের প্রয়োজন, বঙ্গভাষার তৃতীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভযোগ চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাব,—তাঁহার অভ্যুদয়ে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, প্রাচীন জড়ত্ব, ভাবের প্রাচীনত্ব ও অক্ষমতা বিদূরিত হইল, এবং বঙ্গভাষার কুঞ্জ উদার নীলিম আকাশের নিম্নে, ভগবৎ কৃপা ও স্বীয় অন্তর্নিহিত পোষণোপযোগী শক্তির প্রতি প্রবল আস্থায় অতি শীঘ্র অপূর্ব্ব শোভাসম্পদ্‌পূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্গভাষা

পারিলেন না, যাঁহারা বাঙ্গলা ভাষার প্রাচীন ইতিহাসের কিঞ্চিৎ সন্ধানও রাখেন, তাহারাও জানেন মুসলমান সম্রাটগণ ও হিন্দুরাজগণের অবিরত উৎসাহেই বঙ্গভাষা অচিরাৎ উন্নতিপথে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, বৈষ্ণব-কবিগণ ভিন্ন প্রাচীন প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কবিগণই কোন রাজা বা নবাবের অনুগ্রহ ও উৎসাহ লাভ করিয়া স্বকীয় গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন।

বঙ্গভাষার দ্বিতীয়-সহায়-ধর্ম্ম কলহ। শৈবধর্ম্ম স্বীয় উন্নত পতাকা দীর্ঘকাল উন্বিত রাখিতে পারে নাই। "শিবোহং" কথা অদ্বৈত বাদীর, এই অদ্বৈতবাদ মূলক শৈব ধর্ম্মে সাধারণ লোকের ধর্ম্ম পিপাসা মিটিবে কিরূপে! শাক্তধর্ম্ম ইহার মূলে ক্রমাগত আঘাত করিতে লাগিল, প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে বিশ্বাস শাক্ত-ধর্ম্মের মজ্জাগত উপাদান, আমরা চণ্ডীকাব্য ও মনসাকাব্যে দেখিতে পাই, শৈব চাঁদ এবং শৈব ধনপতি সদাগর কত বিপদে ও লাঞ্ছনায় পতিত হইয়াছেন, তাহারা স্বীয় ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া শক্তির বিরুদ্ধে যে দুঃসহ সংগ্রাম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের অটল সংকল্পের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে, কিন্তু শিব তাহাদিগকে কিঞ্চিমাত্র ও সহায়তা করেন নাই, অথচ শক্তির উপাসকগণ বিপদে সম্পদে সর্ব্বত্র স্বীয় উপাস্য দেবতার অনুকম্পা প্রাপ্ত হইতেছেন শিবের এই নিশ্চেষ্টাতার ভিত্তি "সোহং" বাদ ও নির্গুণ ব্রহ্মবুদ্ধি। যেখানে ভগবানও জীব স্বতন্ত্র নহে, কিম্বা ভগবান শক্তি বা গুণহীন, সেখানে সহায়তার কথা উঠাই হইতে পারে না, এদিকে শাক্ত ধর্ম্মের মজ্জাগত বিশ্বাস বিশ্বকর্ত্রী ঈশ্বরী আমাদিগের জননীর ন্যায় পালিকা, জননীর ন্যায় আমাদের প্রতি পক্ষপাতিনী, তাহার ক্রোড়ে থাকিলে আমরা নিঃশঙ্ক; তিনি তাহার স্নেহাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দিতেছেন—যে অকৃতী তাহার অজ্ঞ, মূর্খ দুর্ব্বল ও পাপীর প্রতিই তাহার বেশী দয়া। "সোহং" বাদে সমস্ত উন্নতির মূলে স্বীয় চেষ্টা, শাক্ত ধর্ম্মের সমস্ত উন্নতির মূলে—তাঁহার কৃপা,

প্রত্যক্ষ ভগবানের বিশ্বাস যখন শুধু ভক্তির উচ্ছ্বাসে, [illegible]

উঠিল, তখন তাহার নাম হইল বৈষ্ণব ধর্ম্ম, আর যখন উহা প্রতি কর্ম্মে ভগবানের সহায়তার ভাব আয়ত্ত করিল, তখন উহার নাম হইল শাক্ত ধর্ম্ম। বলা বাহুল্য জন সাধারণ দুরূহ শৈব ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভক্তি ও প্রত্যক্ষ বিশ্বাসের ধর্ম্মের প্রতি বেশী আস্থাপরায়ণ হইল, এবং এই শাক্ত ও বৈষ্ণবগণের চেষ্টায় বঙ্গভাষার অসামান্য শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইল। চণ্ডীকাব্যে বা পদ্মপুরাণে চণ্ডী ও মনসার সাহায্যের যেরূপ কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অনেকটা অমার্জ্জিত, কিন্তু উহার মূলে নির্গুণ, অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্মতত্ত্বের বিরুদ্ধে সগুণ প্রত্যক্ষ নিত্য সহায় ঈশ্বরের বিশ্বাস নিহিত। শৈব ধর্ম্ম উত্তরকালে রূপান্তরিত হইয়া শাক্তধর্ম্মের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, কিন্তু যখন দুই ধর্ম্মে ঘোর প্রতিদ্বন্দিতা চলিতেছিল, তখন বঙ্গভাষার প্রথম পুষ্টির উপকরণের সংঘটন হইয়াছিল।

ধর্ম্মকলহ ও রাজানুগ্রহ বঙ্গভাষাকে উন্নতির দিকে লইয়া যাইতেছিল, কিন্তু যাহা কলহে বা অনুগ্রহে সৃষ্ট হয়—তাহা সাম্প্রদায়িক বা লোকবিশেষের মতের গণ্ডীতে নিপীড়িত থাকে,—তাহা আশ্রয় পাইয়া বাড়িয়া উঠে, কিন্তু বহু উর্দ্ধে উঠিতে পারে না, শ্রেণীবিশেষের চিন্তার সংকীর্ণতা ও ভিক্ষুকের দৈন্যে তাহা কতকটা কুণ্ঠিত হইয়া থাকিতে বাধ্য—স্বাধীন ভাবে অলৌকিক সাহসিকতার সহিত, আত্ম-ক্ষমতার পূর্ণ আস্থার দর্পে, ভিক্ষুকের দৈন্য ত্যাগ করিয়া স্বীয় বিজয় পন্থা আবিষ্কার করিতে হইলে, দেবদত্ত ক্ষমতা লইয়া কোন পুরুষবরের আবির্ভাবের প্রয়োজন, বঙ্গভাষার তৃতীয় ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট শুভযোগ চৈতন্য প্রভুর আবির্ভাব,—তাঁহার অভ্যুদয়ে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, প্রাচীন জড়ত্ব, ভাবের প্রাচীনত্ব ও অক্ষমতা বিদূরিত হইল, এবং বঙ্গভাষার কুঞ্জ উদার নীলিম আকাশের নিম্নে, ভগবৎ কৃপা ও স্বীয় অন্তর্নিহিত পোষণোপযোগী শক্তির প্রতি প্রবল আস্থায় অতি শীঘ্র অপূর্ব্ব শোভাসম্পদ্‌পূর্ণ হইয়া উঠিল। বঙ্গভাষা

চরিতসাহিত্য ধর্ম্মব্যাখ্যা ও পদ-সাহিত্য প্রভৃতি নানা প্রকার উপাদানে সহসা পরিপুষ্ট হইয়া জগৎ সমক্ষে আত্মপ্রচারের জন্য প্রস্তুত হইল।

তৎপর আরও বহুবিধ শক্তি এই ভাষার উন্নতির মুখে সবলে টানিয়া লইল, তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ইংরেজদিগের শুভাগমন।

ইংরাজরাজের সদয় অনুগ্রহে বাঙ্গালা ব্যাকরণের সৃষ্টি হইল, যাহা বহু ছিল, তাহা এক হইয়া গেল, ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গলাকে ভাষা বলিয়া কেহ গণ্য করিত না,—ইহার একটা সাধারণ সংজ্ঞা ছিল না, কেহ ইহাকে 'প্রাকৃত,' কেহ ইহাকে 'গৌড়ীয় সাধু ভাষা,' কেহ বা ইহাকে শুধু 'ভাষা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, ইহার অপূর্ব্ব বৈভব শ্রেণী-বিশেষের আদরের সামগ্রী ছিল। শাক্তগণ চণ্ডীকাব্যের, নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণ ধর্ম্মকাব্যের, বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের স্বীয় সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিতেন, এবং নিজ নিজ গণ্ডীতে পরকীয় সাহিত্যের বিষয়ের অনুশীলনের সমর্থন করিতেন না। ভাষার যথেষ্ট উপাদান ছিল—কিন্তু তাহা বিচ্ছিন্ন, অসম্পর্কিত, পরস্পরবিরোধী ও অসম ছিল। বঙ্গভাষা ললিতকলায় অসামান্য শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিল কিন্তু ইহার এক তন্ত্রীতে অঙ্গুলী স্পর্শ করিলে অপরগুলি বাজিয়া উঠিত না, ভাষাও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অমার্জ্জিত প্রাদেশিকশব্দবহুল সৌষ্ঠব-বিরহিতভাবে এক এক প্রদেশে এক এক ভাবে বিকাশ পাইয়া উঠিয়াছিল। চট্টগ্রামের পুঁথি, ঢাকার পুঁথি ও পশ্চিম বাঙ্গালার পুঁথিতে ভাষার অনৈক্য এত অধিক ছিল যে, সকলগুলিকে এক ভাষা বলিয়া পরিচয় দিতে দ্বিধা বোধ হইত।

কিন্তু ইংরেজরাজপ্রসাদে যখন এক ব্যাকরণ হইয়া বিভক্তি ও ক্রিয়াগুলির সাম্য হইয়া গেল,—তখন প্রাদেশিক কথিত ভাষাসমূহ এক মহাভাষা গঠণের জন্য সমস্ত অনৈক্য বিদায় দিয়া মহদুদ্দেশ্যে সাম্য-মূর্ত্তিতে এক স্থানে আসিয়া বসিল, ব্যক্তিগত বিভিন্নতা সমস্ত বর্জ্জন

করিয়া যেরূপ কোন উচ্চ সংকল্পে এক দেশের সমস্ত লোক—এক সুবৃহৎ জাতির সৃষ্টি করে, প্রাদেশিক কথিত ভাষাগুলি সেইরূপ ব্যাকরণের অনুশাসন মান্য করিয়া বাঙ্গলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-সাধনোদ্দেশ্যে স্বীয় স্বীয় ভেদ চিহ্নগুলি পরিহার করিল,—সুতরাং দেখা যাইতেছে ভগবানের অনুকম্পায় এই ভাষার ক্রমিক বিকাশ অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে, এত দুর্দ্দিনের মধ্যে তিনিই এক হস্তে বঙ্গের সরস্বতীকে ধরিয়া রাখিয়াছেন, বঙ্গের সম্পদলক্ষ্মী অপর হস্ত ছাড়িয়া গিয়াছেন। তিনি ভারতীর দয়া হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করেন নাই, আমরা শৈশবে ভক্তিমান হইয়া উপবাস সংকল্প করিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছি, আমরা সেই সরস্বতীর প্রফুল্লাধরের হাসির কণার জন্য লালায়িত হইয়া সমস্ত দৈন্য ভুলিয়া গিয়াছি,—বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে তাঁহার শুভ দৃষ্টি পাছে তিরোহিত হয়—এই আশঙ্কা! আবার বা প্রাদেশিক ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়া আমাদিগের অধিষ্ঠিত দেবী প্রতিমার পূজার ব্যাঘাত জন্মায়! আসামের ভাষা ও শ্রীহট্টের ভাষায় বেশী প্রভেদ নাই, অথচ এক ব্যাকরণের আশ্রয় পাইয়া শ্রীহট্ট আমাদের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছেন, আসামবাসী ভিন্ন ব্যাকরণের রাজ্যে পড়িয়া সুদূরে অবস্থিত হইয়া রহিয়াছেন,—এই প্রাদেশিক ব্যাকরণ সৃষ্টির আশঙ্কায় আমরা ভীত হইয়া পড়িয়াছি! আমরা কৃত্তিবাস ও ভারতচন্দ্র, কাশীদাস, কবিকঙ্কণ চণ্ডীদাস, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে লইয়া এই দুঃখ দারিদ্র্যের সমুদ্রে পতিত থাকিয়াও যে আশার অত্যুজ্জল স্বপ্ন গড়িতেছি, তাহা কি আমাদের ভাঙ্গিয়া যাইবে! এই যে দীনহীন বাঙ্গালীর পুস্তকগুলি মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী ও উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হইতেছে এমন কি যাহা ইংরেজগণও মাঝে মাঝে প্রশংসা করিয়া স্বীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া লইয়া থাকেন এই পুস্তকগুলি কি কালক্রমে আমাদের বংশধরগণের হস্ত হইতে দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িবে?

পূর্ব্ববঙ্গ স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলে তদ্দেশীয় শাসনকর্ত্তা অনায়াসে নব-ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদিগের উন্নত আশামঞ্জুরী ছেদন করিয়া ফেলিতে পারেন। এক সাহিত্যের দিকেই আমাদের উন্নতি হইতেছে, সেই উন্নতির মূলে পাছে কুঠারাঘাত হয়, ইহাই আমাদের দুর্ভাবনার বিষয়!

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

ভাষার ইঙ্গিত।

এ পর্য্যন্ত আমরা তিন রকমের ইঙ্গিতবাক্য পাইলাম। একটা ধ্বনিমূলক, যেমন সোঁ সোঁ, কন্‌কন্ ইত্যাদি। আর একটা, পদবিকার-মূলক যেমন খোলাখালা, গোলগাল, চুপচাপ ইত্যাদি। আর একটা পদদ্বৈতমূলক, যেমন বলাবলি দলাদলি ইত্যাদি।

ধ্বনিমূলক শব্দগুলি দুই রকমের। একটা ধ্বনিদ্বৈত, আর একটা ধ্বনিদ্বৈধ ;—ধ্বনিদ্বৈত, যেমন কলকল, কটকট ইত্যাদি; ধ্বনিদ্বৈধ, যেমন ফুটফাট, কুপকাপ ইত্যাদি। ধ্বনিমূলক এই শব্দগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়বোধ বেদনাবোধ প্রভৃতি অনুভূতি প্রকাশ করে।

পদবিকারমূলক শব্দগুলি একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থকে কেন্দ্র করিয়া তাহার চারিদিকে অনির্দ্দিষ্ট আভাসটুকু ফিকা করিয়া লেপিয়া দেয়। পদদ্বৈতমূলক শব্দগুলি, সাধারণতঃ অন্যোন্যতা প্রকাশ করে।

ধ্বনিদ্বৈধ ও পদবিকারমূলক শব্দগুলিতে আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল স্বরবিকারেরই পরিচয় পাইয়াছি যেমন হুস্ হাস্—হুসের সহিত যে

বর্ণভেদ ঘটিয়াছে তাহা স্বরবর্ণভেদ—খোলাখালা প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ। এবারে ব্যঞ্জনবর্ণ বিকারের দৃষ্টান্ত লইয়া পড়িব।

প্রথমে অর্থহীন শব্দমূলক কথাগুলি দেখা যাক্, যেমন, উস্‌খুস্, উস্কো খুস্কো, নজ্‌গজ্, নিশ্‌পিশ্, আইঢাই, কাচুমাচু, আবলতাবল, হাঁস-ফাঁস, খুঁটিনাটি, আগড়মবাগড়ম, এব্‌ড়োখেব্‌ড়ো, ছট্‌ফট্, তড়বড়, হিজি-বিজি, ফষ্টিনাষ্টি, আঁকুবাঁকু, হাব্‌জাগোব্‌জা, লট্‌খটে তড়্‌বড়ে ইত্যাদি।

এই কথাগুলির অধিকাংশই আগাগোড়া অনির্দ্দিষ্টভাব প্রকাশ করে। হাত পা চোখ মুখ কাপড়চোপড় লইয়া ছোটখাটো কত কি করাকে যে উস্‌খুস্ করা বলে তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে হতাশ হইতে হয়, কি কি বিশেষ কার্য্য করাকে যে আইঢাই করা বলে তাহা আমাদের মধ্যে কে ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে পারেন? কাঁচুমাচু করা কাহাকে বলে তাহা আমরা বেশ জানি, কিন্তু কাঁচুমাচু করার প্রক্রিয়াটি যে কি তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় বলিবার ভার লইতে পারি না।

এ ত গেল অর্থহীন কথা—কিন্তু যে জোড়া কথার প্রথমাংশ অর্থবিশিষ্ট, এবং দ্বিতীয়াংশ বিকৃতি, বাঙ্গলায় তাহার প্রধান কর্ণধার ট ব্যঞ্জনবর্ণটি। ইনি একেবারে সরকারীভাবে নিযুক্ত—জলটল, কথা-টথা, গিয়েটিয়ে কালোটালো, ইত্যাদি বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়া কোথাও ইহার অনধিকার নাই। অভিধানে দেখা যায় ট অক্ষরের কথা বড় বেশি নাই কিন্তু বেকার ব্যক্তিকে যেমন "পৃথিবী সুদ্ধ লোকের ব্যাগার ঠেলিয়া বেড়াইতে হয় তেমনি বাঙ্গলা ভাষায় কুঁড়েমি চর্চ্চার যেখানে প্রয়োজন সেইখানেই ট টাকে হাজ্‌রে দিতে হয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মূলশব্দের বিকৃতিটাকে মূলের পশ্চাতে জুড়িয়া দিয়া বাঙ্গলা ভাষা একটা স্পষ্ট অর্থের সঙ্গে অনেকখানি ঝাপ্‌সা অর্থ ইসারায় সারিয়া দেয়—জলটল গানটান তাহার দৃষ্টান্ত।

এই সরকারী টয়ের পরিবর্ত্তে এক এক সময় ফ একটিনি করিতে

আসে, কিন্তু তাহাতে একটা অবজ্ঞার ভাব আনে—যদি বলি লুচিটুচি, তবে লুচির সঙ্গে কচুরি নিম্‌কি প্রভৃতি অনেক উপাদেয় পদার্থ বুঝাইবার আটক নাই—কিন্তু লুচিফুচি বলিলে লুচির সঙ্গে লোভনীয়তার সম্পর্ক মাত্র থাকে না।

আর দুটি অক্ষর আছে, স এবং ম বিশেষভাবে কেবল কয়েকটি শব্দেই ইহাদের প্রয়োগ হয়।

স-এর দৃষ্টান্ত :—জো-সো, জড়সড় মোটাসোটা, রকমসকম, ব্যামোস্যামো, ব্যারামস্যারাম, বোকাসোকা, নরমসরম, বুড়োসুড়ো, আঁটসাঁট, গুটিয়েসুটিয়ে, বুঝেসুঝে।

ম-এর দৃষ্টান্তঃ—চটেমটে, রেগেমেগে, হিঁচ্‌ড়েমিচ্‌ড়ে, সিট্‌কেমিট্‌কে চট্‌কেমট্‌কে, চম্‌কেমম্‌কে, চেঁচিয়েমেচিয়ে, আঁৎকেমাৎকে, জড়িয়ে-মড়িয়ে, আঁচড়েমাচড়ে, শুকিয়েমুকিয়ে, কুঁচ্‌কেমুচ্‌কে, তেড়েমেড়ে, এলোমেলো, খিটিমিটি, হুড়মুড়, ঝাঁকৃড়ামাকৃরা, কটোমটো।

দেখা যাইতেছে ম-এর দৃষ্টান্তগুলি বেশ সাধু শান্তভাবের নহে—কিছু রুক্ষ রকমের। বোধ হয় চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে সচরাচর কথাতেও আমরা ম অক্ষরটাকে টয়ের পরিবর্তে ব্যবহার করি, অন্ততঃ ব্যবহার করিলে কানে লাগে না—কিন্তু সে সকল জায়গায় ম আপনার মেজাজটুকু প্রকাশ করে—আমরা "বিষ-মিষ" বলিতে পারি কিন্তু "সন্দেশমন্দেশ" যদি বলি তবে সন্দেশের গৌরবটুকু একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। "দুটো ঘুষোমুষো লাগিয়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে" এ কথা বলা চলে, কিন্তু "বন্ধুকে যত্নমত্ন" বা "গরিবকে দানমান করা উচিত" এ একেবারে অচল—হিংসেমিংসে করা যায় কিন্তু ভক্তিমক্তি করা যায় না, তেমন্ন তেমন স্থলে খোঁচামোচা দেওয়া যায় কিন্তু আদরমাদর নিষিদ্ধ। অতএব টয়ের ন্যায় ফ ও ম প্রশান্ত নিরপেক্ষ স্বভাবের নহে—ইহা নিশ্চয়।

তারপরে, কতকগুলি বিশেষ কথার বিশেষ বিকৃতি প্রচলিত আছে। সেগুলি সেই কথারই সম্পত্তি। যেমনঃ—পড়েহড়ে, বেছেগুছে, মিলেজুলে, খেয়েদেয়ে, মিশেগুশে, সেজেগুজে, মেখেচুখে, জুটেপুটে, লুটেপুটে, চুকেবুকে, বকেঝকে। এইগুলি বিশেষ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত।

উল্লিখিত তালিকাটি ক্রিয়াপদের। এখানে বিশেষ্য পদেরও দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারেঃ—কাপড়চোপড়, আশপাশ, বাসনকোসন, রসকস, রাবদাব, গিন্নিবান্নি, তাড়াহুড়ো, চোটপাট, চাকরবাকর, হাঁড়িকুঁড়ি,* ফাঁকিজুকি, আঁকজোক, এলাগোলা, এলোথেলো, বেঁটেখেটে, খাবার-দাবার, ছুঁতোনাতা, চাষাভুষো,† অন্ধিসন্ধি, অলিগলি, হাবুডুবু, নড়বড়, হুলস্থূল।

এই দৃষ্টান্তগুলির গুটীকয়েক কথায় একটা উল্টাপাল্টা দেখা যায়—বিকৃতিটা আগে এবং মূলশব্দটা পরে যেমনঃ—আশপাশ, অন্ধিসন্ধি, অলিগলি, হাবুডুবু, হুলস্থূল।

উল্লিখিত তালিকার প্রথমার্দ্ধের শেষ অক্ষরের সহিত শেষার্দ্ধের শেষ অক্ষরের মিল পাওয়া যায়। কতকগুলি কথা আছে যেখানে সে মিলটুকুও নাই। যেমন, দৌড়ধাপ, পুঁজিপাটা, কান্নাকাটি, তিতিবিরক্ত।

এইবার আমরা ক্রমে ক্রমে একটা জায়গায় আসিয়া পৌঁছিতেছি যেখানে জোড়াশব্দের দুইটি অংশই অর্থবিশিষ্ট। সেস্থলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুসারে তাহাকে সমাসের কোটায় ফেলা উচিত ছিল। কিন্তু কেন যে তাহা সম্ভবপর নহে দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহা বোঝানো

---

* সংস্কৃত ভাষায় কুণ্ডীশব্দের অর্থ পাত্রবিশেষ, সম্ভবতঃ ইহা হইতেই হাঁড়ি-কুঁড়ি শব্দের কুঁড়ি উৎপন্ন—এই সকল তালিকার মধ্যে এমন আরো থাকিতে পারে যে স্থলে এই দোসর শব্দগুলিকে অর্থহীনের কোঠায় ফেলা চলিবে না।

† "ছুঁতো" নাতা শব্দে "ছুতা" কি নিয়ম অনুসারে ছুঁতো হইয়াছে, এবং "চাষা ভুষো" শব্দের "ভুষা" কি কারণে "ভুষো" হইল পূর্ব্বেই তাহা বলিয়াছি।

যাক্।—ছাইভস্ম, কালিকিষ্টি, লজ্জাসরম প্রভৃতি জোড়াকথার দুই অংশের একই অর্থ—এ কেবল জোর দিবার জন্য কথাগুলাকে গালভরা করিয়া তোলা হইয়াছে। এইরূপ সম্পূর্ণ সমার্থক বা প্রায় সমার্থক জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেল :—

চিঠিপত্র, লোকজন, ব্যবসাবাণিজ্য, দুঃখধান্দা, ছাইপাঁশ, ছাইভস্ম, মাথামুণ্ডু, কাজকর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, ছোটোখাটো, ছেলেপুলে, ছেলেছোকরা, খড়কুটো, সাদাসিধে, জাঁকজমক, বসবাস, সাফসুৎরো, ত্যাড়াবাঁকা, পাহাড়পর্ব্বত, মাপজোখ, সাজসজ্জা, লজ্জাসরম, ভয়ডর, পাকচক্র, ঠাট্টা-তামাসা, ইসারাইঙ্গিত, পাখীপাখালী, জন্তুজানোয়ার, মাম্‌লামকদ্দমা, গা-গতর, খবরবার্ত্তা, অসুখবিসুখ, গোনাগুন্তি, ভরাভর্ত্তি, কাঙালগরিব, গরিবদুঃখী, গরীবগুর্ব্বো, রাজারাজ্‌ড়া, খাটপালং, বাজনাবাদ্য, কালো-কিষ্টি, দয়ামায়া, মায়ামমতা, ঠাকুরদেবতা, তুচ্ছতাচ্ছল্য, চালাকচতুর, শক্তসমর্থ, গালিগালাজ, ভাবনাচিন্তে, ধরপাকড়, টানাহ্যাঁচড়া, বাঁধাছাঁদা, আচাকোঁধা, বলাকওয়া, করাকর্ম্মা।

এমন কতকগুলি কথা আছে যাহার দুই অংশের কোনও অর্থ সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না যেমন—মেগেপেতে, কেঁদেকেটে, বয়েছেয়ে, ঝেড়েতেড়ে, পুড়েঝুড়ে, কুড়িয়েবাড়িয়ে, আগেভাগে, গালমন্দ, পাকে-প্রকারে।

বাঙ্গালা ভাষায় "পত্র" শব্দযোগে যে কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে সে গুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কারণ, গহনাপত্র শব্দে গহনা শব্দের সহিত পত্র শব্দের কোনও অর্থসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ঐরূপ তৈজসপত্র, জিনিসপত্র, খরচপত্র, বিছানাপত্র, ঔষধপত্র, হিসাবপত্র, দেনাপত্র, আস্‌বাবপত্র, পুঁথিপত্র, বিষয়পত্র, চোতাপত্র, দলিলপত্র, এবং খাতাপত্র। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও কথায় পত্র শব্দের কিঞ্চিত সার্থকতা পাওয়া যায় কিন্তু অনেক স্থলে নয়।

যে সকল জোড়াশব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু অং
কাছাকাছি তাহাদের দৃষ্টান্তঃ—মালমস্‌লা, দোকানহাট, হাঁকডা
ধীরেসুস্থে, ভাবগতিক, ভাবভঙ্গি, লম্ফঝম্ফ, চালচলন, পালপা
কাণ্ডকারখানা, কালিঝুল, ঝড়ঝাপট, বনজঙ্গল, খানাখন্দ, জোতজ
লোকলস্কর, চুরিচামারি, উঁকিঝুঁকি, পাঁজিপুঁথি, লম্বাচওড়া, দলাম
বাছবিচার, জ্বালাযন্ত্রণা, সাতপাঁচ, নয়ছয়, ছকড়নকড়া, উনিশ
সাতসতেরো, আলাপপরিচয়, কথাবার্ত্তা, বনবাদাড়, ঝোপঝাড়, হ
খুসি, আমোদ আহ্লাদ, লোহালক্কড়, শাকসবজি, বৃষ্টিবাদল, ঝড়তুফ
লাথিঝাঁটা, সেকতাপ, আদর অভ্যর্থনা, চালচুলো, চাষবাস, মুটেম
ছলবল।

ছাইভস্ম প্রভৃতি দুই সমানার্থক জোড়শব্দ জোড় দিবার জন্য প্র
করা হয়—"মালমসলা" "দোকানহাট" প্রভৃতি সমশ্রেণীর ভিন্না
জোড়াশব্দে একটা ইত্যাদিসূচক অনির্দ্দিষ্টতা প্রকাশ করে। ক
কারখানা, চুরিচামারি, হাসিখুসি প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে ভাষাও ভ
আভাসও আছে।

যে সকল পদার্থ আমরা সচরাচর এক সঙ্গে দেখি তাহাদের ম
বাছিয়া দুটি পদার্থের নাম একত্রে জুড়িয়া বাকিগুলাকে ইত্যাদি
বুঝাইয়া দেবার প্রথাও বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। যেমন ঘটিব
যদি বলা যায় "ঘটিবাটি সাম্‌লাইয়ো" তাহার অর্থ এমন নহে যে
ঘটি ও বাটিই সাম্‌লাইতে হইবে—এই সঙ্গে থালা ঘড়া প্রভৃতি অ
অস্থাবর জিনিষ আসিয়া পড়ে। কাহারো সহিত মাঠে ঘাটে দেখা হ
থাকে বলিলে কেবল যে ঐ দুটি মাত্র স্থানেই সাক্ষাৎ ঘটে তাহা বু
না, উক্ত লোকটির সঙ্গে যেখানে সেখানেই দেখা হয় এইরূপ বুঝি
হয়। এইরূপ জোড়া কথার দৃষ্টান্তঃ—

পথঘাট, ঘরদুয়োর, ঘটিবাটি, কাছাকোঁচা, হাতিঘোড়া, বাঘভা

বাক্।—ছাইভস্ম, কালিকিষ্টি, লজ্জাসরম প্রভৃতি জোড়া কথার দুই অংশের একই অর্থ—এ কেবল জোর দিবার জন্য কথাগুলাকে গালভরা করিয়া তোলা হইয়াছে। এইরূপ সম্পূর্ণ সমার্থক বা প্রায় সমার্থক জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেল :—

চিঠিপত্র, লোকজন, ব্যবসাবাণিজ্য, দুঃখধান্দা, ছাইপাঁশ, ছাইভস্ম, মাথামুণ্ডু, কাজকর্ম্ম, ক্রিয়াকর্ম্ম, ছোটোখাটো, ছেলেপুলে, ছেলেছোকরা, খড়কুটো, সাদাসিধে, জাঁকজমক, বসবাস, সাফসুৎরো, ত্যাড়াবাঁকা, পাহাড়পর্ব্বত, মাপজোখ, সাজসজ্জা, লজ্জাসরম, ভয়ডর, পাকচক্র, ঠাট্টা-তামাসা, ইসারাইঙ্গিত, পাখীপাখালী, জন্তুজানোয়ার, মাম্‌লামকদ্দামা, গা-গতর, খবরবার্ত্তা, অসুখবিসুখ, গোনাগুন্তি, ভরাভর্ত্তি, কাঙালগরিব, গরিবদুঃখী, গরীবগুর্ব্বো, রাজারাজ্‌ড়া, খাটপালং, বাজনাবাদ্য, কালো-কিষ্টি, দয়ামায়া, মায়ামমতা, ঠাকুরদেবতা, তুচ্ছতাচ্ছল্য, চালাকচতুর, শক্তসমর্থ, গালিগালাজ, ভাবনাচিন্তে, ধরপাকড়, টানাহ্যাঁচড়া, বাঁধাছাঁদা, নাচাকোঁধা, বলাকওয়া, করাকর্ম্মা।

এমন কতকগুলি কথা আছে যাহার দুই অংশের কোনও অর্থ সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না যেমন—মেগেপেতে, কেঁদেকেটে, বয়েছেয়ে, জুড়েতেড়ে, পুড়েঝুড়ে, কুড়িয়েবাড়িয়ে, আগেভাগে, গালমন্দ, পাকে-প্রকারে।

বাঙ্গালা ভাষায় "পত্র" শব্দযোগে যে কথাগুলির উৎপত্তি হইয়াছে সে গুলিকেও এই শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে। কারণ, গহনাপত্র শব্দে গহনা শব্দের সহিত পত্র শব্দের কোনও অর্থসামঞ্জস্য দেখা যায় না। ঐরূপ তৈজসপত্র, জিনিসপত্র, খরচপত্র, বিছানাপত্র, ঔষধপত্র, হিসাবপত্র, দেনাপত্র, আস্‌বাবপত্র, পুঁথিপত্র, বিষয়পত্র, চোতাপত্র, দলিলপত্র, এবং খাতাপত্র। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও কথায় পত্র শব্দের কিঞ্চিত সার্থকতা পাওয়া যায় কিন্তু অনেক স্থলে নয়।

যে সকল জোড়াশব্দের দুই অংশের এক অর্থ নহে কিন্তু অর্থটা কাছাকাছি তাহাদের দৃষ্টান্তঃ—মালমস্‌লা, দোকানহাট, হাঁকডাক, ধীরেসুস্থে, ভাবগতিক, ভাবভঙ্গি, লম্ফঝম্ফ, চালচলন, পালপার্ব্বন, কাণ্ডকারখানা, কালিঝুল, ঝড়ঝাপট, বনজঙ্গল, থানাখন্দ, জোতজমা, লোকলস্কর, চুরিচামারি, উঁকিঝুঁকি, পাঁজিপুঁথি, লম্বাচওড়া, দলামলা, বাছবিচার, জ্বালাযন্ত্রণা, সাতপাঁচ, নয়ছয়, ছকড়নকড়া, উনিশবিশ, সাতসতেরো, আলাপপরিচয়, কথাবার্ত্তা, বনবাদাড়, ঝোপঝাড়, হাসিখুসি, আমোদ আহ্লাদ, লোহালক্কড়, শাকসবজি, বৃষ্টিবাদল, ঝড়তুফান, লাথিঝাঁটা, সেকতাপ, আদর অভ্যর্থনা, চালচুলো, চাষবাস, মুটেমজুর, ছলবল।

ছাইভস্ম প্রভৃতি দুই সমানার্থক জোড়শব্দ জোড় দিবার জন্য প্রয়োগ করা হয়—"মালমসলা" "দোকানহাট" প্রভৃতি সমশ্রেণীর ভিন্নার্থক জোড়াশব্দে একটা ইত্যাদিসূচক অনির্দ্দিষ্টতা প্রকাশ করে। কাণ্ডকারখানা, চুরিচামারি, হাসিখুসি প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে ভাষাও আছে আভাসও আছে।

যে সকল পদার্থ আমরা সচরাচর এক সঙ্গে দেখি তাহাদের মধ্যে বাছিয়া দুটি পদার্থের নাম একত্রে জুড়িয়া বাকিগুলাকে ইত্যাদিভাবে বুঝাইয়া দেবার প্রথাও বাঙ্গলায় প্রচলিত আছে। যেমন ঘটিবাটি। যদি বলা যায় "ঘটিবাটি সাম্‌লাইয়ো" তাহার অর্থ এমন নহে যে কেবল ঘটি ও বাটিই সাম্‌লাইতে হইবে—এই সঙ্গে থালা ঘড়া প্রভৃতি অনেক অস্থাবর জিনিষ আসিয়া পড়ে। কাহারো সহিত মাঠে ঘাটে দেখা হইয়া থাকে বলিলে কেবল যে ঐ দুটি মাত্র স্থানেই সাক্ষাৎ ঘটে তাহা বুঝায় না, উক্ত লোকটির সঙ্গে যেখানে সেখানেই দেখা হয় এইরূপ বুঝিতে হয়। এইরূপ জোড়া কথার দৃষ্টান্তঃ—

পথঘাট, ঘরদুয়োর, ঘটিবাটি, কাছাকোঁচা, হাতিঘোড়া, বাঘভাল্লুক,

খেলাধুলো (খেলা দেয়ালা) পড়াশুনো, খালবিল, লোকলস্কর, গাড়ু গামছা, লেপকাঁথা, গানবাজনা, ক্ষেতখোলা, কানাখোঁড়া, কালিয়া-পোলাও, শাকভাত, সেপাইসান্ত্রি, নাড়িনক্ষত্র, কোলেপিঠে, কাঠখড়, দত্যিদানো, ভূতপ্রেত।

বিপরীতার্থক শব্দ জুড়িয়া সমগ্রতা ও বৈপরীত্য বুঝাইবার দৃষ্টান্ত :—আগাগোড়া, ল্যাজামুড়ো, আকাশপাতাল, দেওয়াথোওয়া, নরমগরম, আনাগোনা, উল্টোপাল্টা, তোলপাড়, আগাপাস্তাড়া।

এই যত প্রকার জোড়াশব্দের তালিকা দেওয়া গেছে সংস্কৃত সমাসের সঙ্গে তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, শব্দগুলির যে অর্থ তাহাদের ভাবটা তাহার চেয়ে বেশী এবং এই কথার জুড়িগুলি যেন একেবারে চিরদাম্পত্যে বাঁধা—বাঘভালুক না বলিয়া বাঘসিংহ বলিতে গেলে একটা অত্যাচার হইবে। বনজঙ্গল এবং ঝোপঝাড় শব্দকে বনঝাড় এবং ঝোপজঙ্গল বলিলে ভাষা ক্লিষ্ট হয় অথচ অর্থের অসঙ্গতি হয় না।

এইখানে ইংরাজীতে যে সকল ইঙ্গিত বাক্য প্রচলিত আছে তাহার যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে উল্লেখ করিতে ইচ্ছা করি। বাংলার সহিত তুলনা করিলে পাঠকেরা সাদৃশ্য দেখিতে পাইবেন। Nick-nack, riff-raff, wishy-washy, dilly-dally, shilly-shally, pit-a-pat, bric-a-brac.

এই উদাহরণ গুলিতে জোড়া শব্দের দ্বিতীয়ার্দ্ধে আকারের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে। আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, বাঙ্গালাতেও এরূপ স্থলে শেষার্দ্ধে আকারটাই আসিয়া পড়ে। যেমন, হো-হা, জো-জা, জোর-জার। কিন্তু যেখানে প্রথমার্দ্ধে আকার থাকে দ্বিতীয়ার্দ্ধে সেখানে ওকারের প্রচলনই বেশী, যেমন ঘা-ঘো, টান-টোন, টায় টোয়, ঠারে-ঠোরে। সব শেষে যদি ইকার থাকে তবে মাঝের ওকার উ হইয়া যায়, যেমন জারি-জুরি।

দ্বিতীয়ার্দ্ধে ব্যঞ্জনবর্ণ বিকারের দৃষ্টান্ত—Hotch-potch, higgledy-piggledy, harum-scarum, helter-skelter, hoity-toity, hurly-burly, rolly-polly, hugger-mugger, namby-pamby, wish-washy.

আমাদের যেমন টুংটাং ইংরাজীতে তেমনি dingdong—আমাদের যেমন ঠঙাঠঞ্ ইংরাজীতে তেমনি ding-a-dong।

প্রথমার্দ্ধের সহিত দ্বিতীয়ার্দ্ধের মিল নাই এমন দৃষ্টান্ত :—Topsy-turvy.

জোড়াশব্দের দুই অংশে মিল নাই এমন কথা সকল ভাষাতেই দুর্লভ। মিলের দরকার আছে। মিলটা মনের উপর ঘা দেয়, তাহাকে বাজাইয়া তোলে—একটা শব্দের পরে ঠিক তাহার অনুরূপ আর একটা শব্দ পড়িলে সচকিত মনোযোগ ঝঙ্কৃত হইয়া উঠে, জোড়ামিলের পরস্পর ঘাত প্রতিঘাতে মনকে সচেষ্ট করিয়া তোলে—সে, সুরের সাহায্য অনেকখানি আন্দাজ করিয়া লয়। কবিতার মিলও এই সুবিধাটুকু ছাড়ে না—ছন্দের পর্ব্বে পর্ব্বে বারম্বার আঘাতে সে মনের বোধশক্তিকে জাগ্রত করিয়া রাখে—কেবল মাত্র কথার দ্বারা মন যতটুকু বুঝিত মিলের ঝঙ্কারে অনির্দ্দিষ্টভাবে তাহাকে আরো অনেকখানি বুঝাইয়া দেয়। অনির্ব্বচনীয়কে প্রকাশ করিবার ভার যাহাকে লইতে হয় তাহাকে এইরূপ কৌশল অবলম্বন না করিলে চলে না।

এইখানে আমার প্রবন্ধের উপসংহার করিব। আমার আশঙ্কা হইতেছে এই প্রবন্ধের বিষয়টি অনেকের কাছে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া ঠেকিবে। আমার কৈফিয়ৎ এই যে বিজ্ঞানের কাছে কিছুই অবজ্ঞেয় নাই এবং প্রেমের কাছেও তদ্রূপ। আমার মত সাহিত্য-ওয়ালা বিপদে পড়িয়া বিজ্ঞানের দোহাই মানিলে লোকে হাসিবে কিন্তু প্রেমের নিবেদন যদি জানাই, বলি মাতৃভাষার কিছুই আমার কাছে

তুচ্ছ নহে তবে আশা করি কেহ নাসা কুঞ্চিত করিবেন না। মাতাকে সংস্কৃত ভাষার সমাসসন্ধি তদ্ধিৎপ্রত্যয়ে দেবীবেশে ঝল্‌মল্‌ করিতে দেখিলে গর্ব্ব বোধ হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্মের সংসারে আটপৌরে কাপড়ে তাঁহাকে জননী বেশে দেখিতে যদি লজ্জা বোধ করি, তবে সেই লজ্জার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত।

বৈয়াকরণের যে সকল গুণ ও বিদ্যা থাকা উচিত তাহা আমার নাই,—শিশুকাল হইতে স্বভাবতঃই আমি ব্যাকরণভীরু—কিন্তু বাঙ্গালা ভাষাকে তাহার সকল প্রকার মূর্ত্তিতেই আমি হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি, এইজন্য তাহার সহিত তন্ন তন্ন করিয়া পরিচয় সাধনে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। এই চেষ্টার ফলস্বরূপে ভাষার ভাণ্ডার হইতে যাহা কিছু আহরণ করিয়া থাকি মাঝে মাঝে তাহার এটা ওটা সকলকে দেখাইবার জন্য আনিয়া উপস্থিত করি, ইহাতে ব্যাকরণকে চির ঋণে বদ্ধ করিতেছি বলিয়া স্পর্দ্ধা করিব না, ভূল চুক অসম্পূর্ণতাও যথেষ্ট থাকিবে—কিন্তু আমার এই চেষ্টায় কাহারও মনে যদি এরূপ ধারণা হয় যে, প্রাকৃত বাঙ্গলা ভাষার নিজের একটা স্বতন্ত্র আকার প্রকার আছে এবং এই আকৃতি প্রকৃতির তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া শ্রদ্ধার সহিত অধ্যবসায়ের সহিত বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ রচনায় যদি যোগ্য লোকের উৎসাহ বোধ হয় তাহা হইলে আমার এই বিস্মরণযোগ্য ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা সকল সার্থক হইবে।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ ঠাকুর।

ত্রয়স্ত্রিংশতম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বোক্ত ঘটনার দিবস অপরাহ্নে মুন্না আসিয়া রাজাকে ব্রাহ্মণের অবস্থার কথা জানাইল! রাণী নারায়ণী ও তুলসী একে একে সকলেই সে কথা শুনিল। রাণী অর্দ্ধমৃতের ন্যায় আপনার ঘরে পড়িয়া রহিলেন। নারায়ণী পিতামহীর কাছে বসিয়া রহিল।

তুলসা ভাবিল, আমি কেন তবে জীবনের শ্রেষ্ঠসাধ স্বামী সুখ হইতে বঞ্চিত হই। যে জন্য স্বামীর সহিত দেখা করিবে না বলিয়া সে গুরুর কাছে প্রতিশ্রুত ছিল তাহা ত নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে! রাজার অবস্থার আর রহিল কি।

তুলসী সেইদিনেই সদাশিবকে দেখিবার সঙ্কল্প করিল! ভাবিল, মুন্না যখন আসিয়াছে, তখন এ শুভ অবকাশ পরিত্যাগ করিবনা।

কিন্তু মুন্না রাজার কাছে বসিয়া চুপিচুপি কি কথা কহিতেছিল। সেরূপ অবস্থায় নিকটে যাওয়া উচিত হয় না, তুলসী অপেক্ষায় দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু কথা আর ফুরায় না। উভয়েই যেন বাহ্যজ্ঞান শূন্য। তুলসা সম্মুখ দিয়া কতবার যাতায়াত করিল, উভয়ে দেখিয়াও দেখিল না। যখন তাহাদের কথা শেষ হইল, তখন রাত্রি হইয়াছে।

মুন্না সেখানে সর্ব্বপ্রথম আসিয়াছে। তুলসী ভাবিল, ব্রাহ্মণের অবস্থার সঙ্গে রাজা, তাহার পিতার সংবাদ গ্রহণ করিতেছেন। তাই কথা শেষ করিতে মুন্নার এত বিলম্ব। কথা শেষে মুন্না প্রভু কন্যার নিকটে আসিল। রাজা তুলসীকে তাহার পরিচর্য্যার ভারগ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন! বলিলেন, "লোকটা সারাদিন উপবাসী, তাহার আহারের একটা ব্যবস্থা কর।" আহারের ব্যবস্থা করিতে করিতে

তুলসী মুন্নাকে মনের কথা খুলিয়া বলিল। মুন্না তাহাকে সদাশিবের কাছে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল।

দেবতাদর্শনের ছল করিয়া তুলসী রাণীর নিকট অনুমতি গ্রহণ করিল ; এবং সেইরাত্রে স্বামীকে দেখিতে মুন্নার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল।

বার বৎসরের পর স্বামীদর্শন! সেই পূর্ব্বযুগের স্বামীর মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিয়া ব্রহ্মচারিণী তুলসী বার বৎসর তার পূজা করিয়াছে। সিদ্ধিলাভ ঘটিবে কি? গৃহের বাহিরে পা দিতেই তুলসীর মাথার কাছে টিকটিকি পড়িল। তুলসীর হৃদয়টা কাঁপিয়া উঠিল। হৃদয়ের মধ্যস্থ মূর্ত্তিটা যেন ভাঙ্গিয়া গেল। অন্তশ্চক্ষু দিয়া তুলসী আর একবার মূর্ত্তির পানে চাহিল ; দেখিল মূর্ত্তি ম্লান।

তথাপি তুলসী ফিরিতে পারিল না। মনে মনে ভাবিল—কি জানি কি দেখিব। আমার এখন যা অবস্থা,রমণীর ইহা অপেক্ষা দুরবস্থা আর কি আছে!

প্রথমে তুলসী মনে করিয়াছিল, স্বামীর সহিত দেখা হইলে, কত কথাই বলিবে। কিন্তু যতই সে অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই দেখিল, যেন কথাগুলা মন হইতে একটি করিয়া সরিয়া যাইতেছে।

মুন্না তাহাকে নানা স্থান ঘুরাইয়া, সেই বাগানে আনিয়া উপস্থিত করিল। সেখানে একটা তরুকুঞ্জের আবরণের মধ্যে দাঁড় করাইয়া বলিল—"এইস্থানে অপেক্ষা কর, আমি সন্ধান করিয়া আসি।" মুন্না প্রস্থান করিলে, তুলসী অনেকক্ষণ সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রমে তাহার বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল; মনে করিল, এমন সুন্দর বাগানটায় একটু বেড়াইতে ক্ষতি কি? কিছুদূর যাইতেই তুলসী দেখিল, বেদীর উপর প্রহরিবেশী কে একজন ঘুমাইতেছে।

ক্ষিপ্রগতিতে তুলসী আবার কুঞ্জের আশ্রয় গ্রহণ করিল।

মুন্না ফিরিয়া বলিল—"সন্ধান পাইলাম না।"

তুলসী বলিল—"দেখ দেখি বেদীতে কে ঘুমাইতেছে?"

মুন্না দেখিয়া ফিরিল—

"ঠিক দেখিয়াছ। তোমার স্বামীই ঘুমাইতেছে।"

"তুমি তামাসা করিতেছ।"

"এই কি তামাসা করিবার সময়!"

"এত পরিবর্ত্তন!"

"তার আর আশ্চর্য্য কি! সেই বার বৎসর আগের চেহারা এখন কোথা পাইবে!"

"হৃদয়ের মূর্ত্তি যে ভাঙ্গিয়া গেল।"

"তাহাকে আর আস্ত রাখিবার প্রয়োজন ?"

"মুন্না বার বৎসর ধরিয়া, কল্পনার রাজ্য হইতে কত সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার আনিয়া আমার হৃদয়ের সেই কিশোর মূর্ত্তিটীকে সাজাইয়াছি। এখন দেখি ভস্মে ঘী ঢালিয়াছি। মনের মত সাজাইয়াও তাহাকে এত সুন্দর করিতে পারি নাই।"

মুন্না মনে করিয়াছিল, সদাশিবের বর্ত্তমান রূপ বুঝি তুলসীর ভাল লাগে নাই! সেইটীই তার প্রার্থনীয় ছিল। আর সে জানিত, তাহার শৈলজানন্দ, সেই উদ্দেশ্যেই একমাত্র নন্দিনীকে স্বামী-বিয়োগিনী রাখিয়াছিল। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, ব্রহ্মচারিণীর চক্ষে আর রূপের আদর থাকিবেনা। কিন্তু এখন দেখিল, প্রভুও ভস্মে ঘি ঢালিয়াছে। সে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিতে চাও?"

"আমার স্বামীকে আমি পাইতে চাই। পাইলে সঙ্গে রাখিব, তোদের দেশে আর পাঠাইব না। আমার সে বালকটাকে তোরা এখানে পাঠাইয়া দিস্।"

তুলসী নিদ্রিত স্বামীকে দূর হইতে দেখিতে দেখিতে, সুখের সংসারের একটা মনোরম চিত্র আঁকিতে বসিল।

মুন্না মনে করিল, ইহাদের মিলন তাহার পক্ষে বড় সুবিধাজনক নয়। যেমন করিয়া হউক, ইহার হাত হইতে সদাশিবকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতে হইবে। মিলনের আগে সদাশিবকে প্রস্তুত করিবার উদ্দেশ্যে সে তুলসীকে ক্ষণেক অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। বলিল —"আমি ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত দেখা করিও না।"

মুন্না সদাশিবের নিদ্রার অবকাশে, আনন্দদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তারপর যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে।

দরিদ্রার মনোরথ হৃদয়ে একবার মাত্র উথিত হইয়াই মিলাইয়া গেল। তুলসী জানকীকে দেখিল, স্বামীকে দেখিল। দুইজনে বেদীর উপরে বসিয়া যখন কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, তখন কান পাতিয়া তাহাদের কথাগুলা শুনিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু হৃদয়ের অবিরাম উত্থান পতনে তাহার প্রাণের ভিতর একটা বিষম কোলাহল উত্থিত হইল, তুলসী শুনিতে পাইল না।

তুলসী তখন মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিল। এতকাল পরে আমার স্বামী দেখিবাব সাধ হইল। অদৃষ্টে যদি স্বামী সৌভাগ্যই থাকিবে, তবে এতকাল কি অপরাধে বিধবার দশা ভোগ করিতেছি!" রমণীকে তাহার স্বামী পার্শ্বগতা দেখিয়াও তুলসীর মনে ঈর্ষা আসিলনা! কেন আসিল না, যে পুরুষ কিম্বা যে রমণী দ্বাদশ বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যে অভ্যস্ত তিনি ভিন্ন আর কে এ প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ? সে কেবল বুঝিল, আমি উপেক্ষিতা।

তুলসী গৃহে ফিরিবার অবসর খুঁজিতেছিল; এমন সময়ে দেখিল, মুন্না আসিয়া রমণীকে সঙ্গে লইয়া চলিল। সুন্দরী মনে করিল, মুন্না বুঝি তাহার সেখানে অবস্থিতির কথা সদাশিবকে বলিয়াছে! কিন্তু সদাশিবত লজ্জার কোনও নিদর্শন দেখাইল না!

"এ তবে কি দেখিলাম!" ক্রমে যেন সমস্ত ঘটনাটা তুলসীর স্বপ্নবৎ বোধ হইতে লাগিল। আবার নির্জনতা! সদাশিব এবার বিনিদ্র। চন্দ্রালোকিত বেদীর উপরে, হাতের উপর ঈষৎ ভর দিয়া, সুন্দর দেহ একটু হেলাইয়া, চাঁদের উপর নিবিষ্টচক্ষু সদাশিব নিজের রূপেই যেন সমস্ত বাগানটা আলো করিয়া বসিয়া আছে!

তুলসী ভাবিল, "এমন রত্ন—আমার বিধিদত্ত ধন, হাতে পাইয়া ছাড়িতে যাইব কেন?"

সুন্দরী কুঞ্জান্তরাল পরিত্যাগ করিল, দারোগার সম্মুখে অস্ত্রধারিণী রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণা ভবানী, নবোঢ়ার কম্পিত হৃদয় লইয়া, কম্পিত পদে ধীরে ধীরে স্বামীর দিকে অগ্রসর হইল। নিকটে উপস্থিত হইতেই স্বামীর দীর্ঘশ্বাস, আর সেই সঙ্গে আক্ষেপ কথাটাও তাহার কাণে পৌঁছিল।

তুলসীর এবারে ক্রোধ হইল। তাহার নিকট হইতে বার বৎসর বিচ্ছিন্ন—মুহূর্ত্তের জন্য স্বামীর মনে তাহার চিন্তাটা স্থান পাইল না, আর এই অজ্ঞাতকুলশীলা রমণী ক্ষণেকের অনুপস্থিতিতে অকৃতজ্ঞস্বামীর হৃদয়ের সমস্ত আবেগটা আকৃষ্ট করিয়া লইয়া গেল!

উপহাসের ছলে তুলসী স্বামীকে শুনাইবার জন্য মনে একরাশ কথার সঞ্চার করিল; কিন্তু অভয় বাণীটী ছাড়া সমস্ত কথাই তার কণ্ঠদেশে সংলগ্ন হইয়া রহিল—বাহির হইল না।

সদাশিব কথা শুনিয়া যখন ফিরিয়া দেখিল, তখন তুলসী ক্ষোদিত মর্ম্মর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল। সদাশিব যখন মূর্চ্ছিত হইল, তখন তুলসী বুঝিল স্বামী বহু দোষের আকর হইয়াছে। স্বামী সম্ভাষণের যৎ-সামান্য আশাও যা সে হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল, তাহাকে জলাঞ্জলি দিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল!

কার্য্যের সঙ্গে কারণের একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নির্ণয়ের জন্য

বৈজ্ঞানিক পুরুষানুক্রমে চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু প্রকৃতি তাহার চক্ষে ধূলি দিয়া, কখন, কোন স্থানে, কি ভাবে এক একটা কার্য্য করে, যে শতচেষ্টায়ও মানুষ তাহার সূত্রানুসন্ধানে সমর্থ হয় না।

এই একটি সামান্য আকস্মিক ঘটনায় এক অশীতিপর বৃদ্ধের আজন্ম চেষ্টিত কার্য্য একদণ্ডে নিষ্ফল হইয়া গেল। কেমন করিয়া, পরে বলিতেছি।

চতুস্ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

তুলসী প্রতি প্রভাতে খিড়কীর সেই উদ্যানটাতে পুষ্পচয়ন করিত। সে দিন সূর্য্যোদয়ের অনেক পূর্ব্বেই সে বাগানে উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইয়াই দেখিল, রাজা সেখানে একটা অর্দ্ধভগ্ন পুষ্পবাটিকাকে বেষ্টন করিয়া পদচারণ করিতেছেন।

দেখিয়া, সুন্দরী হাতের সাজী ও আকর্ষী ভূমিতে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রাজা আশীর্ব্বাদ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি তুলসী! দেব দর্শন হইল?"

তুলসী বুঝিল, রাজা সমস্তই জানিয়াছেন। তখন আর লজ্জার প্রয়োজন কি! সস্মিত মুখে যুবতী উত্তর করিল—

"হইয়াও হইল না।"

"কেন?

"দেবতার মাথা কালাপাহাড়ে ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।"

"আমার এ অনন্তপুরে এমন কালাপাহাড় কোথা হইতে আসিল?"

"সেটা মহারাজ যেরূপ জানিবেন, আমার সেরূপ জানিবার সম্ভাবনা কই!"

এই বলিয়া তুলসী ঘটনাটা যথাসম্ভব বিবৃত করিল। "তাই যদি হয়, তাহাতে তোমার অক্ষেপ করিবার কি আছে! তুমি যে মা এক যুগ ত্যাগ শিক্ষা করিয়া, সকল অবস্থার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছ।"

তুলসী এবারে আর অশ্রুসম্বরণ করিতে পারিল না। বিশাল চক্ষু দুটী অঞ্চলাচ্ছাদিত করিয়া বলিতে লাগিল—"মহারাজ! কৃপণের ধন,—আছে, এই আশ্বাসে জীবিত ছিলাম—ও অপহৃত জানিলে কতক্ষণ বাঁচিব!"

রাজা আশ্বাস দিয়া বলিলেন—"ভয় নাই; তোমার কঠোর তপস্যা যাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে, সে সামগ্রী সহজে ডাকিণীর গ্রাসে যাইবার নয়। তুমি নিশ্চিন্ত থাক; সে সামগ্রী এখনও তোমারই আছে!"

বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে তুলসী রাজার মুখ পানে চাহিয়া রহিল। রাজা বলিতে লাগিলেন; "কিন্তু মা! ক্ষত্রিয়নন্দিনী তুমি, ক্ষত্রিয়-সহধর্ম্মিণী—পাটরাণী। অন্য কোন ভাগ্যবতীকে তোমার স্বামী-সৌভাগ্যের যৎকিঞ্চিৎ অংশ দিতে কৃপণতা করাও উচিত নয়। স্বামীর উপর এ অযথা অভিমান তোমার শোভা পায় না।"

তুলসী রাজার পদপ্রান্তে লুটাইল; এবং বলিল—"মহারাজ! বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, এখন কি করিব আদেশ করুন।"

রাজা। স্বামীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করাই তোমার কর্ত্তব্য।

তু। কেমন করিয়া আবার তাহাকে দেখিতে পাইব?

রাজা। আমি তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু মা—

রাজার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল। তুলসী বুঝিল, অনন্তপুরপতি একটা তুচ্ছ রমণীর সম্মুখে মর্ম্মদ্বার উদ্‌ঘাটন করিতে চলিয়াছেন। সে মর্ম্মে বুঝি রাশি রাশি বেদনা সঞ্চিত আছে। না দেখাইলে উপশম নাই। অথচ তুলসী ভিন্ন দেখাইবার লোক নাই! কোমল সান্ত্বনামাখা দৃষ্টিতে রাজার মুখ পানে চাহিয়া তুলসী বলিল—

"মহারাজ! নারায়ণীতে আর আমাতে ভেদ জ্ঞান করিতেছেন কেন?"

রাজা। আমার অবস্থাত সমস্তই শুনিয়াছ! আমার রাজ্য পর হস্তগত; আমার সহচর, সহায়, গুরু কারাগারে। আমি জীবনমৃত হইয়াও, তবু গৃহবাসের সুখভোগ করিতেছিলাম—নারায়ণীকে লইয়া, তোমাকে পাইয়া, দুখে সুখে মিশাইয়া, কতকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম; কিন্তু তাও বুঝি আর থাকে না!

তু। কেন মহারাজ?

রাজা। আমাকে বন্দী রাখিবার ব্যবস্থা হইতেছে, আর যে আমি অধিক দিন তোমাদের কাছে থাকিতে পারিব, এমন ত বিশ্বাস করিনা। তাই বলিতে ছিলাম—

রাজা আবার নীরব। মুখ হইতে মনের কথা ফুটিয়াও ফুটিল না। ইহাতেই তুলসী বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া লইল।

তু। কন্যাকে বলিতে এত কুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? মহারাজ, আমরা রমণী, স্বভাবতঃই অভিমানিনী, ওরূপ সঙ্কোচ দেখিলে মনে হয়, এ অভাগিনী আপনার সন্তানবাৎসল্যের বহু অংশ হইতে বঞ্চিত আছে।

রাজা আর থাকিতে পারিলেন না। তুলসীর মস্তকে উচ্ছ্বাস কম্পিত কর অর্পিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে বলিলেন;—

"মা! তোমাকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব জানি না। তুমি মহান পিতার কন্যা। একটী দরিদ্র পরিবারকে রক্ষা করিতে আসিয়া, পিতার মহত্ত্বের অনুযায়ী কার্য্য করিয়াছ। এও তোমারই যোগ্য কথা। কিন্তু তুলসী! এ অভাগ্য পরিবারের উপর শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইহার উপকার করা মানুষের অসাধ্য। তাই মা তোমাকে বলিতে কুণ্ঠিত হইতেছিলাম। আমি তোমার কাছে, তোমার স্বামীটী ভিক্ষা করি।

তুলসী জিজ্ঞাসা করিল—"নারায়ণীর জন্য?"

নারায়ণীর জন্য! রাজা চমকিয়া উঠিলেন। বাস্তবিক তখন নারায়ণীর কথা তাঁহার মনেই ছিল না। নারায়ণীর নামে রাজার চক্ষে যেন বিষাদের একটা বিরাট ছবি জাগিয়া উঠিল। রাজা চমকিয়া একবার চারিদিক চাহিলেন; দেখিলেন, নারায়ণী আসিতেছে। নারায়ণী পাছে শুনিতে পায়, এইজন্য অনুচ্চস্বরে তুলসীকে বলিলেন;—

"নারায়ণীর চিন্তা করিবার আমার অবসর নাই; আমি নিজের জন্য চাহিতেছি।"

"তাহা হইলেও ত একবার অভাগিনীর জন্য চিন্তা করা কর্ত্তব্য। অনূঢ়া সুন্দরী লইয়া কাঁহাতক পথে পথে ঘুরিব?"

রাজা মনে মনে তুলসীর বুদ্ধির বহু প্রশংসা করিলেন। ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"এমন বুদ্ধি তোমার, তবে তুমি কেন মা একটা অপরিচিতা রমণীর কাছে পরাস্ত হইয়া চলিয়া আসিলে!"

তুলসী মাথা হেঁট করিল। নারায়ণীর নিকটে আসিতে বিলম্ব নাই দেখিয়া, রাজা বলিলেন—"সে তুমি যা ভাল বুঝ কর। কিন্তু কতক্ষণের জন্য! আমি বাসর জাগিবারও অবকাশ দিতে পারিব না।"

তু। প্রয়োজন কি?

এদিক হইতে নারায়ণী আসিল; ওদিক হইতে মুন্না সদাশিবকে কোথা হইতে ধরিয়া আনিল। রাজা সদাশিবের হাত ধরিয়া তুলসীর কাছে আনিলেন;—

"এই লও মা, তোমার সামগ্রী। এই উদ্যানে উন্মাদের মত বিচরণ করিতে দেখিয়া, আমি ইহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলাম। ইহার মুখে সমস্তই শুনিয়াছি। তুমি ইহাকে নিঃসঙ্কোচে পুনর্গ্রহণ কর।"

তুলসী স্বামীর পদপ্রান্তে প্রণতা হইল।

সদা। মনেও যদি তোমার বিরুদ্ধে এতটুকু অপরাধ করিয়া থাকি, তুলসী তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা কর।

তু। "আর্য্যসন্তান মনের অপরাধকেও অপরাধ জ্ঞান করিয়া থাকে। মনের অপরাধেও আর্য্যরমণীর সতীত্ব আহত হয়। যে টুকু অপরাধ করিয়াছ, তারই যোগ্য শাস্তি গ্রহণ কর।" এই বলিয়া সুন্দরী এক হস্তে নারায়ণীকে ও অপর হস্তে স্বামীকে ধরিল। নারায়ণী অবাক হইয়া ব্যাপারটা দেখিতেছিল; কিছুই বুঝিতে পারিতেছিল না। তুলসী হাত ধরিতে বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হাত ধরিতেছ কেন?"

তুলসী। তোমায় বিবাহ করিতে হইবে।

নারা। কাকে ?

তু। আমার স্বামীকে।

নারা। কেন ?

সদাশিবও অবাক! তুলসী এ কি করিতেছে! সে বিস্ময়ে রাজার মুখ চাহিল; "একি মহারাজ!"

রাজা কোনও উত্তর করিলেন না। গভীর চিন্তামগ্নের ন্যায়, বাহু যুগলে বক্ষ আবদ্ধ করিয়া হেঁট মুণ্ডে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তুলসী কিছু অপ্রতিভ হইল। "তা'হ'লে করিব মহারাজ ?"

রাজা। কি করিবে? আমি উত্তর দিতে অশক্ত।

তু। তবে আর হয় না। অবস্থা ত বুঝিতে পারিতেছেন।

মুন্না বলিল—"সেই ভাল ভাল, হাত ছাড়িয়া দাও। আমার সময় নষ্ট হইতেছে।"

তুলসী উভয়েরই হাত ছাড়িয়া দিল। এমন সময় কাছারী বাড়ীতে কামানের গভীর শব্দ উত্থিত হইল। সদাশিব বলিল—বুঝি পিতা পুত্রে রাঁচি হইতে ফিরিয়া আসিল। গুরুজীর কারাবাস হইয়াছে; এ উল্লাস তারই জন্য।

এক দুই তিন—কামানের উপর কামান গর্জিয়া উঠিল। মুন্না

উত্তেজিত হইয়া বলিল—"অন্যায় করিয়া এ সময় নষ্ট কেন মহারাজ! আর একটু বিলম্ব করিলে আজিকার মত কার্য্য নষ্ট। হয়ত চিরদিনের জন্যই নষ্ট হইতে পারে।"

কামানের শব্দ শুনিয়া, রাজা ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন; তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। নারায়ণীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"নারায়ণী! আমার কুল রক্ষার জন্য, তুমি এই যুবাপুরুষকে পতিত্বে বরণ কর। এ অনূঢ়ার নাম খণ্ডন। স্বামীসঙ্গ সুখ, ভোগলালসা, মুহূর্ত্তের জন্যও মনের ভিতর স্থান দিও না!"

নারায়ণী সদাশিবের মুখের পানে চাহিল; সদাশিবও নারায়ণীর মুখ পানে চাহিল। তুলসী আবার দুই হাতে দুজনের হাত ধরিল।

রাজা আবার বলিলেন—আমি তোমার পিতামহ সাক্ষী, এই প্রভুভক্ত ভৃত্য সাক্ষী, আর স্বার্থত্যাগিনী এই সতীরমণী সাক্ষী—এই ত্রিসাক্ষী সম্মুখে আমি আজ তোমাকে এই যুবকের হস্তে সমর্পণ করিলাম। ভগবান যদি কখন দিন দেন, তবেই এ বিবাহে সংস্কার সম্পন্ন করিব, নহিলে এইখানেই বিবাহ সংস্কারের শেষ।

তুলসী হাতে হাতে মিলাইল! "নারায়ণী! আমার আমরণ সহচরী! এই আমাদের বাসর রজনী। তোমার মত আমিও আজ প্রথম স্বামী পাইলাম। এই তিন সাক্ষী আর উপরে অস্তগমনোন্মুখ দেবতা চন্দ্রমা! আর সাক্ষী তোমার প্রাণ। যদিই আমাদের পথে পথে ঘুরিতে হয়, তাহা হইলে আমরা হৃদ্গত দেবতাকে স্মরণ করিয়া সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারিব। শত্রু আজ অজ্ঞাতসারে আমাদের এ শুভ বিবাহের উৎসব করিতেছে।" আবার মুহুর্ম্মুহু কামান্ গর্জ্জিল, দশমীর চন্দ্র অস্তাচলে গেল; অন্ধকারে যে যার নির্দ্দিষ্ট দেশে প্রস্থান করিল।

ইহারই অল্পক্ষণ পরে বীরচন্দ্রের প্রাসাদ হইতে একটী ক্ষীণশঙ্খধ্বনি কামান গর্জনের সঙ্গে ত্রস্তভাবে মিশিয়া অনন্তপুর গগণে বিলীন হইল।

পঞ্চত্রিংশতম পরিচ্ছেদ।

পরদিন শুক্লা একাদশী রাত্রি—হরিবাসর। কাশীপুরের নরনারী শ্রীরাধাবল্লভজীউর মন্দিরে, ও সম্মুখস্থ জ্যোৎস্নাপুলকিত প্রান্তরে অষ্টপ্রহরীয় হরিনামে উন্মত্ত। কাশীপুর গ্রাম, এক নবপ্রাণে অনুপ্রাণিত। রমণীগণ সুন্দর সুন্দর নববস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত করিয়া, দেবতার নৈবেদ্য লইয়া, গ্রামের নানা স্থান হইতে মন্দিরে সমবেত হইতেছিল। বালক সকল হরিধ্বনিতে সুর মিলাইয়া কোলাহল করিতে করিতে প্রান্তরে ছুটাছুটি করিতেছিল। চারিদিকে আনন্দের এক অবিচ্ছিন্ন ধারা অবিরাম গতিতে গ্রাম হইতে বিষাদবিন্দুটী পর্য্যন্ত মুছিয়া লইতেছিল। এমন সময়ে, যুগপৎ সহস্র সহস্র কামান শব্দের ভীষণ প্রলয়গর্জ্জন সমস্ত দেশটাকে মুহূর্ত্তের জন্য যেন আঁধার বন্যায় ডুবাইয়া দিল। সমস্ত মন্দিরটার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল। শ্রীরাধা লুপ্ত সংজ্ঞায় যেন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণের হাতের মুরলী খসিয়া পড়িল। নৈবেদ্যের থালা ঝনঝন শব্দে রমণীদের হস্ত হইতে বিচ্যুত হইল। এক অনুপলে উৎসব কোলাহল নিস্তব্ধ। কেহ মূর্চ্ছিত, কেহ স্তম্ভিত, দেখিতে দেখিতে এক বিশাল শ্বাসরোধী ধূমে সমস্ত প্রান্তরটী আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। লোকসকল একটা অনৈসর্গিক ভীষণ মৃত্যু ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া, নিজ নিজ গৃহাভিমুখে পলায়নপর হইল। কীর্ত্তনীয়া খোল করতাল ফেলিয়া ছুটিল, শ্রোতৃবর্গ যে যার প্রাণরক্ষার জন্য বহির্গমনে ব্যগ্র হইল। তখন কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও পা ভাঙ্গিল, কেহ ভূমিতে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইল। কেহ মুমূর্ষু, কেহ গতপ্রাণ—চীৎকারে আর্ত্তনাদে মুহূর্ত্তমধ্যে দেবমন্দির ও তৎসম্মুখস্থ স্থান বিভীষিকাময় শ্মশানের বিকট খলখল হাসি হাসিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

ঠিক সেই সময়ে তিনজন অশ্বারোহী বিদ্যুৎবেগে সেই শ্মশান

প্রান্তর পার হইতেছিল। পার্শ্বস্থ ভীত বিপন্ন, ভূমিতলস্থ মূৰ্চ্ছিত, মৃতপ্রায়, গতায়ু—কাহারও প্রতি তাহাদের লক্ষ্য ছিলনা। উন্মাদের ন্যায় অশ্বে কষাঘাত করিতে করিতে, তাহারা সেই শব্দ লক্ষ্যে ছুটিতেছিল।

সে তিনজন আর কেহ নহে। রাজা, মুন্না ও সদাশিব। মুন্না উভয়কে প্রভু শৈলজানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য লইয়া যাইতেছিল। পথে আসিতে আসিতে সেই ভীষণ শব্দ তাহাদের কাণে গেল। কারণ নির্দ্ধারণে অসমর্থ, অথচ দারুণ অশুভের আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা শৈলজানন্দের গৃহাভিমুখে ছুটিয়াছেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই মুন্না অশ্বের বেগ হ্রাস করিল। বায়ু তাড়নে ধূম্ররাশি অনেকটা অপসারিত হইয়াছে।

সদা। একি মুন্না!

মুন্না। আর মুন্না। যা ভয় করিয়াছি তাই। এইস্থান হইতেই ফিরিয়া চলুন।

সদা। এত হতাশ হইতেছ কেন?

মুন্না। মায়ের মন্দির কই?

সদাশিবও অশ্বরশ্মি সংযত করিয়া মুন্নার কাছে ফিরিয়া অসিল। রাজাও মুন্নার সমীপস্থ হইলেন। সদাশিব বলিল—"এখান হইতে দেখিতে পাইতেছনা বলিয়া, মন্দিরের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতেছ কেন?"

মুন্না একটু অবজ্ঞার হাসি হাসিল—"আপনি বারবৎসর দেখেন নাই; আমি এইস্থান হইতে তিনদিন পূর্ব্বে দেখিয়া গিয়াছি।"

রাজা বলিলেন—"তথাপি সন্দেহ ভঞ্জন করিতে ক্ষতি কি?"

তিনজনে আবার অগ্রসর হইলেন; কিন্তু অশ্বের আর পূর্ব্ববৎ গতি নাই।

আর কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা যাহা দেখিলেন, তাহাতে

কিয়ৎক্ষণের জন্য কাহারও মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। তাঁহারা দেখিলেন, শৈলজানন্দের অট্টালিকার চিহ্ন মাত্র নাই! প্রাচীর শত স্থানে ভগ্ন, মায়ের মন্দির, শৈলজানন্দের গৃহ—সমস্তই স্তূপরাশিতে পরিণত! ইষ্টকাদিতে পূর্ণ হইয়া পরিখার বহুস্থান জলশূন্য। সকলে অশ্বপৃষ্ঠেই পরিখা পার হইলেন। সেখানে জনপ্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত লক্ষিত হইল না। এক অদম্য নিয়তির শাসনে সমস্ত স্থানটা গতজীবিত, স্পন্দনলেশশূন্য, নীরব। মলিন জ্যোৎস্না মমতাময়ী জননীর ন্যায় কেবলমাত্র মৃত সন্তানের চক্ষে নীরবে শোকের উচ্ছ্বাস ঢালিয়া দিতেছিলেন। কোথায় শৈলজানন্দ? কোথায় তাঁর মন্দিরাধিষ্ঠাত্রী অষ্টভুজা! তাহারা একবার মাত্র সেই ভগ্নস্তূপমধ্যে শৈলজানন্দ, তাঁহার স্ত্রী আর তুলসীর "পুত্র" বিশ্বেশ্বরের সন্ধান করিল; কিন্তু কতকগুলা কামান ও বন্দুকের ভগ্নাংশ ভিন্ন, আর কিছুই খুঁজিয়া পাইল না। ক্রমে সেখানে লোকসমাগম আরম্ভ হইল। গ্রামবাসী এখন প্রকৃতিস্থ হইয়া, সেই ভীষণ শব্দের কারণ নির্ণয় করিতে সেইদিকে দলে দলে ছুটিয়া আসিতেছে।

অধিকক্ষণ অবস্থান যুক্তিযুক্ত নয় বলিয়া, তাহারা ভগ্নমনে সে স্থান ত্যাগ করিল। যাইবার সময় মুন্না কাঁদিয়া ফেলিল; আর সদাশিবকে সম্বোধন করিয়া বলিল;—"আজীবন প্রাণপণ সাধনায় প্রভুতে ও আমাতে যে শক্তি সঞ্চিত করিয়াছিলাম—সেই পঞ্চাশটী উৎকৃষ্ট কামান, বিশহাজার বন্দুক, পর্ব্বত প্রমাণ বারুদ, রাশি রাশি অশ্ব—সমস্তই আজ এক মুহূর্ত্তে আপনার বালকত্বে নষ্ট হইল। কাল অনন্তপুর হইতে যাত্রা করিলে, আর এ সর্ব্বনাশ ঘটিত না।"

সদাশিব কোন উত্তর করিল না। কেবল চলিতে চলিতে ভগ্নস্তূপের দিকে মুখ ফিরাইয়া, একটীবার মাত্র চীৎকার করিল—"বিশ্বেশ্বর!" সদাশিব দেখিল, যেন একটী ননীর পুতুল বালক, মুহূর্ত্তের

জন্ম স্তূপরাশির উপরে দাঁড়াইয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশে কি যেন দেখাইয়া মিলিয়া গেল। সদাশিব ভাইটীকে কখন দেখে নাই। মুন্নার মুখেই ভাইয়ের অস্তিত্ব শুনিয়াছে। তথাপি আর একবার ডাকিল—"বিশ্বেশ্বর! নির্ম্মম স্তূপরাশি একটা প্রতিধ্বনিও ফিরাইয়া দিল না।

ষট্‌ত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

কামান বন্দুক প্রভৃতি কোথায় কি আছে, শৈলজানন্দ কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। মুন্না সেগুলা আছে জানিত, কিন্তু কোথায় আছে জানিত না। সে জানিবার জন্য প্রভুর কাছে কখনও আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। তাহার বিশ্বাস ছিল, এক দিন না এক দিন সে সকল সামগ্রী ব্যবহারে আসিবে। ব্যবহার লইয়াই তাহার কথা; কোথায় আছে জানিবার জন্য তাহার ব্যগ্রতা ছিল না। প্রভু শৈলজানন্দ একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন, জামাতা সদাশিব যোগ্য হইলে, একদিন তাহাকে সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিব। রতন রায় একদিন মাত্র সে সম্পত্তির কিয়দংশ দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন।

সদাশিব যখন বালক, তখন, কখন নিজে, কখনবা মুন্নার সাহায্যে তাহাকে সমরবিদ্যায় রীতিমত শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তার পর কন্যার সহিত বিবাহ দিয়াই, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্য পালনের জন্য, স্বোপার্জ্জিত অর্থে জীবিকানির্ব্বাহ করিতে আদেশ দিয়া, বিদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "যতদিন ফিরিতে না বলিব, ততদিন কাশীপুরে পদার্পণ করিও না।" কন্যাকেও জামাতার যোগ্যা সঙ্গিনী করিবার জন্য, তাহাকে ব্রহ্মচারিণীবেশে শ্বশুরগৃহ-রক্ষায় নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন।

এক যুগ অতীত হইল। জামাতার শক্তিমত্তায় তাঁহার আর অবিশ্বাস রহিল না। কন্যাকেও শক্তিমতি বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস

জন্মিল। সহসা একদিনের অসুস্থতায় তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়িল। তিনি মুন্নাকে ডাকিয়া বলিলেন, "যত শীঘ্র পারিস, সদাশিবকে লইয়া আয়। আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি বুঝাইয়া দিব।"

শুভ অবকাশ বুঝিয়া মুন্না অনন্তপুরে ছুটিল। কিন্তু মুন্নাকে পাঠাইবার পর হইতেই শৈলজানন্দের অসুস্থতা বড়ই বাড়িয়া উঠিল। তিনি বুঝিলেন, সদাশিবের প্রত্যাবর্ত্তনের বিলম্ব সয় না; বুঝি তাহার আসিবার পূর্ব্বেই মরিতে হয়। বৃদ্ধ দিনটা কোনও রকমে সদাশিবের প্রতীক্ষায় যাপন করিলেন। রাত্রির প্রথম প্রহরও অতিবাহিত করিলেন; আর পারিলেন না। তখন বালক বিশ্বেশ্বরকে ঘুম হইতে তুলিলেন। তুলসীর প্রস্থানের পর হইতে বালক শৈলজানন্দের কাছেই থাকিত। সর্ব্বদা সঙ্গে রাখিয়া, বৃদ্ধ এই মাতৃবিয়োগবিধুর বালককে সান্ত্বনা দিতেন। শৈলজানন্দের গৃহিণীরও বালকের প্রতি যত্নের অভাব ছিল না; কিন্তু বালক বৃদ্ধের কাছে থাকিতেই ভাল বাসিত। শৈলজানন্দ পত্নী, পূর্ব্বযুগের গৃহিণী, স্বামীর কার্য্য কলাপ বিশেষরূপে বুঝিতে না পারিলেও, কখন কোনও প্রতিবাদ করিত না। তাই সে জামাতা ও কন্যাকে বিদায় দিয়াও স্বামীর কোন মহদুদ্দেশ্যে কল্পনায় আনিয়া নিশ্চিন্ত ছিল। শৈলজানন্দ বাহ্যিক কঠোর হইলেও, সাংসারিক জীবনে কোমলতাময় ছিলেন। স্ত্রীর তাঁহার উপর রাগ করিবার উপায় ছিল না।

স্বামীর এ কয়দিনের শারীরিক অবস্থা দেখিয়া, তিনি বিশেষ চিন্তিত ছিলেন; এবং গৃহকর্ম্মের অবকাশে এক একবার আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। একবার আসিয়া তিনি দেখিলেন গৃহশূন্য। উৎকণ্ঠায় ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাইলেন, দুর্ব্বল স্বামী এক হস্তে প্রজ্জ্বলিত বর্ত্তিকা, অপর হস্তে বালকের হাত ধরিয়া

অতিকষ্টে প্রাঙ্গণ পার হইতেছেন। সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোথা যাও"।

কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া শৈলাজানন্দ বলিলেন—"আ! পিছু ডাকিলে!" স্ত্রী কিন্তু এবারে স্বামীর বিরক্তি গ্রাহ্য করিল না। তাহার কার্য্যে প্রতিবাদ করিল। শৈলজানন্দ বলিলেন, "বালককে দেবতা দেখাইতে লইয়া চলিয়াছি।" গৃহিণী বলিলেন, "তবে আমিও সঙ্গে যাইব।" বাধ্য হইয়া বৃদ্ধ পত্নীকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কিছুদূর যাইতে না যাইতেই, সেই ক্ষুদ্র দীপালোকে সমস্ত মন্দিরটা যেন সহসা জ্বলিয়া উঠিল। অগণ্য অস্ত্র প্রতিফলিত রশ্মিজালে, স্ফুরৎ প্রভামণ্ডল মধ্যবর্ত্তিনী ভবানী যেন কঠোর কটাক্ষে জাগিয়া উঠিলেন। সবিস্ময়ে শৈলজানন্দ গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"এ কি!"

শৈলজানন্দ বালককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"বিশ্বেশ্বর! দেখিতেছিস্?"

বালক বিস্ময়ের বিন্দুমাত্রও চিহ্ন দেখাইল না, কেবল বলিল—"দেখিতেছি।"

"কি দেখিতেছিস্?"

"মা।"

"মা!" শৈলজানন্দ একবার চারিদিক চাহিল।

শৈলজানন্দ পত্নী জিজ্ঞাসা করিলেন—মা কে? তুলসী?

বালক উত্তর করিল,—"না—আমার মা!"

শৈলজানন্দ মন্দির গোলক সংলগ্ন অস্ত্রগুলা দেখাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন—"আর এ গুলা?"

"হাজার হাত আমাকে কোলে লইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।"

"এই সমস্ত তোমার দাদা আসিলে দেখাইও।"

"দেখাইব।"

বর্ত্তিকাহস্তে শৈলজ্ঞানন্দ অগ্রসর হইলেন। উভয়ে সঙ্গে চলিল। চলিতে চলিতে মন্দিরের ভিতর একটা স্থানে ভূমি সংলগ্ন একখণ্ড প্রস্তর ক্ষুদ্র বিশ্বেশ্বরকে দেখাইয়া বলিলেন,—"বালক পাথরটা উঠাইতে পারিস্?"

অবলীলাক্রমে বিশ্বেশ্বর পাথরটাকে উঠাইল। বিস্মিত শৈলজ্ঞানন্দ বালকের মুখের পানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"বেশ।—ভাই আসিলে দেখাইবি।"

বালক ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "দেখাইব।"

একটা সুড়ঙ্গ বাহির হইল। সকলে সুড়ঙ্গপথে প্রবিষ্ট হইলেন। মাটীর নীচে একটী বিশাল গৃহ। সেই গৃহের এক পার্শ্বে স্তূপাকারে রক্ষিত টাকা ও মোহর। শৈলজ্ঞানন্দ বালককে বলিলেন,—"এই সমস্ত দেখিয়া রাখ, ভাই আসিলে দেখাইবি।"

বালক মাথা নাড়িয়া বলিল, "আচ্ছা।" তখন এক এক করিয়া ভূগর্ভস্থ সমস্ত সম্পত্তি বৃদ্ধ বিশ্বেশ্বরকে দেখাইতে লাগিলেন। একটী একটী করিয়া পঞ্চাশটী কামান, হাজার হাজার গোলা, গুলি—যুদ্ধের যত প্রকার উপকরণ সমস্ত দেখাইয়া, তিনি বালককে বারুদের গুদামে লইয়া চলিলেন। অবাক হইয়া, স্বামীর এই অদ্ভুত কার্য্য দেখিতে দেখিতে শৈলজ্ঞানন্দ পত্নী স্বামীর অনুগমন করিতেছিলেন। বারুদের ঘরে পৌঁছিয়াই দেখিলেন, স্বামীর শরীর কাঁপিতেছে। অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারও মাথা ঘুরিতেছিল। তথাপি তিনি দুর্ব্বল পতনোন্মুখ স্বামীকে ধরিয়া ফেলিলেন; এবং প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। শৈলজ্ঞানন্দ বালককে আবার বলিলেন,—"দেখিতেছিস্।"

বালক "মা! মা!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সূতিকা ঘরের শিশুটী রাখিয়া, বিশ্বেশ্বরের মা পরলোকগতা হইয়াছে। তথাপি তাহার মুখে বারম্বার 'মা' কথা শুনিয়া শৈলজানন্দ পত্নী বলিয়া উঠিলেন—"কোথায় তোর মা?"

বালক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল। শৈলজানন্দ পত্নী মূর্চ্ছিতা হইলেন। বৃদ্ধের কম্পিত হস্ত হইতে জ্বলন্তবর্ত্তিকা মেঝের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বারুদ কণার উপর পতিত হইল। এক আকাশভেদী শব্দে সমস্ত দেশটা কাঁপিয়া এক নিশ্বাসে তিনটী দীপ নিবিয়া গেল।

সপ্তত্রিংশত্তম পরিচ্ছেদ।

ইহার অল্পদিন পরেই, ইংরাজী দশই মে তারিখে,—একদিনে—সমস্ত হিন্দুস্থান ব্যাপিয়া সিপাহী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে লোমহর্ষণকর ব্যাপার ইতিহাসাভিজ্ঞের অবিদিত নাই। তাঁহারই একটা স্ফুলিঙ্গ ছোট নাগপুরে উঁড়িয়া পড়ে। রাজা বীরচন্দ্র এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। বিদ্রোহীরা রাঁচির ধনাগার লুণ্ঠন করে, জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদীদিগকে মুক্তি দেয়। ছোট নাগপুরের অধিবাসী সাহেবগণ কিছুদিনের জন্য প্রাণ লইয়া বিব্রত হন। ব্রাউন, হারলি, ইন্‌জিনিয়ার, কলেক্টর, কমিশনর সকলেই নিজ নিজ প্রাণরক্ষার্থ দেশীয়দিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

রতনের বিচারকর্ত্তা প্রাণভয়ে কারাগারের এক গুপ্তগৃহে আত্মগোপন করেন। সেখানে রতন নির্জ্জন কারাবাসে দণ্ডিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। যখন উন্মত্ত সিপাহীরা সাহেবকে বধ করিবার জন্য, সেই গৃহের দ্বার ভাঙ্গিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন অমানুষিক শক্তিতে কবাটে পৃষ্ঠ দিয়া তাহাদের আক্রমণের বেগ রোধ করেন। সিপাহীরা বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিলে, অনুতপ্ত

হগ্‌সন্ বৃদ্ধের চরণতলে জানু পাতিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল। রতন বলিলেন,—"বিচারে দোষী বুঝিয়া দণ্ড দিয়াছ; ইহার জন্য ক্ষমা ভিক্ষা কেন?" সাহেব তাহাকে কোনও নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল। বলিল, "প্রাণদান দিয়া কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিও না। যাহাতে দ্বিতীয়বার না আক্রান্ত হই, তাহার উপায় করতঃ আমাকে কোনও নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আইস।"

রতন রাত্রিযোগে নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, সাহেবকে হাজারিবাগে পৌঁছিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের তখনও কয়েদীর বেশ পরিহিত ছিল। নিরাপদ হইয়াই সাহেব তাহাকে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিল; বলিল আমার সঙ্গে কলিকাতায় চল; আর তোমাকে জেল খাটিতে হইবে না।" ঘৃণায় সাহেবের এই অনুগ্রহ প্রত্যাখ্যান করিয়া, ব্রাহ্মণ সেই কয়েদীর বেশেই রাঁচির জেলে ফিরিয়া আসিলেন।

তাঁহার অনুপস্থিতির সময়েই, রাজা বীরচন্দ্র জেলে তাঁহার বিস্তর অনুসন্ধান করেন; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে না পাইয়া বিফল মনোরথে ফিরিয়া যান।

সদাশিব বুঝিয়াছিল, আনন্দ দেবের গৃহও আক্রান্ত হইবে। সেই পাপিষ্ঠই যত অনিষ্টের মূল। রাজার হস্তে পতিত হইলে পিতা ও পুত্র, কেহই প্রাণে বাঁচিবে না বুঝিয়া, আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণেই তাহাদিগকে তুলসীর সাহায্যে সাবধান করিয়া দিয়াছিল। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র পিতা পুত্রে পালাইয়া যায়; এবং তুলসীর আদেশমত, রতনের কুটীর সন্নিহিত এক আবর্জ্জনাময় স্থানে মাথা ঢাকিয়া প্রাণ রক্ষা করে। পালাইবার সময় নরাধমদিগের, স্ত্রী সম্বন্ধে চিন্তা করিবারও অবকাশ ছিল না। তুলসী আনন্দদেবের স্ত্রী জানকীকে আপনার আশ্রয়ে আনিয়া রক্ষা করে।

বিপন্ন সাহেবদিগের উদ্ধারার্থ সপ্তাহ মধ্যেই কলিকাতা হইতে ফৌজ আসিল। তাহাদিগের সহিত বিদ্রোহী সিপাহীদের যুদ্ধ হইল। বিদ্রোহীরা প্রাণপণে যুঝিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কামান ছিল না। শুধু বন্দুক লইয়া কামানের মুখে কতক্ষণ যুঝিবে। অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিদ্রোহীরা পরাস্ত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। মুন্না নিহত হইল, রাজা আহত হইলেন; সদাশিব তাঁহাকে অশ্ব পৃষ্ঠে তুলিয়া অরণ্যে পলাইল। দিন কয়েক ইংরাজের প্রাণে উদ্বেগ তুলিয়া বীরচন্দ্র স্বহস্ত প্রজ্বলিত অনলে আপনাকে আহুতি প্রদান করিলেন।

বিদ্রোহ প্রশমনের পর বহুবিদ্রোহীর শাস্তি হইল। কাহারও ফাঁসি হইল; কেহ কেহ যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত, অবশিষ্ট বিবিধ কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইল।

কর্তৃপক্ষ বহুদিন ধরিয়া বীরচন্দ্রের সন্ধান করেন। আনন্দদেবও রাজাকে ধরাইবার অনেক চেষ্টা করেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। চারিদিকে ডিটেক্‌টিভ ছুটিয়াছিল, চারিদিকে ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইয়াছিল, লোকদিগকে অনেক পুরস্কারের প্রলোভন দেখান হইয়াছিল,—কিছুতেই কিছু হয় নাই। নাগপুরের কত বন আলোকিত হইয়াছিল, পুলীস ঘরে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সন্ধান হয় নাই। অনেক দাড়ী পুড়িয়াছিল, অনেক জটা মুড়িয়াছিল; অনেক সন্ন্যাসী গৃহস্থ হইয়াছিল; অনেক গৃহস্থ সংসার অনিত্য ভাবিয়া গৃহধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া পথে বসিয়াছিল, তবু বীরচন্দ্রের সংবাদ মিলিল না।

প্রতিদিন রাঁচি সহরে দলে দলে কত বীরচন্দ্র আসিতে লাগিল, কিন্তু নগরে আসিয়াই কেহ বালমুকুন্দ হইল, কেহ শনিচরোয়া হইল, কেহ বা দুর্ব্বলসিং পাঁড়ে,—কেহই বীরচন্দ্র হইলনা। ভয় পাইয়া কত বৃদ্ধ শ্মশ্রুমুণ্ডন করিল, কেহবা চুলে কলপ লাগাইল।

অনেক করিয়াও যখন দেখিল, কিছু হইল না, তখন পুলীশ মরা বাঘের পেট চিরিয়া, অস্থি অন্ত্র তন্নতন্ন করিয়া খুঁজিয়া, অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিল।

ক্রমে নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। কেহ বলিল, রাজা পলাইয়া আসিয়া নিজের প্রকাণ্ড বাড়ীর ভিতরের একটা চোর-কুটুরীতে লুকাইয়াছিলেন। সেই গৃহমধ্যে বহুকাল হইতে একটা প্রকাণ্ড সর্প বাস করিত। সেটা আশ্রয়দাতাকে বিপন্ন বুঝিয়া, তাঁহার আপাদমস্তক উদরস্থ করিয়া, পুলীশের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছে। কেহ বলিল, রাজা স্বর্ণরেখা পার হইতে জলস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রতিবেশী গণ্ডমূর্থ দুঃখী সিং স্বর্ণরেখার জলে রাজার হাতের আংটী পাইয়া একদিনে ধনী হইয়াছে। কেহ কেহ বা রাজা ব্যাঘ্র মুখে প্রাণ দিয়াছেন, এই কথা চতুর্দ্দিকে প্রচারিত করিল। যে বাঘটা রাজার ঘৃতপুষ্ট দেহ ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহার গায়ে একগাছিও রোম ছিলনা। গাত্রদাহে অস্থির হইয়া শার্দ্দূলপ্রবর যন্ত্রণা প্রতীকার প্রত্যাশায় আনন্দদেবের অন্নভোক্তা পৈত্রিক হিতকারী হনুমান সিংএর ঘরের চারিধারে প্রতি রাত্রিতে ঘুরিয়া বেড়াইত।

এইরূপে কথায় কথায় রাজার মৃত্যু সাবাস্ত হইল। তখন কাহারও গৃহে লোষ্ট্র প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; কাহারও গৃহের সযত্ন রক্ষিত বরফী কে নিত্য খাইয়া যাইতে লাগিল। নিশাগমে রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতে যাইতে বুধীর মার কাণে একটা অনুনাসিক স্বর প্রবেশ করিয়াছিল; পার্ব্বতীর বুকে একটী অস্বাভাবিক বায়ুবেগ অনুভূত হইয়াছিল। তাহাদের বড় সাহস, তাই তাহারা জীবন লইয়া বাটীতে ফিরিয়াছে! কেহ কেহ রাজার প্রেতাত্মা স্বচক্ষে না দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইল না। যখন বহুমূল্য বসন পরিচ্ছদ, ধাতুময় উষ্ণীশশোভিত রাজার

মূর্ত্তি প্রান্তরস্থ বটবৃক্ষের উপর দেখিতে পাইল, তখন সকলে রাজার মৃত্যু স্থির করিল।

এ সকল সংবাদে কিন্তু আনন্দ দেবের মনস্তুষ্টি হইল না। সে মাঝে মাঝে ঘুমের ঘোরে বীরচন্দ্রের জীবিত মূর্ত্তির বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। একদিন দেখিল, রাজা নিদারুণ পিপাসার্ত্তের ন্যায়, জানালার বাহিরে দাঁড়াইয়া, তাহার বক্ষরক্ত পানের প্রতীক্ষা করিতেছেন। আর একদিন প্রভাতে শয্যা হইতে উঠিয়া দেখিল, শাণিত ছুরিকা ঘরের মেজেতে পড়িয়া আছে। প্রথমে সে ঘরের জানালা বন্ধ করিয়া দিল, তারপর বাটীর বাহিরে আসা ছাড়িল।

অল্প দিনের মধ্যেই কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে একটী মূল্যবান জায়গীর ও রাজা খেতাব প্রদান করিলেন। আনন্দদেব জায়গীরের উপস্বত্ব পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার জন্য অনন্তপুরকে জন্মের মত পরিত্যাগ করিয়া, জন্মভূমি প্রসাদপুরে চলিয়া আসিলেন।

অনন্তপুরের শ্রী স্বভাবচাঞ্চল্যে বীরচন্দ্রের আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া আনন্দদেবের অনুসৃতা হইলেন। বীরচন্দ্রের সমস্ত সম্পত্তি ইংরাজ বাজেয়াপ্ত করাইলেন। সুন্দর কাছারী বাড়ীখানি ভূমিসাৎ হইয়া, আনন্দদেবের বাটী নির্ম্মাণের সহায়তা করিল। কেবল পুরাতন রাজ বাটীতে, কর্ত্তৃপক্ষ দয়াপরবশ হইয়া, হস্তক্ষেপ করিলেন না।

হতভাগ্য বীরচন্দ্রের সব গেল! রাজত্ব ত গেলই, শেষে ভিখারীও যে ধনে ধনী, সে ধনও রাজার রহিল না। অসহায় বার্দ্ধক্যে জগতে স্থান রহিল না—জীবন্তে, সহস্র লোকের জীবনদাতার লোকচক্ষে অস্তিত্বই রহিল না।

রহিল কি! রাজ্য ইংরাজে লইয়াছে ও ধন যে সুবিধা পাইয়াছে সেই লইয়াছে। আজ রাজা প্রকৃতির ক্রীড়নক, শার্দ্দূলেরও বধ্য, পিশাচেরও ঘৃণ্য। রাজাকে ধরাইয়া দিতে পারিলে, চোরেও ধনী

হইয়া সমাজের নেতা ও সাধু হইতে পারিত,—দশজনকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে পারিত। এমন হতভাগ্যের সংসারে আপনার বলিবার রহিল কি?

রহিল তিন জন, রহিল, দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হইবার জন্য, অনাহারে কঙ্কালাবশিষ্ট হইবার জন্য, 'কি ছিলাম, কি হইলাম, কেন এমন হইলাম'—ভাবিয়া ভাবিয়া দিবানিশি চক্ষুজল ফেলিবার জন্য, স্বামীর পাপের ফলভাগিনী অনাথিনী রাণী মধুমতি, আর রহিল, পিতামহীর নয়নে নয়ন রাখিয়া, কুহেলিপ্রহতা উন্মেষোন্মুখী কমলকোরকসমা নারায়ণী, আর রহিল তুলসী।

[প্রথমখণ্ড সম্পূর্ণ।*]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ।

গত ২৬শে মে শুক্রবার ইউনিভারসিটী ইনষ্টিটিউট গৃহে সাহিত্য পারিষদের কোন বিশেষ অধিবেশনে শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় "ভাষার ইঙ্গিত" নামে এক সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। আমি ঐ প্রবন্ধ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলাম তাহার প্রতিবাদ করিয়া ও রবীন্দ্র বাবুর মতের সমর্থন করিয়া সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় আষাঢ়ের ভারতীতে "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" নামে একটী নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্র বাবু, দীনেশ বাবু ও তাঁহাদের সম্প্রদায়ভুক্ত খাঁটী বাঙ্গালার পক্ষপাতী শাব্দিকগণ বলেন—

---

* শেষাংশ পুস্তকাকারে বাহির হইবে।

(১) বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি ও সংস্কৃত ভাষার প্রকৃতি একরূপ নহে। উহারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচিত হইতে পারেনা। বাঙ্গালা ভাষার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহার জন্য স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রস্তুত করাই বিধেয়।

(২) শব্দের উচ্চারণ অনুসারে উহার বর্ণবিন্যাস করা কর্ত্তব্য।

(৩) সাহিত্যের ভাষা ও কথিত ভাষা এতদুভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য রাখা উচিত নহে।

(৪) বাঙ্গালা দেশের বিভিন্ন প্রদেশে যে বিশেষ শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গী প্রচলিত আছে, উহা সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পক্ষান্তরে পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রভৃতি সংস্কৃতানুরাগী মহোদয়গণ বলেন—

(১) বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে সমুদ্ভূত সুতরাং সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করা উচিত।

(২) শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় অনুসারে উহার বর্ণবিন্যাস করা কর্ত্তব্য।

(৩) কথিত ভাষা নানাস্থানে নানাভাবে প্রচলিত থাকে কিন্তু সাহিত্যের ভাষা এক প্রকার। সাহিত্যে সাধু ভাষা প্রয়োগ করা উচিত।

(৪) প্রাদেশিক শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গী বাঙ্গালা সাহিত্যে প্রয়োগ করা উচিত নহে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত বাবু রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী ও শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি প্রভৃতি মধ্যপথাবলম্বী মহোদয়গণ কোন কোন বিষয়ে এদিকে এবং কোন কোন বিষয়ে ওদিকে সহানুভূতি প্রকাশ

করিয়া থাকেন। গত তিন বৎসরকাল আমি বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধাদি লিখিয়াছি বা সভাসমিতিতে উক্ত বিষয়ে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছি তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সাধারণে আমাকে সংস্কৃতানুরাগী মহোদয়গণের সম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমি নিজে এখনও বুঝিতে পারি নাই আমি কোন্ সম্প্রদায়ের অন্তর্নিবিষ্ট। যে চারিটী বিষয়ে সংস্কৃত সম্প্রদায় ও খাঁটি বাঙ্গালা সম্প্রদায়ের পরস্পর মতভেদ, উপরে সেই চারিটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছি। ঐ চারিটি বিষয় সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে—(১) ভাষার প্রতিভা, (২) বর্ণবিন্যাস বা বানান, (৩) সাহিত্যের ভাষা, এবং (৪) প্রাদেশিকতা। এই চারিটী বিষয়ে আমার মত এইস্থলে প্রকাশ করিতেছি। উহা দেখিয়া সাধারণে আমার পক্ষাপক্ষ নির্দ্ধারণ করিলেন।

ভাষার প্রতিভা।

মানবের চিন্তা শ্রেণী কোন ভাষায় পরিব্যক্ত হইবার সময়ে যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, তাহাকে উক্ত ভাষার প্রতিকৃতি বা প্রতিভা বলে। সকল জাতির ভাষা সমান প্রতিভাসম্পন্ন নহে। নিম্নে একটী উদাহরণ দ্বারা কয়েকটী ভাষার প্রতিভা প্রদর্শন করিতেছি।

বাঙ্গালা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ১ ২ ৩ ৪ ৫

এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল—এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল।

সংস্কৃত।

২ ১ ৩ ৪ ৫ ২ ১ ৩ ৪ ৫

নরস্য কস্যচিদ্ দ্বৌ পুত্রৌ আস্তাম্—ব্যক্তির একের দুই পুত্র ছিল।

তিব্বতীয়।

১　৪　৩　৫　২　১　৪　৩　৫

মি শিগ্‌-ল বু গ্রিন্‌ য়োদ্‌-প-য়িন্‌=ব্যক্তি একেতে পুত্র দুই ছিল।

মিরি।

২　১　২　৪　৩　৫　২　১　২　৪　৩　৫

আমি আকো বুইকা আউ অন্যেক দুঙ্গৈ=ব্যক্তি এক তাহার পুত্র দুই ছিল।

ইংরেজী।

১　২　৫　৩　৪　১　২　৪　৩　৪

এ-সার্টেন্‌ ম্যান্‌ হ্যাড্‌ টু সন্‌স=এক ব্যক্তি (পাইয়া) ছিল দুই পুত্র।

আমরা দেখিলাম—উল্লিখিত উদাহরণের কোন ভাষায় বিশেষ্য বিশেষণের পূর্ব্বে বসে এবং অপর ভাষায় উহা পরে বসে। কোথায়ও বিশেষ্যকে বিভক্তিহীন রাখিয়া বিভক্তি যোগ করিতে হয় এবং অপর কোথায়ও ইহার সম্পূর্ণ বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। কোন ভাষায় আবার বিশেষ্য ও বিশেষণ এতদুভয়কে বিভক্তিহীন রাখিয়া পরে কোন সর্ব্বনাম দ্বারা উহাদের বিভক্তি নির্দ্দেশ করিতে হয়। কোন ভাষার কর্ম্মকারক অপর ভাষায় কর্তৃকারকের সমান অর্থ প্রকাশ করে। কোন ভাষায় প্রথমা বিভক্তির সাহায্য ব্যতীত সেই অর্থ প্রকাশ করা যায় না। কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়ার অবস্থা সকল ভাষায় সমান নহে। এইরূপে বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন প্রকার প্রকৃতি বা প্রতিভা পরিলক্ষিত হয়। আর্য্য ভাষার প্রতিভা ও সেমেটিক ভাষার প্রতিভা এক নহে। ভাষার মধ্যেও আবার সংস্কৃত, জেন্দ্‌, গ্রীক, জার্ম্মান্‌, প্রভৃতি ভাষার প্রতিভা পরস্পরস্বতন্ত্র। অতএব সংস্কৃত ভাষার প্রতিভা ও বাঙ্গালা ভাষার প্রতিভা যে এক নহে তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন?

বিশেষতঃ কারক বিভক্তি ক্রিয়া বিভক্তি, পদান্বয়, সন্ধি ইত্যাদি

বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার একেবারেই অনুসরণ করে না। রাম শব্দ তৃতীয়া ও পঞ্চমীর এক বচনে সংস্কৃতে যথাক্রমে "রামেণ" ও "রামাৎ" এই দুই পদ হয় কিন্তু বাঙ্গালায় যথাক্রমে "রাম-দ্বারা" ও "রাম-হইতে" এই দুই পদ হয়। বাঙ্গালায় "দ্বারা" ও "হইতে" এই দুইটী স্বতন্ত্র শব্দ। ইহারা অন্য শব্দের অব্যবহিত পরে বসিয়া কারক বিভক্তির কার্য্য নির্ব্বাহ করে। কিন্তু সংস্কৃতে "টা" ও "ঙস্" বিভক্তি কোন স্বতন্ত্র শব্দ নহে। হয়ত প্রাচীনতম কালে উহারা স্বতন্ত্র শব্দ ছিল কিন্তু যখন সংস্কৃত ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছিল তখন উহারা অর্থহীন শব্দাবয়ব মাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। উহারা যে শব্দের অন্তে বসে সেই শব্দের অর্থের কিছু প্রকারভেদ সঙ্ঘটন করে।

বাঙ্গালা ক্রিয়া বিভক্তির সম্বন্ধেও ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যাইতে পারে। "তি", "সি" ও "মি" এবং বাঙ্গালা "ইতেছে", "ইতেছ" ও "ইতেছি" ইহাদের পরস্পর কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। পদান্বয় সম্বন্ধেও সংস্কৃতের সহ বাঙ্গালার ঘোর প্রভেদ। বাঙ্গালা ভাষায় কোন্ বাক্যে কোন্ পদের পর কোন্ পদ বসিবে ইহার একটী নিয়ম আছে; কিন্তু সংস্কৃতে প্রায়শঃ পদসমূহ বাক্যের মধ্যে যথেচ্ছভাবে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে। আমি ভাষা সমূহের প্রত্যেক্যের প্রতিভা প্রদর্শন করিবার জন্য পূর্ব্বে যে বাক্যনিচয় উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের পরস্পর প্রভেদ বুঝিতে পারা যাইবে। "এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল"—এই বাক্যটী বাঙ্গালা গদ্যে আর কোন প্রকারে লিখিতে পারা যায় না। ইহাতে যে পদ যেখানে সন্নিবেশিত আছে তাহা তৎস্থান হইতে বিচ্যুত করিয়া স্থানান্তরে স্থাপন করিলেই অর্থের অনুপপত্তি হইবে। কিন্তু সংস্কৃত বাক্যটীতে যে সকল পদ আছে তাহা অনায়াসে স্থানান্তরিত করা যায়।

"নরস্ত কস্তচিৎ দ্বৌ পুত্রৌ আস্তাম" "কস্তচিৎ নরস্ত দ্বৌ পুত্রৌ আস্তাম" "আস্তাম কস্তচিৎ নরস্ত দ্বৌ পুত্রৌ" "আস্তাম্ দ্বৌ পুত্রৌ কস্তচিৎ নরস্ত"—ইত্যাদি যে কোন প্রকারে পদসমূহের বিন্যাস হউক না কেন বাক্যটী পরিশুদ্ধ থাকিবে, এইরূপে পদনিচয়ের সন্নিবেশ বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার পদ্ধতি অবলম্বন করে না।

সন্ধি বিষয়েও সংস্কৃতের সহ বাঙ্গালার ঘোর প্রভেদ। দেশজ বাঙ্গালা শব্দ ও বৈদেশিক বাঙ্গালা শব্দ ইহারা কেহই সন্ধির নিয়মে বদ্ধ নহে। কিন্তু সংস্কৃত শব্দসমূহ যথাসম্ভব সন্ধির নিয়মে বদ্ধ হইয়া থাকে। "তুমি"+"আছ" এই দুইটী দেশজ বাঙ্গালা শব্দকে সন্ধির নিয়মে বদ্ধ করিয়া "তুম্যাছ" এইরূপ অভিনব পদ কথনই প্রস্তুত করা যায় না। সেইরূপ "বাবুর্চিখানা"×"আস্‌বাব" এই দুইটী বৈদেশিক বাঙ্গালা শব্দের সংযোগেও "বাবুর্চিখানাস্‌বাব" এইরূপ পদ হইতে পারে না। কিন্তু "ত্বম্"+"অসি" এই দুইটী সংস্কৃত শব্দ সন্নিহিত করিয়া "ত্বমসি" পদ অনায়াসে প্রস্তুত করা যাইতে পারে। সন্ধি বিষয়ে সংস্কৃত যে পথ অবলম্বন করিয়াছিল বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য ভাষা সমূহ সে পথে বিচরণ করে না। কারক বিভক্তি, ক্রিয়া বিভক্তি, সন্ধি, পদান্বয় ইত্যাদি বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিভা ও সংস্কৃত ভাষার প্রতিভা পরস্পর পৃথক্। এই সকল বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রকৃতি, পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের সৃষ্টি করাই কর্ত্তব্য।

পক্ষান্তরে যাঁহারা বলেন বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শে প্রস্তুত হওয়া উচিত—তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? তাঁহারা কি বাঙ্গালা ভাষায় রাম শব্দের তৃতীয়ার এক বচনে "রামেণ" পদ লিখিতে বলেন? তাঁহারা কি "করিতেছে" পদ তুলিয়া দিয়া "করোতি" পদ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ করেন? বাঙ্গালা বাক্যে পদসমূহ যথেচ্ছভাবে সন্নিবেশিত হউক ইহাই কি তাঁহাদের অভিলাষ? "তুম্যাছ" "আম্যাছি" ইত্যাদি পদ

প্রয়োগ করিয়া সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনই কি তাঁহাদের কামনীয়? আমার বোধ হয় এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা বিরুদ্ধবাদিগণ বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ বাঙ্গালা অক্ষরে প্রকাশিত করিতে বলিতেছেন না কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের "আদর্শে" বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে বলিতেছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে সংস্কৃত ব্যাকরণ যে প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়াছিল বাঙ্গালা ব্যাকরণ সেই প্রণালীতে প্রস্তুত কর। সংস্কৃতে যেমন কর্ত্তা কর্ম্ম সম্প্রদান অপাদান অধিকরণ ইত্যাদি কারক সম্বন্ধ প্রকাশিত করিতে হইলে শব্দের উত্তর বিভিন্ন বিভক্তি যোগ করিতে হয়, বাঙ্গালায়ও তেমনই শব্দের উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বা অপর শব্দ সমূহ যোগ করিয়া কারক সম্বন্ধ প্রকাশ করিতে হইবে। প্রথম পুরুষ, মধ্যমপুরুষ, উত্তম পুরুষ, বর্ত্তমান কাল অতীত কাল ভবিষ্যৎ কাল ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য সংরক্ষণ করিবার জন্য সংস্কৃতে যেমন "তি", "মি" ইত্যাদি ক্রিয়া বিভক্তির প্রয়োগ হয় বাঙ্গালায়ও তেমনই ঐ সকল বিষয়ের পার্থক্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ধাতুর উত্তর "ইতেছে", "ইতেছ", "ইতেছি" ইত্যাদি বিভক্তি যোগ করিতে হইবে। পদান্বয় বিষয়েও বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের আদর্শের অনুগমন করিতে পারে। সংস্কৃত বাক্যে যেমন কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া ইত্যাদির পরস্পর সম্বন্ধ আছে, বাঙ্গালা বাক্যেও ঐ সকল সম্বন্ধ তুল্যভাবেই বিদ্যমান আছে। সংস্কৃত বাক্যে ক্রিয়া মাত্রেরই কর্ত্তা আছে, বাঙ্গালায়ও অবশ্য কর্ত্তৃহীন ক্রিয়া নাই। সন্ধির নিয়মও বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে তিরোহিত করিবার উপায় নাই, কেবল অপভ্রংশ দেশজ শব্দ দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্য গঠিত হয় নাই। ইহাতে সংস্কৃত শব্দের সংখ্যাই অধিক। ঐ সকল শব্দকে যথাসম্ভব সন্ধির বন্ধনে বদ্ধ করিবার জন্য সূত্রের প্রয়োজন। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণে সন্ধি বিষয়ক সূত্রেরও প্রয়োজন আছে।

উল্লিখিত বিষয় সমূহ ব্যতীত সংস্কৃত ব্যাকরণে অপর যে সকল বিষয়ের সূত্র আছে তাহাও যথাসম্ভব বাঙ্গালা ব্যাকরণে প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপে এস্থলে কয়েকটী বিষয় উল্লিখিত হইতেছে।

বর্ণমালা—বাঙ্গালা বর্ণমালা ও সংস্কৃত বর্ণমালা এতদুভয়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। উচ্চারণভেদে বাঙ্গালা বর্ণকেও কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্দ্ধণ্য, দন্ত্য, ওষ্ঠ্য ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। শষস, ণন, জয, অ য় ইত্যাদি বর্ণের আকার গত ভেদই বা বাঙ্গালা ভাষা হইতে কিরূপে লুপ্ত করা যায়? অতএব সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ব্যাকরণের বর্ণবিষয়ক অধ্যায় বিরচিত হইতে পারে।

স্ত্রীত্ব—স্ত্রীলিঙ্গবোধক "ঈ" "আ" প্রভৃতি প্রত্যয় বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে বিতাড়িত করিলে অর্থবোধের অনেক অসুবিধা হইবে। এই হেতু শুধু সংস্কৃত শব্দে নহে, দেশজ বাঙ্গালা শব্দেও যথা সম্ভব "ঈ", "আ" ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করিয়া স্ত্রীত্ব প্রকাশ করা যায়। সর্ব্বনাম, কৃৎ, তদ্ধিত, বিশেষ্য বিশেষণ, সমাস, ষত্ব ণত্ব, বচন, কাল ইত্যাদি বিষয়েও বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ হইতে যথেষ্ট উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে। এই সকল বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

বাঙ্গালা ভাষার প্রতিভা নির্ণয় করিতে যাইয়া আমরা দেখিলাম—উহা সর্ব্বতোভাবে সংস্কৃতের অনুরূপ নহে। সংস্কৃত ব্যতীত ইংরেজী পার্শী, আরবিক প্রভৃতি ভাষা হইতেও অনেক শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গী বাঙ্গালায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বৈদেশিক শব্দসমূহ অধিকাংশ স্থলে সংস্কৃতের অনুসরণ করে না। যথা "সাহেব" শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "মেম" হইবে কিন্তু "সাহেবী" হইবে না। এইরূপ অনেক বিষয়ে বাঙ্গালা সংস্কৃত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আবার অনেক বিষয়েই বাঙ্গালা সংস্কৃতের অনুধাবন করিতে অক্ষম।

সহস্র প্রভেদ সত্বেও বাঙ্গালা ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণের সহ দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ। সংস্কৃতের সহ বাঙ্গালার যেরূপ সম্বন্ধ জগতের অপর কোন ভাষার সহ বাঙ্গলার সেরূপ সম্বন্ধ নাই। বাঙ্গলা ব্যাকরণের প্রায় সমস্ত উপাদানই সংস্কৃত ব্যাকরণে বিদ্যমান আছে। অতএব বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইলে আমাদিগকে কোন অজ্ঞাত স্থানে পড়িয়া দিঙ্‌নির্ণয়ের জন্য কষ্ট পাইতে হইবেনা। সংস্কৃত ব্যাকরণের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে। মনে করুন আজি যদি প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটী নূতন দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়, আর যদি ঐ দ্বীপের ভাষা আর্য্য সেমিটিক ইত্যাদি কোন শাখার অন্তর্ভূত না হয়, তাহা হইলে বৈয়াকরণগণকে বিশেষ প্রণিধান পূর্ব্বক উক্ত দ্বীপের ভাষার গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নূতন ব্যাকরণ প্রস্তুত করিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রস্তুত করিলে আমাদিগকে সেরূপ সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণের প্রয়োজন হইবে না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

বরাহনগরের প্রাচীন কাহিনী।

(শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরীর উদ্যোগে প্রাপ্ত।)

১। কলিকাতার ৫।৬ মাইল উত্তরে ভাগীরথীর উভয় তটবর্ত্তী পরস্পর সম্মুখীন বালী ও বরাহনগর গ্রামদ্বয় বহুজনাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী সুপ্রাচীন গণ্ডগ্রাম।০ পঞ্জিকা সম্বন্ধে "বালীর মত" আজিও বঙ্গদেশে অতি আদরের সহিত সর্ব্বত্র গৃহীত ও অবলম্বিত হইয়া

থাকে। বরাহনগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বঙ্গসাহিত্যে বহুতর নিদর্শন আছে।

২। "চৈতন্যভাগবত" গ্রন্থে বরাহনগরের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের সমকালে এই গ্রামে "মালীপাড়া" নামক পাড়ার মধ্যে "ভাগবতাচার্য্য" নামে এক সুপণ্ডিত সাধু বৈষ্ণব বাস করিতেন। সে সময়ে বঙ্গদেশে তাঁহার ন্যায় শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন ব্যক্তি আর ছিলেন না। তাঁহার বাসভবন অদ্যাপি "পাঠবাড়ী" নামে সুপরিচিত। সন্ন্যাস গ্রহণান্তে চৈতন্যদেব শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর আলয়ে স্বীয় জননী শচীদেবীসকাশে নীলাচলে বাস করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তথায় গমনকালে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশী তিথীতে বরাহ-নগরে ভাগবতাচার্য্যের আশ্রমে শুভাগমন করেন এবং তথায় তিন দিবস কাল অবস্থিতি পূর্ব্বক সংযতচিত্তে আচার্য্যের নিকট ভাগবতপাঠ শ্রবণান্তে নীলাচলে গমন করেন। আচার্য্যের প্রার্থনায় মহাপ্রভু বরাহনগরের পাটবাড়ীতে তাঁহার খড়ম দুখানি রাখিয়া যান এবং তদুপলক্ষে আচার্য্য স্বীয় আলয়ে তাঁহার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে ফাল্গুনী কৃষ্ণা দ্বাদশীর সময়ে পাঠবাড়ীতে মহোৎসব হইয়া থাকে।

৩। মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কন কৃত চণ্ডীকাব্যে চৈতন্যদেবের বন্দনা আছে। সুতরাং ঐ গ্রন্থোক্ত শ্রীমন্ত সদাগরের সিংহল যাত্রা কালে যে বরাহনগর গ্রাম গঙ্গাতীরে বর্ত্তমান ছিল তাহা স্বতঃসিদ্ধ।

৪। বরাহনগর সম্বন্ধে একটি প্রবাদ এই যে অতি পূর্ব্বকালে এইগ্রামে "বরাহ মুনি" নামে এক সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারে এই গ্রাম "বরাহনগর" নামে অভিহিত। কেহ কেহ বলেন যে এই বরাহ মুনি ও উজ্জয়িনীপতি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নভুক্ত সভাসদ বরাহ একই ব্যক্তি।

৫। এই গ্রাম সম্বন্ধে অপর প্রবাদ এই যে মহারাজ বিক্রমাদিত্য যে সময়ে আরাকান বিজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন সেই সময়ে এই গ্রামে দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎসূত্রে তাঁহার সভাসদ বরাহের নামানুসারে এই গ্রাম বরাহনগর নামে অভিহিত। বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক আরাকান বিজয় কতদূর ঐতিহাসিক ঘটনা তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিলেও, পূর্ব্ববঙ্গায় "বিক্রমপুর" পরগণা যে বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে কল্পিত তদ্বিষয়ক কিম্বদন্তি আছে সুতরাং বিক্রমাদিত্যের বঙ্গাগমন অপ্রকৃত না হইতে পারে।

৬। এই গ্রামের উত্তরাংশ "উত্তর বরাহনগর" নামে উক্ত তথায় এইক্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বংশীয়গণ যে ভদ্রাসনে বাস করিতেছেন সেখানে অতি প্রাচীনকালে "অকিঞ্চন ব্রহ্মচারী" নামে এক মহা প্রভাবশালী সিদ্ধপুরুষ বাস করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে বহুতর প্রবাদ উক্ত হইয়া থাকে। অকিঞ্চন একদিন স্নানান্তে গঙ্গাতীরে বসিয়া আহ্নিক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে একটা কুম্ভীর সেই ঘাট হইতে একটি বালককে কবলিত করিয়া লইয়া যায় এবং তজ্জন্য তাহার মাতা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে থাকে। সেই আর্ত্তনাদে সিদ্ধপুরুষের ধ্যানভঙ্গ ঘটে। তিনি অবস্থা বুঝিয়া স্বীয় তপোবলে কুম্ভীরকে তৎক্ষণাৎ সেই বালক প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য করেন এবং তাঁহার মন্ত্র প্রভাবে বালক অবিলম্বে পুনর্জ্জীবিত হয়। তৎপরে ব্রহ্মচারী কুম্ভীর উদ্দেশে অভিশম্পাৎ করেন যে ভবিষ্যতে কোন কুম্ভীর অথবা হাঙ্গর বরাহনগরের কোন ঘাট হইতে কোন মনুষ্য অথবা অন্য জীবকে গ্রহণ বা ব্যাপাদিত করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহপাত হইবে। তৎসূত্রে সাধারণের বিশ্বাস এই যে বরাহনগর গ্রামে গঙ্গাগর্ভে অবগাহন কালে কোন ব্যক্তির নক্রগ্রহজনিত মৃত্যুর আশঙ্কা নাই। ফলতঃ এই গ্রাম হইতে কখনই কোন ব্যক্তি কুম্ভীর কর্ত্তৃক ধৃত হয় নাই। আর এক

দিন অকিঞ্চন গ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগকে ভোজনার্থ তাঁহার আলয়ে আহ্বান করিয়াছিলেন কিন্তু তদর্থে কোন দ্রব্য আহরণ করেন নাই। অথচ ব্রাহ্মণভোজনকালে তিনি তাঁহার বাসগৃহের অলিন্দে উপবেশন পূর্ব্বক, ঘরের মধ্য হইতে, সহস্রাধিক্য ব্রাহ্মণের আহারোপযোগী দ্রব্যসম্ভার পরিবেষ্টাদিগের হস্তে অকাতরে অবলীলাক্রমে অর্পণ করিয়াছিলেন। আহারার্থ ব্রাহ্মণগণ প্রাঙ্গনে উপবেশন করিলে, সহসা আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া বৃষ্টিপতনোন্মুখ হয় এবং প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, তাহাতে ব্রহ্মচারী প্রাঙ্গনে অবতরণ পূর্ব্বক ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিবামাত্র ঝড়বৃষ্টি নিবারিত হয় এবং ব্রাহ্মণেরা বরঞ্চ নিরাতপ অবস্থা স্বচ্ছন্দ পূর্ব্বক ভোজনকার্য্য সমাপন করেন। ঐ দিন ব্রাহ্মণগণ ভোজনার্থ আসন পরিগ্রহ করিলে সহসা আরও কতকগুলি ব্রাহ্মণ উপস্থিত হন। তাহাতে পরিবেষ্টাগণ স্থানাভাব বশতঃ তাঁহাদের উপবেশনের স্থানের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া নিতান্ত ব্যাকুলিত হন। তদ্দর্শনে ব্রহ্মচারী পুনরায় প্রাঙ্গনে অবতরণ করিয়া প্রান্তবর্ত্তী প্রাচীর-পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইবামাত্র, তথায় ব্রাহ্মণগণের উপবেশনোপযোগী প্রচুর স্থান প্রকাশিত হয় এবং তদ্দর্শনে উপস্থিত ব্যক্তিবৃন্দ সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক শক্তি উপলব্ধি করিয়া বিমোহিত হন। অকিঞ্চন ব্রহ্মচারীর ভদ্রাসনে যে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা পুরুষানুক্রমে বাস করিতেছেন, তন্মধ্যে বরাহনগর মিউনিসিপালিটীর বর্ত্তমান ভাইসচেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত শ্রীযুক্ত বাবু শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সম্প্রতি কলিকাতা বহুবাজারবাসী স্থপতিবিদ্যাবিশারদ শ্রীযুক্ত বাবু ক্ষেত্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রায় বাহাদুর সুপ্রসিদ্ধ।

৭। এই গ্রামবাসী আর একজন সিদ্ধপুরুষের অলৌকিক প্রভাব সম্বন্ধেও কিম্বদন্তি আছে। তিনি ব্রাহ্মণভোজন উপলক্ষে ঘৃতের

পরিবর্ত্তে তাঁহার বাটীর নিকটবর্ত্তী এক দীর্ঘিকার জলের দ্বারা লুচি প্র করাইয়াছিলেন। সেইজন্য সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি "ঘি-পুকুর" ন আখ্যাত।

৮। বরাহনগর সম্বন্ধে আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কাশী ও নবদ্বীপ ব্যতীত, ভাগীরথীতটে অন্য কোন স্থানে, বরাহনগরের ন্যায় এতাধিক প্রাচীন ঘাট নাই। সাধকগণ বলেন যে এই গ্রামে গঙ্গাতী সাধনোপযোগী যত আসন সংস্থাপিত আছে, কাশী ব্যতীত এত আ আর কোথাও নাই। ইহাও বরাহনগরের প্রাচীনত্বের একটি প্র নদর্শন। চর্চ্চা অভাবে এই সকল আসন লুপ্ত হইয়াছে। কো কি আসন আছে, তাহা এইক্ষণ সাধারণের অজ্ঞাত। কেবল একটি পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রাচীন গ্রাম্যদেবতা "দশমহাবিদ্যা" মন্দি বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের অপর প্রাচীন গ্রাম্যদেবতার ন "বুড়াশিব"।

৯। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে এই গ্র কুঠী স্থাপন করেন। তখন দিনামার, ওলন্দাজ, ফরাসী কি ইংর কেহই বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই। (Hunter's Statistic Account of the Twenty-four Parganas District দ্রষ্টব্য)।

১০। পরে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে এই গ্র গ্রহণ করেন। ওলন্দাজদিগের অধিকারকালে এই গ্রাম বাণিজ্যক প্রচুর উন্নতি লাভ করে এবং তৎসূত্রে বহুতর গন্ধবণিক, তিলি, তন্তুব শৌণ্ডিক প্রভৃতি জাতীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তি এই স্থানে বাস গ্র করেন। ফলতঃ সপ্তগ্রামের পতনের পর বরাহনগর বঙ্গদেশে ভাগীরথ তটে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। সেই সময়ে বরাহনগ "খাশবাগান" নামক পল্লীতে যেরূপ উৎকৃষ্ট ধুতী, শাটী ও গরদ প্রস্তু হইত, বঙ্গদেশে সেরূপ সামগ্রী আর কুত্রাপি মিলিত না। বরাহনগরে

"ডুরে" অতি প্রসিদ্ধ ছিল। বস্ত্রসম্বন্ধীয় বরাহনগরের সেই প্রতিপত্তি এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

১১। অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই গ্রামে ওলন্দাজ অধিকারের নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। এই গ্রামের যে অংশ "কুঠীঘাটা" নামে পরিচিত, তথায় ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যপোতের ব্যবহারোপযোগী সদর ঘাট অবস্থিত ছিল। এই স্থান হইতে গঙ্গার ধারে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাই সে সময়ে Strand ছিল। এই পথ যে স্থানে শেষ হইয়াছে, তথায় এইক্ষণ কলিকাতাবাসী স্বর্গগত জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের ৺ কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কালী-বাড়ী স্থলেই ওলন্দাজদিগের কুঠীয়ালের প্রাসাদ, বিচারালয়, মালখানা, কারাগার প্রভৃতি সংস্থাপিত ছিল। ইহার উত্তরাংশ ওলন্দাজদিগের আবাসপল্লী স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। এই ওলন্দাজ গৃহস্থগণের মধ্যে শেষ ছিলেন স্যামুয়েল সাহেব। স্যামুয়েলকে দেখিয়াছেন, এরূপ বৃদ্ধ আজিও জীবিত আছেন। ওলন্দাজদিগের প্রাচীন নহবতখানাদ্বয় আজিও কালীবাড়ীর সংলগ্ন ঘাটের উভয় পার্শ্বে নহবতখানা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

১২। ষ্ট্র্যাণ্ডের পূর্ব্ব পার্শ্বে এবং কুঠীঘাটা হইতে বরাহনগরের বাজার পর্য্যন্ত "কুঠীঘাটা রোড" নামক রাজপথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী ছিল। সে গুলি তুলা প্রভৃতি বিবিধ পণ্য দ্রব্যের গুদাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। এই গুদাম গুলির বৃহদায়তন ভিত্তি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরাংশ অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন ওলন্দাজ অধিকারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাজারের নিকটস্থ "সানপুকুর" নামক স্থানে দ্বিতল গৃহাবলীতে ওলন্দাজ [illegible]গণ বাস করিত এবং গ্রামের এই অংশের নাম ছিল "নটীপাড়া"। বাজারের রাস্তার পূর্ব্বধারে যে প্রশস্ত দ্বিতল গৃহের নিম্নতলে বিপণি

পরিবর্ত্তে তাঁহার বাটীর নিকটবর্ত্তী এক দীর্ঘিকার জলের দ্বারা লুচি প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। সেইজন্য সেই পুষ্করিণী অদ্যাপি "ঘি-পুকুর" নামে আখ্যাত।

৮। বরাহনগর সম্বন্ধে আর একটি জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, কাশীধাম ও নবদ্বীপ ব্যতীত, ভাগীরথীতটে অন্য কোন স্থানে, বরাহনগরের ন্যায় এতাধিক প্রাচীন ঘাট নাই। সাধকগণ বলেন যে এই গ্রামে গঙ্গাতীরে সাধনোপযোগী যত আসন সংস্থাপিত আছে, কাশী ব্যতীত এত আসন আর কোথাও নাই। ইহাও বরাহনগরেব প্রাচীনত্বের একটি প্রশস্ত নদর্শন। চর্চ্চা অভাবে এই সকল আসন লুপ্ত হইয়াছে। কোথায় কি আসন আছে, তাহা এইক্ষণ সাধারণের অজ্ঞাত। কেবলমাত্র একটি পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রাচীন গ্রাম্যদেবতা "দশমহাবিদ্যা" মন্দিরে বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের অপর প্রাচীন গ্রাম্যদেবতার নাম "বুড়াশিব"।

৯। ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে পর্ত্তুগীজেরা সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রামে কুঠী স্থাপন করেন। তখন দিনামার, ওলন্দাজ, ফরাসী কি ইংরাজ কেহই বঙ্গদেশে আগমন করেন নাই। (Hunter's Statistical Account of the Twenty-four Parganas District দ্রষ্টব্য)।

১০। পরে ওলন্দাজেরা পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে এই গ্রাম গ্রহণ করেন। ওলন্দাজদিগের অধিকারকালে এই গ্রাম বাণিজ্যকল্পে প্রচুর উন্নতি লাভ করে এবং তৎসূত্রে বহুতর গন্ধবণিক, তিলি, তন্তুবায়, শৌণ্ডিক প্রভৃতি জাতীয় ব্যবসায়ী ব্যক্তি এই স্থানে বাস গ্রহণ করেন। ফলতঃ সপ্তগ্রামের পতনের পর বরাহনগর বঙ্গদেশে ভাগীরথী-তটে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। সেই সময়ে বরাহনগরে "খাশবাগান" নামক পল্লীতে যেরূপ উৎকৃষ্ট ধুতী, শাটী ও গরদ প্রস্তুত হইত, বঙ্গদেশে সেরূপ সামগ্রী আর কুত্রাপি মিলিত না। বরাহনগরের

"ডুরে" অতি প্রসিদ্ধ ছিল। বস্ত্রসম্বন্ধীয় বরাহনগরের সেই প্রতিপত্তি এইক্ষণে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছে।

১১। অতি অল্পদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই গ্রামে ওলন্দাজ অধিকারের নিদর্শন বিদ্যমান ছিল। এই গ্রামের যে অংশ "কুঠীঘাটা" নামে পরিচিত, তথায় ওলন্দাজদিগের বাণিজ্যপোতের ব্যবহারোপযোগী সদর ঘাট অবস্থিত ছিল। এই স্থান হইতে গঙ্গার ধারে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত পথ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাই সে সময়ে Strand ছিল। এই পথ যে স্থানে শেষ হইয়াছে, তথায় এইক্ষণ কলিকাতাবাসী স্বর্গগত জয়নারায়ণ মিত্র মহাশয়ের ৺ কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠিত আছে। এই কালী-বাড়ী স্থলেই ওলন্দাজদিগের কুঠীয়ালের প্রাসাদ, বিচারালয়, মালখানা, কারাগার প্রভৃতি সংস্থাপিত ছিল। ইহার উত্তরাংশ ওলন্দাজদিগের আবাসপল্লী স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। এই ওলন্দাজ গৃহস্থগণের মধ্যে শেষ ছিলেন স্যামুয়েল সাহেব। স্যামুয়েলকে দেখিয়াছেন, এরূপ বৃদ্ধ আজিও জীবিত আছেন। ওলন্দাজদিগের প্রাচীন নহবতখানাদ্বয় আজিও কালীবাড়ীর সংলগ্ন ঘাটের উভয় পার্শ্বে নহবতখানা রূপে ব্যবহৃত হইতেছে।

১২। "ষ্ট্রাণ্ডের পূর্ব্ব পার্শ্বে এবং কুঠীঘাটা হইতে বরাহনগরের বাজার পর্য্যন্ত "কুঠীঘাটা রোড" নামক রাজপথের উভয় পার্শ্বে উচ্চ অট্টালিকাশ্রেণী ছিল। সে গুলি তুলা প্রভৃতি বিবিধ পণ্য দ্রব্যের গুদাম স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। এই গুদাম গুলির বৃহদায়তন ভিত্তি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরাংশ অদ্যাপি স্থানে স্থানে বিদ্যমান থাকিয়া প্রাচীন ওলন্দাজ অধিকারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বাজারের নিকটস্থ "সানপুকুর" নামক স্থানে দ্বিতল গৃহাবলীতে ওলন্দাজ বেশ্যাগণ বাস করিত এবং গ্রামের এই অংশের নাম ছিল "নটীপাড়া"। বাজারের রাস্তার পূর্ব্বধারে যে প্রশস্ত দ্বিতল গৃহের নিম্নতলে বিপণি

শ্রেণী সংস্থাপিত আছে, তাহাও ওলন্দাজ আমলের বাটী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

১৩। ওলন্দাজেরা এই গ্রাম গড়বন্দী করিয়াছিলেন। এই গড় গ্রামের দক্ষিণে, কাশীপুর ও বরাহনগরের মধ্যস্থলে যেখানে ভাগীরথীর সহিত মিলিত ছিল, তথায় এইক্ষণ কাশীপুরের শবদাহঘাট অবস্থিত আছে। সেই প্রাচীন গড় বহুপূর্ব্ব হইতে ড্রেনে পরিণত হইয়াছে এবং এই ড্রেনের ধারে ধারে বরাহনগরের দক্ষিণ সীমান্ত রেখার পরিচায়ক "P. B. P." (Public Boundary Pillar) চিহ্নিত লৌহময় স্তম্ভ-শ্রেণী সংস্থাপিত হইয়াছে। সেই গড়ের প্রান্ত যে স্থানে গঙ্গার সহিত যুক্ত ছিল, তথায় দক্ষিণেশ্বরস্থ স্বর্গগতা রাণী রাসমনির কালীবাড়ী ও কলিকাতাবাসী স্বর্গগত যদুনাথ মল্লিক মহাশয়ের উদ্যানবাটীর মধ্যবর্ত্তী খাল আজিও বিদ্যমান আছে। এই খাল প্রাচীনকালে "দৈত্যের খাল" নামে উক্ত ছিল।

১৪। যে সময়ে এই দেশে ডাকাইতীর উপদ্রব ছিল, সেই সময়কার যে যে বাটী এই গ্রামে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহার প্রত্যেকটিতে সিঁড়ির উপরে "চাপা দরজা" আছে। শ্রীমানীদিগের ও বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের বাটীতে এই চাপা দরজা আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। ওলন্দাজদিগের অধিকারকালে মধুসূদন শ্রীমানী, তিলী জাতীয় শ্রীমানী বংশের কর্ত্তা ছিলেন। তুলার কারবারে তিনি বিশেষ ধনাঢ্য হইয়াছিলেন। প্রবাদ এই যে একবার ডাকাইতেরা তাঁহার বাটীতে ডাকাইতী উপলক্ষে অস্ত্রদ্বারা তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়াছিল।

১৫। এই গ্রামে "সিধে ডাকাত" নামক এক প্রসিদ্ধ ডাকাই বাস করিত। এই গ্রামের যাহা কিছু ডাকাইতী তাহা সিধের জন্মে পূর্ব্বে। সিধের প্রতিপত্তিকাল অবধি আর এই গ্রামে বিশেষ মারাত্ম কোন ডাকাইতী হয় নাই।

১৬। পলাসীর যুদ্ধের পরে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজদিগের সহিত ইংরাজদিগের বিরোধ ঘটে। তৎসূত্রে ক্লাইব কর্ত্তৃক Col. Forde এই গ্রামে প্রেরিত হন এবং এই স্থানে ইংরাজ ওলন্দাজে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধের প্রারম্ভে Col. Forde ক্লাইবের অনুমতি প্রার্থনায় কলিকাতায় দূত প্রেরণ করেন। ক্লাইব তখন তাস ক্রীড়ায় নিযুক্ত ছিলেন সুতরাং তিনি একখানি তাসের (টেক্কা) উপর "Dear Forde, Drive them out—" এই আদেশ পেন্সিল যোগে লিখিয়া পাঠান এবং সেই আদেশ ক্রমে Forde ওলন্দাজদিগকে বরাহনগর হইতে দূরীভূত করেন। (Macfarlane's History of British India.)

১৭। এই যুদ্ধের পরে ওলন্দাজদিগের সহিত ইংরাজের সন্ধি হয় এবং তৎসূত্রে ইংরাজ যবাদ্বীপস্থিত স্বাধিকৃত ভূমি ওলন্দাজদিগকে অর্পণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকট হইতে বরাহনগর গ্রাম গ্রহণ করেন। বঙ্গদেশ মধ্যে ইংরাজরাজ এইরূপে অন্যান্য ইয়ুরোপীয় বা দেশীয়দিগের নিকট হইতে যে যে ভূমি লাভ করিয়াছেন, তৎসমস্ত খাশমহাল নামে অভিহিত। বরাহনগর জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত ১০৬৮ নং খাশমহাল, সুতরাং এই গ্রামবাসীগণ কোন জমীদারের প্রজা নহেন। এই গ্রামবাসীগণ নিজ নিজ ভদ্রাসন বাটীর নিমিত্ত বর্ষে বর্ষে কালেক্টরীতে খাজনা দাখিল করেন।

১৮। ইংরাজাধিকারের পর এই গ্রাম প্রথম ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে জরীপ হয়। তৎপরে স্বর্গগত স্বনামধন্য দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় এই গ্রামের বন্দোবস্ত জন্য কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন। তিনি প্রতি বিঘা ৩।০ হারে বন্দোবস্ত করেন।

১৯। এই বন্দোবস্তের পরে টাকী ও বরাহনগর বাসী স্বর্গগত রায় কালীনাথ চৌধুরী (মুন্সী) মহাশয় এই গ্রাম ইজারা গ্রহণ করেন,

সেই ইজারাকালে গ্রামস্থ ব্যক্তিবর্গ খাজনা দিতে অসমর্থ হইলে, মুন্সীবংশীয়গণ তাহা বহন করিতেন। এইহেতু তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি হওয়ায়, তাঁহারা ইজারা পরিত্যাগ করেন এবং নড়াইলের জমীদার স্বর্গগত রামরতন রায় মহাশয় এই গ্রামের ইজারা গ্রহণ করেন।

২০। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই গ্রাম পুনরায় জরীপ হইয়া নূতন বন্দোবস্ত হয়। তদবধি এইগ্রামের খাশ তহশীল চলিতেছে।

২১। এই গ্রামের প্রাচীন অধিবাসীগণের মধ্যে দক্ষিণ বরাহ-নগরের স্বর্গগত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দুর্গারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাঁশ-তলার চক্রবর্ত্তী" আখ্যাত করঞ্জ গাঁই মঙ্গল ওঝার সন্তান বারেন্দ্র চক্রবর্ত্তী বংশীয়গণ, "বোড়ালপাড়ার" বোড়াল ও চট্টোপাধ্যায়গণ, মুন্সীবংশীয়গণ এবং "ময়রাডাঙ্গার" শ্রীমানীগণ এবং উত্তর বরাহনগরের দেওয়ান বংশ ও স্বর্গগত দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশ এবং "পালপাড়ার" ভট্টাচার্য্যবংশ সুপ্রসিদ্ধ। বিখ্যাত "Reis and Rayyet" পত্রিকার স্বনামধন্য সম্পাদক স্বর্গগত ডাক্তার শম্ভূচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রামের উজ্জ্বল রত্ন।

২২। ইদানীং জুট ফ্যাক্টরীর জন্য বরাহনগর গ্রাম প্রসিদ্ধ। স্থানীয় উৎসব মধ্যে পূর্ব্বাবধি পালপাড়ার "পচাচড়ক" এবং ইদানীং "কুঠিঘাটা হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার" বার্ষিক মহোৎসব অতি সমারোহে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।

সাময়িক কথা।

বিগত ২০শে জুন রবিবার সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেদিনকার অধিবেশন সম্বন্ধে আমরা যে বিবরণ শ্রুত হইয়াছি তাহা নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :—সভায় অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের অসুস্থতা প্রযুক্ত তাঁহার প্রবন্ধটি অপর এক মহোদয় কর্ত্তৃক পঠিত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্গের পণ্ডিত সমাবেশ।

প্রবন্ধে ভারতীয় ন্যায়দর্শন প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি গৌতম সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়, তৎপরে বৌদ্ধনৈয়ায়িক সুপ্রসিদ্ধ দিঙ্‌নাগাচার্য্য, পক্ষধর মিশ্র, উদয়নাচার্য্য, গঙ্গেশ শিরোমণি, রঘুনাথ শিরোমণি, জগদীশ তর্করত্ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িকগণের সম্বন্ধেও নানা কথা আলোচিত হয়। কিন্তু প্রবন্ধকার স্বয়ং বৈদান্তিক, ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে ব্যুৎপন্ন হইলেও উক্ত শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার আন্তরিক প্রীতির অভাব প্রবন্ধটিতে লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, যে সকল কথা অতি সহজে প্রকাশ পাইতে পারিত, নৈয়ায়িকগণ তাহা ইচ্ছা করিয়া দুর্ব্বোধ করিয়াছেন, তাঁহারা ন্যায়ের তত্ত্বগুলি এরূপ জটিল ও অপ্রচলিত ভাষার ব্যূহের মধ্যে সংস্থাপিত করিয়াছেন, যে তাহা উক্ত শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন না হইলে কোন পণ্ডিতেরই সহজে অধিগম্য হইবার নহে, এই যুক্তির সাপক্ষে তিনি যে সকল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছিলেন তাহাতে সভাস্থলে একটা অট্টহাসির কলরব পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রধান প্রধান কয়েক জন নৈয়ায়িক পণ্ডিতের কর্ণে সেই অট্টহাসির শব্দ যে মধুর বোধ হয় নাই তাহা পরক্ষণেই জানা গিয়াছিল।

প্রবন্ধ পাঠ শেষ হইলে কোটালীপাড়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জানকী নাথ বেদান্ত তর্কপঞ্চানন উঠিয়া প্রায় এক ঘণ্টা কাল বক্তৃতা করেন, সেই এক ঘণ্টায় তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্য উপস্থিত সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তিনি প্রতিপন্ন করেন, ন্যায়ের ভাষা জটিল নহে; বরং উহা সহজ। কারণ অন্য সকল শাস্ত্রই

ব্যাকরণ জ্ঞান না থাকিলে অনধিগম্য হয়, কিন্তু ব্যাকরণের কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান শূন্য বহুসংখ্যকব্যক্তিকে ন্যায়শাস্ত্রে অসামান্য পটুতা লাভ করিতে তিনি দেখিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রে পারিভাষিক শব্দ না থাকিলে চলে না, এবং সেই সকল পারিভাষিক শব্দে শুধু ন্যায়শাস্ত্রেরই প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, অন্যত্র তাহাদের ব্যবহার নাই, যাঁহারা ন্যায় পড়িবেন, তাঁহাদের সেই সকল শব্দজ্ঞান ভিন্ন গত্যন্তর নাই, এই পারিভাষিক শব্দসমূহের জন্যই ন্যায়শাস্ত্র আপাততঃ দুর্ব্বোধ বলিয়া বোধ হইতে পারে।

তিনি বৌদ্ধ প্রত্যক্ষবাদী নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি ও তৎবিরুদ্ধে হিন্দু নৈয়ায়িক-গণের অনুমান-বাদ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন,—কোন গৃহ হইতে ধূম্র নিঃসৃত হইতেছে, সুতরাং সে স্থানে অগ্নির সত্ত্বা অনুমান করা প্রামাণ্য, এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষবাদীরা বলেন,—অনুমান কখনই গণ্য নয়, উহা সম্ভাবনা মাত্র, যেরূপ কোন ব্যক্তিকে খুঁজিতে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে যাওয়া হয়—শুধু সম্ভাবনা-মূলক অনুমান দ্বারা নিশ্চিত কিছু প্রতিপন্ন হয় না,—সুতরাং প্রত্যক্ষ প্রমাণই প্রমাণ, অনুমান কখনই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যাহা হইতে পারে এবং নাও হইতে পারে তাহা আবার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে কিরূপে? হিন্দু নৈয়ায়িকগণ এই কথার প্রত্যুত্তরে বলেন. নিজের চক্ষু নিজে দেখা যায় না,—দর্পনাদিতে যাহা দেখা যায় তাহাও যে নিজের চক্ষু ইহা অন্যত্র দৃষ্ট অবস্থার সাদৃশ্যমূলক অনুমান প্রসূত, সুতরাং প্রত্যক্ষ জ্ঞানাভাবে স্বীয় চক্ষুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে অবিশ্বাসী হইতে হয়।

এই সকল কথা অজস্র শ্লোকের উদ্ধরণ দ্বারা এমন সুস্পষ্ট ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ হইয়াছিল—যে সভায় সমবেত ব্যক্তিগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাহা শুনিয়াছিলেন।

অতঃপর মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কামাখ্যাচরণ তর্কবাগীশ মহাশয় ন্যায়-শাস্ত্রের ভাষা পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করিয়া জটিল করেন নাই, ইহা অতি বিশদরূপে বুঝাইয়া ছিলেন। "ঘট নাই" বলিতেও ঘটাভাব ও "নীল ঘট" নাই বলিতেও সেই ঘটাভাব, কিন্তু এই দুই ঘটাভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে, তাহা বুঝাইতে কতকগুলি পারিভাষিক শব্দ গ্রহণ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, এই ব্যাপারের জন্য পণ্ডিতগণ যে সকল পারিভাষিক শব্দ অবলম্বন করিয়াছেন, তদপেক্ষা সহজ ভাষায় যদি কেহ উক্ত বিষয় বুঝাইতে পারেন, তবে নৈয়ায়িক পণ্ডিত তাঁহার পুঁথি পত্র গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইবেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি ন্যায়শাস্ত্রের প্রতি রামচন্দ্রের অভিশাপের কথা বিবৃত করিলেন। জাবালী বলিয়াছিলেন

"বাক্য উৎপন্ন হইয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয়,—সুতরাং তোমার পিতৃমুখ উচ্চারিত বাক্যও তদ্দণ্ডেই লয় পাইয়া গিয়াছে—সুতরাং বিনষ্ট বাক্যকে তুমি প্রতিপালন করিবে কি প্রকারে, পিতৃসত্য পালন কথাই অসিদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ যদি পিতৃসত্য পালনরূপ অসিদ্ধ কথাও মানিয়া লই, তথাপি বন অর্থ কি ? বন অর্থ যদি যাবতীয় বন হয়, তবে চৌদ্দবৎসরে তোমার জগতের সমস্ত বন পর্য্যটন করা অসম্ভব, তাহার অর্থ যদি কোন বিশেষ কয়েকটি মাত্র বন হয়—তবে অযোধ্যার পার্শ্ববর্ত্তী বন উপবনে তুমি বাস করিতে পার, তাহা হইলে কৌশল্যাদেবী এবং অপরাপর কাহারও মনে কোনই ব্যথা হইবে না।" শ্রীরামচন্দ্র উত্তরে বলিলেন, "আমি পিতা দশরথের কোন কার্য্যই এ পর্য্যন্ত অসঙ্গত দেখি নাই, শুধু এইটি দেখিতেছি যে আপনার ন্যায় নাস্তিককে তিনি পৌরোহিত্যে বরণ করিয়াছিলেন,—আমি ধর্ম্মবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছি, আপনি অসার কতকগুলি যুক্তি দ্বারা আমাকে তৎপথ হইতে বিচলিত করিতে আসিয়াছেন। ন্যায় শাস্ত্রের মত এরূপ ধর্ম্মহীন শাস্ত্র যাঁহারা অধ্যয়ন করিবেন, আমার অভিশাপে তাঁহারা জন্মান্তরে শৃগালযোণি প্রাপ্ত হইবেন।" পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন এই ক্রূঢ় কটাক্ষ শুধু প্রত্যক্ষবাদী নাস্তিক বৌদ্ধ নৈয়ায়িকগণের প্রতি। বস্তুতঃ ন্যায়শাস্ত্র বুদ্ধিকে মার্জ্জিত করিয়া উহাকে ধর্ম্মমুখী করে।

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন নবদ্বীপের ন্যায়ের একটি বিশেষত্ব আছে। ইতিপূর্ব্বে ন্যায়শাস্ত্র ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল, কিন্তু নবদ্বীপের জগৎবিখ্যাত নৈয়ায়িকগণ উহাকে ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র করিয়া শুধু মার্জ্জিত যুক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের উপায়ে পরিণত করেন, এই স্থলে তাঁহাদের বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব। অতঃপর প্রসিদ্ধ বক্তা কৃষ্ণদাস বেদান্ত-বাগীশ মহাশয় কিছু বলিলেন এবং সভাপতি মহাশয় অতি মিষ্টভাবে আলোচনার মীমাংসা করিয়া দিলেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচার-পতি ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি প্রবন্ধলেখক ও বক্তাগণকে ধন্যবাদ প্রদান করার পরে সভাভঙ্গ হয়।

এই সভায় সমবেত ব্যক্তিগণ একটি বিষয় অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন। যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলন করিতেছেন তাঁহারা টোলের সংস্কৃত অধ্যাপকগণের নিকট কোন ঋণ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হন নাই, তাঁহারা ইংরেজী ও সামান্য সংস্কৃত জ্ঞানের উপর বঙ্গভাষার ভিত্তি স্থাপন করিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতেছেন, কিন্তু

এখনও বাঙ্গালা দেশের পর্ণকুটীরে যে জ্ঞানের আলোচনা, যে সূক্ষ্ম বিচার এবং পাণ্ডিত্যের যে আশ্চর্য্য প্রভাব পল্লীর পল্লবছায়ায় আত্মগোপন করিয়া আছে, তাহার নিকট আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকের মস্তক স্বতঃই অবনত হইবে। সেই সকল পর্ণকুটীর সরস্বতীর প্রকৃত বিলাস ক্ষেত্র, কেহ জীবন পণে ব্যাকরণ শিক্ষা করিতেছেন, কেহ বা ন্যায়-বেদান্ত প্রভৃতি চর্চ্চায় কেশ গুলি শুভ্র করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহাদের কাণ্ডজ্ঞান নাই তাঁহাদের সমস্তই পণ্ডশ্রম—ইংরেজীর সহজ জ্ঞানের অভাবে তাঁহাদের জীবন ব্যাপী শ্রম বিফল, সেই সহজ জ্ঞান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের টুলো পণ্ডিতের বিরুদ্ধে ইত্যাদি প্রকার নিন্দাবাদ সর্ব্বত্র শোনা যায়। কিন্তু সাহিত্য পরিষদের এই অধিবেশনে অনেকের সে ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে, এই যে ঘণ্টাদ্বয় ব্যাপী বিবিধ শাস্ত্রোদ্ধরণে গাঢ়রসপূর্ণ, ক্ষুরধার, সূক্ষ্ম তর্কচ্ছটায়-ও বাক্‌চাতুরীতে বিচিত্র বাদানুবাদ সকলে মন্ত্র মুগ্ধের ন্যায় শ্রবণ করিলেন, তাহাতে আধুনিক শিক্ষিতগণের মধ্যে সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ ব্যতীত কেহ বাঙনিষ্পত্তি করিতে সাহসী হন নাই, আর একজন এম্‌ এ, উপাধিধারী দাঁড়াইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়া সমবেত ব্যক্তি মণ্ডলীকর্ত্তৃক যেভাবে তিরস্কৃত হইয়া বসিয়া পড়িয়াছিলেন তাহা সকলের কৃপা উদ্রেক করিয়াছিল। বস্তুতঃ খর্জ্জুর বৃক্ষের ন্যায় পণ্ডিতমণ্ডলী রসগৌরবে ইংরাজী শিক্ষিতের অপেক্ষা বহুঊর্দ্ধ স্থানে উপস্থিত আছেন, ইহাঁদিগের সংযোগে ভিন্ন বঙ্গভাষা সম্যক স্ফূর্ত্তিলাভ করিবে না। ইহাঁরা বিশেষজ্ঞ, যিনি যে বিষয়ে ব্যুৎপন্ন তৎভিন্ন অপরাপর বিষয়ে তাঁহাদের অজ্ঞতা অতি সুস্পষ্ট, কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা জীবন পণে কোন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন সেই বিশিষ্ট পণ্ডিতকে আধুনিক পল্লব গ্রাহীগণের উপেক্ষা বা বিদ্রূপ করা বাতুলতা মাত্র। এই তর্ক উপলক্ষে বাঙ্গালা ভাষার যে সকল ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল তাহা বড়ই বিচিত্র, "তিনি যে সকল যুক্তির উপন্যাস করিয়াছেন," প্রভৃতি প্রকারের ব্যবহার সভ্যগণের কর্ণে অদ্ভুত শুনাইবার কথা উপন্যাস বলিলে বঙ্কিম কৃত যে সকল পদার্থ মনে পড়ে, এই উপন্যাস তাহা নহে। আমরা সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে কতকগুলি পরিভাষিক শব্দের সৃষ্টি করিয়াছি, কিন্তু যাহা দেশের পণ্ডিতগণ চিরকাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, সেই সকল পারিভষিক শব্দ কথনই উপেক্ষনীয় নহে।

পরিষদের এই অবিবেশান অন্য একটি কথা স্বতঃই মনে হইল, যাঁহারা এত বড় পণ্ডিত, তাঁহাদের কোনরূপ আড়ম্বর, ও সাজসজ্জার প্রতি দৃষ্টিপাত নাই, ইহাঁরা

কুটীরবাসী, সামান্য বেশী,—বর্ত্তমান বিলাসিতার হাওয়ায় ইহাঁদের একটী কেশও এখন পর্য্যন্ত বিচলিত হয় নাই—তথাপি ধর্ম্ম-বিশ্বাসে, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যে ইহাঁরা অসামান্য। বক্তৃতায় ইহাঁদের নিরতিশয় সংযম ও গুণগ্রাহিতা প্রকাশ পাইল,—আধুনিক সভ্যতার হিসাবে ইহাঁরা আড়ালে পড়িয়া গিয়াছেন, ইহাঁরা প্রকাশ্য ভাবে আসিয়া কর্ণধারিত্ব গ্রহণ না করিলে আমাদের সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টি অসম্ভব।

মুসলমান ও হিন্দুর অন্যোন্য ধর্ম্মগ্রহণ।

সম্প্রতি রুর্কিতে চারজন মুসলমানকে আর্য্যসমাজ আর্য্যধর্ম্মে দাক্ষিত করিয়াছেন। হিন্দু সমাজের সর্ব্ববর্ণের ব্যক্তিগণ এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। মুসলমানগণ মুণ্ডিত মস্তক হইয়া হিন্দু পরিচ্ছদে শুদ্ধি ক্রিয়া সমাধা করিয়াছিলেন। উৎসবান্তে নূতন দীক্ষিত চারি ব্যক্তি নিজ হস্তে সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন এবং তাঁহারা প্রীতির সহিত তাহা আহার করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

বোম্বাইএর ব্রাহ্ম (প্রার্থনা) সমাজ সৈয়দ আব্দুলকাদের নামক জনৈক শিক্ষিত মুসলমান ভদ্রলোককে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছেন। দীক্ষা কার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত হইযাছিল। শাস্ত্রী মহাশয় নব দীক্ষিত সৈয়দ মহাশয়কে দীক্ষা কালে বিশেষ ভাবে উপদেশ প্রদান করেন তিনি যেন তাঁহার প্রাচীন সমাজের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া জগতের ধর্ম্মসমূহের অন্যতম নেতা মহম্মদের প্রতি শ্রদ্ধা না হারাইয়া ফেলেন।

এই ব্যাপারের সঙ্গে আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাঃ নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সম্প্রতি হায়দ্রাবাদে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি মুসলমান নাম গ্রহণ পূর্ব্বক এখন মুসলমান সমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। সাম্প্রদায়িক হিসাবে এই দ্বিবিধ ঘটনা বিদ্বিষ্ট সমালোচনার হেতুভূত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইতে পারি নাই। আমাদের এই জাতীয় দুর্দ্দিনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য। কতকটা উদারতা অবলম্বন না করিলে আমাদের স্বদেশ ভক্তি ব্রতের সঙ্কল্প গ্রহণ অসম্ভব। আমরা হিন্দু মুসলমানকে এখন এক জাতি বলিয়া মনে করি—তাঁহারা ভারতবাসী এই হিসাবে তাঁহারা আর

ভিন্ন জাতি নহে। আমরা মাতৃনামে পরিচিত হইয়া ঐক্যের গৌরব অনুভব করিতে শিখিলে ভবিষ্যতের বহু কল্যাণ সাধিত হইবার সম্ভাবনা আছে। প্রটেষ্টাণ্ট ও ক্যাথলিক পরস্পরের নানা অনৈক্য সত্বেও ইংলণ্ডে তাঁহারা যেমন ইংরেজ এই সাধারণ সংজ্ঞায় পরিচয় প্রদান করিয়া মাতৃভূমির গাঢ় সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন, আমরা সেইরূপ হিন্দু মুসলমান ভারতবাসী বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়া কেন না প্রীতির বন্ধনে দৃঢ় আবদ্ধ হইব। কোন প্রোটেষ্টাণ্ট রোমান ক্যাথলিকের দীক্ষা গ্রহণ করিলে কিম্বা ক্যাথলিক প্রটেষ্টাণ্ট হইলে তাঁহাদের ইংরেজ নাম ঘুচিয়া যায় না, স্বদেশের উন্নতি কল্পে তাঁহারা পাশাপাশি ভ্রাতৃবেশে দাঁড়াইতে কুণ্ঠিত হন না, ধর্ম্মদ্বৈধ জাতীয়লক্ষ্মীর প্রীতির আবাহনে আত্মোৎসর্গ করে, আমাদের এখন এই দৃষ্টান্ত অনুসরণীয়। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে যাহার যেরূপ অধিকার তদনুসারে সে সেইপ্রকার ধর্ম্ম চর্চ্চা করিবে, সুতরাং শাস্ত্র আমাদের বিদ্বেষের কোন কারণ সৃষ্টি করে নাই, আমরা বৃথা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠার মোহে যেন জাতীয় লক্ষ্য এক দিনের জন্যও বিস্মৃত না হই। হিন্দু মুসলমানের অদৃষ্টে একই দাসত্বের লিপি লিখিত হইয়াছে, বিদেশী বণিক একই নলমুখে উভয় সম্প্রদায়ের রক্ত মোক্ষণ কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এখন বিদ্বেষের চক্ষে জাতিগত ব্যাপার গুলি না দেখিয়া উদার দেশহিতের আলোকপাতে পরস্পরের কর্ত্তব্য পথ দেখিয়া লওয়া উচিত।

প্রবন্ধান্তরে আমরা বলিয়াছি যে হিন্দুস্থান যুগে যুগে বিদেশীয় উপাদান গুলির দ্বারা স্বীয় কলেবরের পুষ্টিসাধন করিয়া লইয়াছে, এখন সেই সকল উপাদান দেশের অপরিহার্য্য অঙ্গে পরিণত হইয়া গিয়াছে। কত হূণ, মঙ্গলিয়ান, ও সিদিয়ান হিন্দু সমাজে প্রবেশ করিয়া এমন কি ব্রাহ্মণের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন, তাহার সাক্ষ্য কতক ইতিহাসের পত্রে লিপিবদ্ধ আছে, কতক আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের শিরোকঙ্কাল পরীক্ষায় ধরা পড়িয়া গিয়াছে। যে হিন্দু ঋকমন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে পঞ্জাব অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহাদের রক্তের বিশুদ্ধি হিন্দুস্থানে রক্ষিত হয় নাই, এদেশের অধিবাসীর রক্তে কি পরিমাণে হূণ, চীন ও গ্রীক যবনের রক্ত বিদ্যমান আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া কেহ যদি আমাদের প্রকৃত পরিচয় দেন তবে আমরা স্বরূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া পড়িব। হিন্দু মুসলমানে তুলনায় প্রভেদ অতি সামান্য, তাতার এবং অপরাপর স্থানবাসী বৌদ্ধ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া

পুনশ্চ হিন্দুস্থানে স্বপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন সুতরাং সে হিসাবে তাঁহারা আমাদের পর নহেন। আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষদিগের মধ্যে অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং শোনিতের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞাতিত্ব অস্বীকার করিবার যো নাই, ধর্ম্ম-মত ভেদের অন্ধতায় বর্ত্তমান শঙ্কটাপন্ন অবস্থা যেন আমরা বিস্মৃত না হই। যখন কোন কোন বন্যা আসিয়া পল্লী প্লাবিত করিয়া ফেলে, তখন বাঘ মেষশাবক একস্থানে মিত্রভাবে অবস্থান করে, আমাদের দেশের এই সর্ব্ববিধ ঘোর অবনতির দিন যেন বৃথা সাম্প্রদায়িক কলরবের সৃষ্টিতে সৌভ্রাত্রের বন্ধন ছেদন না করি, ঐক্যই আমাদের প্রধান মন্ত্র হউক এবং জাতীয়লক্ষ্মীর পুনঃ প্রতিষ্ঠা হিন্দু মুসলমানের তপস্যার একমাত্র লক্ষ্য নির্দ্ধারিত হউক।

বিশ্বকোষে "মুসলমান" শব্দ।

৩৩৩ সংখ্যক বিশ্বকোষ অভিধানে "মুসলমান" শব্দার্থে এমন কতকগুলি কথাছিল যাহাতে মুসলমানদিগের মনে আঘাত লাগিবারকথা, প্রত্যুত বিশ্বকোষের ন্যায় পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিধানে একটি বিশিষ্ট জাতির ইতিহাস রচনায় তদ্রূপ ত্রুটি গর্হিত। এই প্রবন্ধটি লইয়া নবনূরে "বিশ্বকোষে বসুজ" শীর্ষক একটি তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রতিবাদ লেখক হিন্দুধর্ম্মের বিরুদ্ধে এমন সকল কথা লিখিয়াছেন, যাহাতে হিন্দুগণ ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন,—এবং যাহা বিশ্বকোষের প্রবন্ধের প্রতিবাদে স্থান পাইবার কোন অপরিহার্য্য দাবী রাখে না।

বিশ্বকোষের প্রবন্ধটি স্থানে স্থানে নিতান্তই দূষণীয় হইয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম বিশ্বকোষ সম্পাদক নগেন্দ্র নাথ বসু এই প্রবন্ধ লিখেন নাই, এমন কি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে তিনি তাহা একবার দেখিবারও সুবিধা পান নাই, তিনি বিশেষ কার্য্যানুরোধে কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার অনুপস্থিতি কালে এইরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে। নগেন্দ্রবাবু নবনূরের প্রবন্ধ পাঠ করিয়া মুসলমান শব্দার্থ সম্বন্ধে বিশ্বকোষে প্রকাশিত সন্দর্ভটি পুনরায় পাঠ করেন এবং অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া নবনূরের সম্পাদক মহাশয়কে এক পত্র লিখেন, তাহাতে ক্ষমা প্রার্থনা ত ছিলই, অধিকন্তু নগেন্দ্র বাবু বিশ্বকোষে প্রকাশিত প্রবন্ধটি নষ্ট করিয়া তৎস্থলে আর একটি বিশুদ্ধ সন্দর্ভ প্রকাশ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তিনি

"মুসলমান" শব্দ লিখিবার জন্য কোন যোগ্য মুসলমান শিক্ষিতমহোদয়কে নির্ব্বাচন করিবার ভার, নবনূর সম্পাদক মহাশয়কে দিয়াছেন।

এই পত্র পাইয়া নবনূর সম্পাদক এবং স্বয়ং প্রতিবাদ লেখক উভয়েই নগেন্দ্র বাবুর প্রতি তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিবার জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন। উভয় পক্ষের শিষ্টাচারে উদ্যত বিদ্বেষ নির্ব্বাপিত হইয়া প্রীতির ধারা বর্ষিত হইয়াছে।

যে ব্যক্তি মুসলমান শব্দের অর্থ বিশ্বকোষে লিখিয়াছেন, তিনি বিদ্বেষের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উহা লিখেন নাই। মুসলমান ধর্ম্মের ইতিহাস সঙ্কলন করিতে কতকগুলি ইংরাজী পুস্তকই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল, তিনি অন্ধভাবে সেই ইংরেজ লেখকগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া গিয়াছিলেন এই জন্যই সমস্ত বিভ্রাট।

এ স্থলে আর একটি কথা বলা উচিত, হিন্দুলেখকগণের অনেকেই আরবী পার্শী এমন কি উর্দ্দূভাষায়ও ব্যুৎপন্ন নহেন,—মুসলমানদের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে হইলেই ইংরেজী পুস্তকই প্রধানতঃ অবলম্বনীয় হয়। খৃষ্টান পাদ্রীগণ হিন্দুধর্ম্ম ও মুসলমান ধর্ম্ম মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই চিত্রের প্রতিচ্ছায়া যাহাতে পড়িবে তাহাতে সমস্ত প্রীতি ও সদ্ভাব বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা আছে। এক্ষেত্রে আমাদিগের উচিত বঙ্গভাষায় আমাদিগের সমস্ত তত্ত্ব প্রচার করা, হিন্দুগণ তৎপথে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, মুসলমানগণ এই ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া স্বীয় ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক ইতিহাসের জীবন্ত চিত্র বঙ্গদেশে প্রকটিত করুন, তাহা হইলে তাঁহাদের জাতীয় শিক্ষা সফল হইবে এবং স্বীয় সমাজের উচ্চ ও নিম্নতম স্তরে একই ভাবের অনুপ্রাণতায় ঘনিষ্ঠতর ঐক্য ও প্রীতির বন্ধন উপলব্ধ হইবে এবং হিন্দু ও মুসলমানের আদর্শ পরস্পরের নিকট জাজ্জ্বল্যমান হইবে, হিন্দুলেখক আর তাহা হইলে প্রতিবাসী ভ্রাতাদের বিকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য পাদ্রীর শরণাপন্ন হইবেন না।

হিন্দুদিগকে আমাদের একটা কথা বলিবার আছে, আমাদের জাতীয় চিন্তা এখন বড়ই বিকৃত পথে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আমরা কার্য্যের অভাবে শুধু সময় যাপন করিবার জন্য প্রতিবেশীদের নিন্দাবাদ করিয়া তাহাদিগের মনে কষ্ট দিই, আমরা উড়িষ্যাবাসীকে "উড়ে মেড়া" বেহারীকে "মেড়ুয়া" পূর্ব্ববঙ্গের লোকদিগকে "বাঙ্গাল" ও মুসলমানদিগকে "নেড়ে" বলিয়া আমোদ পাই,—এরূপ অসঙ্গত ভাষা এখন অমার্জ্জনীয়। আমরা বিভিন্ন নহি, একজাতির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, আমাদের জাতীয় কল্যাণের জন্য এখন পরস্পরের প্রতি এইরূপ ঘৃণায় বিষবাণ যাহাতে নিক্ষিপ্ত না

হয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক লেখকের জিহ্বা ও লেখনীর অগ্রে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

নবনুরে "দু মুখো" নামক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা বিদ্বিষ্ট রচনা; যে স্থলে কোন লেখায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের সৃষ্টি হইতে পারে, তাদৃশ অমার্জ্জিত রচনা ভদ্রসাহিত্যের বহির্ভূত। উহা প্রকাশিত করিলে সম্পাদক তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। নগেন্দ্র বাবু সম্বন্ধীয় এই ঘটনায় একটি কথা জাজ্জ্বল্যমান হইয়াছে, যে হিন্দু মুসলমানের পরস্পরের প্রতি প্রীতি উৎপাদন কত সহজ, অথচ যদি আমরা এই সুখের সম্মিলনের সুগমপন্থা পরিত্যাগ করিয়া সাম্প্রদায়িক প্রাচীর তুলিয়া পরস্পরের প্রতি বিমুখ হইয়া অবস্থান করি—তবে উদার নীলাম্বরের নিম্নে একই মাতৃভূমির স্তন্যপান করিয়া আর কি শিক্ষালাভ করিলাম?

হাওড়া হিতৈষী নামক পত্রিকায় শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী মহাশয়ার একটি প্রবন্ধের প্রতিবাদ উপলক্ষে নিতান্ত অভদ্রোচিত কথা লিখিত হইয়াছিল,

কায়স্থ লেখক কর্ত্তৃক কায়স্থ মহিলার অবমাননা।

তৎসম্বন্ধে জনৈক লেখক "কায়স্থ রমণীর মানহানি" শীর্ষক একটি উত্তেজিত ও অভিযোগমূলক প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতীতে প্রকাশের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধে কায়স্থ সভা ও তৎসংশ্লিষ্ট অনেক কায়স্থ গণ্যমান্য ব্যক্তির প্রতি দোষারোপ ছিল। প্রবন্ধে বর্ণিত বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নিরূপণের জন্য আমরা বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিকট এতৎসম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য জানিতে চাহিয়াছিলাম, তিনি কায়স্থ সভার একজন উদ্যোগী এবং কায়স্থ পত্রিকার সম্পাদক, [illegible] প্রকৃত ঘটনা জ্ঞাত আছেন। তিনি উত্তরে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল, এই পত্র পাঠে দেখা যাইতেছে যে শ্রীমতী নগেন্দ্রবালার অপমানে কায়স্থ সভা নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন ছিলেন বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস—তাঁহারা ভ্রান্ত। নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন—

"গত বর্ষের ফাল্গুন মাসে আনন্দ বাজার পত্রিকায় কায়স্থ সমাজের সম্মিলন সম্বন্ধে

শ্রদ্ধাস্পদা শ্রীযুক্তা নগেন্দ্রবালা সরস্বতী এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। হাওড়া হিতৈষীতে তাহার অভদ্রোচিত প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। সে প্রতিবাদ দর্শনে আমরা সকলেই বিচলিত হইয়াছিলাম। গত ৩রা চৈত্রের আনন্দবাজারে শ্রীমতী নীরদা সুন্দরী উক্ত প্রতিবাদের অভদ্রোচিত অংশ উদ্ধৃত করিয়া কায়স্থ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তৎপরে কায়স্থ সভার অধিবেশনে শ্রীমতী নীরদা সুন্দরীর পত্র আলোচিত হয়। তাহাতে কায়স্থ রমণীর মান রক্ষার জন্য কায়স্থ সভার কর্ত্তৃপক্ষ সকলেই যথাসাধ্য ব্যয়ভার বহন করিতে সম্মত হন এবং উপযুক্ত আইনজ্ঞের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবার জন্য কয়েক ব্যক্তির উপর ভারার্পণ করেন। শ্রীযুক্তা সরস্বতীর স্বামী মহাশয়ও কলিকাতায় আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হিতৈষীর অযথা নিন্দাবাদ পাঠ করিয়া কোন আইনজ্ঞই প্রতিকারের ব্যবস্থা দিলেন না ; কাজেই বাধ্য হইয়া আমাদিগকে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইল। দণ্ড বিধাতা ভগবানই দোষীর দণ্ডবিধান করিবেন, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।"

ইংরাজ রমণীর ভারতপ্রমিকর্তা।

তিনটি শ্বেত রমণী ভারতবর্ষের প্রতি পক্ষপাতী হইয়া আমাদিগকে জগতের মধ্যে একটি শ্রদ্ধার স্থান দিতে প্রয়াসী। মিসেস্ ফ্লোরাষ্টিলের সুন্দর গল্পগুলিতে দেশীয় চরিত্র উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে, আমরা কিপলিঙ্গের উপন্যাস পড়িয়া যখন ক্ষুব্ধ হইয়া পড়ি, তখন ফ্লোরাষ্টীল শেন সুকোমল স্বরে আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। মিসেস্ আনি বেসান্ত ভারতীয় ধর্ম্মতত্ত্বকে জগতের চিন্তার শীর্ষে স্থাপন করিতে চেষ্টিত, তাঁহার অসামান্য পাণ্ডিত্যের বাগ্মিতা আমাদিকের কথা জগৎবাসীর কর্ণে দুন্দুভি-নাদে শুনাইতেছে। কিন্তু সিষ্টার নিবেদিতা "দি ওয়েব অফ্ ইণ্ডিয়ান লাইফ" নামক নবপ্রকাশিত গ্রন্থে ভারতের পারিবারিক জীবনের যে স্নিগ্ধসুন্দর কল্যাণময় চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশেষ অনুরাগ আকর্ষণ করে। এই পুস্তকে পাঠক ইংরাজ রমণীর সহৃদয়তা ও চিত্রাঙ্কণ নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া পড়িবেন। ইহাতে হিন্দু রমণীর প্রতিকর্ম্মের মূলে লেখিকা যে ভক্তি প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন তাহাতে ভাব রাজ্যের জীবন্ত মূর্ত্তির ন্যায় তাঁহারা আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছেন। কোন নববিবাহিতা রমণী স্বীয় শ্বশুরালয়ের সমস্ত [illegible] স্বরূপ বিস্ময়মিশ্র প্রীতির

চক্ষে সন্দর্শন করেন, আর্য্যা নিবেদিতা হিন্দুর পরিষ্কারের সমস্ত কার্য্য সেইরূপ চক্ষে দেখিয়াছেন।

কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হয়, ইহাতে অনেক স্থলে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসজনিত অতিরঞ্জিত বর্ণনা বিদ্যমান, আমাদিগের যে দিকটা আঁধার সেই দিকটা একবারে এই ছবির পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে, এমন কি হয়ত কোন কোন আঁধার কোণও ভক্তির আবেগে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা সাদা মুখের প্রশংসায় আত্মহারা হইয়া যাই, এই জন্য আশঙ্কা হয় এই পুস্তকের সমস্তই যে শুভফলদায়ক হইবে এমন নহে। নিন্দাই হউক, প্রশংসাই হউক সবই যেন আমরা আমাদের স্বাধীন বিচারশক্তির দ্বারা গ্রহণ করিতে পারি। অন্ধ অবজ্ঞাকে যেন ঘৃণা করিতে জানি, এবং অন্ধ ভালবাসাকে যেন ভয় করিতে শিখি, কারণ পক্ষান্তরে দুইই আমাদের প্রকৃত উন্নতির অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বাঙ্গালা সাহিত্যের মাসিক বিবরণী।

সাহিত্য—কাব্যশাখা ১১।

বেলা—গীতিকাব্য, শ্রীগিরিজানাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। উর্ম্মিচঞ্চল সমুদ্রের আঘাত সহিয়া বেলাভূমি শান্ত, স্থির ও দৃঢ়। ফেনোৎক্ষেপী চূর্ণতরঙ্গ বেলায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে—বেলা শান্ত, স্থির ও দৃঢ়। বেলার এই শান্তির মধ্যে একটা সকরুণ ভাব আছে, এই শান্তি ধৈর্য্যের, অটুট ধৈর্য্যের—ইহা সুখ-নিবাসের আরাম শয়নের হিল্লোলে পরিপুষ্ট নহে—ইহা ঝড়ের মধ্যে একটু বিরাম ও অবকাশের রেখা আঁকিয়া দেখাইতেছে। যেখানে তরঙ্গ, আবর্ত্ত ও আলোড়নে—সমগ্র চিত্রটি চঞ্চল—এই শান্তি তাহারই মধ্যে থাকিয়া বৈপরীত্যে আপনার সত্ত্বাকে মহান করিয়া দেখাইতেছে।

বেলার কবিতাগুলি এই হিসাবে স্বনামের সার্থকতা করিয়াছে। সংসারের সুখ-দুঃখের আন্দোলনে যাহার হৃদয় পুড়িয়া গিয়াছে, সুখের অমৃত ও দুঃখের হলাহল—এই দুই হইতেই যে নিষ্কৃতি ভিক্ষা করে অথচ কাপুরুষের ন্যায় অভিভূত হয় না,—বেলার কবিতা সেইরূপ হৃদয়ের বল ও নীরব ধৈর্য্য প্রকটিত করিতেছে। সমস্ত কবিতাগুলির সুরে জীবনে বীতস্পৃহ বিষাদের রেশ জাগিয়াছে, অথচ সে বিষাদে কটুত্ব বা আর্ত্তনাদ নাই—সে বিষাদ অদৃষ্টের বিধান মান্য করিয়া কার্য্যের প্রেরণা প্রদান করিতেছে এবং কর্ম্মশেষে ভগবৎ চরণে অশ্রুসিক্ত হৃদয়টি রাখিয়া চরম শান্তিলাভ করিবার প্রতীক্ষা করিয়া আছে।—এই কবিতাগুলির প্রতিটি শব্দ যেন এক একটী শিশিরাদ্র ফুলের ন্যায় অবনত মস্তকে রৌদ্র বৃষ্টি সহিয়া দাঁড়াইয়া আছে—বেলার এই বিষণ্ণতা এই সংযম ও এই ধৈর্য্য আমাদিগের হৃদয়কে কারুণ্যে পরিপূরিত করিয়া ফেলে, কবিতার এই বিষাদের হাসি, ত্যাগের কামনা ও শুভ্র মহত্ত্ব আমাদিগের হৃদয় নীরবে আকৃষ্ট করে। এই বিষণ্ণ ভাবটি কচিৎ মাত্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, যখন কবি দুঃখকে বরণ করিয়া বলিতেছেন—

> "বর্ণহীন রূপহীন, আপনাতে চিরলীন
> আমি চাই অন্ধতম নিবিড় নিশায়।
> মুগ্ধ মহিমায়

সেত ভেদ নাহি জানে, আস্থপরে বুকে টানে
সে মম দুঃখের মূর্ত্তি—নাম তার পায়,
আয় দুঃখ আয়॥"

কিম্বা মৃত্যুকে বলিতেছেন,—প্রিয়তমার কোমল ভুজবন্ধনে আবদ্ধ থাকার সময়ও যদি তাহার আহ্বান শুনিতে পান, তবে তিনি দ্বিধাহীন হইয়া মৃত্যুর আলিঙ্গনে ধরা দিতে প্রস্তুত—তখন মনে হয়, তাঁহার ধৈর্য্য ক্ষণকালের জন্য টুটিয়া গিয়াছে। কবি সুনিপুণ শব্দ-শিল্পী; অতি সংযত, সুসম্বন্ধ পদাবলীতে তিনি সুন্দর ভাবগুলি যোজনা করিয়াছেন, বর্ষা-চিত্র হইতে এই কয়েকটি ছত্র পাঠ করুন—

"নীলাঞ্জন-নিন্দি-নীল-মেঘাঞ্চলে ঢেকে দাও
রবি-দগ্ধ পাটল আকাশ।
কুটজ-কেতকী-গন্ধে ভারাক্রান্ত করি' দাও
আদ্রি-স্নিগ্ধ-তোমার বাতাস।"

সাহিত্য—কাব্যশাখা ১২।

গান। প্রথম উচ্ছ্বাস। বিদ্যাসাগরের জীবন চরিত, ইংরেজের জয়। তিতুমির প্রভৃতি গ্রন্থকর্ত্তা সুলেখক শ্রীবিহারীলাল সরকার প্রণীত, এই পুস্তকে আবাহন, কীর্ত্তন, আগমনী, বিজয়া, শ্যামা, সাহিত্য সম্মিলন, শোক, স্মৃতি, উৎসব, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগুলি সংগীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল সংগীত সেকেলে গানের মধুর ভাববিহ্বলতায় ভরপুর। এখনও বঙ্গের শ্যাম পল্লব ছায়ায় বৈষ্ণবগায়কগণ যে সকল মধুর গান গাহিয়া পল্লী পাখীর কাকলীর সঙ্গে ঐক্যতান সুকণ্ঠ মিশাইয়া থাকে, শরৎকালে শরৎ সেফালিকার সঙ্গে যে সকল আগমনী ও বিজয়াগানের মর্ম্মস্পর্শী স্মৃতি সম্পৃক্ত, যে উন্মাদনাময় গানের তানে ও শব্দ সম্পদে শ্যামার বিশ্বপূজিতা মাতৃ মূর্ত্তি ও সংহারিণী শক্তি অত্যুজ্জ্বল হইয়া ভক্তের মানসপটে অলৌকিক চিত্র-রাশি অঙ্কিত করে, এই সকল গানের অধিকাংশে সেই চিরশ্রুত, চিরপ্রিয় পল্লী-গাথার প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা প্রাচীন রীতি হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে; গানগুলির ভাব অনেক স্থলে প্রাচীন, কিন্তু ভাষার নূতন পরিচ্ছদ, এই ভাষায় গ্রাম্যতা ও জড়তা নাই, তাহা এই যুগের বিচিত্র শব্দচ্ছটায় আধুনিক রুচির তৃপ্তি সাধন করিবে। শোকস্মৃতির গানগুলির মধ্যে যে কাতরতা ও আবেগ

দৃষ্ট হইল, তাহাতে কবির বাষ্পগণের শোকাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর বারংবার আমাদের কর্ণে আর্ত্তভাবে বাজিয়া উঠিয়াছে। এই গানের বহিখানি আমাদের বড় ভাল লাগিয়াছে।

সন্দর্ভশাখা—১২।

ধম্মপদ।—শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বসু সম্পাদিত। বুদ্ধদেবের উপদেশগুলি এই "ধম্ম পদে" সংগৃহীত, বৌদ্ধ জগতে এই বইখানি নিত্য পাঠ্য। হিন্দুর গীতা, খৃষ্টানের বাইবেল ও বৌদ্ধের ধম্মপদ, এই তিন খানি বই একই শ্রেণীর, এক এক সম্প্রদায়ের পূজার্হ, জীবনের নিয়ামক।

বুদ্ধদেবের আদেশ ছিল, তাঁহার উক্তি তিনি যে ভাষায় বলিয়াছিলেন, সেই ভাষায় যেন লিপিবদ্ধ হয়, মহাপুরুষের এই আদেশ হইতে হিন্দুস্থানে ভাষার ইতিহাসে এক নব যুগ প্রবর্ত্তিত হয়, তদবধি পালী লিখিত ভাষা হইয়া দাঁড়ায়, ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃতের পূর্ণ আধিপত্যের কালে কথিত অবজ্ঞাত পালীর এরূপ সম্মান লাভ স্বপ্নের অগোচর ছিল, বুদ্ধদেবের কথায় পালীভাষা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চক্ষে সহসা অপূর্ব্ব সম্মান-মণ্ডিত হইয়া উঠিল, তদবধি বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সংস্কৃত ও পালী উভয় ভাষায়ই গ্রন্থাদি রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং পালী ব্যাকরণও অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচিত্র শব্দ ভাণ্ডার ও কথিত ভাষার বেগশীলতা লাভ করিয়া দ্রুতবেগে অসামান্য রূপ পুষ্ট হইয়া উঠিল।

এই ধম্মপদ পালীভাষায় রচিত, বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ইহা সর্ব্ব প্রথম সংগৃহীত হয়, এই পুস্তক বহু সংখ্যক ভাষায় অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে, পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার যে গবেষণা মূলক ভূমিকাটি লিখিয়াছেন, তাহাতে পুস্তকখানির রচনাকাল এবং এতৎসম্বন্ধীয় অপরাপর জ্ঞাতব্য তথ্যের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের নীতি বাক্য সমূহ এখন হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্ম প্রচার করেন তখন আর্য্যধর্ম্মের সঙ্গে ইহার এক বিষয়ে প্রভেদ ছিল। হিন্দু শাস্ত্রাদি প্রায়ই পারলৌকিকতথ্য ও ভক্তির কথায় পূর্ণ। হিন্দু স্থানের হিমাচলসদৃশ সমুচ্চ বেদান্ত ধর্ম্ম ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয়ও ব্রহ্ম লাভের আনন্দ বিবৃত করিতেছে, সেই নভ-স্পর্শী উন্নত ধর্ম্মের শেখর দেশ ঋষিগণের আয়ত্ত হইতে পারে কিন্তু সাধারণ লোকের পক্ষে সে স্থান অনধিগম্য। সাধারণ লোকের জন্য ব্রাহ্মণ

গ্রন্থে যে সকল যাগ যজ্ঞের ব্যবস্থা আছে তাহাতে কর্ম্মকাণ্ড ক্রমশঃ ভাবহীন আড়ম্বরে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, স্বর্গে আরোহণ করিবার জন্য যে সোপানাবলী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, সেই সোপানাবলীই শেষে লোকের লক্ষ্যীভূত হইয়া উঠিল, উদ্দেশ্য ভ্রষ্ট হইয়া উপায়ই উদ্দেশ্যের স্থানীয় হইয়া গেল—বিশেষতঃ যাগ যজ্ঞে পশু হত্যার স্রোত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া লোকবর্গকে নির্ম্মম করিয়া তুলিল।

বুদ্ধদেব এই সময় জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মকে উচ্চ অঙ্গের নীতির ভিত্তিতে অবস্থিত করাইলেন, তাঁহার সময়ে অজিত কেশ কম্বল, পূর্ণকাশ্যপ, মস্কালিপুত্র গোশাল, ককুদ-কাত্যায়ণ, নিগ্রন্থ জ্ঞাতি পুত্র, প্রভৃতি দার্শনিকগণ আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি চিন্তা সূত্রের আবর্ত্তনে ক্রমেই জটিল করিয়া তুলিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ একবারে পরিহার করিয়া নীতি-শিক্ষাই সার্ব্বজনীন ধর্ম্মের মূল বলিয়া প্রচার করিলেন।

কিরূপে ষড়রিপুকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্থ করিয়া সংসার সংগ্রামে আত্মজয়ী হওয়া যায়—তাহা এই ধম্মপদ গ্রন্থে যেরূপ আছে, বোধ হয় অন্য কোথায়ও তাহার এরূপ পূর্ণাঙ্গ বিবৃতি নাই, এই ধম্মপদ খৃষ্টানের বাইবেলকে এবং হিন্দুর অসংখ্য ধর্ম্মগ্রন্থকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে, ইহা মনুষ্য চরিত্রকে কল্পনার নিবিড় ব্যূহ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিয়া কর্ম্মের উপর স্থাপন পূর্ব্বক গরীয়ান করিয়া তুলিয়াছে। এই পুস্তক খানি যিনি পড়িবেন তাঁহারই আত্মানুসন্ধানে দৃষ্টি পড়িবে, তিনিই অসংযত প্রবৃত্তি-নিচয়কে শাসনের গণ্ডীতে আনিবার জন্য ক্ষণতরেও চেষ্টিত হইবেন—বুদ্ধদেবের শ্রীমুখের বাণী বিফল হইবার নহে, উহার কণিকাপ্রসাদেও আমরা ধন্য হইতে পারি।

চারুবাবু এই পুস্তক সম্পাদনে যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। মূল পালীর অন্বয় ও ভাষ্য সংস্কৃত অন্বয় ও ভাষ্য এবং বাঙ্গলা অনুবাদ—এই বিচিত্র সম্পদে সমৃদ্ধ হইয়া পুস্তকখানি বাঙ্গালীর হাতে প্রদত্ত হইয়াছে, শ্রমশীল ভক্ত পণ্ডিতের দান বলিয়া ইহা আমাদের সাদরে গৃহীতব্য—এই পুস্তকখানিকে আমাদের জীবন-যাত্রার নিত্য সহচরে পরিণত করিতে পারিলে আমরা এই মহাদানের যোগ্য হইব।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

প্রকৃতি।

(১)

তোমার উদার হৃদয় প্রকৃতি
সকলেরি তরে মুক্ত ;
তুমি কর দান অকপট প্রাণ
যে তোমারে চাহে ভক্ত।
ছলনা জানেনা করুণা তোমার,
সবাই লভিছে তৃপ্তি।
তোমার বক্ষে ক্লান্ত চক্ষে
শ্রান্তেরা লভে সুপ্তি।

(২)

নয়ন সলিল পুঁছিতে পুঁছিতে
সিক্ত যাহার বস্ত্র,
বাহি সারা বেলা কর্ম্মের ভেলা
অসাড় যাহার হস্ত,
চুম্বিয়া তুমি নয়নে তাহায়
ফুটাও হরষ-দীপ্তি,
হাতখানি দেহে বুলাইয়া স্নেহে
দাও নব নব শক্তি।

(৩)

মানবের তুমি প্রেমময়ী সখী
চির যৌবনা প্রকৃতি!
আনিয়া মরণ কর আবরণ
জীর্ণ তনুর বিকৃতি।
উদয়ে, অস্তে, স্বাস্থ্যে, জরায়
তোমার মতন সঙ্গী কে ?
মহিমা তোমার নিখিল অপার
গাহিছে বিজয় সঙ্গীতে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

প্রতিজ্ঞা পূরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভবতোষ কলেজে ইংরাজি পড়িতেছে বটে, কিন্তু সে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত। ইংরাজি বিদ্যার প্রতি তাহার তিলমাত্র শ্রদ্ধা নাই। ইংরাজি পড়িয়া পড়িয়াই দেশটা উৎসন্ন গেল ইহাই তাহার মত। দেশে আর্য্যভাব ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে অনাচার বর্দ্ধিত হইতেছে, সে কালের সে শুভদিন ভারতে ফিরিবার আর উপায় থাকিতেছে না, এই বলিয়া ভবতোষ প্রায়ই আক্ষেপ করিত। আত্মীয় স্বজনের তাড়নায় তাহাকে বাধ্য হইয়া ইংরাজি পড়িতে হয়, নহিলে তাহার ইচ্ছা নবদ্বীপ বা ভট্টপল্লীতে গিয়া কোনও টোলে প্রবেশ করে। যাহা হউক, ইংরাজি পড়া সত্ত্বেও ভবতোষ তবু নিজের আচার ব্যবহার ও চিন্তাপ্রণালী অনেকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছে।

ভবতোষ কলিকাতার মেসের বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিতেছিল, একদিন হঠাৎ পূজার ছুটী হইল। ভবতোষ বাড়ীর জন্য নূতন বস্ত্রাদি করিয়া, বাক্স পুঁটুলি বাঁধিয়া, গৃহযাত্রা করিল। তাহাদের গ্রামটি কলিকাতা হইতে অধিক দূরে নহে।

পূজা হইয়া গেল;—পূর্ণিমা আসিল। সেদিন ভোরে ভবতোষের বিধবা মাতা গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছিলেন। গঙ্গার ঘাট গ্রাম হইতে কিঞ্চিৎ দূরে। সে দিন ঘাটে বহুসংখ্যক পুরস্ত্রীর সমাগম হইয়াছে। স্নানান্তে ঘাটে উঠিয়াছেন,—এমন সময় ভবতোষের মাতা দেখিলেন, তাঁহার একটী বাল্যসখী,—উপেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের স্ত্রী।

"কি দিদি, ভাল আছ ত?" বলিয়া উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী ভবতোষের

মাতার কাছে আসলেন। দুই সখীতে কুশল প্রশ্নাদির পর, উপেন্দ্র-বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"ভবতোষ বাড়ী এসেছে ?"

"এসেছে। তার ছুটিও ফুরিয়ে এল,—আবার কলকাতায় আসতে যাবে।"

উপেন্দ্র বাবুর একটী সুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা আছে তাহার নাম পুলিনা। মেয়েটি অবিবাহিতা। উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী বলিলেন—"দেখ দিদি, আমার পুলিনার সঙ্গে তোমার ভবতোষের যদি বিয়ে দাও, তবে বেশ হয় ?"

ভবতোষের মা বলিলেন—"আমারও তাই ত অনেকদিন থেকে ইচ্ছে বোন,—ছেলে যে বিয়ে করতে চায় না, কি করি। কত সম্বন্ধ এসে ফিরে ফিরে গেল।"

"আচ্ছা, আর একবার বলে দেখ না। তোমার বড় ছেলেটি, একটি বউ আসবে তোমার কত আহ্লাদ হবে, কেন বিয়ে করে না ?"

ভবতোষের মা বলিলেন—আচ্ছা, বলিয়া দেখিবেন। ছেলে যদি রাজি হয় তাহা হইলে এমন কি এই অগ্রহায়ণ মাসেই বিবাহ হইতে পারে।

মা যখন গৃহে ফিরিলেন, ভবতোষ তখন বৈঠকখানায় বসিয়া সংবাদ-পত্রের উপহার পরাশরসংহিতার একখানি তর্জ্জমা মন দিয়া পাঠ করিতেছিল। মা আসিয়া বলিলেন, "বাবা, বাড়ীর ভিতর এস, একটা কথা আছে।"

ভবতোষ বহি রাখিয়া ধীরে ধীরে মাতার অনুগমন করিল।

নিজের কক্ষে লইয়া গিয়া মা পুত্রকে বলিলেন—"বাবা, এইবার একটা বিয়ে-থাওয়া করে ফেল। তুমি আমার বড়ছেলে, বউয়ের মুখ দেখব আমার কতদিনের সাধ, সে সাধ পূর্ণ কর।"

বলিয়াছি, পূর্ব্বে ভবতোষ বিবাহ করিতে অত্যন্ত অসম্মত ছিল।

পাঠদ্দশায় বিবাহ করা উচিত নয় কিম্বা উপার্জ্জন সক্ষম না হইলে বিবাহ করা উচিত নয়, এরূপ কোনও ইংরাজি আপত্তি ভবতোষের ছিল না। তাহার আপত্তিটা অন্যরূপ এবং শাস্ত্রীয়ও বটে। সে শুনিয়াছে (এবং সংবাদ পত্রেও পাঠ করিয়াছে) যে আজি কালিকার নবস্ত্রীরা আর যথার্থ হিন্দুগৃহলক্ষ্মীস্বরূপ আবির্ভূতা হন না। তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসিনী ও "বাবু" হইয়া পড়িয়াছেন। শাস্ত্রীয় রীতি অনুসারে স্বামীদিগকে ভক্তি টক্তি আর করেন না, পরন্তু স্বামীর সহিত সখ্য ব্যবহার করিতে উদ্যত! আরও নানা প্রকার অভিযোগ সে শুনিয়াছে।

কিন্তু বিধবা মাতার একান্ত অনুরোধে, বেচারি কি করে? মাতৃ আজ্ঞা অবহেলার পাপও সঞ্চয় করিতে সে ইচ্ছা করে না। সুতরাং অল্পদিন হইতে স্থির করিয়াছে, মা এবার অনুরোধ করিলেই বিবাহ করিবে, কিন্তু সে নিজের আদর্শানুযায়ী একটি মেয়ে বিবাহ করিবে।

এখন এ সম্বন্ধে ভবতোষের স্বাধীন চিন্তাপ্রসূত অনেকগুলি মতাদি ছিল, তাহা তাহার বাসার সহপাঠীরা সকলেই বিলক্ষণ অবগত আছে। রাত্রে আহারের পর ছাদের উপর যখন বাসার ছেলেদের একটি দণ্ডায়মান সভা বসিত, যখন অনেকগুলি সিগারেটাগ্র যুগপৎ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিত, তখন অনেক সময় এই বিষয়ের আলোচনা হইত। তর্ক স্থলে ভবতোষ কতবার বলিয়াছে—"যদি আমি কখন বিয়ে করি, যদি করি, তবে একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব। কারণ, সুন্দর মেয়ে প্রায়ই দেমাকে হয়। শ্বশুর শাশুড়ীকে ভক্তি শ্রদ্ধা করে না, স্বামীকে গুরুজ্ঞান করে না. সহধর্ম্মিণী না হয়ে সহবিলাসিনী হয়ে ওঠে। তা ছাড়া, তারা অত্যন্ত "বাবু" হয়। একটু রূপ আছে বলে, সে রূপকে ভাল করে সাজিয়ে প্রকাশ করবার জন্য, ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকে। সাবান চাই, সেণ্ট চাই; পাউডার চাই, পার্শী শাড়ী চাই, সেমিজ চাই—

স্বামী বেচারীর প্রাণও ওষ্ঠাগত।—দ্বিতীয়তঃ, লেখা পড়া জানা মেয়েও বিয়ে করব না। তারা থালি নভেল পড়ে (কেউ কেউ নভেল লেখেও) আর তাস খেলে, স্বামীকে কবিতা করে চিঠি লিখতেই দিন যায়, গৃহকার্য্য হয় না, ব্রত নিয়মাদির ত সময়ই নেই—ছেলে মাটিতে পড়ে কাঁদে।—ইত্যাদি

এইরূপ ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া, বাসার ছেলেরা কেহ কেহ বলিত "আচ্ছা ভবতোষ বাবু, কার্য্যকালে কি করেন দেখা যাবে। ওরকম বলে অনেকে। বলায় করায় ঢের তফাৎ।"

এই সন্দেহবাদে ভবতোষ আগুন হইয়া বলিত—"আচ্ছা দেখব মশায়, দেখে নেবেন। আমার যে কথা সেই কায।"

মা যখন বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন ভবতোষ সম্মত হইল বলিল—"আচ্ছা মা, আমি বিয়ে করব, কিন্তু নিজে দেখে শুনে বিয়ে করতে চাই।"

শুনিয়া মা অত্যন্ত খুসী হইলেন। বলিলেন—"তা দেখে শুনে বিয়ে করতে চাও? বেশ ত। একটি থাসা সুন্দর মেয়ে আছে তের বছরের।"

ভবতোষ শুনিয়া চমকিয়া বলিল—"খুব সুন্দর না কি?"

মা সোৎসাহে বলিলেন—"খুব সুন্দর। মুখ খানি একবারে প্রতিমের মত। যেমন নাক, তেমনি চোখ, তেমনি কপালের ভুরু! রংটি যেন একবারে গোলাপ ফুলের মত।"

ভবতোষ ধীরে ধীরে, গম্ভীর স্বরে বলিল—"সে মেয়ে ত আমি করব না মা।"

মা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। বলিলেন—"কেন? কি হয়েছে?"

"সুন্দর মেয়ে আমি বিয়ে করব না।"

"তবে কি রকম মেয়ে বিয়ে করবি?"

"আমি একটী কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করব।"—ভবতোষের স্বর বজ্রের মত দৃঢ়।

শুনিয়া মা অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। বলিলেন—"পাগল ছেলে! সকলেই ত সুন্দর মেয়ে বিয়ে করতে চায়। লোকে পায় না।"

"সকলে করুক। আমি একটু অন্যরকম করব।"—বলিতে বলিতে ভবতোষের মুখমণ্ডল আত্মগোরবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে কি সকলের মধ্যে একজন? সে কি সকলের মত বিলাসের জন্য বিবাহ করিতেছে?

মাকে একটু দুঃখিত দেখিয়া ভবতোষ সমস্ত কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিল। সুন্দরী মেয়ে যে আদর্শ হিন্দুগৃহলক্ষ্মী কেন হইতে পারে না, তাহা তাঁহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল। শেষে বলিল—তাহার প্রতিজ্ঞা স্থির—অটল—অচল।

সে দিন আর জননী অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না। ভবতোষেরও ছুটী ফুরাইল, সে কলিকাতায় চলিয়া আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরে একদিন পাল্কী করিয়া উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী ভবতোষের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

প্রথম অভ্যর্থনার কুশল প্রশ্নাদির পর উপেন বাবুর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন—"দিদি ভবতোষ রাজি হল?"

ভবতোষের মাতা বলিলেন—"বিয়ে করতে ত রাজি হয়েছে—কিন্তু তার আর এক আজগুবি মত।"

"কি রকম?"

"প্রথমে বল্লে আমি দেখে শুনে বিয়ে করব। আমি বল্লাম তা বেশ ত, একটি খাসা সুন্দরী মেয়ে আছে দেখে এস। সে বলে আমি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করব না, একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করতে চাই।"

উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রীও শুনিয়া বিস্মিত হইলেন! বলিলেন—"এমন অনাসৃষ্টি আবদারও ত কখনও শুনি নি। এ রকম আবদার কেন?—তা কিছু বল্লে?"

ভবতোষের মাতা তখন পুত্রের নিকট যেমন শুনিয়ছিলেন, সেইরূপ বলিলেন। উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন—"দেখ, তুমি এক কাজ কর দিকিন দিদি। ভবতোষকে এই শনিবারে আসতে লেখ। লেখ যে তোমার যে রকম মেয়ে বিয়ে করা মত, সেই রকম মেয়ে একটি স্থির করেছি, তাকে দেখবে এস। তার পর, এলে, রবিবার দিন বিকালে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও, আমি সব ঠিক করে নেব।"

ভবতোষের মাতা সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, হয় ত উপেন্দ্র বাবুর স্ত্রী মনে করিয়াছেন, ভবতোষ পুলিনাকে দেখিলে আর বিবাহে অসম্মত হইতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহা আশ্চর্য্য নয়, মেয়েটি খুবই সুন্দরী বটে।

*   *   *   *

ভবতোষ শনিবারে বাটী আসিল। পরদিন বৈকালে একখানি ঘোড়া গাড়ী করিয়া, চুল উস্কো খুস্কো করিয়া (কারণ সে কালের মুনি ঋষিরা চুল আঁচড়াইতেন না) গ্রামান্তরে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইল।

গিয়া শুনিল, সে দিন উপেন্দ্র বাবু বাড়ী নাই, কার্য্য উপলক্ষ্যে স্থানান্তরে গিয়াছেন। একটি যুবক মহা সমাদরে তাহাকে নামাইয়া

লইল এবং বৈঠকখানায় বসাইল। যুবকটি উপেন্দ্র বাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, অন্দরে যাইতে হইবে। ঝি ভবতোষের মুখের পানে চহিয়া একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া গেল।

যুবকটির সঙ্গে সঙ্গে ভবতোষ অন্দরে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল চাকর বাকর সকলেই যেন হাসি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভবতোষ একটি কক্ষে নীত হইল। কক্ষটি উত্তমরূপ সাজানো। তাহার মধ্যস্থলে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের সম্মুখে রূপার রেকাবীতে ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত। অল্পদূরে আর একখানি আসন পাতা রহিয়াছে।

অনুরোধ ক্রমে ভবতোষ মিষ্টান্নের থালার সম্মুখে বসিল। এমন সময় বাহিরে মলের ঝুম ঝুম শব্দ উঠিল। ঝি মেয়েটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। মেয়েটি অপর আসন খানিতে বসিয়া ঘরের চতুর্দ্দিকে কৌতূহল পূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

লজ্জায় ভবতোষের মস্তক অবনত। একটু একটু করিয়া ফল খাইতেছে এবং আড়চোখে আড়চোখে মেয়েটির পানে চাহিতেছে। মেয়েটির পরিধানে একখানি বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ী। মাথাটি খোলা। চুলগুলি তেলে যেন চব চব করিতেছে।

মেয়েটির রংটি মসীনিন্দিত। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, কোটরান্তর্গত। সে দুটি আবার অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। কপালটি উচ্চ। নাকটি চেপ্টা। চিবুক নাই বলিলেই হয়। সম্মুখের দাঁতগুলি কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে।

ভবতোষের মনে হইল, মেয়েটি তাহার আদর্শের অনুযায়ী বটে। একটু গলা ঝাড়িয়া, সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"তোমার নাম কি?"

মেয়েটি হঠাৎ ভবতোষের পানে চাহিয়া, কিঞ্চিৎ জিহ্বা বাহির করিয়া, বলিল—"অ্যাঁ ?"

"তোমার নাম কি ?"

"আমার নাম জগদম্বা।"

এমন সময় যুবকটি ও সেই ঝি তাহার পানে সরোষ কটাক্ষপাত করিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল—"আমার নাম পুলিনা।"

যুবকটি বলিলেন—"আগে ওর নাম ছিল জগদম্বা, এখন বদ্‌লে পুলিনা রাখা হয়েছে।"

ভবতোষ ভাবিল, পরিবর্ত্তনটা ভাল হয় নাই। "পুলিনা।"—তার চেয়ে জগদম্বা ঢের ভাল,—পৌরাণিক নাম, ঠাকুরদেবতার নাম। বিবাহ করিয়া সে জগদম্বা নামই বাহাল রাখিবে।

ভবতোষ তখন জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি পড় ?"

বালিকা পূর্ব্ববৎ জিহ্বা দেখাইয়া, বলিল—"অ্যা ?"

"তুমি কি পড় ?"

"কিছু পড়িনে। আমার দাদা পাঠশালে—

ঝি ও সেই যুবকটি তাহার প্রতি পুনরায় সরোষ কটাক্ষপাত করায় বালিকা থামিয় গেল।"

শুনিয়া ভবতোষ আরও আশ্বস্ত হইল। এই ঠিক হইয়াছে। ইহাকেই যথার্থ হিন্দুগৃহিনী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। দেখিতে একটু—তাহা হউক। তাহাই ত তাহার প্রতিজ্ঞা। বিবাহের সময় বাসার ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আসিতে হইবে।

ভবতোষ বলিল—"আচ্ছা তুমি যেতে পার।"

মেয়েটি জিহ্বাগ্রভাগ দর্শন করাইয়া পূর্ব্ববৎ বলিল—"অ্যাঁ ?"

"যেতে পার।"

ঝি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ভবতোষের জলযোগ তখন শেষ হইয়াছে। এই সময় একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা রূপার ডিবায় ভরিয়া পাণ লইয়া আসিল। মেয়েটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী। একখানি দেশীয় কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। পায়ে চারি গাছি মল। হাতে গিনি সোণার দুইটি টুকটুকে বালা। ভ্রূযুগলের মাঝখানে খয়েরের একটি টীপ।

পান রাখিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্যদিকে চাহিয়া একটু মুচকী হাসি হাসিয়া গেল। ভবতোষ মনে মনে ভাবিল, দেখ, এই একটি সুন্দরী মেয়ে। ধর যদি ইহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল! আমার সকল আদর্শ, সকল সংকল্প, অতল জলে ডুবিয়া যাইত। প্রতিজ্ঞাপূরণজনিত আত্মগৌরব ভবতোষের মনে উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ বাহিরে আসিল। ঝি আসিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"বাড়ীর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে?"

ভবতোষ সগর্ব্বে বলিল—"হয়েছে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভবতোষ মনে মনে অপরাহ্ণের ঘটনা আলোচনা করিতে লাগিল। গ্রামের পথ দিয়া গাড়ী আসিতেছে। কত যুবতী মেয়ে কলসীতে জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সে সকল মেয়ের মুখগুলি ভবতোষ একটু মনোযোগের সহিত দেখিল। তাহার মধ্যে সুন্দর মেয়ে আছে, শ্যামবর্ণ মেয়েও অনেক আছে—কিন্তু জগদম্বার মত অত কুৎসিত একটি মুখও দেখিতে পাইল না।

গাড়ী ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মনে আত্মজয়ের উৎসাহ ভরপূর। তথাপি মনে মনে হইতে লাগিল, সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বটে, কিন্তু একবারে

এত কুৎসিৎ না হইলেও হইত। যাহা হউক, পছন্দ হইয়াছে খন বলিয়া আসিয়াছে, তখন সে আলোচনায় ফল কি?

এই অবস্থায় ভবতোষ বাড়ী পৌঁছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি বাবা, কেমন পছন্দ হল?"

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।"

"তবে সব ঠিক করি?"

"কর।"

"এই অগ্রহায়ণ মাসেই হোক তা'হলে?"

"আচ্ছা।" বলিয়া ভবতোষ অন্যত্র চলিয়া গেল।

মা দেখিলেন, ছেলের মনটি যেন ভার ভার। ভাবিলেন, সুন্দর মেয়ে বিবাহ করিব না বলিয়া অনেক লম্ফ ঝম্ফ করিয়াছিল, এখন রাজি হইয়াছে, তাই বোধ হয় ছেলের লজ্জা হইয়াছে।

ভবতোষ রাত্রে কিছু আহার করিল না, বলিল উহাদের বাড়ী অনেক খাইয়া আসিয়াছে, ক্ষুধা নাই। তখন তাহার মন হইতে আত্মজয় ও প্রতিজ্ঞাপূরণ জনিত উদ্দীপনা অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে। রাত্রে শয়ন করিয়া জগদম্বার মুখখানি যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতরটা হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যদি অত কুৎসিৎ না হইয়া, শ্যামবর্ণের উপর মুখচোখ গুলা একটু মানানসই হইত, তাহা হইলে মন্দ হইত না।

সোমবারে উঠিয়া ভোরের ট্রেণে ভবতোষ কলিকাতা যাত্রা করিল। মা বলিয়া দিলেন, বিবাহের আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে। দুই দিন পূর্ব্বে ভবতোষ যেন বাড়ী আসে।

বাসায় পৌঁছিলে সহপাঠীরা দেখিল, ভবতোষের মুখখানি মেঘের মত অন্ধকার। ভবতোষ গিয়া নিজের কক্ষের মধ্যে উপবেশন করিল।

"কি ভবতোষ বাবু? খবর কি?" বলিতে বলিতে রজনী বাবু,

শরৎ বাবু, নৃপেন্দ্র বাবু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবতোষ বাড়ী যাইবার সময় ইহাঁদের সকল কথাই বলিয়া গিয়াছিল।

"খবর কি ভবতোষ বাবু ?"

ভবতোষ একটু কষ্টহাসি হাসিয়া বলিল—"খবর ভাল।"

তাহার পর সকলে প্রশ্ন করিয়া মেয়েটির রূপ, গুণ, বয়স প্রভৃতি সমস্ত খবর জানিয়া লইল। শরৎ বাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—"মেয়েটির নাম কি ?"

ভবতোষ নাম বলিল।

তাহা শুনিয়া সকলেরই মুখে একটু একটু হাসি দেখা দিল। কেবল নৃপেন্দ্র বাবু আত্মসংযম হারাইয়া হাসিয়া ফেলিলেন—"হা—হা—হা, জগদম্বা—হি—হি—হি—বেশ নামটি ত ?"

শরৎ বাবু বলিলেন—"নৃপেন্দ্র বাবু, হাসছেন কেন ?"

নৃপেন্দ্র বাবু বলিলেন—"না, হাসিনি, হি—হি—হি—হাসব কেন ? হা—হা।"

রজনী বাবু বলিলেন—"না নামটি মন্দ কি ? পৌরাণিক নাম। আজ কালকার তোমাদের সরসীবালা, জ্যোৎস্নাময়ী, তড়িল্লতা এই সব নাটুকে নামই বুঝি ভাল ?"

ভবতোষ ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। এ সকল বিষয়ে তাহার পূর্ব্বেকার উৎসাহ আজি যেন আর নাই !

বিবাহের আর নয়দিন বাকী আছে। এ নয়দিন যে ভবতোষের কি অবস্থায় কাটিল, তাহা সেই জানে। বাসার লোকেও কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছিল। জগদম্বাকে ভবতোষ যতই মনের মধ্যে ভাবে ততই তাহার বুকের ভিতরটা অন্ধকারে ভরিয়া যায়। ভবতোষ কলেজে যায়, কিন্তু লেকচর কিছুই শুনিতে পায় না। ক্ষুধার জন্য বাসায় সে বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার পাতের অন্নব্যঞ্জন অর্দ্ধেকের

বেণী পড়িয়া থাকে। ভবতোষ কাহারও সঙ্গে হাস্যালাপ করে না, সদাই অন্যমনস্ক। বাসার লোকে তাহাকে বলিতে লাগিল—"ভবতোষ বাবু, প্রেমব্যাধির সকল লক্ষণগুলিই আপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্চে।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভবতোষ আর সহজে নিদ্রা যায় না। কেবল এ পাশ ও পাশ করে। অতি কষ্টে যখন নিদ্রা আসে, তখন কেবল বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। একদিন স্বপ্ন দেখিল, জগদম্বা যেন কালী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার অল্প পরিমাণ রসনা ভবতোষ যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যেন লেলিত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যেন দুইটা নূতন হস্ত বাহির হইয়াছে। তাহার এক হাতে যেন রক্তমাখা খড়্গ, অপরটাতে যেন ছিন্ন মুণ্ড দুলিতেছে। মুণ্ডটা যেন ভবতোষেরই মত দেখিতে। আর একদিন স্বপ্ন দেখিল, ভবতোষ যেন কণ্টকময় একটা জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আকুল হইয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একটা মহিষ যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। মহিষের পরিধানে যেন একখানি বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ী। তাহার মুণ্ডের স্থানে যেন জগদম্বার মুখ, কেবল তাহাতে দুইটা শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

যখন বিবাহের আর তিনদিন মাত্র বাকী আছে, তখন ভবতোষ ভাবিল, মাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিয়া ফেলিবে। সেদিন অসুস্থতার ভাণ করিয়া কলেজে গেল না। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া মাকে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাসার লোকেরা যখন শুনিবে যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা কি বলিবে? তাহাদের উপহাস বিদ্রূপ সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

সেদিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পশ্চিমে পলাইয়া যাইবে। উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া টাইম

টেবেল উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতে আবার তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ছি ছি, শেষে কি এত কাণ্ডকারখানার পর সে ভীরুনাম গ্রহণ করিবে? তাহা হইবে না, প্রতিজ্ঞা সে পূরণ করিবে, তাহার পর তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক।

যথাদিনে সে বাড়ী গেল। যথাসময়ে বিবাহমণ্ডপেও উপনীত হইল। সেখানকার লোকসমাগম আলোক ও কোলাহলে আজ দশ দিন পরে তাহার চিত্ত অনেকটা স্থির হইল। যুদ্ধকালে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়।

বিবাহ আরম্ভ হইল, তখন ভবতোষের চিত্ত নির্ব্বিকার। তখন তাহার চিত্তে ভয় বা ভাবনা বা হর্ষ বা নৈরাশ্য কিছুই নাই।

ক্রমে স্ত্রী আচারের সময় আসিল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। কন্যার পানে চাহিয়া দেখিয়া ভবতোষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল: ইহা তাহার দশদিনকার বিভীষিকা, নিদ্রার দুঃস্বপ্ন জগদম্বা নহে, এ সেই চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি যে রূপার ডিবায় পান রাখিয়া গিয়াছিল।

* * * *

* * * *

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ভবতোষ তাহার নব বধূকে কথা কহাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল, তখন একটা বুদ্ধি করিল। সে শুনিয়াছিল, যে নববধূ কিছুতেই কথা কহে না, সে আপন আত্মীয় স্বজনের অপবাদ শুনিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকে। তাই ভবতোষ বলিল—"তোমার মা আমার সঙ্গে এ চাতুরী করলেন কেন?"

পূর্ণিমা তখনি বলিল—"আমি সুন্দর বলে তুমি নাকি আমায় বিয়ে করতে চাওনি? কেমন জব্দ!"

ভবতোষ এ পর্য্যন্ত এ প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারে নাই। জিজ্ঞাসা করিল, "যাকে দেখিয়াছিলাম, সে মেয়েটি কে?"

"সে পাড়ার কলুদের মেয়ে। কেমন জব্দ!"

*　　*　　*

ক্রমে এমন দিনও আসিল যখন ভবতোষ ডাক আসিবার পূর্ব্বে বাসার দরজার বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া থাকিয়া পিয়নের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে লাগিল।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

কাবুলীওয়ালা।*

কাবুলীওয়ালার মূর্ত্তি সর্ব্বদাই আমার বিস্ময় ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া থাকে। একদিন ইষ্ট বেঙ্গল রেলপথে জোর করিয়া একটা সমগ্র বেঞ্চী অধিকার পূর্ব্বক তদুপরি সুবিপুল দেহভার ন্যস্ত করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল. মধ্য শ্রেণীর পথিকগণের মধ্যে এই আকস্মিক ঘটনায় একটা তুমুল বিভ্রাট উপস্থিত হইয়াছিল। বাবুগণ সকলেই স্থান ত্যাগ করিয়া দাঁড়ইয়া উদ্বিগ্ন ভাবে এই মনুষ্যপ্রবরের সুষুপ্তি অবস্থা লক্ষ্য করিতেছিলেন। আমি তখন সপ্তদশ বর্ষীয় বালক, আমি কাবুলীওয়ালার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিলাম, নিদ্রিত কাবুলীওয়ালার মুখ খুব ভাল করিয়া যতই দেখিতে লাগিলাম, ততই আমার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না; বিস্তৃত মুখমণ্ডলে সুদীর্ঘ নাসিকা, আয়ত চক্ষুপুট, ঘনকৃষ্ণরেখায় টানা সুদীর্ঘ ভ্রূ, স্বচ্ছ শুভ্রোজ্জ্বল কপাল, একটা বিরাট

---

* এই প্রবন্ধের উপাদান শ্রদ্ধেয়া ভারতী সম্পাদিকার আহ্বানে ভারতী কার্য্যালয়ে সমাগত কোন সম্ভ্রান্ত কাবুলদেশনিবাসীর নিকট হইতে সংগৃহীত ও প্রবন্ধটি সাহিত্য-পরিষদের গত (শ্রাবণ মাসের) অধিবেশনে পঠিত। লেখক।

প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় বেঞ্চী জুড়িয়া কাবুলীওয়ালা পড়িয়াছিল, গালিভারস্ প্রতিকায় মনুষ্যের দেশে যাইয়া যে সকল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এই মূর্ত্তি সেই জাতীয়, ইহার নিকট আমরা সকলেই খর্ব্ব হইয়া পড়িলাম, মনে হইল যেন একদল বালকের মধ্যে একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ পড়িয়া আছে; শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বাবুগণকেও এই যুবক মূর্ত্তির পার্শ্বে চিত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র ও নির্জীব বোধ হইতে লাগিল। সেই দিনকার বিস্ময় আমার এখন পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই, পথে ঘাটে যখনই কোন কাবুলীওয়ালাকে দেখিতে পাই, তখনই আমি সসম্ভ্রমে চাহিয়া থাকি, তাহার গতির মধ্যে একটা মন্থর গাম্ভীর্য্য, সদর্প দৃষ্টি, তাহার বহুস্তরে-বিভক্ত বিপুল পরিচ্ছদ, স্কন্ধাবলম্বী কেশ গুচ্ছ, ত্রিকোণ টোপর—সমস্তই আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আমি একটি কাবুলী রমণীকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রভুত্ব ব্যঞ্জক, মুখশ্রী প্রতিভাময়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত এবং নাসাচক্ষুভ্রু সুস্পষ্ট ভাবে আর্য্যজাতীয়, ইহাকে দেখিয়াও আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আমার মনে হইল আমার কাছে ইহাঁর অবগুণ্ঠন নিষ্ফল, আমি ইহাঁর দিকে অবাধে চাহিয়া থাকিতে পারি এবং রমণীও অসঙ্কোচে আমাকে দৃষ্টি দান করিতে পারেন, ইহাতে কোনরূপ লজ্জার ভাব মনে উদয়ই হইতে পারে না, আমি যে চক্ষে চাহিব তাহা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের এবং তিনি যে চক্ষে চাহিবেন—তাহা কৃপার। গল্পে শুনিয়াছি একজন বাঙ্গালী বন্ধুকে এক কাবুলীওয়ালা তাহার দেশে লইয়া গিয়া স্বীয় পত্নীকে তাহার আহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিয়াছিল, বন্ধুটির আহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রমণী স্বামীকে বলিয়াছিলেন, তুমি দোস্ত কাহাকে বলিতেছ? এ মানুষ নহে একটি পাখী।

কাবুলীওয়ালা এখন বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শীতের সময় বিলাতী বস্ত্রের বস্তা লইয়া কুটীরে কুটীরে দাতা শিরোমণির ন্যায় মুক্ত হস্তে বস্ত্র

বিতরণ করিয়া থাকে, সে কোন প্রকার খৎ চায় না, অনশনক্লিষ্ট হতভাগ্য হাত বাড়াইয়া যতগুলি ইচ্ছা শীতবস্ত্র সেই বস্তা হইতে গ্রহণ করে, সে কি দিয়া কি ভাবে মূল্য শোধ দিবে, কাবুলীওয়ালা এক মুহূর্ত্তও তাহা চিন্তা করে না ; এত বড় সদাশয় ও অসতর্ক বণিক বোধ হয় জগতে আর নাই। কাবুলীওয়ালা প্রাপ্য উদ্ধারের জন্য আদালতে উপস্থিত হয় না। অসমর্থা বৃদ্ধা পরের কুটীরের একপ্রান্তে জীর্ণ কন্থাখানি লইয়া পড়িয়া আছে, কাবুলীওয়ালা অনায়াসে ১০৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে দিয়া ফেলিতেছে। কাবুলীওয়ালা সাধারণতঃ কোন হাকিমের শরণাপন্ন হয় না, প্রহারিত হইলে পুলিশের কাছে ঘেঁষে না, সে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বলে—হাকিমের কাজ—পুলিশের কাজ নিজে সমাধা করিয়া থাকে। এই উদার-প্রকৃতি মুক্তহস্ত মহাজন যখন ফাল্গুন মাসের শেষে পল্লীতে স্বীয় প্রাপ্য উদ্ধারের জন্য গৃহস্থের দ্বার আগুলিয়া বসিয়া থাকে, তখন সে পল্লী ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ভীষণ ভাব পরিগ্রহ করে ; পল্লীর বংশযষ্টিচালন-পটু মুসলমান সর্দ্দারগণ কখনও কখনও সমবেত হইয়া, এই পল্লীব্যাঘ্রের উপদ্রব দমনের চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু তীক্ষ্ণাগ্র ত্রিকোণ টোপর-পরা, যষ্টিমাত্র সম্বল, উদ্ভট গুম্ফধারী এই বিদেশী প্রবরদের দুইটিমাত্র একত্র হইলে সমস্ত পল্লীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। বুড়ী জীর্ণ কন্থা লইয়া আতঙ্কে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহার প্রাপ্য শুধিয়া ফেলে, অপগণ্ড শিশুদিগের খাদ্য যে অর্থ দ্বারা সংগৃহীত হইবে, বিপন্ন গৃহস্থের ভয়শিথিল হস্ত হইতে সেই অর্থ কাবুলীওয়ালার থলিয়ায় পড়িয়া যায় ; ইহারা নিঃশব্দে বাঙ্গালার পবিত্র পল্লীগুলি বিজয় করিতেছে, যে প্রাপ্য আদালতের শত চেষ্টায় লোকের সর্ব্বস্ব নিলাম করিয়াও উদ্ধার হওয়া অসম্ভব, নিঃশব্দে বল প্রয়োগ করিয়া ইহারা তাহা সম্পূর্ণভাবে আদায় করিয়া লইতেছে। বণিক সম্প্রদায় অলক্ষিতরূপে কি ভাবে

প্রস্তর-মূর্ত্তির ন্যায় বেঞ্চী জুড়িয়া কাবুলীওয়ালা পড়িয়াছিল, গালিভারস্ অতিকায় মনুষ্যের দেশে যাইয়া যে সকল মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, এই মূর্ত্তি সেই জাতীয়, ইহার নিকট আমরা সকলেই খর্ব্ব হইয়া পড়িলাম, মনে হইল যেন একদল বালকের মধ্যে একটা পূর্ণবয়স্ক মানুষ পড়িয়া আছে; শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ বাবুগণকেও এই যুবক মূর্ত্তির পার্শ্বে চিত্রের ন্যায় ক্ষুদ্র ও নির্জীব-বোধ হইতে লাগিল। সেই দিনকার বিস্ময় আমার এখন পর্য্যন্ত লুপ্ত হয় নাই, পথে ঘাটে যখনই কোন কাবুলীওয়ালাকে দেখিতে পাই, তখনই আমি সসম্ভ্রমে চাহিয়া থাকি, তাহার গতির মধ্যে একটা মন্থর গাম্ভীর্য্য, সদর্প দৃষ্টি, তাহার বহুস্তরে-বিভক্ত বিপুল পরিচ্ছদ, স্কন্ধাবলম্বী কেশ গুচ্ছ, ত্রিকোণ টোপর—সমস্তই আমার শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। আমি একটি কাবুলী রমণীকে দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রভুত্ব ব্যঞ্জক, মুখশ্রী প্রতিভাময়; ভ্রূ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সুগঠিত এবং নাসাচক্ষুভ্রূ সুস্পষ্ট ভাবে আর্য্যজাতীয়, ইহাকে দেখিয়াও আমার মন বিস্ময়ে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, আমার মনে হইল আমার কাছে ইহাঁর অবগুণ্ঠন নিষ্ফল, আমি ইহাঁর দিকে অবাধে চাহিয়া থাকিতে পারি এবং রমণীও অসঙ্কোচে আমাকে দৃষ্টি দান করিতে পারেন, ইহাতে কোনরূপ লজ্জার ভাব মনে উদয়ই হইতে পারে না, আমি যে চক্ষে চাহিব তাহা শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের এবং তিনি যে চক্ষে চাহিবেন—তাহা কৃপার। গল্পে শুনিয়াছি একজন বাঙ্গালীবন্ধুকে এক কাবুলীওয়ালা তাহার দেশে লইয়া যাইয়া স্বীয় পত্নীকে তাহার আহার সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিয়াছিল, বন্ধুটির আহারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রমণী স্বামীকে বলিয়াছিলেন, তুমি দোস্ত কাহাকে বলিতেছ? এ মানুষ নহে, একটি পাখী।

কাবুলীওয়ালা এখন বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে শীতের সময় বিলাতী বস্ত্রের বস্তা লইয়া কুটীরে কুটীরে দাতা শিরোমণির ন্যায় মুক্ত হস্তে বস্ত্র

বিতরণ করিয়া থাকে, সে কোন প্রকার খৎ চায় না, অনশনক্লিশ হতভাগ্য হাত বাড়াইয়া যতগুলি ইচ্ছা শীতবস্ত্র সেই বস্তা হইতে গ্রহণ করে, সে কি দিয়া কি ভাবে মূল্য শোধ দিবে, কাবুলীওয়ালা এক মুহূর্ত্তও তাহা চিন্তা করে না; এত বড় সদাশয় ও অসতর্ক বণিক বোধ হয় জগতে আর নাই। কাবুলীওয়ালা প্রাপ্য উদ্ধারের জন্য আদালতে উপস্থিত হয় না। অসমর্থা বৃদ্ধা পরের কুটীরের একপ্রান্তে জীর্ণ কন্থাখানি লইয়া পড়িয়া আছে, কাবুলীওয়ালা অনায়াসে ১০৲ টাকা মূল্যের বস্ত্র শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে দিয়া ফেলিতেছে। কাবুলীওয়ালা সাধারণতঃ কোন হাকিমের শরণাপন্ন হয় না, প্রহারিত হইলে পুলিশের কাছে ঘেঁষে না, সে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের বলে—হাকিমের কাজ—পুলিশের কাজ নিজে সমাধা করিয়া থাকে। এই উদার-প্রকৃতি মুক্তহস্ত মহাজন যখন ফাল্গুন মাসের শেষে পল্লীতে স্বীয় প্রাপ্য উদ্ধারের জন্য গৃহস্থের দ্বার আগুলিয়া বসিয়া থাকে, তখন সে পল্লী ব্যাঘ্রের অপেক্ষাও ভীষণ ভাব পরিগ্রহ করে; পল্লীর বংশযষ্টিচালন-পটু মুসলমান সর্দ্দারগণ কখনও কখনও সমবেত হইয়া, এই পল্লীব্যাঘ্রের উপদ্রব দমনের চেষ্টা করিয়া থাকে, কিন্তু তীক্ষ্ণাগ্র ত্রিকোণ টোপর-পরা, যষ্টিমাত্র সম্বল, উদ্ভট গুম্ফধারী এই বিদেশী প্রবরদের দুইটিমাত্র একত্র হইলে সমস্ত পল্লীর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। বুড়ী জীর্ণ কন্থা লইয়া আতঙ্কে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া তাহার প্রাপ্য শুধিয়া ফেলে, অপগণ্ড শিশুদিগের খাদ্য যে অর্থ দ্বারা সংগৃহীত হইবে, বিপন্ন গৃহস্থের ভয়শিথিল হস্ত হইতে সেই অর্থ কাবুলীওয়ালার থলিয়ায় পড়িয়া যায়; ইহারা নিঃশব্দে বাঙ্গালার দরিদ্র পল্লীগুলি বিজয় করিতেছে, যে প্রাপ্য আদালতের শত চেষ্টায় লোকের সর্ব্বস্ব নিলাম করিয়াও উদ্ধার হওয়া অসম্ভব, নিঃশব্দে বল প্রয়োগ করিয়া ইহারা তাহা সম্পূর্ণভাবে আদায় করিয়া লইতেছে। বণিক সম্প্রদায় অলক্ষিতরূপে কি ভাবে

দুর্জ্জয় হইয়া উঠিতে পারে, কাবুলীওয়ালা তাহার জীবন্ত ইতিহাস-স্বরূপ। রাষ্ট্রবিপ্লবের এখন কোনই আশঙ্কা নাই, কিন্তু রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে এই শ্রেণীর বণিকদলের সহসা এরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করা অসম্ভব নহে—যাহা অপ্রত্যাশিত ভাবে ভীতিদায়ক হইয়া নানা প্রকারের আশঙ্কা জন্মাইতে পারে।

কাবুলীওয়ালা এতদ্দেশের শুধু শীতবস্ত্র যোগাইবার ভার গ্রহণ করে নাই, বঙ্গের কুটীরদ্বারে কাবুলীওয়ালা বস্ত্রের বণিক, কিন্তু বঙ্গের হর্ম্ম্যপার্শ্বে কাবুলীওয়ালার ফলবিক্রেতা রূপই বিশেষ পরিচিত। যে সুস্বাদুফল তাহাদের দেশের প্রকৃতি অপর্য্যাপ্তরূপে প্রদান করিয়া তাহাদের ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ করিয়া থাকেন, সেই ফলের অজস্র সঞ্চয় মাতৃদত্ত পুঁটুলির ন্যায় দেশ দেশান্তরে তাহাদের বাণিজ্যের মূলধনের কার্য্য করিয়া থাকে। সে দেশ কি প্রকার মনোহর, যে দেশে ধান্যের ফসলের ন্যায় অপর্য্যাপ্ত আঙ্গুরলতা কাষ্ঠখণ্ডের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া সুশোভিত, পল্লবিত, ফলবান স্তবকের সমৃদ্ধ ভারে অবনমিত হইয়া থাকে, বন্য বিহঙ্গ ক্ষণতরে কাকলী থামাইয়া সেই ফলে চঞ্চু প্রয়োগ পূর্ব্বক চক্ষু মুদিয়া রসাস্বাদ করিতেছে, কাবুলীওয়ালা অজস্র খাইতেছে ও অজস্র থলিয়া পূর্ণ করিয়া দেশ বিদেশে লইয়া যাইতেছে; যে দেশে রসভরা বিশালকায় জেঁরগুজা ফল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্যামাভ পত্রাকীর্ণ বৃক্ষের অবচ্ছেদে পক্ক হইয়া ক্ষুধিতের জন্য সুসংবাদের মত শাখাগ্রে দুলিতেছে ও ক্ষুদ্রদেহ ক্ষুদ্রপত্র নাসপাতি তরুটি বেপথুবতী রমণীর দাঁড়াইয়া দর্শক চক্ষুকে নীরব নিমন্ত্রণে প্রলুব্ধ করিতেছে; যে দেশে বিপুল "আখমণি" বৃক্ষের ফলের মধ্যে বাদামের ন্যায় স্বাদুবীজ উৎপন্ন হইয়া থাকে ও যে দেশে আখ্‌রটের ত্বক খাইয়া রমণীগণের অধর রঞ্জিত প্রবালের বর্ণ ধারণ করে। ক্ষুদ্রকায় "ভেই" তরু বৃহৎ সাঁতুত ও দীর্ঘ খর্জ্জুর যে দেশের প্রকৃতির অপর্য্যাপ্ত অফুরন্ত রসভাণ্ডারের তত্ত্ব নিঃশব্দে

ঘোষণা করে—সে দেশ আমাদের চক্ষে এক ঐন্দ্রজালিক রাজ্য—যে দেশে রুগ্ন ব্যক্তিকে ২॥০ টাকা সেরে বেদানা কিনিয়া খাইতে হয় না, রাশি রাশি বেদানা পথে পড়িয়া থাকে। কাবুলীওয়ালা এই প্রকার রসবতী প্রকৃতির অঙ্ক হইতে এখানে আসিয়া যখন তাহার মাতৃহস্তের দান ফলরাশি বিক্রয় করিতেছিল, তখন তাহার হৃদয়টি আমরা বেদানা ও আঙ্গুরের মতই কোমল রসপূর্ণ মনে করিয়াছিলাম, রবীন্দ্র বাবু কাবুলীওয়ালা গল্পটিতেও তাহার চিত্রের উপর এই কল্পিত সুকোমল প্রভাপাত করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু আফ্‌গনিস্থানের এই সুন্দর অধিত্যকা ভূমি হইতে আসিয়া যখন সে মাতৃহস্তের দান পরিত্যাগপূর্ব্বক, বিলাতী কাপড়ের বস্তা লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন তাহার মূর্ত্তি উদগ্র ও ভয়ানক ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।

কাবুলীওয়ালা আমাদের নিত্যদৃষ্ট, অথচ তাহার সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। যে সকল কাবুলীওয়ালা এ দেশে আসে, তাহারা দেরা ইসমাইল খাঁর সমীপবর্ত্তী স্থানবাসী, এই প্রদেশ আফ্‌গনিস্থানের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত, এখানে সোলেমান-তকৃত পাহাড় বৃহৎ নিঃসঙ্গ শৃঙ্গ উত্থিত করিয়া আছে, কাবুলীওয়ালা-হিন্দু এই পাহাড়কে "প্রহ্লাদ-ভক্তকে পাহাড়" নামে অভিহিত করিয়া থাকে,—দক্ষিণে "সফেদকো"—শ্বেতপর্ব্বত, উহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম "সীতারাম," আফ্‌গনিস্থানের পর্ব্বতকুলের মধ্যে ইহার ন্যায় আর কোন শৃঙ্গ স্বর্গ-পথে এতদূর অগ্রসর হয় নাই।

কাবুল ও তৎসমীপবর্ত্তী স্থান সমূহ খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত ছিল, এখনও বহুসংখ্যক স্তূপরাশি লুপ্ত বৌদ্ধ-ভাবের নিদর্শনস্বরূপ সুবিস্তীর্ণ মুসলমান রাজ্যে যেন কুণ্ঠিত হইয়া অবস্থান করিতেছে, অশোকের কপুর দি-গিরি—লিপিমালাও এতদ্দেশীয় সেই প্রাচীন বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে; এই রাজ্য প্রকৃতির

একটি বিচিত্র প্রহেলিকার ন্যায়; ইহার কোন স্থান বন্ধুর, পর্ব্বতগাত্র একবারে তরুশূন্য, কৃষ্ণপ্রস্তরসঙ্কুল, এবং নির্জ্জলতায় ভীতিপ্রদ, আর কোন স্থান অপূর্ব্ব লাবণ্যের রাশি—সুহাসিনী প্রকৃতির ফলপুষ্প তরুর শোভায় বিচিত্ররূপে উজ্জ্বল। "সফেদকো" ও হিন্দুকুশের ঊর্দ্ধস্থান বিস্তৃত অরণ্যানী ও বৃহৎ দেবদারু শালবৃক্ষের শ্রেণীতে নয়নরঞ্জক, কিন্তু ছোট ছোট পাহাড়গুলি একবারে বনশূন্য এবং নগ্ন ধূসরতায় পরিবৃত; তাহারা একাগ্র, উৎকট ধ্যানে পাণ্ডুবর্ণাভ আকাশে মিলিয়াছে। কিন্তু আবার তাহাদেরই পাদমূল নির্ঝর ধারায় প্রক্ষালিত এবং সেখানে প্রকৃতি তাহার চিরহরিৎ শোভা উদ্ঘাটন করিয়া রাখিয়াছেন। কাবুলীওয়ালা এই স্থানে মাটীর দেওয়ালের ভিতর স্বীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী রচনা করিয়া বাস করিয়া থাকে। এক একটা মৃৎপ্রাচীরের অভ্যন্তরে ২০।২৫ ঘর কাবুলীওয়ালা বাস করে—সেখানে তাহারা উট ভেরী ও ঘোড়া পালন করে এবং তাহাদের দুধ ও ঘি বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয় করে। অবগুণ্ঠনবতী কাবুলানী গৃহে বসিয়া স্বামীপুত্র প্রভৃতির জন্য আমাদের পরিচিত আলখাল্লার মত বহু স্তরস্তবকময় জামা সেলাই করেন; তাঁহারা শতরঞ্চি, ভেরীর রোমের গালিচা পট্ট ও তাম্বু প্রস্তুত করিতে সিদ্ধ হস্ত।

কাবুলানী ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত "মকতবে" পাঠ করিতে পারেন, সেই সময়ের মধ্যে তিনি "তক্তির" উপর বর্ণগুলি লিখিতে শেখেন এবং "কায়দা বোগদাদী" নামক প্রথম শিক্ষার পুস্তক অধ্যয়ন করার পর গৃহে যাইয়া কোরাণের "আম ছেপারা" পাঠ করেন, এবং গার্হস্থ শিল্পের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। ধনাঢ্যের গৃহে কাবুলানী বিচিত্রালঙ্কারে শোভিতা হন, তাঁহাদের অলঙ্কারের তালিকাটি কৌতুকাবহ—এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

কর্ণে—১৬ ভরি সোণার চাটলা; "দুবড়" ৪ ভরি, "পেয়াজান"

২ ভরি। নাসিকায়—নথ ৩.৪ ভরি। মাথায়—"দাউনি (সিঁথি) ৮৷১০ ভরি। গলায়—সোনার "গরবন্দা" অথবা চাদির চকল ১৬৷২০ ভরি। কামিজের উপর "কুব্বা," বক্ষের উপর রূপার ঘুঙ্গুরীসহ গলার "স্বর্ণ চমকালী"। হাতে—"মঙ্গলী" সোনার ৫০৷৬০ ভরি, "বউগান" (চুড়ি) ৪০৷৫০ ভরি। পায়ে—কাড়ি (মল) ১০০ ভরি। নূড়ে (বাঁকা মল) ২৫৷৩০ ভরি।

একটি রমণীকে অলঙ্কারে পরিশোভিতা করিয়া গৃহস্থ মনে করিতে পারেন, তাঁহার পারিবারিক ভবিষ্যতের বেশ একটা সংস্থান করা হইয়াছে। যে কাবুলবাসীর নিকট হইতে আমি এই তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন একটি কাবুলানীর সমস্ত অলঙ্কার এখানকার কোন মর্দ্দাণা (পুরুষ) ধরিয়া তুলিতে পারিবে না। ইহাঁরা খর্ব্বাকৃতি, দুর্ব্বলস্নায়ু নরনারীর পার্শ্বে কোন বিচিত্র গ্রহের উন্নততর অপূর্ব্ব মনুষ্য জাতির নিদর্শনস্বরূপ। ইহাঁদের রমণীগণের মধ্যে ব্যভিচার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, এখানে ব্যভিচারের দণ্ড মৃত্যু, কিন্তু এই প্রকার দণ্ডার্হ লোকের সংখ্যা অত্যল্প। ২০৷২৫ বৎসর বয়সে কাবুলানী পরিণীতা হইয়া থাকেন, ইহার পূর্ব্বে তাঁহারা কুমারী, আমরা কল্পনা করিতে পারি, গিরিবিহারিণী এই কুমারীগণ আয়ুধময়ী পার্ব্বতীর ন্যায় সুশ্রী ও নির্ম্মলস্বভাবা। যে স্থানে গিরিদুহিতা ধ্যানমগ্ন স্বামীর পাদমূলে পল্লবিত কুসুমাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক আরাধনা করিয়াছিলেন, সেই কৈলাস এ স্থানের অনতিদূরবর্ত্তী। কাবুলের পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ হইতে পাতিব্রত্যের মূর্ত্তিমতী গান্ধারী, হিন্দুরাজ্যের আবালবৃদ্ধ বণিতার বক্ষে আদর্শ পত্নী,—তৎসমীপবর্ত্তী প্রাচীন কৈকয় রাজ্য হইতে কৈকেয়ী ও মদ্রদেশ হইতে মাদ্রী স্ব স্ব স্বামীদিগের সম্মুখে যে রূপবহ্নি প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে পড়িয়া তাঁহারা পতঙ্গের মত প্রাণ ত্যাগ করিয়া—আফগান প্রদেশের রমণীগণকে হিন্দু ইতিহাসে স্মরণীয় করিয়া

রাখিয়াছেন। আমাদের দুর্গামূর্ত্তির যে বিশাল মুখমণ্ডল, আকর্ণ নয়ন ও ধনুর ন্যায় সুবক্র কৃষ্ণভ্রূ—তাহা বাঙ্গালী রমণীর নাই, সেরূপ মহিমান্বিত রমণীমূর্ত্তি দেখিতে হইলে পারস্য ও আফগানিস্থানের বিচিত্র গিরি উপত্যকাসমূহে সন্ধান লওয়া যাইতে পারে।

কাবুলীওয়ালা তাহার মাতৃভূমির স্তন্যধারার ন্যায় ফলসমূহের রসাস্বাদ করিয়া উদর তৃপ্তি করে, সেই পাহাড়পূর্ণ ফলস্তবকভারনম্র তরুশোভিত প্রদেশে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা নাই, এখনও রেল গাড়ী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দস্যুগণ তাহাদের ফলফুলের বিচিত্রভাণ্ডার লুণ্ঠন করিতে উপস্থিত হয় নাই। কাবুলীওয়ালার নিত্যভক্ষ্য নেমকরুটি এক একখানি ওজনে এক এক সের, তৎসঙ্গে বক্রী, উট বা মোরগের মাংস অপর্য্যাপ্ত ফলের সহিত তাহারা উদর-গহ্বরে প্রেরণ করে, ইহা ছাড়া বক্রীর খালে আঙ্গুর রাখিয়া চাটনির মত প্রস্তুত করে, তাহা রৌদ্রে শুকাইয়া লয় এবং শেষে তেলে কি ঘিয়ে ভাজিয়া খাইয়া থাকে—ইহাকে "লান্দি" বলে, এই "লান্দি" কবুলীওয়ালার অতি উপাদেয় খাদ্য।

কাবুলে "কেজিল বাস" সম্প্রদায়ই যুদ্ধ প্রভৃতির নিয়ন্তা ও সমাজের শাসনকর্ত্তা, "ইউসুফজুই" ও "বার খজই" মধ্যবর্ত্তী, সাধারণ লোকের অধিকাংশ "দারকানি" সম্প্রদায় ভুক্ত।

শাসন বিভাগের সর্ব্বপ্রধান অবশ্য "আমির"। "উজির আজম" তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর উপাধি। ইহাঁর আবার ৪ জন সহকারী মন্ত্রী আছেন—

(১) মাঃ কামায়ে আদালত বা মাঃ কামায়ে এনসাফ—ধর্ম্মাধিকারের পদে প্রতিষ্ঠিত—

(২) "ভগয়বা" বা বিবিধ বিভাগের—মন্ত্রী।

(৩) ফৌজ বিভাগের মন্ত্রী।

(৪) "তামিবতে"—মিউনিসিপালিটি ও পাব্লিকওয়ার্কের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী।

এতদ্ভিন্ন প্রতি জেলার হাকিম ও কাজি আছেন, গ্রামের অধিকাংশ ভারই পঞ্চায়েতের উপর। বহিঃশত্রুর আগমন প্রতিরোধ করিতে হইলে গ্রামের মণ্ডল সহস্র সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়া থাকেন, তিনি অপরাধীর দণ্ড দিয়া থাকেন, মোট কথা রাজকীয় শাসনে পল্লার স্বাধীনতা কিছু মাত্র নষ্ট হয় নাই, পাশ্চাত্য সভ্যতা নগরমুখী ও প্রাচ্য সভ্যতা পল্লীমুখী, পর্য্যালোচনায় ইহা স্পষ্টতঃ দৃষ্ট হয়। কাবুলীওয়ালাকে অধীনতা পাশে বদ্ধ করিতে চাহিলে জালে পতিত ব্যাঘ্রের ন্যায় সে অনেক সময় তাহা ছিন্ন করিবার দুর্দ্দান্ত চেষ্টায় প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। এই অরণ্যবিহারী স্বভাবস্বাধীন জাতি কোনপ্রভুর সেবা করিতে সহজে স্বীকৃত নহে, পল্লীর মণ্ডলই ইহাদের প্রকৃত সম্রাট, প্রীতির আনুগত্য কাবুলীওয়ালা স্বীকার করিতে পারে, কিন্তু বলপূর্ব্বক ইহাকে বশীভূত করিবার চেষ্টা বৃথা। এক সময়ে এলফিনষ্টন সাহেবকে এক বৃদ্ধ কাবুলীওয়ালা যাহা বলিয়াছিল, তাহা তাহার জাতীয় চরিত্রের পরিচায়ক। "আমরা পরস্পরের সঙ্গে কলহ করি, তথাপি আমরা সুখী, আমরা সর্ব্বদা বিপদের সম্মুখীন তথাপিও সুখী, আমরা সর্ব্বদা রক্তপাতের দৃশ্য দেখিয়া অভ্যস্ত—তাহাতেও অসুখী নহি, কিন্তু আমরা কখনও কোন প্রভুর আনুগত্য স্বীকার করিয়া সুখী হইতে পারিব না—তাহা আমাদের কল্পনায়ও অসহনীয়।"

কাবুলীওয়ালা ৫।৬ বৎসর বয়স হইতে নানা প্রকার ব্যায়ামে অভ্যস্ত; কুস্তি, মুগুরভাঁজা,—তলোয়ার, বর্শা ও বন্দুক চালনা, অশ্বারোহণে শিকার প্রভৃতি কার্য্যে ইহারা স্ফূর্ত্তিতে উন্মত্ত হইয়া উঠে। চিতা বাঘ শিকার করিতে যাইয়া ইহারা পার্ব্বত্য প্রদেশে যে অভিনয় করে তাহাতে ব্যাঘ্রের উল্লম্ফন ও কাবুলীওয়ালার উদ্দণ্ড পরিক্রমণ

উভয়ই একটা জান্তব ভাবের চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করে। ইহাদের প্রতিহিংসাবৃত্তি আইনের অনুমোদিত। যদি হত্যাপরাধে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ড হয়, তবে হত ব্যক্তির আত্মীয় স্বহস্তে সেই দণ্ড প্রয়োগ করিতে আহূত হইয়া থাকে, এই আইনের সমর্থনে কাবুলীওয়ালা বলিয়া থাকে দণ্ডিত ব্যক্তির প্রতি আদালত বিচার পূর্ব্বক প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন সত্য, কিন্তু হতব্যক্তির আত্মীয় যদি স্বহস্তে তাহার প্রাণ নিতে না পারে, তবে তাহার পরিতৃপ্তি কিসে হইবে ?

ক্রুদ্ধ হইলে কাবুলীওয়ালা প্রায়ই হত্যা করিয়া থাকে, এইজন্য হত্যাপরাধের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের বিধান অতি কঠোর। কোন ব্যক্তি হত হইলে অনেক সময় সেই হত্যাকারীর গ্রামবাসীর সকলের ৪.৫ সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড দিতে হয়, সেই মুদ্রা হত ব্যক্তির আত্মীয় পাইয়া থাকে; হত্যাসম্বন্ধে পল্লার সমস্ত লোকের উপর দায়িত্ব আরোপ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদিগকে সতর্ক রাখেন।

ধর্ম্মভাব প্রাচ্যদেশের বিশেষত্ব। কাবুলীওয়ালা নামাজ, রোজা প্রভৃতি কার্য্য নিয়মিত ভাবে করিয়া থাকে। স্বামী স্বর্গীয় হইলে কাবুলানী সাধারণতঃ দেবরকে স্বামীর পদে বরণ করিয়া থাকে। কন্যার পিতা পণ গ্রহণ করেন, কিন্তু দেবরের সঙ্গে বিবাহ হইলে পণ দিতে হয় না।

কাবুলীওয়ালা অতিশয় আতিথ্যপ্রিয়, ভিন্ন পল্লীবাসী কোন বন্ধু বাড়ীতে আসিয়া যদি ২।৩ দিন না থাকিয়া চলিয়া যায়—তবে সে নিতান্ত অপমানিত মনে করে।

এই আতিথ্য, নির্ভীকতা প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর সঙ্গে তাহাদের কার্পণ্যও উল্লেখযোগ্য। কাবুলীওয়ালা অর্থব্যয়ে বড় কুণ্ঠিত, একজন তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতপথে পাদুকা যুগল হাতে করিয়া নগ্নপদে চলিতেছিল, তুষারপথে পদ ক্ষত বিক্ষত ও রক্তপ্লুত হইয়াছিল, এতদবস্থায় গৃহে

প্রত্যাগত হইলে একটি লোক তাহার পদের ক্ষত লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করাতে সে ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, "পদের ক্ষত ৩।৪ দিনে শুকাইবে, কিন্তু পাদুকা ছিন্ন হইলে মূল্য দিয়া তাহা কিনিতে হইত—ইহা অপেক্ষা কয়েক দিন পড়িয়া থাকা অনেক শ্রেয়ঃ।" একবার একটি বাঙ্গালী ও কাবুলীওয়ালায় ঝগড়া হওয়াতে উভয়েরই আদালতে উপস্থিত হইতে হইয়াছিল, বিচারে বাঙ্গালীর ১৫ দিনের জেল ও কাবুলীওয়ালার ৫৲ টাকা অর্থদণ্ড হইল, কাবুলীওয়ালা সেই ১৫ দিন জেল তাহার হউক কিন্তু ৫৲ টাকা অর্থদণ্ড না হয়, এইজন্য হাকিমের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়াছিল।

শত শত কাবুলীওয়ালা হ্যারিসনরোডে দৃষ্ট হয়—ইহারা কলিকাতার পথে ঘাটে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে, কিন্তু মহানগরীর এই সমৃদ্ধ বিলাসের ক্ষেত্রে কাবুলীওয়ালা সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত। মাড়োয়ারী বহু অর্থসঞ্চয় করিয়া সেই বিলাসঅগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছে, কিন্তু কাবুলীওয়ালা থলিয়া অর্থপূর্ণ করিয়া সেই শতচ্ছিন্ন অঙ্গে চিরসংলগ্ন পোষাকে বৎসরান্তে কাবুলে ফিরিতেছে। কলিকাতার ট্রামগাড়ী সহসা তাহার মুষ্টি হইতে কপর্দ্দক বিমুক্ত করিতে পারে না। অর্থশালী হউক কিম্বা নির্ধন হউক কাবুলীওয়ালা সহরের এই এমারত, এই দৌলত এই উৎকট প্রলোভন কিছুমাত্র গণ্য করে না। যে দেশে আঙ্গুরের পল্লবিত ও স্তবকনম্র লতা দুলিয়া দুলিয়া "সোলেমান তকৃত" কিম্বা "সফেদকো" পাহাড়ের উপত্যকাকে হরিতাভা বিতরণ করিতেছে, কাবুলীওয়ালার কল্পনা-নেত্র সেই দেশের প্রতি স্থির রহিয়াছে। সে এদেশ হইতে কিছু গ্রহণ করিতে আসে নাই,—এ দেশের দোকান পাট হইতে কিছু বিলাতী বস্ত্র লইয়া এ দেশবাসীর হস্তে তাহা দিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করে, সেই অর্থ "সোলেমান তকৃতর" দীর্ঘ সাঁতুত তরুচ্ছায়ায় স্ত্রীপুত্র লইয়া ভোগ করিবে, ইহাই তাহার আশয়। সহরের

হর্ম্ম্যশীর্ষ হইতে শত আমোদের বৃথা আমন্ত্রণ উপেক্ষা করিয়া যষ্টিসম্বল খলিয়াকক্ষ সুগঠিত বীর মূর্ত্তিগুলি তাহাদের অরণ্য, নির্ঝর ও সাধু-ফলিত উপবন সকলের কল্পনা করিতেছে। ইহারা মাতৃভূমির সুসন্তান, পরভূমির সৌন্দর্য্যের নিকট ইহারা আত্মবিক্রয় করে না, বিদেশ পরি-ভ্রমণকালে মাতৃপ্রতিমার প্রতি নির্নিমেষ লক্ষ্য রাখিতেছে। মাতৃভূমি যে বেশ, যে বিদ্যা, যে ভূষা দিয়াছে তদ্দ্বারা মণ্ডিত হইয়া ইহারা আসিয়াছে এবং সেই মণ্ডণগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বৎসরান্তে স্বগৃহে ফিরিয়া যায়; আর আমরা স্বগৃহের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় সূক্ষ্ম মস্‌লীন ছাড়িয়া ফ্ল্যানেল ও সার্জ্জ ধরিয়াছি—বাস্তব রাজ্যের স্বাভাবিক উপ-যোগিতা বিস্মৃত হইয়া কোন কাল্পনিক শীত জগতের জন্য আহারে পরিচ্ছদে প্রস্তুত হইতেছি, দেশের ছেলে বিদেশীর ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া স্বদেশ-ভক্তির বক্তৃতা দ্বারা আত্মবঞ্চনা করিতেছি। কাবুলীওয়ালার নিঃশব্দ ও অনাড়ম্বর তপস্যার যে তেজ ও আত্মাভিমান আছে তাহাই মূর্খতা কিম্বা আমাদের গ্ল্যাডষ্টোনের ধরণে গ্রীবাভঙ্গী ও বার্কের প্রতিধ্বনিমূলক বক্তৃতাই মূর্খতা?

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।

বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

বর্ণবিন্যাস।

মুখের দ্বারা উচ্চারিত শব্দ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত করিবার জন্য উহা আমরা অক্ষরের আকারে প্রকাশিত করি। শব্দের এই অক্ষর-বন্ধন বা লিপি-বন্ধনের নাম উহার বর্ণবিন্যাস বা বানান। ভাষার আদিম অবস্থায় উচ্চারণ অনুসারে শব্দের বর্ণবিন্যাস করাই কর্ত্তব্য। যে শব্দ যেরূপ ভাবে উচ্চারিত হয় সেই শব্দ তদনুরূপ বর্ণদ্বারা প্রকাশিত করাই বিধেয়। যেমন "রাম" ও "রমা" এই দুইটী শব্দের পার্থক্য প্রকাশ করিতে হইলে প্রথমটীতে রকারের পরে ও দ্বিতীয়টীতে মকারের পরে আকার যোগ করিতে হয়। এইরূপে উচ্চারণের যত সূক্ষ্মভেদ হইবে বর্ণবিন্যাসেরও তত সূক্ষ্মভেদ করা কর্ত্তব্য।

ভাষার প্রৌঢ়াবস্থায়—যখন শব্দের বর্ণবিন্যাস স্থির হইয়া গিয়াছে—তখন উচ্চারণের অনুসরণ করিয়া বর্ণবিন্যাসের ব্যত্যয় ঘটাইলে অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়। চিরকাল যে ভাবে যে শব্দের বর্ণবিন্যাস করা হইয়াছে, উহার উচ্চারণের সহস্র পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও ঐ শব্দের ঐ ভাবে বর্ণবিন্যাস করা এখনও কর্ত্তব্য। এই হেতু সংস্কৃতানুরাগী মহোদয়গণ বলেন উচ্চারণের অনুসরণ না করিয়া প্রকৃতি প্রত্যয় অনুসারে শব্দের বর্ণবিন্যাস করাই কর্ত্তব্য। শব্দসমূহ বিশ্লেষণ করিয়া উহাদের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দ্ধারণ করিলে বুঝিতে পারা যায় কিহেতু ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণবিন্যাস করা হইয়াছে। যদি শব্দসমূহ লিপিবদ্ধ করিবার সময়ে সকলেই উহাদের প্রকৃতি প্রত্যয়ের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে

সকলের বর্ণবিন্যাসই এক প্রকার হইবে, বর্ণবিন্যাস বিষয়ে কাহারও মতের অনৈক্য হইবে না। কিন্তু উচ্চারণ অনুসারে শব্দ লিপিবদ্ধ করিলে বর্ণবিন্যাস বিষয়ে অনেক মতভেদ ঘটিবে। বাঙ্গালা ভাষার অধিকাংশ শব্দই সংস্কৃত হইতে গৃহীত। ঐ সকল শব্দের একণে প্রৌঢ়াবস্থা। অধুনা উহাদের বর্ণবিন্যাসের পরিবর্ত্তন ঘটাইলে অর্থ বোধের অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। অনেক স্থলেই ক্ষ খ, শ স, ণ ন, ই ঈ, উ ঊ ইত্যাদির প্রভেদ উচ্চারণদ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করা যায় না। য—ফলা, ব—ফলা ইত্যাদিরও সম্যক্ উচ্চারণ হয় না। তাই বলিয়া কি আমরা ক্ষএর পরিবর্ত্তে খ লিখিব? শ স ষ এই তিনের ভেদ তুলিয়া দিব? ণ ন এতদুভয়ের একটীর পরিবর্ত্তে অপরটী ব্যবহার করিব? ই ঈ এতদুভয়ের ভেদ সংরক্ষণ করিবার জন্য চেষ্টা করিব না? "শমতা" ও "সমতা" এই দুইটা শব্দ একই ভাবে উচ্চারিত হয় কিন্তু উহার একটীর অর্থ "শান্তি" ও অপরটীর অর্থ "তুল্যতা"। "ক্ষণ" ও "খন"—ইহাদের উচ্চারণগত ভেদ নাই বটে কিন্তু অর্থগত ভেদ অত্যন্ত অধিক। একটীর অর্থ "মুহূর্ত্ত" ও অপরটীর অর্থ "খনন করা"। "বিস" শব্দের অর্থ "মৃণাল" কিন্তু "বিষ" শব্দের অর্থ "গরল"। "বারি" শব্দের অর্থ "জল" কিন্তু "বারী" শব্দের অর্থ "গজ-বন্ধনী"। উচ্চারণের অনুসরণ করিলে এইরূপে অনেক শব্দেরই অর্থ অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে। অতএব প্রকৃতি প্রত্যয় অনুসারে শব্দের বর্ণ-বিন্যাস করাই বিধেয়। খাঁটী বাঙ্গালা বা বৈদেশিক শব্দের বর্ণবিন্যাস বিষয়ে অবশ্য কোন অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম নির্দ্ধারণ করা যায় না। তথাপি সেই সকল স্থলেও যথাসম্ভব সংস্কৃতের অনুসরণ করা উচিত। "ষ্টীমার" এই শব্দটীতে আমরা "ষ" এর পরিবর্ত্তে "স" বা "শ" ব্যবহার করিতে কখনই সাহসী হইব না। কারণ "স্তোঃ ষ্টুনা ষ্টুঃ" এই সূত্র অনুসারে টকার যুক্ত স ও শ উভয়ই ষকারে পরিণত হয়। "মেছোনী"

প্রভৃতি খাঁটি বাঙ্গালা শব্দেও স্ত্রীলিঙ্গবোধক ঈ প্রত্যয় ব্যবহার করা উচিত, এ বিষয়েও সংস্কৃত ঈ প্রত্যয়ের ছায়া অনুসরণীয়। "বাঙ্গালা" এই শব্দটী রবীন্দ্রবাবুপ্রমুখ খাঁটি বাঙ্গালার পক্ষপাতী শাব্দিকগণ "বাংলা" এইরূপ ভাবে লিখিয়া থাকেন। "বাঙ্গালী" লিখিতে তাঁহারা "বাঙালী" এইরূপ বর্ণবিন্যাস করেন। কিন্তু "বঙ্গীয়" লিখিতে তাঁহাদিগকে "ঙ্গ" এর শরণাপন্ন হইতে হয়। "বাংলা" বাঙালী," ও "বঙ্গীয়" এই তিনটী শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে লিখিয়া কোনই ফল নাই। উহাদিগকে "বাঙ্গালা," "বাঙ্গালী" ও "বঙ্গীয়" এইরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ করাই উচিত। তাহা হইলে "বঙ্গ" এই মূল শব্দ বা প্রকৃতির সহ উহাদের সম্বন্ধ অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ নানা প্রকার বিবেচনা করিয়া আমাদের বোধ হয় উচ্চারণের অনুসরণ না করিয়া প্রকৃতি প্রত্যয় অনুসারে শব্দের বর্ণবিন্যাস করাই বিধেয়।

প্রাদেশিক শব্দ।

কোন কোন সময়ে দেশের কোন কোন অংশে কতকগুলি শব্দের আবির্ভাব হয়। ঐ সকল শব্দ ঐ সময়ে দেশের ঐ অংশের লোকের মনোভাব প্রকাশের প্রকৃষ্ট দ্বার হইয়া থাকে। যদিও সমগ্র দেশে ঐ সকল শব্দ বোধগম্য হয় না, তথাপি দেশের যে অংশে উহাদের প্রচলন আছে তথাকার লোক উহাদের দ্বারা অতি পরিষ্কার ভাবে স্ব স্ব মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। এই সকল শব্দকে প্রাদেশিক শব্দ বলে। "ছিল" একটী বাঙ্গালা ক্রিয়াপদ। চট্টগ্রাম প্রভৃতি প্রদেশে ইহার পরিবর্ত্তে "আছিল্" এই ক্রিয়া পদ ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ বঙ্গের কোন কোন অংশে "ছিল" এই স্থলে "ছ্যাল" পদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। "ছিল" এইটী সমগ্র বাঙ্গালী জাতির ক্রিয়া পদ, কিন্তু "ছ্যাল" ও "আছিল্" এই দুইটী প্রাদেশিক পদ। "পুত্র" একটী বাঙ্গালা শব্দ। ইহার পরিবর্ত্তে কোন

কোন স্থলে "পোয়া" শব্দ ব্যবহৃত হয়। "পোয়া" এইটী প্রাদেশিক শব্দ। "তাড়ান" এই ক্রিয়ার স্থলে কোন কোন প্রদেশে "খ্যাদান" ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়। "খ্যাদান" একটী প্রাদেশিক ক্রিয়াপদ।* এইরূপ অসংখ্য প্রাদেশিক শব্দ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দ সংস্কৃতের অপভ্রংশে উৎপন্ন হইয়াছে। যথা "বিবাহ" শব্দের অপভ্রংশে "বে," আবার কতকগুলি দেশজ, অপরগুলি বৈদেশিক। প্রাদেশিক শব্দসমূহের সঞ্চরণস্থল অতি সঙ্কীর্ণ। কোন কোন প্রাদেশিক শব্দ একটী জেলায় ব্যবহৃত। অপর কোন শব্দ দুই তিন জেলায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু কোন প্রাদেশিক শব্দই সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয় না।

প্রাদেশিক শব্দসমূহ কেবল অত্যল্প স্থান অধিকার করে এইরূপ নহে—উহাদের কালিক প্রসারও অত্যন্ত অল্প। উহাদের আয়ুঃপরিমাণ সাধারণতঃ এক শত বৎসর। ঐ কালের মধ্যে উহাদের আয়ুঃশেষ হইয়া যায়। আবার নূতন নূতন শব্দের উৎপত্তি হয়। এইরূপ শত শত প্রাদেশিক শব্দের অবিরত উৎপত্তি ও বিলয় হইয়া থাকে। উহাদের দ্বারা স্থায়ী সাহিত্যের কোন প্রকার পরিপুষ্টি হয় না। অনেকেই দেখিয়াছেন বর্ষার অন্তে নদীতীরে বহুপ্রকার তৃণলতা ইত্যাদির উৎপত্তি হয় কিন্তু পুনরায় বর্ষা আগমনের পূর্ব্বেই ঐ সকল ধ্বংস লাভ করে। উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ সাধন করিতে কাহারও ক্লেশ পাইতে হয় না, উহারা স্বতঃই উৎপন্ন ও বিনষ্ট হয়। নদীতীরজাত তৃণলতার ন্যায় প্রাদেশিক শব্দ নিচয়ও আমাদের অলক্ষ্য ভাবে অবিরত উৎপত্তি ও বিনাশ লাভ করিতেছে। উহাদের লীলাভূমি অতি সঙ্কীর্ণ এবং জীবৎকাল অতি সংক্ষিপ্ত। উহাদের দ্বারা আমাদের

---

* সংস্কৃতে কোন কোন স্থলে "খেদিতঃ" এই পদ "তাড়িতঃ" অর্থে প্রযুক্ত হয়।

অথবা আমাদের ঊর্দ্ধতন বা অধস্তন দুই তিন পুরুষের কথোপকথন কার্য্য নিষ্পন্ন হইতে পারে বটে, কিন্তু উহারা স্থায়ী সাহিত্যের কোন উপকারই সাধন করিতে পারে না।

কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দ আছে উহারা এত ক্ষণস্থায়ী যে উহাদিকে ভাষার বুদ্বুদ্ বলিলেও চলে। উহারা নিতান্ত অন্তঃসার-শূন্য সুতরাং দুর্ব্বল। ঐ সকল দুর্ব্বল শব্দ ভাষার অপর সবল শব্দের সহিত এক তন্তুতে বদ্ধ হইবার একেবারেই যোগ্য নহে। সবল শব্দের সহিত দুর্ব্বল শব্দের একত্র ব্যবহারকে "গ্রাম্যতা" বা "প্রাদেশিকতা" দোষ বলিতে পারা যায়। সুলেখক মাত্রই এই দোষ পরিহার করিবেন। যে সকল শব্দের অর্থ দেশের কতক অংশের লোক বুঝিতে পারে কিন্তু অপর অংশের লোক বুঝিতে পারে না, ঐ সকল গ্রাম্য ও ক্ষণিক শব্দকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করা কর্ত্তব্য।*

সাহিত্যের ভাষা।

বহুলোক "সহিত" অর্থাৎ একত্র হইয়া যাহা পাঠ করিতে পারে তাহাকে সাহিত্য বলে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়বিশেষের পাঠ্য নহে উহা সমগ্র জাতির পাঠ্য। যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ সমগ্র বাঙ্গালী জাতি বুঝিতে পারে তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা সাহিত্য। আর যে সকল বাঙ্গালা গ্রন্থ বঙ্গের কোন কোন প্রদেশের লোকে বুঝিতে পারে কিন্তু অপর প্রদেশের লোকে বুঝিতে পারে না, উহারা কখনই বাঙ্গালা "সাহিত্য" পদ বাচ্য হইতে পারে না। সাহিত্যকে যদি সমগ্র জাতির

* সংপ্রতি জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ডাক্তার জগদীশ চন্দ্র বসু এম এ, ডি এস্ সি, সি আই ই মহোদয়ের সহিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে আমার কথোপকথন হয়। জগদীশ বাবু রবীন্দ্র বাবুর "ভাষার ইঙ্গিত" প্রবন্ধের বিশেষ সুখ্যাতি করিলেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলিলেন যে সাহিত্যে প্রাদেশিক শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য নহে। গত তিন বৎসর বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আষাঢ়মাসের প্রদীপ পত্রিকায় মৎপ্রণীত "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

তুল্যরূপ বোধগম্য করিতে হয় তাহা হইলে কথিত ভাষা ও লিখিত ভাষা এতদুভয়ের মধ্যে ভেদ অবশ্যই নির্দ্দেশ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গী প্রচলিত আছে। ঐ সকল প্রাদেশিক শব্দ ও প্রাদেশিক বাক্য যদি লিখিত গ্রন্থে ব্যবহৃত হয় তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থনিচয় সমগ্র বাঙ্গালী জাতির পাঠ্য হইবে না। যে প্রদেশে যে শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গী প্রচলিত আছে সেই প্রদেশের লোক কথোপকথন কালে সেই শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গী ব্যবহার করুন। কিন্তু গ্রন্থ লিখিবার কালে তাঁহারা যেন সাবধান হন। যে সকল শব্দ সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তুল্যভাবে বোধগম্য হয়, তাঁহারা যেন কেবল সেই সকল শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করেন। যদি কোন বিশেষ অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য সমগ্র বঙ্গদেশে ব্যবহৃত কোন সাধারণ পদ না পাওয়া যায় তাহা হইলে বরং কল্পিত পদের আশ্রয় গ্রহণ করিব তথাপি প্রাদেশিক পদ ব্যবহার করিব না। যেমন কৃধাতুর বর্ত্তমানকালে উত্তম পুরুষে "কর'ছি," "কর্ছি," "কর্‌তেছি," "কর্‌তিছি" ইত্যাদি নানা প্রাদেশিক পদ বিদ্যমান আছে; কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালা দেশের জন্য একটী সাধারণ পদ নাই। এই হেতু সাহিত্যে "করিতেছি" এইরূপ একটী কল্পিত পদের ব্যবহার করা হয়। "করিতেছি" এই পদটী বঙ্গের কোথাও কথিত ভাষায় ব্যবহৃত হয় না কিন্তু লেখকগণ পরস্পরের সম্মতি-ক্রমে উহা সাহিত্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সকলেই স্বীকার করিবেন—সংস্কৃত পদ সমূহই সাহিত্যের বিশেষ উপযোগী। সমগ্র বাঙ্গালী জাতি তুল্যভাবে উত্তরাধিকারসত্ত্বে সংস্কৃত পদসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ঐ সকল পদ দেশের অংশবিশেষে সমুদ্ভূত হয় নাই। উহারা বহুকাল হইতে সমপ্রদেশ ব্যাপিয়া অবস্থিত আছে। বাঙ্গালার সকল প্রদেশের লোকেই উহাদিগকে স্বসম্পত্তি বলিয়া দাওয়া করিতে পারেন। ঐ সকল শব্দ কাহারও অপরিচিত বা নিঃসম্পর্ক

নহে। অতএব গ্রাম্যতা দোষ পরিহার করিতে হইলে সাহিত্যে বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

সমগ্র ভারতে একতাবন্ধন করিতে হইলেও সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদি বাঙ্গালা মহারাষ্ট্র পঞ্জাব প্রভৃতি সকল দেশের সাহিত্যই সংস্কৃতশব্দবহুল হয় তাহা হইলে উহাদের মধ্যে একটী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিবে। কিন্তু যদি সাহিত্যে বহুল পরিমাণে প্রাদেশিক শব্দ প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে এক দেশের সাহিত্য অপর দেশের সাহিত্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ হইয়া পড়িবে। অতএব সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দের বহুল প্রয়োগ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়।

নূতন ভাব প্রকাশ করিবার জন্য আমরা অনেক বৈদেশিক ও দেশজ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। ঐ সকল শব্দ সমগ্র বাঙ্গালা দেশে তুল্য ভাবে বোধগম্য হয়। অতএব সাহিত্যে ঐ সকল শব্দের ব্যবহারে কোন হানি নাই। বস্তুতঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্যক্ পরিপুষ্টি সাধন করিতে হইলে ইউরোপীয় দর্শন বিজ্ঞান পুরাবৃত্ত ইত্যাদি হইতে ভাব [illegible] করিয়া নূতন শব্দ সঙ্কলন করা কর্ত্তব্য। কোন কোন স্থলে সংস্কৃত প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে নূতন শব্দ নির্ম্মাণ করিতে হইবে, কোথাও বা বৈদেশিক শব্দ বিদেশীয় আকারে গ্রহণ করিতে হইবে। সাহিত্যে সংস্কৃতমূলক দেশজ ও বৈদেশিক এই তিন শ্রেণীর শব্দই বিদ্যমান থাকিবে। সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দসমূহের সহ কথিত ভাষার শব্দের প্রভেদ এই যে পূর্ব্বোক্ত শব্দসমূহ চিরকাল তুল্য অর্থে দেশের সর্ব্ব অংশে বোধগম্য হইবে, কিন্তু কথোপকথনের ভাষা সেরূপ কোন নিয়মে বদ্ধ নহে।

মতভেদের কারণ।

সংস্কৃতানুরাগী ও খাঁটি বাঙ্গালার পক্ষপাতী মহোদয়গণের পরস্পর মতভেদের কারণ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই

পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় বাঙ্গালা সাহিত্যকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য ব্যগ্র, আর শেষোক্ত সম্প্রদায় সে বিষয়ে উদাসীন। বাঙ্গালা সাহিত্য সমগ্র বাঙ্গালা দেশের লোকে বুঝিবে কি না বুঝিবে, উহা দীর্ঘকাল পৃথিবীতে থাকিবে কি না থাকিবে—তাহা খাঁটি বাঙ্গালার পক্ষপাতিগণ একবারও ভাবিয়া দেখেন না। সাহিত্য যাহাতে চিরস্থায়ী হয় এবং উহা যাহাতে সার্ব্বজনীন হয়, তাহার সম্যক্ বিধান করিবার জন্য সংস্কৃতানুরাগী সম্প্রদায় সংস্কৃতের আদর্শ অনুসরণ করিয়া থাকেন।

পাণিনি অন্যূন আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে গান্ধার দেশে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহার সময় হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণের কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এমন কি পাণিনির সহস্র বৎসর পূর্ব্ব হইতে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম স্থির হইয়া রহিয়াছে। আর একটা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গান্ধার দেশে সংস্কৃত ব্যাকরণের যে নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল সমগ্রভারতে—এমন কি মধ্য এসিয়ায় পর্য্যন্ত—সেই নিয়ম প্রচলিত রহিয়াছে সারে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে কাশ্মীর দেশের লোক যে ভাবে কথা বলিত মলবর উপকূলের লোকও কি অবিকল সেইরূপ ভাবে কথা কহিত? তখন কি গুজরাট ও আসামের লোকের ভাষার পরস্পর কোনই প্রভেদ ছিল না? প্রভেদ অবশ্যই ছিল। তবে বৈয়াকরণগণ সাহিত্যে প্রাদেশিক শব্দের ব্যবহার একেবারেই নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কথিত ভাষার বৈচিত্র্যের প্রতি উদাসীন হইয়া সাহিত্যের নিমিত্ত এক আদর্শ ভাষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ ভাষা কোন স্থলবিশেষে (ব্রহ্মাবর্ত্তে) কথিত হইত কি না, জানা যায় না। কিন্তু সমগ্র ভারত ও মধ্য এসিয়ার লোকে ঐ ভাষা শিক্ষা করিয়া উহাতে গ্রন্থ লিখিতেন। হয়ত তখন দাক্ষিণাত্যে সংস্কৃত ভাষা একেবারেই প্রচলিত ছিল না, সম্ভবতঃ তখন দাক্ষিণাত্যের লোক দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথোপকথন

করিতেন। তাঁহাদের কথোপকথনের ভাষা যাহাই হউক না কেন, গ্রন্থ লিখিতে হইলে তাঁহাদিগকেও সংস্কৃত ব্যাকণের নিয়ম অভ্যাস করিতে হইত। কথিত ভাষা অবশ্যই ভারতের নানা প্রদেশে নানা ভাবে প্রচলিত ছিল কিন্তু লিখিত ভাষা এক ও অপরিবর্ত্তনীয় ছিল। কথোপকথনের ভাষা হইতে সাহিত্যের ভাষা পৃথক্ করিয়া প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ সংস্কৃত সাহিত্যের সুদীর্ঘ স্থায়িত্ব সাধন করিয়াছেন। তাঁহারা যদি গান্ধার, গুজরাট, আসাম, কেরল, বিদর্ভ, অযোধ্যা প্রভৃতি সকল দেশের প্রাদেশিক শব্দ সাহিত্যে ব্যবহার করিবার অনুমতি দিতেন তাহা হইলে ঐ সকল দেশে লিখিত সাহিত্যের কখনই পরস্পর মিল থাকিত না। গত সাড়ে তিন হাজার বৎসর মধ্যে ভারতে কথোপকথনের ভাষার বিস্তর পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে এবং অনেক উপভাষার সৃষ্টি হইয়াছে কিন্তু সাহিত্যের ভাষা অটল ও অচল আছে। যাঁহারা সংস্কৃতের আদর্শ অনুসরণ করিতে বলেন—তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই যে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা এমন একটী আদর্শ সাধু ভাষা কর যাহা কল্পান্ত কাল পর্য্যন্ত অপরিবর্ত্তনীয় থাকিবে।

কথোপকথনের ভাষা যতই পরিবর্ত্তিত হউক না কেন সাহিত্যের ভাষা চিরকাল এক থাকিবে। প্রাচীন মীসরীয়গণ যে প্রণালীতে মৃতদেহ বামী (balmy) দ্বারা সংরক্ষণ করিতেন, সাহিত্যের ভাষাকেও সেইরূপ ভাবে ব্যাকরণের নিয়মদ্বারা রক্ষণ করিতে হইবে। এইরূপ ভাবে সংরক্ষিত ভাষা কালসহকারে প্রাণত্যাগ করিবে বটে অর্থাৎ কালের পরিবর্ত্তনে ঐ ভাষায় কেহই কথা বার্ত্তা কহিবে না বটে কিন্তু সাহিত্যগুলি চিরস্থায়ী হইবে। যেরূপ অধুনা সংস্কৃত ভাষা প্রাণত্যাগ করিয়াছে বটে কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্য আজিও সজীব আছে, এবং আরও সুদীর্ঘ কাল উহা সজীব থাকিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যকেও আমরা এরূপ ভাবে গঠন করিতে চাই যে ভাষা মরিয়া গেলেও সাহিত্য জীবিত

থাকিবে। ভাষাকে অমর করা কাহারও সাধ্য নহে কিন্তু সাহিত্যকে অমর করা অমাদের সুসাধ্য। অনেক স্থলেই মৃত ভাষা লইয়া সাহিত্য গঠন করিতে হয়। কালিদাস ভবভূতি শ্রীহর্ষ মাঘ শঙ্করাচার্য্য উদয়নাচার্য্য প্রভৃতির সময়ে সংস্কৃতভাষা সম্ভবতঃ সজীব অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষা ছিল না। রঘুনন্দন, রঘুনাথ শিরোমণি, গঙ্গেশ উপাধ্যায়, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রভৃতির সময়ে সংস্কৃত নিশ্চয়ই মৃত ভাষা হইয়াছিল। তথাপি ইঁহারা মৃত সংস্কৃত ভাষাদ্বারা যে সাহিত্য গঠন করিয়াছেন তাহা চিরস্থায়ী। সজীব ভাষার দ্বারা সাহিত্যের আরম্ভ হয় কিন্তু মৃত ভাষার দ্বারা উহার পরিপুষ্টি সংসাধিত হইয়া থাকে। এ বিষয়ে পালি বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে একটী গল্প উদ্ধৃত হইতেছে :—

মগধে কোন ব্রাহ্মণ বৃদ্ধ বয়সে পত্নীহীন হইয়া দারান্তর পরিগ্রহ করেন। নব পরিণীতা স্ত্রী বিবাহের কিছুকাল পরেই স্বামীকে বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ আমার ভাবী সন্তানগণের জন্য ক্রীড়ন দ্রব্য ক্রয় করিয়া আন। শিশুগণ মর্কট শাবকের সহ খেলিতে বড় ভাল বাসে। অতএব আমার ভবিষ্যৎ পুত্রগণের জন্য মর্কটশাবক ক্রয় কর"। পত্নীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন—"হে ভদ্রে আমাদের এখন কোন সন্তান সন্ততি নাই, যখন সন্তান জন্মিবে তখন ক্রীড়নক দ্রব্য কিনিয়া আনিব, এখন কিনিয়া কোন ফল নাই।" এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন—"তোমার কোন সাংসারিক জ্ঞান নাই। দেখ কিছুকাল পরে আমাদের অর্থ নিঃশেষ হইয়া যাইতে পারে। সংসারে তোমার আসক্তি কমিয়া যাইতে পারে এবং ক্রীড়নক দ্রব্যের প্রতি তোমার অনাদর জন্মিতে পারে। অতএব তুমি এখনই মর্কট শাবক ইত্যাদি ক্রীড়নক দ্রব্য কিনিয়া রাখ।" ব্রাহ্মণীর তীব্র যুক্তি দ্বারা পরাস্ত হইয়া ব্রাহ্মণ তখনই বিপণি হইতে মর্কটশাবক

ইত্যাদি কিনিয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণী তখন বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ তুমি এখনই কোন শিল্পকারের নিকট গমন করিয়া এই মর্কটটী আমাদের ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া আন। মর্কটের লেজের প্রয়োজন কি? ইহার লেজ কাটিয়া ফেলিতে হইবে। চক্ষুঃ আরও বিশাল করিতে হইবে। ইহাকে চরণের উপর দণ্ডায়মান করিতে হইবে। মস্তকের কেশ আরও দীর্ঘ করিতে হইবে।" ব্রাহ্মণীর আদেশ অনুসারে ব্রাহ্মণ শিল্পকারের নিকট গমন করিয়া মর্কটটীকে যথোক্ত ভাবে গড়িতে বলিলেন। শিল্পকার বলিল—"মহাশয় সজীব মর্কট কি গড়া যায়? লেজ কাটিলে ইহা মরিয়া যাইবে। মস্তকে নূতন কেশ রোপণ করিতে গেলেই মস্তিষ্কের বিকৃতি হইবে। চক্ষুর ছিদ্র বিশালতর করিতে হইলেই ইহা দৃষ্টি শক্তি বিহীন হইয়া পড়িবে। ইহাকে সরল ভাবে চরণের উপর দণ্ডায়মান করিলেই ইহা প্রাণ ত্যাগ করিবে। অতএব মহাশয়, যদি আপনার মর্কটটী জীবিত রাখিতে চান তাহা হইলে আমাকে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিবর্ত্তন করিতে বলিবেন না। কাষ্ঠ, প্রস্তর, লৌহ বা অন্য কোন নির্জ্জীব ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত মর্কট লইয়া আসুন, এখনই উহাকে ইচ্ছানুরূপ গড়িয়া দিতেছি।" শিল্পকারের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ গৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণীর নিকট সমস্ত বিজ্ঞাপন করিলেন। তখন ব্রাহ্মণী বলিলেন—"হে ব্রাহ্মণ এখনই প্রস্তরের মর্কট কিনিয়া শিল্পকার দ্বারা উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইচ্ছানুরূপ পরিবর্ত্তন কর, উহা দীর্ঘকাল গৃহে রাখিতে পারিবে। যখন প্রয়োজন হয় তখনই উহার ব্যবহার করিতে পারিব। কালের পরিবর্ত্তনে উহার পরিবর্ত্তন হইবে না"। ব্রাহ্মণীর কথা অনুসারে ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ বিপণি হইতে প্রস্তরের মর্কট কিনিয়া আনিয়া যথেচ্ছ গড়িয়া লইলেন।

উল্লিখিত গল্পের তাৎপর্য্য আমরা বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধেও প্রয়োগ করিতে পারি। সজীব অর্থাৎ কথোপকথনের ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত

করিয়া কোনই ফল নাই। সাহিত্যের নিমিত্ত একটী নির্জীব অর্থাৎ যাহার জীবন চিরকাল সমান থাকিবে এমন একটী ভাষার উদ্ভাবন কর। কথোপকথনের ভাষায় সাহিত্য লিখিলে প্রতি দশ বৎসর অন্তর উহার নূতন সংস্করণ না করিলে উক্ত সাহিত্য সাধারণের বোধগম্য হইবে না।

খাঁটি বাঙ্গালার পক্ষপাতিগণ।

খাঁটি বাঙ্গালার পক্ষপাতিগণের* মত উপরে সমালোচিত হইয়াছে। গত আষাঢ়ের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় রবীন্দ্র বাবুর মতের সমর্থন ও আমার মতের প্রতিবাদ করিয়া "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উপসংহার করিব। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের মর্ম্মার্থ এই—(১) যে সকল বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক সেই সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা বাঙ্গালা বৈয়াকরণের কর্ত্তব্য অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার অসাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয় করাই বাঙ্গালা ব্যাকরণের মুখ্য লক্ষ্য; (২) আর যে ভাষায় আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে কথবার্ত্তা কহি সেই ভাষায় সাহিত্য লেখা উচিত।

দীনেশ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার উত্তর প্রসঙ্গক্রমে এই প্রস্তাবে পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন; এ স্থানে এই মাত্র বক্তব্য যে বাঙ্গালা ভাষার অসাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে উহার স্বাধীন উদ্দাম গতির অনুসরণ করিলে চলিবে না। উদ্দাম বস্তুর গমনের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। অতএব তাঁহারা

---

* ব্যাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে ব্যাকরণ সম্বন্ধে কাহার কি মত তাহা আমি গত আষাঢ় মাসের প্রদীপ পত্রিকায় "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছি। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র বাবু ও দীনেশ বাবুর মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও প্রদত্ত হইয়াছে।

যদি উদ্দাম বাঙ্গালা ভাষার গতি নির্ণয় করিয়া সূত্র প্রণয়ন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন—তাহা তাঁহাদের দুরাশামাত্র। ভাষার গতি যতক্ষণ স্থির না হইবে ততক্ষণ উহার ব্যাকরণ প্রস্তুত হইতে পারে না। আমাদের মতে বাঙ্গালা ভাষার এখন আর উদ্দামতা নাই। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে উহার গতিস্থিতির কোন নিয়ম ছিল না বটে কিন্তু এক্ষণে উহা একরূপ স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাকরণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন বাঙ্গালা ভাষার গতি এখনও উদ্দাম আছে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়নের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। স্থির ভাষা লইয়া ব্যাকরণ প্রস্তুত করা যায়। অস্থির ভাষার ব্যাকরণ হইতে পারে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বোম্বায়ের বোরাজাতি।

বোম্বাই প্রদেশে "বোরা" অথবা "বোরি" নাম শুনিলে প্রথমেই সামান্য ফেরিওয়ালা বা মোট মাথায় "হুকার" মনে উদয় হয়। একটি ইংরাজ মহিলা ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে বোম্বায়ের কোন একটি বিশিষ্ট ভদ্র পরিবার বোরাজাতিভুক্ত। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বোরাগণ ব্যবসাপ্রধান জাতি। প্রকৃতপক্ষে এই জাতি যে বরাবরই এখনকার মত একটি মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল তাহা নহে; পূর্ব্বে তাহারা গুজরাট বা সিন্ধুদেশবাসী বোরা নামক এক হিন্দুজাতি ছিল, তৎপরে ইসলামের ধর্ম্মগ্রহণ করে।

করিয়া কোনই ফল নাই। সাহিত্যের নিমিত্ত একটী নির্জীব অর্থাৎ যাহার জীবন চিরকাল সমান থাকিবে এমন একটী ভাষার উদ্ভাবন কর। কথোপকথনের ভাষায় সাহিত্য লিখিলে প্রতি দশ বৎসর অন্তর উহার নূতন সংস্করণ না করিলে উক্ত সাহিত্য সাধারণের বোধগম্য হইবে না।

খাঁটি বাঙ্গালার পক্ষপাতিগণ।

খাঁটি বাঙ্গালার পক্ষপাতিগণের* মত উপরে সমালোচিত হইয়াছে। গত আষাঢ়ের ভারতীতে শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় রবীন্দ্র বাবুর মতের সমর্থন ও আমার মতের প্রতিবাদ করিয়া "বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তৎসম্বন্ধে একটী কথা বলিয়াই এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবের উপসংহার করিব। দীনেশ বাবুর প্রবন্ধের মর্ম্মার্থ এই—(১) যে সকল বিষয়ে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা হইতে পৃথক সেই সকল বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করা বাঙ্গালা বৈয়াকরণের কর্ত্তব্য অর্থাৎ বাঙ্গালা ভাষার অসাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয় করাই বাঙ্গালা ব্যাকরণের মুখ্য লক্ষ্য; (২) আর যে ভাষায় আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে কথবার্ত্তা কহি সেই ভাষায় সাহিত্য লেখা উচিত।

দীনেশ বাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার উত্তর প্রসঙ্গক্রমে এই প্রস্তাবে পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এ স্থানে এই মাত্র বক্তব্য যে বাঙ্গালা ভাষার অসাধারণ ধর্ম্ম নির্ণয় করিতে হইলে উহার স্বাধীন উদ্দাম গতির অনুসরণ করিলে চলিবে না। উদ্দাম বস্তুর গমনের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম নাই। অতএব তাঁহারা

---

* বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে ব্যাকরণ সম্বন্ধে কাহার কি মত তাহা আমি গত আষাঢ় মাসের প্রদীপ পত্রিকায় "বাঙ্গালা ব্যাকরণ" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছি। সেই সঙ্গে রবীন্দ্র বাবু ও দীনেশ বাবুর মতের সংক্ষিপ্ত সমালোচনাও প্রদত্ত হইয়াছে।

যদি উদ্দাম বাঙ্গালা ভাষার গতি নির্ণয় করিয়া সূত্র প্রণয়ন করিতে অভিলাষ করিয়া থাকেন—তাহা তাঁহাদের দুরাশামাত্র। ভাষার গতি যতক্ষণ স্থির না হইবে ততক্ষণ উহার ব্যাকরণ প্রস্তুত হইতে পারে না। আমাদের মতে বাঙ্গালা ভাষার এখন আর উদ্দামতা নাই। কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে উহার গতিস্থিতির কোন নিয়ম ছিল না বটে কিন্তু এক্ষণে উহা একরূপ স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে উহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিশ্লেষণ করিয়া ব্যাকরণ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। যদি কেহ বলেন বাঙ্গালা ভাষার গতি এখনও উদ্দাম আছে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রণয়নের কাল এখনও উপস্থিত হয় নাই। স্থির ভাষা লইয়া ব্যাকরণ প্রস্তুত করা যায়। অস্থির ভাষার ব্যাকরণ হইতে পারে না।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

বোম্বায়ের বোরাজাতি।

বোম্বাই প্রদেশে "বোরা" অথবা "বোরি" নাম শুনিলে প্রথমেই সামান্য ফেরিওয়ালা বা মোট মাথায় "হুকার" মনে উদয় হয়। একটি ইংরাজ মহিলা ত কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে বোম্বায়ের কোন একটি বিশিষ্ট ভদ্র পরিবার বোরাজাতিভুক্ত। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে বোরাগণ ব্যবসাপ্রধান জাতি। প্রকৃতপক্ষে এই জাতি যে বরাবরই এখনকার মত একটি মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল তাহা নহে; পূর্ব্বে তাহারা গুজরাট বা সিন্ধুদেশবাসী বোরা নামক এক হিন্দুজাতি ছিল, তৎপরে ইসলামের ধর্ম্মগ্রহণ করে।

বোরাদিগের ধর্ম্মের উৎপত্তি আমূল বিবৃত করিতে গেলে অনর্থক জটিলতায় মগ্ন হইতে হইবে, তবে মোটামুটি বলা যাইতে পারে তাহারা ইস্মায়লী সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ। তাহা হইলেই বলা হইল যে তাহারা বৃহত্তর শিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মুসলমানদের দলাদলির প্রধান কারণ উত্তরাধিকার সম্বন্ধীয় মতভেদ, কোন ধর্ম্মগত বা শাস্ত্রগত মতভেদ তত নহে। এই সম্প্রদায় সম্বন্ধেও সে কথা খাটে। ধর্ম্মগত মতভেদ যাহা কিছু আছে তাহা একই শাস্ত্রবচনের ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধ প্রসূত ;—কোরান অবশ্য সকল মুসলমান সম্প্রদায়েরই এক মূল শাস্ত্র। কিন্তু বর্ত্তমানকালে মুসলমান জাতি অতি দূর সম্পর্কীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যথা,—

মুসলমান

(মহম্মদের উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে মতভেদ)

সুন্নি | শিয়া

(আলির ত্রয়োদশ উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে মতভেদ)

ইস্মায়লী
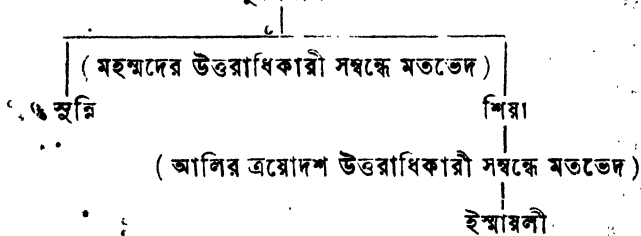
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বোরাগণ এই ইস্মায়লী সম্প্রদায়ের অংশবিশেষ। কিন্তু কথায় বলে ইতিহাসে পুনরাবৃত্তির শেষ নাই ;—এই স্বল্পকাল হইল,—আন্দাজ দুই শতাব্দী পূর্ব্বে,—বোরাদিগের মধ্যেও আবার দুই দল হইয়াছে, দাউদী এবং সুলইমানী। এই দলাদলির কারণ "দায়ী" পদের উত্তরাধিকারী সম্বন্ধে মতভেদ। "দায়ী" অর্থে গুরু বা ধর্ম্মনেতা। কিন্তু ধর্ম্মমত পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে যে পরিমাণ বলের প্রয়োজন, তাহা ভারতবর্ষীয় বোরাগণের কখনও হয় নাই। আরব্যদেশে তাহাদের গুরু ক্ষমতাশালী, এবং একটি বৃহৎ প্রদেশের অধীশ্বর। যদিও তাহারা শিয়া, কিন্তু প্রথম তিন খলিফকে মহম্মদের

স্থায্য উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকার করা ব্যতীত অন্যান্য সব বিষয়েই তাহারা সুন্নিদিগের অনুরূপ। ফলে এদেশে তাহারা সহজেই সুন্নির সহিত মিলিয়া মিশিয়া যায়।

ভারতবর্ষীয় সাইক্লপীডিয়া বা বিশ্বকোষে বলে ;—"বোরাগণ গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ ও নিরীহ, এবং সাধারণ ইংরাজ অপেক্ষা মাথায় লম্বা।" শেষ কথাটা ঠিক কি না সন্দেহ,—তবে ইহা সত্য বটে যে বোরাগণ কর্ম্মিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ, এবং শান্ত ও নিবিষ্টভাবে আপনার ব্যবসার অনুশীলন করিয়া থাকে। তাহাদের বাহ্যাকৃতির প্রধান লক্ষণ লম্বা দাড়ি এবং সামান্য শাদা কাপড় ও পাগড়ি। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত বড়লোক ছোট লোক সকলেরই এক কাপড় ছিল,—কেবল পরিচ্ছন্নতার মাত্রায় যা কিছু প্রভেদ। বেশভূষার ঐক্য অর্থাৎ কাজ কর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও পদমানের ঐক্য,—তাহাতে সমাজের শৈশব অবস্থা প্রকাশ পায়। আজকাল সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সামান্য চিহ্নও বৃহৎ ব্যাপারের সূচনা করে। কলম্বস যেমন সমুদ্রের জলে কতকগুলি তাজা পাতা ভাসিতে দেখিয়া ভূখণ্ডের সান্নিধ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তেমনি বেশ পরিবর্ত্তন হইতেও মহত্তর ভাবের আভাস পাওয়া যায়,— যথা, সমাজে নূতন প্রাণের সঞ্চার ; পরিবর্ত্তণ ও উন্নতির আবশ্যকতা অনুভব,—(ইহাই সকল শিক্ষার প্রথম পাঠ ;) তৎসঙ্গে অপরের চক্ষে নিজেদের দেখিতে পারা, এবং অপরে কোন্ কোন্ বিষয়ে আমাদের অপেক্ষা ভাল তাহা বুঝিবার ক্ষমতা।

বোরাগণ মিশুক ও সামাজিক প্রকৃতির লোক। সে জন্য সমাজ ও ধর্ম্মঘটিত প্রধান যে একটি বিষয়,—স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা বা পরদা,—সে সম্বন্ধে যতক্ষণ না চোখে আঙ্গুল দিয়া বিশেষরূপে তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়—তাহারা বড়ই শিথিল ছিল, পূর্ব্বে বোরা মহিলাগণ তাঁহাদের আপনার "মহল্লা"র

পরদা রক্ষা করিয়া চলা নিতান্তই অসঙ্গত জ্ঞান করিতেন, এবং তাঁহাদের স্বধর্ম্মী সকলেই ভ্রাতৃনামে আহূত ও গৃহকর্ত্রী সন্দর্শনে কৃতার্থ হইতেন। আত্মীয়তার সীমানা এতদূর বিস্তৃত হইলে স্বভাবতঃই বন্ধুবান্ধবও ক্রমশঃ তাহার অধিকার সকল লাভ করিতে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আজকাল এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। যখন বোরাজাতির বিস্তার এবং বাসস্থান ও কাজকর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল, তখন আর পরদা সম্বন্ধে এরূপ অযত্ন শৈথিল্য টিঁকিল না। অবশ্য নানান নূতন ভাব ও যুক্তির প্রভাবে পূর্ব্ব প্রচলিত প্রথায় তাহারা অসন্তোষ ও অশান্তি অনুভব করিয়া থাকিবে। কিন্তু এতদিনের নিরবচ্ছিন্ন মেলামেশা ও স্বাধীনতার ফলে বোরারমণী-দের মধ্যে একটি চরিত্রবল ও আত্মনির্ভরের ভাব জন্মিয়াছিল। এখনও "বুর্খা" আবৃত বোরারমণী যেরূপে রাস্তায় যাতায়াত করেন তাহাতে সে ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতেই হইবে যে তাঁহাদের গন্তব্যস্থান হিসাবমত দুইটির বেশী নয় ;—(১) গোরস্থান, এবং (২) ষ্টেসন। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, ইহা সত্য যে কড়াকড় পরদার শাসনের ফল যে অস্বাভাবিক অতিলজ্জা, তাহা বোরারমণীতে অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহা এই সমাজের একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য এবং অনুকরণ যোগ্য বিষয়। অন্যান্য মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ সম্বন্ধে বোরাদিগের এত তফাৎ কেন? তাহার কারণ (১) বোরগণ ব্যবসাপ্রধান জাতি, অনেক সময়ে স্ত্রী পুত্র বন্ধুর জিম্মায় রাখিয়া দেশ ভ্রমণে বাহির হইতে হয়। (২) স্বামীর অনুপস্থিতিকালে স্ত্রীকেই তাঁহার সব কাজকর্ম্মের ভার বহন করিতে হয়। (৩) প্রতি সহরে বোরার সংখ্যা এত অল্প, যে প্রায়ই সকলে একই "মহল্লা"র অন্তর্গত, সুতরাং পরস্পরের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে বাধ্য। (৪) আপনাআপনির মধ্যে

বহুকাল যাবৎ বিবাহাদি প্রযুক্ত ছেলেমেয়েরা ছোটবেলায় একত্রে খেলাধূলা করিয়া থাকে,—এবং ভবিষ্যৎ জীবনে সে বন্ধন সহজে ছেদন করা যায় না। (৫) প্রায় সকলেই বিবাহসূত্রে পরস্পরের সহিত জ্ঞাতিসম্পর্কে আবদ্ধ। এই সকল কারণে বোরারমণীগণ নিতান্ত দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক নহেন,• বরঞ্চ বিলক্ষণ স্বাধীনচেতা এবং নিজ সাংসারিক বুদ্ধি ও আশুপরিণত চরিত্রবলে স্বামীর সহিত সমকক্ষভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প আছে,—অনেক বৎসর পূর্ব্বে, রেলওয়ের আমলের আগে, ক্যাম্বে-নিবাসী একটি ভদ্রলোকের সহিত বোম্বায়ের একটি বোরারমণীর বিবাহ হয়, এবং একদিন স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তিনি বাপের বাড়ী চলিয়া যাইবেন বলিয়া শাসান। স্বামীটি আসলে লোক ভাল, কিন্তু বোরাজাতিসুলভ জিদ্ বশতঃ এই শাসানো অগ্রাহ্য করেন; মনে দৃঢ় বিশ্বাস এই যে ক্যাম্বে হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত যাওয়া কোন রমণীর কর্ম্ম নহে, বিশেষতঃ স্বামীর অমতে বা অজ্ঞাতসারে। কিন্তু সে তাঁহার নিতান্তই মনের ভ্রম। স্ত্রীটি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই করিলেন,—বোম্বাই অভিমুখে রওনা হইয়া স্বামীর নিকট প্রমাণ করিয়া দিলেন যে তিনি স্বপক্ষ সমর্থনে সক্ষম, এবং স্বামীটি পত্রপাঠ তাঁহার অনুধাবন করিয়া মানভঞ্জন করিতে বাধ্য হইলেন।

উল্লিখিত স্বাতন্ত্র-অবলম্বিনীটি কোন্ কোন্ বিষয়ে শিক্ষা পাইয়াছিলেন;—একমাত্র কোরাণ, এবং হয়ত অল্পস্বল্প গুজরাটী। এই যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করিয়াও যে বোরারমণীর গৃহে এত আধিপত্য তাহার কারণ "জ্ঞানই ক্ষমতা"। বোরাপুরুষগণ লেখাপড়ার বড় ধার ধারে না। তাহাদের যা' কিছু শিক্ষা সে বাস্তব জীবনক্ষেত্রে পাইয়া থাকে, পুস্তক হইতে পায় অতি কম। তাহাদের ব্যবসাই তাহাদের শিক্ষালাভের প্রধান উপায়। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের পুরাকালীন

ফেরিওয়ালাদের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ওয়র্ডস্‌ওয়ার্থের "এক্সকর্শন্‌" নামক কবিতার নায়কের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় ঐরূপ ব্যবসা কবিতে গিয়া তাহারা পর্য্যবেক্ষণ শক্তির চালনা ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা কবিবার কত সুযোগ পায়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যদিও বোরাগণ আরবী অক্ষর চেনে, এবং যদিও গুজরাটীতে হিন্দুস্থানীতে খুব কাছাকাছি সম্পর্ক, তবুও তাহারা তখনকাব বিস্তৃততর হিন্দুস্থানী সাহিত্য আয়ত্ত করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করে নাই। এখন গুজরাটী সাহিত্য হিন্দুস্থানীকে অনেক অতিক্রম করিয়াছে, কিন্তু ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থা সেরূপ ছিল না। অবশ্য হিন্দুস্থানী সাহিত্যের সার সংগ্রহ করিতে কোন হিন্দুস্থানিবাসীবই কষ্ট হইত না, তাহার উপর বোরাগণ ত মুসলমান এবং আববী অক্ষরের সহিত এতটা পরিচিত যে দিনে অন্ততঃ একবার করিয়া কোরাণ পাঠ করিতে পারে। কিন্তু তাহাদের সে দিকে কোন ঝোঁক ছিল না, কিম্বা এই নূতন শিক্ষালাভে উত্তেজিত করিবার পক্ষে বুদ্ধিবল যথেষ্ট ছিল না। এখন সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে—একবার সুবিধা বুঝিতে পারিয়া এখন আর সুলইমানী বোরাগণ হিন্দুস্থানী ভাষায় দখল পাইবার সুযোগ অবহেলা করেন না। এমন কি আজকাল বোম্বাই সহরে ত অন্ততঃ গুজরাটী অপেক্ষা হিন্দুস্থানী ভাষাই সুলইমানীদের মধ্যে বেশী প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

বোরাজাতির মত ও বিশ্বাস এবং সমাজতন্ত্র এমন অনন্যসাধারণ যে কার্য্যগতিকে এইরূপে নানা লোকের সহিত সংস্রবে আসা তাহাদের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা না হইলে ধর্ম্মগত স্বাতন্ত্র্য-প্রভাবে হয় ত তাহাদের মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িত। এদেশেও তাহাদের সমাজের যেরূপ বিস্তৃতি তাহাতে অন্য সমাজের মুখাপেক্ষা করিতে হয় না, কিন্তু অপরপক্ষে মানসিক উন্নতি এবং ভাববিস্তারেরও যথেষ্ট

সহায়তা করে না। য়ুরোপীয় জাতির মধ্যেও ত জাতিগত কুসংস্কার লক্ষিত হয়। এত মেলামেশা সত্ত্বেও বোরাগণ যেন একটু তফাৎ তফাৎ থাকে। যেমন প্রটেষ্টাণ্ট দেশে দেখিতে পাওয়া যায় কোন একটি জেশুয়িট সকলের সঙ্গেই বন্ধুভাবে মেশে, ও পাণ্ডিত্যক্ষেত্রে সমভাবে আলাপ পরিচয় করিয়া থাকে, কিন্তু সমস্তক্ষণ মনে মনে জানে নিজে একজন অসাধারণ লোক,—মনের একটি কোনে ছিপি আঁটিয়া রাখে, সকল মনোভাবের ভিতরে ভিতরে তাহার একটি প্রচ্ছন্ন ভাব থাকিয়া যায়। বোরাগণেরও ধর্ম্মানুষ্ঠান পূজার্চ্চনা প্রভৃতির জটিল "জমায়েৎ" প্রণালী তাহাদের মন ও সময়ের এতটা অংশ অধিকার করিয়া রাখিত, যে তাহাদের কতকটা এইরূপ গর্ব্বভাব ছিল।

আমি অতীতকাল হিসাবে এই সব বলিতেছি, কারণ বর্ত্তমানে বহুৎ পরিবর্ত্তনের সময় উপস্থিত। আভ্যন্তরিক নানা ঘটনাচক্রে, যাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে, এবং বাহ্যিক নানা ঘটনাচক্র যাহা সকলেরই দৃষ্টিগোচর, এবং যাহার কারণ ইংরাজরাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবহার, য়ুরোপীয় জ্ঞানালোকের সহিত সংস্রব, ও একটি সম্পূর্ণ বিদেশী জাতির সংঘর্ষের দরুণ সকল ভারতবাসীর মধ্যে যে ঐক্যভাব জন্মিয়াছে, তাহাই,—এই সব মিলিয়া এখানকার বোরাদিগকে চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেকার বোরাজাতির সহিত বিস্তর তফাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু তবুও যতই নব্যতন্ত্রের সৃষ্টি হউক না কেন, যতদিন বোরাদিগের বিশেষ বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের লেশ মাত্র বজায় থাকিবে, তত দিন এই জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের বিশেষত্বও থাকিবে। কারণ প্রথমতঃ বোরাগণ অল্প দিনের মধ্যে যে অপর কোন জাতির সহিত ঘন ঘন বিবাহাদি করিবে তাহা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ "দায়ী" পদটি তাহাদের ঐক্যের একটা প্রধান সহায় ও তাহাদের

বন্ধনের প্রকৃত কারণ,—বোরাগণের ধর্ম্মমত সম্পূর্ণ লোপ না পাইলে তাহা কখনো লুপ্ত হইতে পারে না। অপর পক্ষে "দায়ী" পদ বোরাদিগের দৈনিক সাংসারিক জীবনক্ষেত্র হইতে এতই সুদূরে অবস্থিত যে তাহাদের উপর নামমাত্র প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। যদি আর সব বন্ধন ছিন্ন হয় তাহা হইলে অবশ্যই সে বন্ধন তাহাদের তখনো একত্রে বাঁধিয়া রাখিবে। কিন্তু বর্ত্তমানে দৈনিক জীবনের সামাজিক রীতিনীতিই ঐক্যসাধনে কার্য্যতঃ অধিকতর ফলদায়ক। যথা, পূর্ব্বোল্লিখিত অবরোধ প্রথার শৈথিল্য।

এই পর্য্যন্ত আমরা সাধারণ বোরাজাতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সুলাইমানী ও দাউদী এই দুই দলে বিভক্ত হওয়া এত অল্প দিনের কথা যে তাহাতে বিশেষ কোন পার্থক্য ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু আকস্মিক ঘটনাচক্রফলে প্রথম দলটি শেষোক্তটিকে অনেক অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। দৈবক্রমে এই সুলইমানী বোরাদিগের একজন, ভারতবাসী মুসলমানের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম নিজ পুত্রকে কার্য্যোপলক্ষে শিক্ষালাভের জন্য বিলাত প্রেরণের সুবিধা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই নির্ভীক আচরণের ফলাফল কিরূপ সুদূর বিস্তৃত হইল। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষীয়গণ সর্ব্বপ্রথম জেতৃজাতীয় শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণের সহিত অবশ্যম্ভাবী ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলেন। এবং উভয়পক্ষ পরস্পরকে অনুকূল অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ভারতবাসীর নিকট যে সকল নূতন ভাব অলক্ষিত ও সুসঙ্গতরূপে ধরিয়া দেওয়া হইল তাহা তাহার তরুণ মন স্বচ্ছন্দে আত্মসাৎ করিল, অথচ এ দেশে জানিয়া বুঝিয়া ইংরাজের নকল করিতে গেলে যেরূপ হীনতা স্বীকার করিতে হয়, সেরূপ কিছুই আবশ্যক হইল না। অপর পক্ষে ভারতবর্ষে "সাব লোক" যেরূপ উদ্ধতমূর্ত্তি ধারণ করিতে কতক পরিমাণে বাধ্য হ'ন, স্বদেশে সেরূপ নহে। বিলাতে এইরূপ সমভাবে

চলিবার অভ্যাস হওয়াতে এদেশে আসিয়াও ভারতবাসী সেই সমকক্ষতা দাবী করিতে সাহস পান, এবং ইংরাজও দেখিয়া আশ্চর্য্য হ'ন যে তাঁহার সে দাবীর বিরুদ্ধে কিছু আপত্তি তুলিবার যো নাই।

এই নূতন পন্থার প্রধান প্রদর্শক শ্রীযুক্ত তায়েবালি ভাই মিঞা। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি আপন পুত্র কমরুদ্দিন তায়েবজী মহাশয়কে বিলাতে পাঠান তখন কি এই সকল যুক্তি তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল? তাঁহার কার্য্যের সমুদায় ফলাফল তিনি অবগত ছিলেন বলিলে অত্যুক্তি বোধ হইতে পারে, কিন্তু যে সকল কার্য্যের দরুণ তাঁহার ও তাঁহার বংশের নাম আধুনিক ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম নামের মধ্যে উচ্চ স্থান পাইয়াছে, সেই সব কার্য্যের অস্পষ্ট স্মৃতি হইতে ও যাহারা তাঁহার অদ্ভুত মাহাত্ম্যের পরিচয় পাইয়াছে, তাহাদের নিকট ইহা অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হইবে না। কিন্তু এ কথা লইয়া তর্কবিতর্ক করা বৃথা;—যদি জানিয়া লওয়া যায় যে তিনি এই কার্য্যের ফলাফল তখন সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারেন নাই, তাহা হইলে ত আমরা দেখিয়া অধিকতর বিস্মিত হই যে স্বাধীন পন্থা অবলম্বন করিতে তাঁহার কতকটা সাহস দরকার ছিল, এবং শিক্ষা সম্বন্ধে নিশ্চয়ই তাঁহার নিতান্ত উৎসাহ ও প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। সে বিশ্বাস অর্থলোভ প্রণোদিত নহে, চতুর্দ্দিকের দৃষ্টান্তে ও অনিবার্য্য ভাবে উৎপাদিত নহে, সাধারণ মত প্রভাবেও গঠিত নহে। "স্বতঃশিক্ষিত" বলিতে যাহা বুঝায়, তিনি নিজেই সম্পূর্ণ অথচ শ্রেষ্ঠ ভাবে তাহাই ছিলেন, এবং উচ্চপদলাভোদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন লোকও তিনি পূর্ব্বে দেখেন নাই।

একটি বিখ্যাত রোমান একবার বলিয়াছিলেন যে স্বয়ং ধনবান হওয়া অপেক্ষা, ধনবান লোকের উপর কর্তৃত্ব করাটাই তিনি বেশি পছন্দ করেন। সেইরূপে তায়াবালি মহাশয় (পরে তাঁহার নাম হইল তায়াবজী) যিনি অনেকটা অজ্ঞাতসারে নিজ বংশের ভবিষ্যৎ গৌরবের

কারণ হইয়াছিলেন, তিনিও হয়ত আপনি বড়লোক হওয়া অপেক্ষা একটি উচ্চ কুলের আদিপুরুষরূপে খ্যাতি লাভ করা শ্রেয় বোধ করিতেন।

কমরুদ্দিন মহাশয় এ দেশের সর্ব্বপ্রথম সলিসিটর হইলেন। সেই সময়ে তাঁহাকে শপথ করানো সম্বন্ধে একটু গোলযোগও বাধিয়াছিল। এই উপলক্ষে "পঞ্চ্" পত্রিকা যে মন্তব্য করেন তাহা এই;—লর্ড ক্যাম্বেল ও তাঁহার সহযোগীগণ এ বিষয়ে যে সুযুক্তিসঙ্গত রায় দিয়াছেন, তাহাতে অ্যাটর্নি মাত্রকে খৃষ্টান মনে করা স্বরূপ যে অদ্ভুত বিড়ম্বনা ছিল তাহার শেষ ভগ্নাবশেষ লুপ্ত হইল"! আইন ব্যবসায়ীগণ প্রথম প্রথম যে সকল বাধাবিপত্তির দরুণ অনেক সময়ে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হ'ন, কমরুদ্দিন মহাশয়ের সেরূপ বড় কিছু হইয়াছিল বলিয়া ত বোধ হয় না; উত্তরোত্তর তাঁহার খ্যাতি ও পসার বাড়িতে লাগিল।

এক পুত্র এইরূপ শীঘ্র ও বিশিষ্টভাবে কৃতী হইবার পর অবশ্য তায়াবালি মহাশয় আর এক পুত্রকে পাঠাইতে বেশি ইতস্ততঃ করিলেন না। অনতিবিলম্বে তিনি বদ্রুদ্দিন তায়াবজী মহাশয়কে ব্যারিষ্টার হইবার উদ্দেশ্যে বিলাত পাঠাইলেন। এবং আর এক পদ অগ্রসর হইয়া এইবার তাঁহাকে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার মানস করিলেন। বদ্রুদ্দিন মহাশয় সে শিক্ষার প্রারম্ভেই যেরূপ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে ভবিষ্যতে ভাল রকম জয় লাভ করিবার খুবই সম্ভাবনা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু মস্তিষ্কের অতিরিক্তচালনা বশতঃ তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল; সে সময়ে একজন ডাক্তার তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন যে বিলাতে পৌঁছিয়া প্রথম আঠারো মাস তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন তাহা কোন মস্তিষ্কে সহ্য হওয়া অসম্ভব। অতঃপর অবশ্য তাঁহাকে অগত্যা নিবৃত্ত হইতে হইল,—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভের জন্য এতটা আগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাহাতে বঞ্চিত হইলেন।

বদ্রুদ্দিন মহাশয়ের বৈলাতিক শিক্ষা প্রায় সাঙ্গ হইলে পর তবে আর একজন ভারতবাসী ঐ উদ্দেশ্যে বিলাত যাত্রা করিলেন,—কলিকাতার বাঁড়ুয্যে মহাশয়। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে তায়াবালি মহাশয়ের প্রথমোদ্যম এত সফল হইবার পরেও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা তখনকার কালে কত কঠিন ছিল। ফলতঃ বিলাতে শিক্ষিত সর্ব্বপ্রথম দুই ভারতবাসী তায়াবজী মহাশয়ের পুত্রদ্বয়।

ইহাতে বোরাজাতি অবশ্য উন্নতির পথে যথেষ্ট অগ্রসর হইল, কিন্তু তাহাদের সমাজ এত সঙ্কীর্ণ এবং অনেকের অবস্থা ও ক্ষমতা এত সামান্য, যে তাহারা এই নূতন ও আশু ফলদায়ক পরীক্ষার যথেষ্ট সদ্ব্যবহার করিতে পারিল না। সৌভাগ্যক্রমে ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতি ততটা পশ্চাৎপদ হইলেন না। এবং এখনও বেচারি বোরাগণ আর সকলের বহু পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে।

যদিও মুসলইমানীগণ ভারতের এই বৃহৎ ও নূতন উদ্যোগের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারে, কিন্তু সে অহঙ্কারে তাহারা ভোলে নাই যে নিজের সমাজের কি কি অভাব আছে, এবং নিজেদের হয়ত এখনও কতকাল কি সামান্য অবস্থায় থাকিতে হইবে। তাহাদের মধ্যে হয়ত দুই একজনের বিলাতে উচ্চ শিক্ষালাভ করিবার মত অর্থবল আছে, কিন্তু এই গরীব ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের এমন সংস্থান নাই যে ছেলেকে যৎসামান্য লেখাপড়াও শিখাইতে পারে, এবং তাহাদের সে অভিজ্ঞতাও নাই যাহাতে শিক্ষিত লোকের ন্যায় অন্ততঃ শিক্ষার অর্থকরী মর্য্যাদাও বুঝিতে পারে। এইরূপ সম্প্রদায়ের পক্ষে দাতব্য শিক্ষার উপায় করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। এবং "সারময়া" নামক অনুষ্ঠানে তাহাই করা হইয়াছে,—সেরূপ আরও অনুষ্ঠান হওয়া খুব দরকার। আন্দাজ ত্রিশ বৎসর হইল ইহা স্থাপিত হইয়াছে, এবং আপাততঃ জমায়তের ত্রিশতাধিক দরিদ্র

বালক সেখানে আশ্রিত, প্রতিপালিত ও বিনাপয়সায় শিক্ষিত হইয়া থাকে।

ইহাতে কেবল একদিকেই এই পরীক্ষার ফলাফল দেখা গেল,—শিক্ষার উপর তাহার প্রত্যক্ষ প্রভাব। বলা বাহুল্য অন্যান্য সব দিকেও উন্নতি হইতে লাগিল, নানা লক্ষণে তাহা প্রকাশ পায়।

ইংরাজরা কথায় বলে "ঈটন স্কুলের ক্রীড়াক্ষেত্রেই ওয়ার্টলুর যুদ্ধ জয় হয়।" শান্তিপ্রিয় বোরাগণের এমন কোন সাধারণ খেলা নাই যাহা নিজস্ব বলিতে পারে। গুলিডণ্ডা, "আসক বাসক" ও প্রধানতঃ "আট্যা পাট্যা"ই খেলা হইত বটে, কিন্তু অতি অল্পই; মোটের উপর বলিতে হইবে যে এই জাতি পুরুষালা খেলাধূলায় পটু নহে। তাহার কারণ প্রথমতঃ তাহারা ব্যবসাজীবী এবং কার্য্যগতিকেই অনেকটা বাহিরে বাহিরে ঘুরিতে হয়, দ্বিতীয়তঃ এই সকল খেলা এপর্য্যন্ত ধনাদিগের বেশি অধিকারে ছিল, কেবল সম্প্রতি সকলেরই আয়ত্তের মধ্যে আসিতেছে। যাহা হউক, আজকাল ইংরাজ সংস্পর্শের কল্যাণে বোরাদিগের মধ্যে নূতন ভাবের প্রভাব বিস্তার হইতেছে, এবং খেলা প্রভৃতিতে তাহাদের উদ্যমের নূতন পথ খুলিয়া দিতেছে, ফলে তাহাদের স্বভাবেও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে।

বোম্বায়ে মুসলমানদিগের যে সকল বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে তাহা সকলেরই নজরে পড়িবে;—আঞ্জুমান ইস্‌লাম ইস্কুল (তিন বিভাগ)—আঞ্জুমান ইসলাম লাইব্রেরি, ইস্‌লাম ক্লাব্, এবং ইস্‌লাম জিমখানা। প্রথম তিনটি সর্ব্বপ্রধান সুলইমানী পরিবার দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত, এবং শেষোক্তটি অন্যগুলি হইতে প্রসূত।

ইহা হইতে স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম হইতেছে, যে যদিও সুলইমানী-সমাজে জনসংখ্যা অল্প, তবু বোম্বায়ে সমস্ত মুসলমান ধর্ম্মীর উপর তাহার প্রভাব অত্যন্ত অধিক।

কেহ কেহ হয়ত আশ্চর্য্য হইতে পারেন যে এমন সকল জাজ্জ্বল্যমান কীর্ত্তিসত্ত্বেও এই সমাজ লোকের নিকট এত কম পরিচিত কেন,— তাহার কারণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাহারা কিছুই হস্তক্ষেপ করে না, এবং আজকাল রাজনীতিচর্চ্চা ও ধনসম্পত্তি, এই দুয়েতেই সমাজ-বিশেষকে লোকের চক্ষের সমক্ষে আনিয়া দেয়। সুলইমানী বোরাগণের এই দুই বিষয়েরই একান্ত অভাব। পূর্ব্বোল্লিখিত বিশ্বকোষে বলে :—"তাহারা রাজনৈতিক কৌশল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, উদার-চেতা, মুক্তহস্ত, এবং আরব্য বা পারস্যজাত মুসলমান অপেক্ষা নগরবাসী হিসাবে সমধিক শ্রেষ্ঠ।"

শ্রীহাসান তায়েবজী।

মহারাজ রাজবল্লভ ও তাঁহার সমকালবর্ত্তী বঙ্গীয় হিন্দুসমাজ।

(আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।)

মুসলমান শাসনের অন্তিম সময় বাঙ্গালার ইতিহাসের একটি বিপ্লবপূর্ণ যুগ। এই যুগে যে সমস্ত প্রধান রাজপুরুষ বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে মহারাজ রাজবল্লভ সেন অন্যতম। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার এক ক্ষুদ্র পল্লীতে রাজবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পল্লী এক সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইয়া "রাজনগর" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ বিক্রমপুর পরগণার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া "কীর্ত্তিনাশা" নামে যে স্রোতস্বতী প্রবহমান আছে, প্রায় ৩৫ বৎসর গত হইল "রাজনগর" ঐ স্রোতঃপ্রবাহের

কুক্ষিগত হইয়া অতীতের বিষয়ীভূত হইয়াছে। যে বংশে রাজবল্লভের জন্ম, তাহা বিক্রমপুরস্থ বৈদ্যসমাজের একটি সম্ভ্রান্তবংশ বলিয়া পরিগণিত। সেনপুম প্রদেশের রাজা শ্রীহর্ষসেন এই বংশের বীজ-পুরুষ। সুপ্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন, স্বনামখ্যাত ভরতমল্লিক, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন এবং বৈষ্ণবকবি কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই শ্রীহর্ষ সেনের উত্তরপুরুষ হইতে সমুদ্ভূত।

রাজবল্লভ অসামান্য প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিন। সামান্য "লাওয়ার" বিভাগের জমানবীশের পদ হইতে ক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া তিনি বিহার প্রদেশের শাসনকর্তৃপদে নিযুক্ত হন এবং অবশেষে মারকাশেমের নৃশংসতা ফলে মুঙ্গের দুর্গের উপরিভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে জাহ্নবীসলিলে জীবন বিসর্জ্জন করেন। রাজবল্লভের সর্ব্বোতোমুখী প্রতিভা একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল না। তদীয় জীবদ্দশায় বাঙ্গালা দেশে যে সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রবিগর্হিত প্রথা প্রচলিত ছিল, তিনি তাহার অধিকাংশের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া সৎসাহসের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন এবং যে সমস্ত বৈদিক যাগযজ্ঞ বহুকাল পর্য্যন্ত এতদ্দেশে অপ্রচলিত ছিল, তিনি তাহারও অনুষ্ঠান করিয়া স্বদেশে বৈদিক তত্ত্ব প্রচার বিষয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ সেন রাজবংশের অধঃপতনের পর হইতে যাবতীয় বৈদিক অনুষ্ঠান বাঙ্গালা দেশে অপ্রচলিত হইয়া পড়িয়াছিল। জগতের প্রাচীনতম সভ্যতার যে ইতিহাস একদা ভারতীয় আর্য্যগণের কণ্ঠস্থ ছিল, কালে বাঙ্গালাদেশীয় আর্য্যসন্তানগণ তাহা বিস্মৃতি সাগরে নিমগ্ন করিয়া দিয়া পৌরাণিক ধর্ম্মের আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। "পুরাণের" প্রভাবে বৈদিক সহজ ও সরল তত্ত্বসমূহ প্রহেলিকার কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং তত্ত্বজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কুসংস্কার জনসাধারণের

অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া তাহাদিগের চিত্তবিভ্রম উৎপাদন করিয়া দিয়াছিল। যে বেদ একদা ভারতীয় আর্য্যজাতির প্রত্যেক গৃহধর্ম্মাচরণে প্রযুক্ত হইত তাহা বাঙ্গালীর পক্ষে অপার্থিব ও দুর্জ্ঞেয় বস্তুতে পরিণত হইয়াছিল।

বাঙ্গালার এই তমসাচ্ছন্ন যুগে রাজবল্লভ বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতে কৃতসংকল্প হন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের কৃপায় "বেদ" এক্ষণে অনেকের অধিগম্য হইয়াছে। কিন্তু রাজবল্লভের সময় কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতই এবিষয়ের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই এবং সমগ্র বাঙ্গালাদেশে এমন একটি পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন না, যিনি বেদ ও বৈদিক যাগযজ্ঞ সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্রও অবগত ছিলেন। এতদ্দেশে "বৈদিক পুরোহিত" নামে এক শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। অপর সাধারণের ন্যায় তাঁহারাও তৎকালে বেদ ও বৈদিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। যিনি রাজবল্লভের বৈদিক পুরোহিত ছিলেন, তাঁহার নাম গোবিন্দ দেব চক্রবর্ত্তী। এই পুরোহিতের উত্তরপুরুষগণ এক্ষণে বিক্রমপুরের অন্তর্গত মসুরা গ্রামে বাস করিতেছেন। রাজবল্লভ যজ্ঞানুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়া প্রচুর অর্থ সহ গোবিন্দদেবকে কাশীধামে প্রেরণ করেন। গোবিন্দদেব যজ্ঞপ্রকরণ ও মন্ত্র সংগ্রহ করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, তিনি যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন। গোবিন্দদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার স্মৃতিভূষণ মহাশয় বলেন, তদীয় বৃদ্ধ প্রপিতামহের স্বহস্ত লিখিত পূর্ব্বোক্ত পদ্ধতি অদ্যাপি তাঁহাদের গৃহে বিদ্যমান আছে এবং এক্ষণে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় যে সমস্ত বেদসম্মত যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইতেছে তাহা এই গ্রন্থ লিখিত বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

রাজবল্লভের অনুষ্ঠিত যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোম, অত্যাগ্নিষ্টোম, বাজপেয় এবং কৌরিটকোণ যজ্ঞই সমধিক উল্লেখযোগ্য। কৌরিটকোণ যজ্ঞ

মুরশীদাবাদের সমীপবর্ত্তী কীরিটেশ্বরীর আলয়ে সম্পন্ন হইয়াছিল। অদ্যাপি এইস্থানে রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত এক শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ পাষাণময় শিবলিঙ্গ "রাজবল্লভেশ্বর" নামে আখ্যাত। "রাজবল্লভেশ্বর" এক্ষণে ভগ্নাবস্থাপন্ন। কথিত আছে, যে সময় রাজবল্লভ মুঙ্গের দুর্গের উপরিভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাগীরথী গর্ভে প্রাণত্যাগ করেন, তৎকালে এই শিবলিঙ্গ বিকট শব্দে বিদীর্ণ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

অগ্নিষ্টোম, অত্যাগ্নিষ্টোম এবং বাজপেয় যজ্ঞ রাজনগরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের সন তারিখ নির্ণয় করা সহজ-সাধ্য নহে। তবে, ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যে অগ্নিষ্টোম ও বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডগ্রামে রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত এক দেবমন্দির বর্ত্তমান আছে। এই মন্দির "ভূতনাথ দেবের মন্দির" নামে আখ্যাত। মন্দিরের প্রাচীর সংলগ্ন প্রস্তরে যে শ্লোক খোদিত আছে তাহা এই :—

প্রাসাদং স্বমকারয়ৎ পরমমুং শ্রীভূতনাথস্ত বৈ।
যেঽগ্নিষ্টোম মহাধ্বরাদি মযজত্তো বাজপেয়ী ক্ষিতৌ॥
দাতা শ্রীযুত রাজবল্লভ নৃপোঽম্বষ্ঠায় বিন্দার্য্যমা।
শাকে তর্ক মহীধ্র রাগে রজনীনাথে চ মাঘে সিতে॥

এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হইতেছে যে ১৬৭৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজবল্লভ কর্ত্তৃক ভূতনাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং ঐ সময়ের পূর্ব্বে তিনি অগ্নিষ্টোম বাজপেয় প্রভৃতি সুবৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৺কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত "ক্ষিতীশ বংশাবলী" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে নবদ্বীপাধিপতি কৃষ্ণচন্দ্র রায়ও অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। রাজবল্লভ এবং কৃষ্ণচন্দ্র সমসাময়িক লোক।

সমকালবর্ত্তী যে সমস্ত লেখক তাঁহাদের সম্বন্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা রাজবল্লভকে "অগ্নিষ্টোমী" ও "বাজপেয়ী" প্রভৃতি বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কৃষ্ণচন্দ্র যে কোন লেখক কর্ত্তৃক এইরূপ বিশিষ্ট সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছেন তাহা জানা যায় না। গোপাল কৃষ্ণের বিরচিত গ্রন্থে লিখিত আছে :—

"অগ্নিষ্টোম অত্যাগ্নিষ্টোম যজ্ঞকারী।
মহারাজ রাজবল্লভ দাতা শুদ্ধচারী॥"

ফলতঃ যে সময় রাজবল্লভ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তৎকালে উহা বাঙ্গালা দেশে সাতিশয় অভিনব ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং কৃষ্ণচন্দ্রের যজ্ঞানুষ্ঠানের সময় ঐ অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইয়াছিল।

কেহ কেহ বলেন, অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রাজবল্লভ বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফলসা গ্রামে লালা রামগতির নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন; তৎকালে রামগতি কার্য্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া তিনি বিদুষী কন্যা আনন্দময়ীকে ঐ প্রমাণ ও প্রতিলিপি লিখিয়া দিবার নিমিত্ত আদেশ করেন; আনন্দময়ী দেবী অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের প্রমাণ ও যজ্ঞকুণ্ডের প্রতিলিপি লিখিয়া দিলে, তদনুসারে রাজবল্লভের যজ্ঞকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়াছিল। এই উক্তির মূলে মোটেই সত্য নিহিত নাই তাহা কয়েকটি অবস্থা লক্ষ্য করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে। রামগতির পিতা শ্রীশ্রীরামপ্রসাদ জ্ঞাতি সম্পর্কে রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। টমসন সাহেবের রিপোর্টে * লিখিত আছে যে রাজবল্লভের মৃত্যুর পর

* With respect to the Taluque in Buzrugumedpore claimed by the petitioner it appears that it was Malgoozari land subject to the assessment of Pargana during the lifetime of Rajballab and rendered Lakhiraj after his death in the Bengal year 1192 by the late

লালা রামপ্রসাদ রাজবল্লভের ত্যক্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিয়াছেন। শ্রীখণ্ডের দেবমন্দিরে যে শ্লোক খোদিত আছে তাহার সহিত রাজবল্লভের জন্মের সময় ঐক্য করিলে সিদ্ধান্ত হয় যে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৭ বৎসর অতিক্রম করে নাই। টমসন সাহেবের রিপোর্ট পাঠে অবগত হওয়া যায় যে লালা রামপ্রসাদ বাঙ্গালার ১১৯২ সন অর্থাৎ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্যক্ষম ছিলেন, সুতরাং তিনি যে রাজবল্লভ অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ হইতেন তাহা এক প্রকার অবধারণ করা যায়। রাজবল্লভ ও রামপ্রসাদ অন্ততঃ সমবয়স্ক ছিলেন বলিয়া অনুমান করিলেও রামপ্রসাদের পুত্র রামগতি যে ঐ যজ্ঞের সময় কৈশোর অতিক্রম করিয়াছিলেন তাহা সিদ্ধান্ত হয় না। পৌরাণিক ধর্ম্মপ্লাবিত বঙ্গদেশে যে বৈদিক যাগযজ্ঞ সমগ্র পণ্ডিত সমাজের অনধিগম্য ছিল, তাহা যে রামগতির ন্যায় এক অল্পবয়স্ক ব্যক্তি পরিজ্ঞাত ছিলেন তাহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। রামগতির কন্যা আনন্দময়ী তৎকালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ এবং জন্ম হইয়া থাকিলেও তিনি ঐ সময় নিশ্চয়ই মাতৃক্রোড় পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হন নাই।

বাঙ্গালাদেশের ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীস্থ যাবতীয় জাতিই একাধিক মেলে বিভক্ত। ব্যক্তিগত বিশুদ্ধতা সংরক্ষণের নিমিত্ত যে মেলবন্ধনের সৃষ্টি হইয়াছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু, কালে এই মেলবন্ধনের সঙ্কীর্ণতা দ্বারা সমাজের অশেষ অনিষ্ট সাধিত হইয়াছে। মেলবন্ধনের প্রসাদে এক এক জাতি বিভিন্ন উপজাতিতে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে হিন্দুসমাজে "কন্যাদায়" নামে যে এক বিপদ সমুপস্থিত হইয়াছে, মেলবন্ধনই তাহার মূলীভূত কারণ। এই

Lala Ramprosad, the then managing Naib who assigned it over to the elder widow for her life .....—Report of G. Thomson, Second Assistant of Dacca, dated the 23rd September 1791. To William Douglas Esq., Collector of Dacca, Jalalpore.

নীতির অনুরোধে ব্রাহ্মণ সমাজে অনেক কুলীন কন্যাকে আজীবন কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন এবং একাধিক বালিকাকে একই বরের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া সপত্নীগঞ্জনা সহ্য করিতে হইতেছে। বৈদ্য ও কায়স্থ সমাজে এই মেলবন্ধনের প্রসাদে অনেক জনক জননী তনয়ার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। অধুনা কেহ কেহ মেলবন্ধনের অপকারিতা অনুভব করিয়া এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু অনেকেই অবগত নহেন যে রাজবল্লভই সর্ব্বপ্রথম এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ছিলেন।

বাঙ্গালা দেশের বৈদ্যসমাজ পঞ্চকোট, রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ এবং পূর্ব্বকুল এই পঞ্চসমাজে বিভক্ত। মানভূম, সিংহভূম, ধনভূম, বরাহভূম, শিখরভূম এবং মঙ্গলকোট প্রভৃতি স্থান লইয়া পঞ্চকোট সমাজ গঠিত। এই সমাজের সাধারণ নাম সেনভূমি প্রদেশ। বাঙ্গালার যে অংশ ভাগীরথার পশ্চিম, দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের পূর্ব্ব, পঞ্চনদীর দক্ষিণ এবং সুন্দর বনের উত্তর, তাহা রাঢ় সমাজের অন্তর্গত। যে সমস্ত স্থান বারেন্দ্র ভূমি নামে খ্যাত তাহা বরেন্দ্র সমাজভুক্ত। ২৪ পরগণার নিকটবর্ত্তী স্থান, যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর বাখরগঞ্জ ময়মনসিংহের পশ্চিমাংশ এবং ঢাকা জেলা লইয়া বঙ্গসমাজ বিস্তৃত। ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী এবং কুমিল্লা পূর্ব্বকুল সমাজের অন্তর্গত। রাজবল্লভের সময় এই বিভিন্ন সমাজস্থ বৈদ্যগণমধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল না। তিনি এই মেলবন্ধন ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে রাঢ় সমাজের অন্তর্গত শ্রীখণ্ড গ্রামের এক বৈদ্যকন্যার এবং বরেন্দ্র সমাজস্থ দ্বিতীয় বৈদ্যকন্যাব পাণিগ্রহণ করেন। একাধিক দার পরিগ্রহ সন্নীতির পারপন্থী সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে রাজবল্লভের সময় বহুবিবাহ দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত ছিল না।

শ্রীখণ্ড গ্রামের কোন্ বৈদ্য কন্যা যে রাজবল্লভের সহিত পরিণীতা হইয়াছিলেন তাহা শ্রীখণ্ডনিবাসী শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ চৌধুরী মহাশয় অস্বীকার করেন। বিক্রমপুর সমাজে এই বিবাহের বিষয় এতদূর রাষ্ট্র যে দুর্গাচরণ বাবুর উক্তির প্রতি সহজে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। শ্রীখণ্ডে রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত যে দেবমন্দিরের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা বিক্রমপুরস্থ লোকের মতে তাঁহার শ্বশুরালয়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজবল্লভের উত্তর পুরুষ শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র সেন মহাশয় বলেন যে তদীয় স্বর্গীয়পিতা রাজবল্লভের শ্রীখণ্ড গ্রামস্থ পত্নীকে বারাণসী ধামে অবস্থান করিতে দেখিয়াছেন এবং এই মহিলা সম্বন্ধীয় অনেক বৃত্তান্ত তাঁহার নিকট গল্পচ্ছলে বলিয়াছিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফলসা গ্রামে রামানন্দ সরকার নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ সেন মহাশয় এই রামানন্দের সহোদরের উত্তর পুরুষ। প্রিয় বাবুর নিকট হইতে যাহা অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় যে রামানন্দ রাজবল্লভের অনুবর্ত্তী হইয়া শ্রীখণ্ড গ্রামের দ্বিতীয় বৈদ্য কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত মহিলার নাম গোবিন্দপ্রিয়া। গোবিন্দপ্রিয়ার হস্তাক্ষর সাতিশয় সুন্দর ছিল। প্রিয়বাবুর গৃহে অদ্যাপি এই হস্তাক্ষর বিদ্যমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত দুর্গাচরণ বাবুর মতে রাজবল্লভ বঙ্গীয় বৈদ্য সমাজে যজ্ঞোপবীত প্রথা পুনঃপ্রচলনে প্রয়াসী হইয়া উপবীত পদ্ধতি জানিবার উদ্দেশ্যে শ্রীখণ্ডে গমন করেন এবং তদুপলক্ষে ভূতনাথ দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরে যে শ্লোক খোদিত আছে তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে রাজবল্লভ এই সময়ের পূর্ব্বেই অগ্নিষ্টোম ও বাজপেয় যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। সকলেই অবগত আছেন, যাঁহারা অনুপনীত তাঁহাদিগের এই যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই। অতএব মন্দির প্রতিষ্ঠার

ই যে রাজবল্লভ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা অনায়াসে
ারণ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে
ন যে উপবীত পদ্ধতি জ্ঞাত হইবার উদ্দেশ্যে শ্রীখণ্ডে গিয়া ভূতনাথের
র সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহা কদাচ সিদ্ধান্ত হয় না।

স্বনামখ্যাত স্বর্গগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় অক্ষতযোনি
ু বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ প্রচলন বিষয়ে উদ্যোগ করিয়া নব্যবঙ্গে
সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত
ওয়া বাঞ্ছনীয় কি না, এস্থলে তাহার আলোচনায় নিষ্প্রয়োজন।
সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় এ বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত করেন,
ৎকালে বাঙ্গালা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
াশ্চাত্য শিক্ষা দ্বারা ভারতবর্ষে যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে তাহা
কহ অস্বীকার করিতে পারেন না। এই শিক্ষার প্রভাবে ভারতীয়
নসাধারণ বহুকাল সঞ্চিত জড়তা পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বাধীন ভাবে
চন্তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। যে সময় এই নব্য শিক্ষা-
প্রণালীর অভাবে এতদ্দেশীয় লোকের স্বাধীন চিন্তামাত্র উন্মেষিত
য় নাই, তৎকালে অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অন্যূন এক শতাব্দী
পূর্ব্বের রাজনগরের রাজবল্লভ সেন অক্ষতযোনি হিন্দু বিধবাগণের
পুনর্ব্বিবাহ প্রচলন বিষয়ে সুবিশাল ভারতবর্ষের এক প্রান্তে হইতে
অপর প্রান্তে আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন।

রাজবল্লভের সর্ব্ব কনিষ্ঠা কন্যা অভয়া তৎকাল প্রচলিত গৌরীদান
অনুসারে অষ্টম বর্ষ বয়সে পরিনীতা হইয়াছিলেন। ভগবানের ইচ্ছায়
জামাতা রূপেশ্বর সেন বিবাহের অল্পকাল পরেই কালগ্রাসে পতিত
হইলেন। এই দুর্ঘটনার পর হইতেই প্রচলিত নীতি অনুসারে
এই অবোধ বালিকাকে শুক্লাম্বর পরিধান করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন
করিতে হইল। কন্যার এই অভাবনীয় পরিণামে রাজবল্লভ শোকে

মুহ্যমান হইলেন। শোকের প্রথম উচ্ছ্বাস অবগত হইলে, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, কন্যার এই আজীবন ব্রহ্মচর্য্য কদাচ মঙ্গলময় জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হইতে পারে না! তৎকালে রাজনগরে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদ্যমান ছিলেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণদাস বিদ্যাবাগীশ, নীলকণ্ঠ সার্ব্বভৌম এবং কৃষ্ণদেব বেদান্তবাগীশের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। রাজবল্লভ এই পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া বিধবা বিবাহের বৈধতা সম্বন্ধে মত জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারা পরস্পর শাস্ত্রালোচনা করিয়া অক্ষতযোনি বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিলেন; যে প্রথা বহুকাল যাবৎ হিন্দুসমাজে অপ্রলিত ছিল, তাহা মাত্র এই তিন জন পণ্ডিতের মতের উপর নির্ভর করিয়া প্রচলন করিবার চেষ্টা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত ছিল না। সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলীর মত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত রাজবল্লভ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে লোক প্রেরণ করিলেন।

রাজবল্লভের প্রেরিত লোক ভারতের নানা স্থান হইতে অনুকূল মত সংগ্রহ করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আগমন করিল। তৎকালে এই স্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিত বাস করিতেন। সমগ্র বাঙ্গালা দেশের এক মাত্র নবদ্বীপেই বিবিধ শাস্ত্রের আলোচনা হইত। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ যে মত প্রদান করিতেন তাহা অশিষ্ট হইলেও বাঙ্গালা দেশে বেদ বাক্যের ন্যায় অভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপালিত হইত। এই পণ্ডিতসমাজ সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রিত ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত সৌহার্দ্য ছিল বলিয়া রাজবল্লভ মনে করিয়াছিলেন যে কৃষ্ণচন্দ্রের সাহায্যে নবদ্বীপ হইতে অনুকূল মত সংগৃহীত হইবে। কিন্তু সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্রই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধি বিষয়ে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত লোক নবদ্বীপে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণচন্দ্র তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইলেন। অবশেষে

তিনি গোপনে পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান করিয়া জ্ঞাত হইলেন যে অক্ষত-যোনি বিধবাগণের পুনর্বিবাহ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে অসিদ্ধ নহে। বৈদ্য-বংশীয় রাজবল্লভ সেন কর্তৃক এরূপ একটি গুরুতর সামাজিক সংস্কার সাধিত হইবে তাহা ব্রাহ্মণ বংশীয় কৃষ্ণচন্দ্রের অভিপ্রেত হইল না। তিনি পণ্ডিত মণ্ডলীকে বলিলেন "আগামী কল্য রাজবল্লভের দূত রাজসভায় উপস্থিত হইলে আমি আপনাদিগকে বিধবা বিবাহ বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিবার নিমিত্ত সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিব; কিন্তু আপনারা আমার অনুরোধ না শুনিয়া বিরুদ্ধ মত প্রদান করিবেন।" তৎকালে বাঙ্গালা দেশে নৈতিক অবনতির চরমসীমা উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং পণ্ডিতমণ্ডলী কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

পরদিন রাজনগরের দূত সভায় উপস্থিত হইলেন, নবদ্বীপাধিপতি উপস্থিত পণ্ডিতবর্গকে বিধবা বিবাহ বিষয়ে অনুকূল মত প্রদান করিবার নিমিত্ত প্রকাশ্যে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু শাস্ত্রব্যবসায়ীগণ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে কথা কহিতে গিয়া নিরয়গামী হইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজবল্লভ যে আশা হৃদয়ে পোষণ করিয়া পূর্ণ উৎসাহের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা এইরূপে নবদ্বীপের পাদসঞ্চারিণী ভাগীরথী সলিলে বিসর্জ্জিত হইল এবং তদবধি প্রাতঃ-স্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভ্যুত্থান পর্য্যন্ত বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আন্দোলন স্থগিত রহিল।

শ্রীরসিকলাল গুপ্ত।

রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ ও তৎসংক্রান্ত সভাদ্বয়ের বিবরণী।

গত ৭ই শ্রাবণ শুক্রবার অপরাহ্ন ৬½ টার সময় চৈতন্য লাইব্রেরীর বিশেষ অধিবেশনে মিনার্ভা থিয়েটার গৃহে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "স্বদেশী সমাজ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, সভায় সহরের অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন এবং জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে প্রায় এক সহস্র ব্যক্তি সভাগৃহে স্থান না পাইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

প্রবন্ধের সার মর্ম্ম এই। বিলাতের আদর্শ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা; ভারতবর্ষে কে রাজা হইল, উজির হইল লোকে তাহা বড় গণ্য করে না, পল্লী সমাজগুলি স্বীয় স্বীয় অভাব অভিযোগ নিবারণের ব্যবস্থা নিজেরাই করিয়া প্রীত ছিল। বিলাতে ষ্টেট অর্থাৎ সরকার জলের ব্যবস্থা, আলোর ব্যবস্থা, শিক্ষা এমন কি ভিক্ষুককে দানের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত সমস্ত বিধান করিয়া থাকেন, সুতরাং এই সরকার যাহাতে সতত সচেষ্ট ও কল্যান কর্ম্মে নিরত থাকেন, এজন্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক থাকিতে হয়, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতাই তাহাদের সমস্ত উন্নতির মূলে, এজন্য তাহাই রক্ষা করিতে তাহারা প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকে। আমাদের দেশের স্বতন্ত্র নিয়ম, রাজা সংগীত চর্চ্চা বা শিকার করিয়া কাল অতিবাহিত করুন, ধর্ম্মের নিকট তজ্জন্য তিনি দায়ী হইবেন, রাজ্যের লোকেরা তাহার উপর একান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না; দেশীয় জল কষ্ট, অন্ন কষ্ট, শিক্ষার অভাব এ সমস্ত নিরাকরণের ভারই সমাজের উপর ন্যস্ত। পল্লী সমাজগুলি এ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, সুতরাং কোনরূপ চাঁদার খাতার উপদ্রব

বা সরকারী তাগিদের প্রয়োজন ব্যতীত পল্লী গুলি স্বীয় স্বীয় অভাব পূরণের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে; এখন আমরা আত্ম নির্ভরের এই হিতকর সনাতন নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট দরখাস্ত জারি করিয়াই স্বদেশের প্রতি সমস্ত কর্ত্তব্যের শেষ হইল মনে করিয়া আত্মবঞ্চনা করিতেছি, প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন "যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখা প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয়, তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই সমস্ত আকাশ কুসুম লইয়া তাহার সার্থকতা কি?"

রাজকীয় সম্মান এই দেশের লোকগণ পূর্ব্বেও লাভ করিতেন, কিন্তু তাঁহারা এখনকার রাজসম্মানে সম্মানিত ব্যক্তিগণের ন্যায় এরূপ আত্মবিক্রয় করিয়া ফেলিতেন না। "পূর্ব্বে যাঁহারা বাদ্সাহের দরবারে রায়রা"য়াঁ" হইয়াছেন, নবাবেরা যাঁহাদের মন্ত্রনা ও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করিতেন, চরম সম্মানের জন্য তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্য লোকেও বলিবে মহাশয় ব্যক্তি ইহা সরকারদত্ত রাজা মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড় ছিল। দেশের লোকে ধন্য বলিবে ইহাতে আজ আমাদের সুখ নাই।"

"ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালে, লেডি ডফরিণ ফণ্ডে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঘোড়দৌড়ে, লাট সাহেবের অভ্যর্থনায় টাকা ঝড়িয়া পড়িতেছে কখন? যখন, সেই টাকাজোগানকারী প্রজার দল গ্রীষ্ম মধ্যাহ্নে পানীয় জলের জন্য হাহাকার করিতেছে, যখন ম্যালেরিয়ায় তাহারা উৎসন্ন হইয়া গেল, যখন তাহাদের গরু বাছুর চরিবার এক ছটাক জমি নাই, যখন তাহাদের নিম্ন ভূমির উপর হইতে বর্ষার পর তিনি চার মাস ধরিয়া জল নিকাসের কোন উপায় থাকে না।"

প্রবন্ধকারের বিশ্বাস এ অবস্থা স্থায়ী হইবে না, বিদেশে ঘুরিয়া আমাদের মন পুনরায় দেশের অভিমুখী হইবে। এক সময় ইংরেজী সাহিত্যের চর্চ্চায় অন্ধ হইয়া আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায় বঙ্গভাষাকে ঘৃণা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এখন সেদিন কাটিয়া গিয়াছে, বিদেশের সাহিত্যাগার হইতে রত্নরাজি চয়ন করিয়া এখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় বঙ্গভাষার শোভাবর্দ্ধন করিতেছেন, কে জানিত ডিরোজিওর ছাত্র বিদেশী শিক্ষায় আকণ্ঠমগ্ন মধুসূদন দেশের সাহিত্যের শ্রীসম্পন্ন করিবার জন্য রত্ন সন্ধান করিবেন? একবার হারাইয়া পুনঃপ্রাপ্ত হইলে সেই প্রাপ্তি গৌরবান্বিত হইয়া উঠে, বঙ্গভাষাকে যেরূপ আমরা ফিরিয়া পাইয়াছি, স্বদেশীয় সমাজকেও আমরা সেইরূপই ফিরিয়া পাইব, প্রবলতর অনুরাগের সহিত, উহার উন্নতিকল্পে হস্ত সুদৃঢ়তর করিয়া আমরা ইহাকে ফিরিয়া পাইব। চতুর্দ্দিকে জাতীয়তার শুভ-লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইয়াছে এবং যতই কেন সামান্য হউক না, অনুষ্ঠান কিছু কিছু আরব্ধ হইয়াছে।

আমরা "বিলাতের মন ত ভুলাইতে পারিলাম না, বারংবার ত মাথা হেঁট করিয়া ফিরিতে হইল। এখন এ সমস্ত মিথ্যা ছলাকলা ফেলিয়া দিয়া একবার দেশের মনকে পাইবার জন্য দেশী প্রণালীতে চেষ্টা করিয়া দেখিব না কি?"

কি প্রণালীতে আমাদের সমাজকে পুনর্জ্জীবিত করিতে হইবে; তাহা সুধীমণ্ডলীর বিবেচ্য, কিন্তু ভারতবর্ষ সমস্ত বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য বিধানের প্রতিভা চিরদিন দেখাইয়া আসিতেছে। বিচিত্র উপকরণ গুলি সমস্ত স্বীকার করিয়া তাহা সমাজে রক্ষা করিবার বিধান ভারতবর্ষ চিরদিনই করিয়া আসিয়াছে। আর্য্যগণ যখন এদেশে প্রথম আসিয়াছিলেন, তখন দীর্ঘব্যাপী বিরোধের মধ্যে অনার্য্যকে তিনি সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত করেন নাই, তাহারা আদিম অষ্ট্রেলিয়ান বা

অ্যামেরিকানদের ন্যায় বর্জ্জিত হয় নাই। বৌদ্ধ প্রভাবের সময় নানা প্রকার জাতির সঙ্গে আর্য্যগণের মিশ্রন হইয়াছিল,—নব প্রতিষ্ঠিত হিন্দুসমাজ সেই বিচিত্র উপকরণরাশিকে আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিল। তৎপর মুসলমান জাতির সঙ্গে হিন্দুর যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে, নানকপন্থী কবির পন্থা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় অভ্যুদিত হইয়া সমাজের একটা সংরক্ষণী শক্তি ও মিলনাভিমুখীগতি সপ্রমাণ করিয়াছিল। এখন পাশ্চাত্যজাতির সঙ্গে সংঘর্ষে আমাদের সমাজের যে একটা বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে—তাহাও ভারতীয় প্রতিভা সামঞ্জস্যের অভিমুখে লইয়া যাইবে, প্রবন্ধকারের ইহাই দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের জাতীয় উন্নতির জন্য সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি করা প্রয়োজনীয়, এখন এতদর্থে যে সকল সভা সমিতি হয়, তাহার অনেকগুলির কাজ ইংরেজীতে নির্ব্বাহিত হয়, এই সমস্ত অনুষ্ঠান যে প্রণালীতে সম্পাদিত হয় তাহা আপনাকে স্বভাবতই ব্যর্থ করিয়া ফেলে; এদেশের সর্ব্বত্র মেলা হইয়া থাকে, মেলাগুলির সংস্কার পূর্ব্বক শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি এই সূত্রে সর্ব্বসাধারণের সঙ্গে এক যোগে কাজ করেন, তবে সমাজের ঊর্দ্ধ ও নিম্ন পর্য্যায়ের মধ্যে যে একটা প্রাচীর উঠিয়াছে, তাহা ভগ্ন হইয়া যায়, এই মেলাগুলি দ্বারা দেশের অনেক প্রকৃত কাজ সাধিত হইতে পারে।

তৎপরে প্রবন্ধকার দেশের একটি সমাজপতি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করেন, এতৎসম্বন্ধে তিনি বলেন "স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই যিনি আমাদের সমাজের প্রতিমা স্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই, আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় সমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার সঙ্গে যোগ রাখিলেই সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।" কে এমন প্রতিভাপন্ন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আছেন,

যিনি আমাদের শীর্ষে প্রতিষ্ঠা পাইতে পারেন ও সমস্ত সমাজ ঘাড় হেঁট করিয়া যাঁহার কথা মান্য করিবেন, এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া প্রবন্ধকার বলেন—"রাজা তাঁহার সকল প্রজার চেয়ে যে স্বভাবতঃ বড় তাহা নহে, কিন্তু রাজ্যই রাজাকে বড় করে। আমাদের সমাজ-পতিও সমাজের মহত্বেই মহৎ হইয়া থাকিবেন। সমাজের সমস্ত বড় লোকই তাঁহাকে বড় করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলস থাকে তাহা নিজে উচ্চ নহে, মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।"

এই বিষয়গুলি বিস্তৃতভাবে বলিয়া উপসংহারে প্রবন্ধলেখক স্বদেশের পূজার জন্য সকলকে যে কবিত্বপূর্ণ ভাষায় উদ্বোধন করিয়াছিলেন, তাহা সমবেত শত শত ব্যক্তি চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরবে শ্রবন করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রবন্ধ-সম্বন্ধে সভাপতি মুগ্ধভাবে বলিয়া-ছিলেন, এরূপ প্রবন্ধ তিনি কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ নাই,—উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তি এই মন্তব্যের সত্যতা স্বীয় স্বীয় হৃদয়ের মধ্যে প্রবল ভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ পাঠান্তে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উঠিয়া উহার বিশেষ প্রশংসা করিলেন, তিনি বলিলেন, প্রবন্ধের বিষয় তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, একভাগ সর্ব্ববাদীসম্মত, যথা রাজদ্বারে আবেদন করার অপেক্ষা আত্মনির্ভরের প্রতি লক্ষ্য স্থির করা উচিত, বিদেশ হইতে সংগ্রহ করিব, দেশে সঞ্চয় করিব ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগ—এমন কতকগুলি বিষয় আছে, যাহা আমি ভাল করিয়া চিন্তা করি নাই সুতরাং তৎসম্বন্ধে আমি সুস্পষ্টভাবে স্বীয় মত ব্যক্ত করিতে পারিব না, সমাজপতি নির্ব্বাচন প্রভৃতি বিষয় এই শ্রেণীর। তৃতীয় ভাগ—প্রবন্ধকার মেলার কথা সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন, জাতীয় উন্নতি সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়ের আভাষ দিয়াছেন কিন্তু তাহা খুব সুস্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কোন ব্যক্তি একটি দেশ গজকাটি লইয়া

মাপিতে যান, প্রত্যেকটি স্থান, তাহার ভৌগোলিক সংস্থান, ইতিহাস প্রভৃতি তাঁহার নক্সায় পরিস্ফুট হইয়া উঠে; ইনি বৈজ্ঞানিক। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি সে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র তত্ত্বের দিকে না যাইয়া হয়ত একটা টিলার উপর দাঁড়াইয়া অঙ্গুলি সঙ্কেতে দূর হইতে দেখাইয়া দেন, সেই আভাষে সমগ্র দেশটির একটী সংক্ষিপ্ত ও জীবন্ত চিত্র দর্শকের চক্ষে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, ইনি কবি। বৈজ্ঞানিক যেরূপ ভাবে আমাদের অভাব অভিযোগের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা বলিয়া উপায়-গুলির ক্ষুদ্রতম বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতেন, রবীন্দ্রনাথ তাহা না করিয়া তাঁহার অপূর্ব্বপ্রতিভার সঙ্কেতে যেন একটি জীবন্ত চিত্র আঁকিয়া দেখাইয়াছেন।

আমরা বিদেশমুখী ছিলাম এখন স্বদেশমুখী হইব; কেন্দ্রের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া স্বদেশ বিদেশ দুইই আমরা পাইব, অন্ধ কেন্দ্রাভি-মুখী গতি আমাদের কল্যাণকর নহে, ধূমকেতুর ন্যায় কেন্দ্রবিচ্যুত হওয়া ভাল নহে, সৌরজগতের গ্রহাদির মত কেন্দ্রের অধীন হইয়া আমাদের গতি রাখিতে হইবে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় উঠিয়া প্রবন্ধের অশেষ প্রশংসা পূর্ব্বক বলিলেন, গত ৪০।৫০ বৎসর যাবৎ লোকের মনে যে সকল কথা আভাষে উদয় হইয়াছে রবীন্দ্র বাবু তাহাই অপূর্ব্ব ভাষার পরিচ্ছদ পরাইয়া বাহিরে আনিয়াছেন। ভিক্ষাবৃত্তি এখন নিরর্থক হইয়াছে কিন্তু এক সময় উহা সার্থক ছিল। যে যুগে বেণ্টিক, মেটকাফ, মেকলে প্রভৃতির ন্যায় উদার হৃদয় ব্যক্তিগণ সত্য সত্যই এই দেশকে উন্নত করিতে সরল ভাবে অভিলাষী ছিলেন, সে যুগে ভিক্ষার ঝুলি শূন্য থাকিত না, তাঁহাদের কার্য্যকলাপে আমাদের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার হইয়াছিল, সুতরাং দেশের পূর্ব্ব নায়কগণ কতকগুলি ভিক্ষাবৃত্তি করিয়াছিলেন, তখন গৃহস্বামী সদয় ছিলেন।

কিন্তু এখন যদি তিনি সিংহদ্বারে অর্দ্ধ চন্দ্র লইয়া রোষকষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করেন, তবে ভিক্ষুকের আশা একবারে ত্যাগ করাই ভাল। তাঁহারা যদি মনে করিতেন, তবে আমাদের অনেক উন্নতি করিতে পারিতেন। জাপান ৩০ বৎসরে যে উন্নতির শিখরদেশে দাঁড়াইল ১৫০ বৎসরের চেষ্টায় কি তাহা আমাদের অধিগম্য হইত না? ভগবান ইংরেজের দ্বারা আমাদের যে একটা মহৎ উপকারের সুযোগ দিয়াছিলেন, তাহা কি কারণে পণ্ড হইল, আমার বিবেচনায় এজন্য ইঁহারাই দায়ী। ইহাঁরা ইচ্ছা করিয়াছিলেন এজন্য স্কটল্যাণ্ডের অবস্থা দ্রুতবেগে উন্নতিলাভ করিয়াছে কিন্তু আয়রলণ্ড ইহাঁদের অবজ্ঞায় পশ্চাতে পড়িয়া আছে। আমরা দুরদৃষ্টক্রমে ইহাঁদের World Empire এর মধ্যে স্থান পাই নাই; অষ্ট্রেলিয়া যাহা পাইয়াছে, শত্রুতা করিয়াও বোয়ারগণ যাহা পাইল, ভারতবাসীগণ হৃদয়ের রক্ত অজস্র ঢালিয়াও তাহা পাইল না, সুতরাং আমাদের এখন আত্মনির্ভর ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এখন ভারতবাসী সমস্ত জাতি একত্র হইয়া কার্য্য করিবার দিন, খণ্ড খণ্ড ভারত লইয়া এখন এক মহাভারত গঠন করার সময় হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বলিলেন, আমি প্রবন্ধ পাঠের উপলক্ষ্যে আপনাদের অনেকটা সময় নিয়াছি এখন আর একটু সময় নেব, আমি বাল্যকাল হইতে কাব্য-সাহিত্য দ্বারা আপনাদের হৃদয় রঞ্জন করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, কিন্তু অদ্যকার উদ্দেশ্য শুধু হৃদয়রঞ্জন নহে। যে লোকের ব্যবসা বাঁশী বাজান, সহসা সর্পাঘাতের উপক্রম হইলে সে বাঁশীকে লাঠীর মত ব্যবহার করিয়া থাকে, আমার যাহা কিছু শক্তি আছে তাহা উদ্যত করিয়া আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে আসন্ন অমঙ্গলকে ঠেকাইতে চেষ্টা করিতেছি! আমি সমাজের একজন অধিনায়ক স্থির করার কথা বলিয়াছি, এদেশে যত প্রকার চেষ্টা

হইয়াছে, তন্মধ্যে দেখিতে পাই যে কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্রবর্ত্তী করিয়া আমরা যেরূপ সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছি, অন্য কোনরূপে তাহা হয় নাই, একজন লোককে এই ভাবে দাঁড় করাইতে পারি নাই বলিয়া আমাদের উদ্যম সফলতা লাভ করিতে পারিতেছে না।

অতঃপর রবীন্দ্র বাবু স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়কে সমাজের অধিনায়কের পদে বরিত করিবার পক্ষে অনেকগুলি সুযুক্তি প্রদর্শন করিলেন।

সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ নাই।

একটি কথা এই যে কেবল রাজনীতি বা কেবল সামাজিক বিষয় লইয়া কোন জাতি উন্নত হয় না। উন্নতি সমস্ত দিক্ হইতেই হইয়া থাকে, কোন গাছটি বৃদ্ধি পাইবার পূর্ব্বে যদি নিয়ম বাঁধিয়া দেওয়া হয়, উহা এতদিন শুধু লম্বা হইতে থাকিবে কিংবা এতদিন শুধু চওড়া হইতে থাকিবে,—তাহা যেরূপ অস্বাভাবিক, এক সঙ্গে লম্বা ও চওড়া হইয়া বৃদ্ধি পাওয়াই নিয়ম, সেইরূপ জাতীয় উন্নতি চতুর্দ্দিক হইতে হইয়া থাকে, শুধু সমাজনীতি বা রাজনীতি লইয়া থাকা একদেশদর্শিতা। ভাগীরথী যেরূপ রাজমহাল হইতে শতধারায় সমুদ্রাভিমুখী গতি লইয়াছে, আমাদের চেষ্টাও সেইরূপ শতমুখী হইয়া উন্নতির পথে প্রধাবিত হইবে। ঐক্য অবলম্বন করিয়া যে কোন বিষয়ে কাজ করা যায়, তাহাতেই সার্থকতা হইবে, এই সুফল আমাদের রাজার হাতে ততটা নহে যতটা আমাদের হাতে।"

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভা ভঙ্গ হইল।

ইহার পর শত শত বিমুখ ব্যক্তি রবীন্দ্র বাবুর দ্বারে ঘুরিতে লাগিল,

এই প্রবন্ধ বহুলোকে শুনিতে পান নাই, তাঁহারা সভায় স্থানাভাববশতঃ লাঞ্ছনার একশেষ পাইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন, ইহাঁদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া অসুস্থতা সত্ত্বেও রবীন্দ্র বাবু পরিবর্দ্ধিত আকারে পুনরায় উহাপাঠ করিতে সম্মত হন। গত ১৬ই শ্রাবণ রবিবার বেলা ৫টার সময় কর্জ্জন থিয়েটার গৃহে এই জন্য একটি সভা আহূত হয়, এবার টিকিট বিতরণ করিয়া শ্রোতাগণের জন্য স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, ১২০০ টিকিট ৪ ঘণ্টার মধ্যে বিতরিত হইয়া গিয়াছিল, বহুসংখ্যক লোককে এবারও ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন; রবীন্দ্র বাবু জ্বর লইয়া সভাস্থলে আসিয়াছিলেন, তিনি দাঁড়াইতে না পারিয়া বসিয়া ধীর সুকণ্ঠে তাঁহার সুন্দর প্রবন্ধটি পুনরায় পাঠ করেন। যাঁহারা প্রথমবার শুনিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে উপস্থিত ছিলেন,—কিন্তু সুকণ্ঠ উচ্চারিত কবিত্বপূর্ণ ভাষায় এদিনও যখন তিনি প্রবন্ধ পাঠ করেন, তখন শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার মুখের প্রতি নির্নিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া বসিয়াছিলেন। প্রবন্ধকার যখন বলিতে লাগিলেন কলাপাতে খাওয়া আমাদের লজ্জার কথা নহে, একা খাওয়াই লজ্জার কথা;—সাহেব মনস্তুষ্টির কথা উল্লেখ করিয়া যখন চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত করিলেন—

"ঘর কৈনু বাহির বাহির কৈনু ঘর
পর কৈনু আপন আপন কৈনু পর"

তখন শত শত শ্রোতা জাতীয়তার যে আবেগ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা সভাগৃহকে মৌন স্বদেশ ভক্তির উচ্ছ্বাসে অপূর্ব্ব ভাবে সজীব করিয়া তুলিয়াছিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে এবার প্রবন্ধটি পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল, এবার সমাজের অধিনায়কের পদে শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে

রণ করিবার প্রস্তাব প্রবন্ধের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছিল, অংশটি এই—"যিনি একদিকে আচার ও নিষ্ঠা দ্বারা হিন্দুসমাজের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন, অপর দিকে আধুনিক বিদ্যালয়ের শিক্ষায় যিনি মহৎ গৌরবের অধিকারী; একদিকে কঠোর দারিদ্র্য যাহার অপরিচিত নহে, অন্যদিকে আত্মশক্তির দ্বারা যিনি সমৃদ্ধির মধ্যে উত্তীর্ণ, যাঁহাকে দেশের লোকে যেমন সম্মান করে, বিদেশী রাজপুরুষেরা তেমনি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে; যিনি কর্ত্তৃপক্ষের বিশ্বাসভাজন, অথচ যিনি আত্মমতের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করেন নাই। নিরপেক্ষ ন্যায়বিচার যাঁহার প্রকৃতিগত ও অভ্যাসগত, নানা বিরোধী পক্ষের বিরোধ সমন্বয় যাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক, যিনি সুযোগ্যতার সহিত রাজার ও প্রকৃতিসাধারণের সম্মাননীয় কর্ম্মভার সমাধা করিয়া বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান অক্ষুব্ধ অবসর লাভ করিয়াছেন—সেই স্বদেশ বিদেশের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, সেই ধন সম্পদের মধ্যেও অবিচলিত তপোনিষ্ঠ ভগবৎপরায়ণ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম যদি এই খানে আমি উচ্চারণ করি, তবে অনেক পল্লবিত বর্ণনার অপেক্ষাও সহজে আপনারা বুঝিবেন, কিরূপ সমাজকে আমি প্রার্থনীয় ও সম্ভবপর জ্ঞান করিতেছি।"

প্রবন্ধ পাঠের পর সভাপতি মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধটি দ্বিতীয়বার শুনিলাম, কিন্তু এরূপ প্রবন্ধ শত শত বার শুনিলেও ইহার রসাস্বাদের জন্য পুনশ্চ আগ্রহ জন্মে। কেহ কেহ বলেন রবীন্দ্র বাবু জাতীয় নৈরাশ্যের সংগীত শুনাইতেছেন,—আমার মনে হয় ইহাঁর কথা নব আশার সংগীত। তিনি বলিতেছেন যে প্রণালীতে আন্দোলন হইয়া আসিতেছে তাহাতে কাজ হইবে না,—যাঁহারা গতানুগতিতে কাজ করিতেছেন তাঁহারা হয়ত একটু ভীত হইয়া পড়িতেছেন; তাঁহাদের কার্য্যে ততটা স্বার্থত্যাগ নাই, এবং দেশের জন্য জীবন ব্যয় করিয়া খাটিবার চেষ্টাও নাই, অথচ দেশের কার্য্য করিতেছি এই বিশ্বাসজনিত একটা পরিতৃপ্তি আছে। রবীন্দ্রবাবু দেখাইয়াছেন পূর্ব্বে

যে প্রণালীতে কাজ করা হইত, এখন তাহা উপযোগী নহে, বৎসরের মধ্যে তিন দিন মাত্র একত্র হইয়া বাক্য ব্যয় করিলে দেশের বিশেষ কোন কল্যাণ সাধিত হইবে না, ইংরেজদের সদ্ব্যবহারে ইতিপূর্ব্বে খানিকটা আশা ছিল—কিন্তু এখন সে আশা ঘুচিয়া গিয়াছে, শুভ্রাঙ্গের সাম্রাজ্যে কৃষ্ণাঙ্গের অধিকার লাভের আশা দুরাশা। যে দিন দেখা গেল, স্যালিশব্যারি দাদা ভাই নৌরোজীকে কৃষ্ণাঙ্গ বলিয়া প্রকাশ্য-ভাবে অবজ্ঞার স্বরে কথা কহিলেন, যে দিন দেখা গেল বোয়ারদের প্রতি শত্রুতা ঘোষণা করিয়াও তাঁহাদিগকে রিপাব্লিক দেওয়া হইল, ভারতবর্ষের শত শত আবেদন উপেক্ষা করিয়া ক্রমেই তাঁহাদের রাজকার অনুগ্রহের গণ্ডী সঙ্কুচিত করা হইতেছে—তখন রাজদ্বারে কাঙ্গালের বেশে উপস্থিত হওয়া যে নিতান্ত নিরর্থক তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। তিন দিনের ঝঙ্কারে এখন আমাদের চেষ্টার কোন সার্থকতা হইবে না। সমস্ত জীবন ব্যয় করিয়া দেশের কাজ করিতে হইবে, তাহা না হইলে জীবন প্রভাত হইবে না। রবীন্দ্র বাবু আশান্বিত ভাবে বলিয়াছেন আমাদের অপমৃত্যু ঘটিবে না, তিনি জাতীয় জীবনের ভূতচিত্র হইতে এ দেশের সামঞ্জস্য বিধানের প্রতিজ্ঞা প্রতিপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন, তিনি দেখাইয়াছেন, এক সময়ে অনার্য্যকে, তৎপর শক, প্রভৃতি জাতিকে হিন্দুজাতি আত্মীয় করিয়া লইয়াছেন,* বৌদ্ধ বিপ্লবের পরে হিন্দুজাতির একটু সংকীর্ণতা অবলম্বন আবশ্যকীয় হইয়াছিল, পারশীক্ প্রভৃতি জাতি সেই বন্যার সময় আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা না করাতে আত্মঘাতী ও লুপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, হিন্দুজাতি সংকীর্ণতার প্রাচীর তুলিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছেন, এখন আর সেই সংকীর্ণতা ততটা উপযোগী নহে।

---

* এই তথ্যটির প্রতি গত বৎসরে এলবার্ট হলে পঠিত, ও ভারতীতে প্রকাশিত "ভারতের হিন্দু ও মুসলমান" নামক প্রবন্ধে শ্রদ্ধেয়া শ্রীমতী সরলা দেবী প্রথম হিন্দুসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন ও সবিস্তারে উহা আলোচনা করেন। —লেখক।

সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিলেন—রবিবাবু যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহা নূতন নহে, এবং তাহা পুরাতনও নহে, নূতন আদর্শ পুরাতন আদর্শকে বর্জ্জন করে নাই। গত ২৫ বৎসর যাবৎ দেশে যে সাধনা চলিতেছে রবীন্দ্র বাবুর প্রবন্ধ তাহারই ফল। এক সময় পশ্চিমগগণপ্রান্ত সৌরকরচ্ছটায় দীপ্ত হইয়া আমাদিগকে আমন্ত্রিত করিয়াছিল, এখন যদি আমাদের পক্ষে পশ্চিমে সূর্য্যাস্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার অভিমুখী হইয়া থাকা পণ্ডশ্রম মাত্র, এখন নবসূর্য্য পূর্ব্বদিক হইতে সমুদিত হওয়ার লক্ষণ দেখাইতেছে, আর পশ্চিমের দিকে তাকাইলে চলিবে না। এক সময় আমরা ভাবিয়াছিলাম ইংরেজও মানুষ আমরাও মানুষ, তাঁহাদের যাহা সাধ্যায়ত্ত আমাদেরও তাহাই,—সে ভ্রম এখন ঘুচিয়া গিয়াছে। তখন ফরাসী বিপ্লবের প্রকাণ্ড আলোকে ইংরেজ আমাদিগের রাজ্যে অভিনব মৈত্রীর মহাবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, আমরা তাহাতেই লুব্ধ হইয়াছিলাম, রেড ইণ্ডিয়ানের মত আমরা শ্বেতাঙ্গের মোহিনীতে মুগ্ধ হই নাই, ইংরেজ এখন সেই মৈত্রীর প্রতিশ্রুতি ক্রমেই ভুলিয়া যাইতেছে, কিন্তু বুদ্ধ যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে দেশের লোক মনুষ্যত্বের উচ্চতম আদর্শ কখনই বিস্মৃত হইবে না। জাতীয় উন্নতি এখন আর পরকীয় দান দ্বারা ঘটিবে না, স্বকীয় সাধনা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হইবে। বিলাতে রাজা প্রজার প্রতিনিধি, এখানে তাহা নহে। দশ জন দেশীয় লোক আজ সাহেবের সভা আলো করিয়া বসিবেন, ৩০০ প্রস্তাবের মধ্যে তিনটি প্রস্তাব সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ সার্থকতা লাভ করিবেন. ইহাকেই দেশের বিরাট হিত বলিয়া ঘোষণা করিতে হইবে, —মিউনিসিপাল করপোরেসনে যেখানে দেশীয় লোকের পক্ষ হইতে ৩০০৲ টাকা মঞ্জুর করিবার প্রস্তাব হইল, সেইস্থানে তিন টাকা মঞ্জুরী পাইয়াই কি আমরা ধন্য হইব,—এই অকিঞ্চিৎকর চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যাহাতে আমরা নিজের পায়ের উপর নিজেরা দাঁড়াইতে পারি, তাহারই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, রবীন্দ্র বাবু জাতীয় জীবনের

যে নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের পক্ষে একান্ত অবলম্বনীয়।

সভাভঙ্গের পূর্ব্বে রবীন্দ্র বাবু সভার রীতি ভঙ্গ করিয়া দুইটী কথা বলিবার অনুমতি লইলেন এবং বলিলেন—

আজ সমবেত ব্যক্তিগণকে সাহিত্যরস দেওয়ার জন্য আমি দাঁড়াই নাই, শুধু উদ্দীপনায় কোন কাজই হয় না; আগুণ জ্বালাইতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়িও চড়াইতে হইবে, ক্রমাগতঃ অগ্নি জ্বালাইলে ইন্ধন নষ্ট করা হয় মাত্র, হাঁড়ি চড়াইয়া হয়ত অগ্নির বেগ সংযত করিবার জন্য গোটা কতক ইন্ধন সরাইয়া ফেলিতেও হইবে। আমাদিগকে অপ্রমত্তভাবে কাজ করিতে হইবে, আমরা সাধারণতঃ সর্ব্বদাই যেন একটা মত্ততার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকি, কিছু পরেই উত্তেজনার অবসানে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ি, আমি শুধু উদ্দীপনার জন্য এই প্রবন্ধ পাঠ করি নাই। আমরা অনেক সময় কল্পনা দ্বারাই খুব বেশী পরিমাণে চালিত হই, দেশের কাজ করিতে হইলে মনে ভাবি যেন ধূমধামের সহিত মস্ত একটা অট্টালিকা গড়িতে হইবে, একটা চূড়া প্রস্তুত করিতে হইবে, যেন কোন একটা সমারোহ ব্যাপার —আমাদের চেষ্টা এই ভাবে একটা সুবৃহৎ কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়। আমরা যেন প্রত্যেকে নিজ নিজ ক্ষুদ্রভাবে দেশের জন্য কাজ করিতে পারি। আমার প্রস্তাব, প্রত্যেকে নিজেদের গৃহে স্বদেশের জন্য যদি প্রত্যহ কিছু উৎসর্গ করিয়া রাখেন, তবে ভবিষ্যতে সেই সঞ্চয় কাজে লাগিবে, তাহা ছাড়া উহা আমাদের একটা চেতনা প্রবুদ্ধ করিয়া রাখিবে, ইহা সভা কি বার্ষিক কোন সমিতির জন্য প্রতীক্ষা না করিয়া আমরা আনায়াসে করিতে পারি, এইরূপে নীরবে কোন বিশেষ সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া সেবার কার্য্য করিতে ভারতবর্ষের একটা বিশেষত্ব আছে। অন্যদেশে রবিবার দিন মাত্র গির্জ্জায় যাইতে

হয় এবং প্রার্থনাদির জন্য পাদ্রীর আবশ্যক হয়, কিন্তু আমাদের প্রত্যেককে মন্ত্র জপিতে হয়, তাহার জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না; সেই মন্ত্র প্রত্যহ আধ্যাত্মিক শক্তি উদ্বোধিত করিয়া দেয়; আমরা সাপ্তাহিক কোন উত্তেজনার প্রতীক্ষা করি না। আমাদের স্বদেশ-ভক্তিও যেন সেইরূপ কোন সভাসমিতির তাগিদের প্রতীক্ষা না করিয়া নীরবে আপন কার্য্য সমাপন করে। স্বদেশের কাজ যেন বৃহৎ বাহ্য অনুষ্ঠানে পরিণত না হয়, তজ্জন্য একটা বড় ভাণ্ডার করিয়া একজন খাজাঞ্চী হইলেন, একজন টাকা ভাঙ্গিতে লাগিলেন,—এইরূপ ভাবের অনুষ্ঠান কখনই এদেশে সার্থক হইবে না। আমাদের অবস্থা একটা গল্পের কথায় এইভাবে বলা যাইতে পারে, একজন একটা পয়সা খুঁজিতে দীপ জ্বালাইয়া ইতস্ততঃ সন্ধান করিতে করিতে তাহার পূর্ব্বপুরুষের একটা রত্নভাণ্ডারের খোঁজ পায়, তথাপি মাটি খুঁড়িয়া তাহা বাহির করিবার চেষ্টা না করিয়া ক্রমাগতঃ সে যদি সেই একটা পয়সার খোঁজই করিতে থাকে, তবে এমন ব্যক্তিকে কি বলা যাইবে। ইংরেজ সেইরূপ এদেশে আসিয়া কয়েকটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়াছিল, তাহা খুঁজিতে যাইয়া আমরা দেশীয় আত্মশক্তির রত্নভাণ্ডারের খোঁজ পাইয়াছি, তথাপি কেহ কেহ সেই পয়সা কয়েকটির খোঁজ করিয়াই সময় অতি-বাহিত করিতেছেন। ইংরেজের ভোজের নিমন্ত্রণে আমাদের আহ্বান নাই, তথাপি দ্বারস্থ হইয়া সেই টেবিলের দিকে চাহিয়া থাকিতেছি, যাহা গড়াইয়া পড়িতেছে তাহার দিকে লুব্ধ দৃষ্টিপাত না করিয়া বাড়ীতে যাইয়া হাঁড়ি চড়াইয়া ভাত ডালের ব্যবস্থা করা কি উচিত নহে? সেই শাকান্নও আমাদের পক্ষে সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।*

* এই বিবরণী সভাস্থলেই নোট করা হইয়াছিল, বাঙ্গলা বক্তৃতা দ্রুত রেখাক্ষরে রিপোর্ট করিবার সুবিধা নাই, সুতরাং উপরোদ্ধৃত বিবরণীতে বক্তাগণের কথার সার মর্ম্ম সঙ্কলিত হইয়াছে, কিন্তু সাধ্যমত তাঁহাদের নিজের ভাষা রক্ষা করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে।—লেখক।

উর্ব্বশী ও তুকারাম।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিবর্ষণশীল—সন্ধ্যাকাল।

অরুণাবতীর মন্দিরে, দর্শকমণ্ডলীর অভিমুখে পাশাপাশি দুইটি কক্ষ
একটি কক্ষ দেবী নিকেতন; অন্য কক্ষে যাত্রীদিগের বসিবার
জন্য দুই তিন খানি অজিনাসন। প্রত্যেক আসনের
তিন দিকে চতুর্ম্মুখী প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত এবং
সম্মুখে ধূপধুনা গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি সংরক্ষিত।
এই কক্ষে মেনকা উর্ব্বশী এবং
পুরোহিত দণ্ডায়মান।

পুরো। (উর্ব্বশীর প্রতি)

তুমি মাতা দেবীস্থলে চল একাকিনী,
জানত নিয়ম? জপ তাঁরে একমনে
তুমি হোথা গিয়া, পূর্ণ হইবে বাসনা।

(উর্ব্বশীকে সঙ্গে লইয়া পুরোহিতের দেবী নিকেতনে গমন এবং
উর্ব্বশী দেবীসম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যানে রত হইলে
পুনরায় মেনকার নিকট আসিয়া।)

এখনো দাঁড়ায়ে মাতা! বস এ অজিনে,
ধূপধুনা গন্ধদ্রব্য রয়েছে সম্মুখে—
আহুতি করিয়া দান দেবীর উদ্দেশে
কাটাও সময়; অন্য মাত্রা যতক্ষণ
না আসেন ফিরে তাঁর পূজা সমাপনে।

(প্রদীপের সলিতা উস্‌কাইয়া দিতে দিতে।)

আমি এবে যাই ঘরে; পাশেই কুটীর
আবশ্যক যদি হয় ডাকিও আমারে,—
বুঝিলে মা? ইথে যেন না করিও আন।
ঘুমাইয়া পড়ি যদি? ভয় নাহি তাহে,
সারারাত জেগেই ত থাকি, কবে আসে
পোড়া নিদ্রা বুঝিতে না পারি। তবুও মা

(উচ্চস্বরে কাশিতে কাশিতে)

নিতান্তই আসিতে না পারি
বৃদ্ধা আছে ঘরে, সাড়া পাইবে নিশ্চয়।
লোকে বলে বটে বৃদ্ধা কাণে কিছু খাট,
জেনো তা ঈর্ষার কথা! আমি পেয়ে থাকি
চিরদিনই অন্যরূপ জাগ্রত প্রমাণ।
এক কথা না কহিতে শুনি দশ কথা!

মে। (হাসিয়া) আপনি নিশ্চিন্ত মনে করুন গমন
যা বলিলা সেইমত হবে সব কাজ।

(পুরোহিতকে প্রণাম ও দক্ষিণা দান।)

পু। (তুষ্টচিত্তে)
দেবীবরে মনোমত পাবে মাতা বর,
চলিলাম, রুদ্ধ কর দ্বারের অর্গল।

[পুরোহিতের প্রস্থান।

(মেনকা দ্বারের নিকট আসিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করতঃ)

গুরু গুরু গরজনে গরজে গরবে
কাদম্বিনী, ঝুপঝুপ ঝরে বারিধারা,

থেকে থেকে সৌদামিনী ঝলকে সঘনে
ক্ষণপ্রভা হাসি তার ঢালি আচম্বিতে ;
হেরি এ গম্ভীর দৃশ্য বিমুগ্ধ নয়ন,
শ্রবনবিমুগ্ধ শুনি, আকাশ দেবের
বর্ষা মুখরিত বাণী।

(উপবিষ্ট হইয়া ধুনাপাত্রে আহুতি প্রদান করিতে করিতে)

দেবতা অরুণা,
জগতের সুমঙ্গল কর আনয়ন,
এই বর্ষা বৃষ্টি হোক তাহার কারণ।

(দ্বারে গুম্ গুম্ শব্দ)

মে। কে করে আঘাত দ্বারে ! বৃদ্ধবর বুঝি ?
আবার আসিলা হেথা তেয়াগি সহসা,
বিশ্রাম শয়ন আহা ! আপদ স্মরিয়া
অতিথি বালার তাঁর ! কি সাধুতা মরি !

(পুনরায় দ্বারে আঘাত শব্দ। মেনকার উঠিয়া দ্বার উন্মোচন ; ছত্রধারী পথিকের গৃহ প্রবেশ। এবং গৃহ কোণে ছত্র সংরক্ষণ ও অল্পসিক্ত পরিচ্ছদ ও উষ্ণীষের জল ঝাড়িয়া পুনরায় উষ্ণীষ মস্তকে ধারণ। ইত্যবসরে মেনকা অজিনোপরি আসিয়া দণ্ডায়মান এবং পথিককে উত্তমরূপে দেখিয়া আপন মনে)

একি ! এ নহেত সেই প্রবীন পূজারী !
সৌম্য সুকুমার মূর্ত্তি যুবাবর কে এ ;
ছদ্মবশে দেবরাজ জীমূত বাহন।

নামিয়া আসিলা নাকি মেঘরথে হেথা
এ নিশীথে সম্ভাষিতে অরুণাবতীরে!
সব যেন স্বপ্ন সম হইতেছে জ্ঞান!
কি মায়া এ মায়াদেবী করিলা সৃজন!

(উষ্ণীষ পরিধানান্তে পথিকের মেনকার প্রতি দৃষ্টিপাত
এবং দীপাবলী প্রজ্জ্বলিত চিত্রার্পিত রমণীর
মূর্ত্তি দর্শনে সবিস্ময়ে!)

অরুণা মন্দির এ যে!
কি দৃশ্য অপূর্ব্ব!

(সচকিতে পদতলে জানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক করযোড়ে)

অপরূপা মূর্ত্তিময়ী দেবতা অরুণা—
একি এ করুণা তব অযোগ্য অধমে!
এত কৃপা এত দয়া সহিতে না পারি,
হৃদি যেন টুটে টুটে আনন্দ বন্যায়!
কঠোর তপস্যাধারী কত যোগী ঋষি
যে মোহিনী মূর্ত্তি তব না পায় ধেয়ানে;
কোন্ পুণ্যবলে আজি এ অভাগা জনে
সেই রূপে দরশন দিলা!

মে। উঠ পান্থ!

সামান্য মানব কন্যা দেবী আমি নহি।
উঠ উঠ পান্থবর ভাবিতে শিহরি
কি করিলে মহাভ্রম মহা পাপ তুমি!
ক্ষমুন তোমারে দেবী এই ভিক্ষা মাগি।

প। সামান্য মানব কন্যা! সকলি বিভ্রম!

(উঠিয়া পুনঃ পুনঃ নেত্র মর্দ্দন করিতে করিতে)

তবুও সম্মুখে সেই মূর্ত্তি সুমোহিনী!
নয়ন মুদ্রিত করি পুনঃ চেয়ে দেখি,
তবুও সম্মুখে সেই চিত্র অপরূপা।
অপ্সরানিন্দিতরূপা অয়ি অসামান্যে
সাক্ষাৎ ইন্দিরা! ক'রনা ছলনা মোরে,
জেনো, দাস ভক্ত বলে দীনহীন জনে।

মে। ও কথা বলোনা ছি ছি! আমি শ্রেষ্ঠীকন্যা,
আর কেহ নহি সত্য।

প। (স্বগতঃ) শ্রেষ্ঠীর দুহিতা।
ইনিই উর্ব্বশী তবে, ভুবন মোহিনী!
কহিলা সৈনিক মোর যথার্থ বচন!
শাপভ্রষ্টা স্বর্গবালা মর্ত্ত্যে আবির্ভূতা!
(প্রকাশ্যে) সার্থক হইল দেবী জীবন আমার;
জন্ম জন্মান্তের পুণ্য হইল সফল!
চর্ম্ম চক্ষে বিভাসিত অলৌকিক রূপ
ত্রিদিব বিস্ময়! কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য!

মে। (স্বগতঃ) কিবা দিব্যরূপ কিবা সুধামাখা স্বর!
প্রতি শব্দ উচ্চারণে সঞ্চারিয়া যায়,
হরষ বিদ্যুৎ মরি শিরায় শিরায়!
কত পুণ্যবলে আজি এই দরশন।
ধন্য মা অরুণাবতী তোমার করুণা!

(উভয়ের মুগ্ধভাবে চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিতি। সহসা নানা
বর্ণের আলোকচ্ছটায় উভয়ের মূর্ত্তি লুকায়িত করিয়া
রঙ্গমঞ্চের সম্মুখে দিগ্‌বালার প্রবেশ ও
উভয়কে দর্শন।)

"ঝর্ ঝর্ ঝরে বারিধারা সমতানে ;
বায়ু বহে থেকে থেকে বিষম আবেগে
কাঁপাইয়া দীপাবলী দ্বার ছিদ্র পথে।
বাজি উঠে অকস্মাৎ মাথার উপর
ভীষণ নিনাদে বজ্র, কম্পিত মন্দির !
দোঁহে কিন্তু অচেতন ঝটিকা ঝঞ্ঝায় !
এদের ইন্দ্রিয়গম্য নহে কিছু আর।
নির্নিমেষ নেত্রে চাহি দোঁহে দোঁহা পানে
প্রেমের কুহক স্বপ্নে জাগ্রত মগন।
উর্ব্বশীর ধ্যানভঙ্গ করি এইবার।

[প্রস্থান।

(বজ্রনিনাদে উর্ব্বশীর ধ্যানভঙ্গ ও চতুর্দ্দিকে
অবলোকন করিয়া)

উ। "নিভিয়া গিয়াছে দেখি আরতি প্রদীপ।
অপ্রসন্না যেন হেরি দেবতা মূরতি
সিন্দুর চর্চিতা শিলা কালিকার সম
করালবদনী রূপে নয়নে প্রকাশ !
হে দেবি করুণাময়ি হ'য়োনা নিদয়া
সিদ্ধ কর পণ, ব্রত কর উদযাপিত,
গৌরবিত হোক মম সমগ্র শকতি
সার্থক হউক জন্ম, সফল প্রকৃতি।

(পুনরায় বজ্রধ্বনি)

তবু অসন্তুষ্টা দেবী ! অশুভ সূচনা।
তাঁহারি উত্তর ক্রুদ্ধ এ ভীম নিনাদ।
জপিতেও তাঁরে আর নাহি অধিকার !
আকুল পরাণ ! একবার ধ্যানভঙ্গে
সাঙ্গ পূজা সঙ্গে সঙ্গে সে দিনের মত ;
দেবীর আদেশ ইহা লঙ্ঘিব কেমনে।

(অশ্রু মুছিতে মুছিতে উর্ব্বশীর উত্থান এবং অন্য কক্ষে আসিবার ইচ্ছায় মধ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করতঃ মেনকার সম্মুখীন এবং তাহার দিকে পশ্চাৎবর্ত্তী পুরুষকে দেখিয়া সবিস্ময়ে।)

কে ও যুবা মেনকার সম্মুখে দাঁড়ায়ে !
সেই অশ্বারোহী বর যেন মনে লয় !
যদিও আনন তাঁর না পাই দেখিতে,
তেমনি সুদীর্ঘ দেহ বলিষ্ঠ আকৃতি।
অস্ত্রশস্ত্র শূন্য বটে রাজসজ্জাহীন,
ছদ্মবেশধারী এবে নাহিক সংশয়।
অথবা এ মায়াপুরী সব যাদু খেলা
জাগিয়া স্বপন দেখি তাই ধ্যান ভঙ্গে !
অথবা প্রার্থনা মোর শুনিলেন দেবী
অবজ্ঞা ভুলিয়া তাই প্রেম পূজা লয়ে,
আসিলেন পার্থ মম বৃহন্নলা বেশে
এ বিজন নিশাকালে উদ্ধারিতে মোরে।
দেবীর কি এত কৃপা ! মেনকা কি কহে !

(মেনকা ও পান্থ অন্ত গৃহে)

মে। আজ্ঞা হোক আসন গ্রহিতে পান্থবর।

প। তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য ! কিন্তু কি দাসের
প্রধান কর্ত্তব্য পূজ্যে, নহে রক্ষা করা
দেবীর সম্মান অগ্রে ? কেমনে বসিবে
এ সেবক, পূজনীয়া জনা না বসিলে ?
(উভয়ের উপবেশন)

উ। (অন্য গৃহে দ্বারদেশে)
কি মধুর ভাষী ! ধনরাজ ইন্দ্রজিতে
চিরদিন শুনি কেমনে জানিব ভাষা
আছে অন্যতর, অর্জ্জুনের মুখে যেন
হইতেছে উচ্চারিত; ঠিক বীরোচিত
মনোহর ভদ্রভাষা ! প্রত্যেক অক্ষরে,
প্রকাশিত রমণীর সম্মান ইহাতে—
সুললিত ছন্দে ! মেনকা কি কহে পুনঃ !

মে। কে তুমি পথিক ! দেব বা কিন্নর নর !
কি কারণে কোথা হতে দুরন্ত নিশীথে
আসিয়া উদয় এই বিজন মন্দিরে ?
বিস্ময়ে আকুল চিত্ত কহ দয়া করে।

প। (সহাস্যে) দেবতা কিন্নর নহি ক্ষুদ্র আমি নর,
শঙ্কর আমার নাম, বাস শ্রীনগরে ;
শ্রান্তি ক্লান্তি তুচ্ছ করি বহু দূর হতে
যে উদ্দেশ্য হৃদে ধরি আসিয়াছি হেথা—
সফল সার্থক তাহা। এ আনন্দ তরে—
লক্ষবার নাহি ডরি বরিতে মৃত্যুরে।

মে। (স্বগতঃ) সুভগা উর্ব্বশী বলি ভাবেন আমারে!
প। কিন্তু এ দুর্য্যোগ ভরা বিপন্ন নিশীথে
কুসুম কোমলা নারী অসহায়া একা,
কি সাধনা তরে, কোন মনোপূজা লাগি,
বুঝিতে না পারি এই বিজনবাসিনী?
মে। কি বিপদে ডরে, মানে কোন্ বাধা নারী,
বরলাভ তরে তার মনের মতন?
প। কোন্ রাজ রাজেশ্বর সসাগরাপতি
নাহি জানি যোগ্যবর এ বরনারীর!
মে। সেই মহা মহীপতি ভালবাসি যারে,
সম্রাট হইতে বড় মানি ভিখারীরে
হৃদয়ের অধিপতি যিনি পান্থবর।
উ। (অন্য গৃহে)
ঠিক বলিয়াছ বোন! বুঝি নাই তাহা
এতদিন! আজ একি ইন্দ্রজালে পড়ি
জড়িত আপনা জালে বুঝিতে না পারি!
ধরা দিতে বিয়াকুল ধরিবারে গিয়া!
প। (মেনকাকে)
ধন্য সে মানববর, তাহারেই মানি
ভাগ্যধর, এ মহিমাময়ী যারে যাচে।
মে। (স্বগতঃ)
জানিনাত কেমন এ সৌন্দর্য্য মহিমা।
এই মাত্র জানি শুধু, যদি সৌম্যবরে,
আনন্দ প্রদানি থাকি মুহূর্ত্তের তরে
জাগিল মাহাত্ম্য সত্য এতদিনে এথ।

উ। (অন্য গৃহে)

আজি মোর এ সৌন্দর্য্য বৃথা মনে হয়,
ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্র আমি আজি বুঝিয়াছি!
বিফল, মহিমাশূন্য এ রূপ লাবণ্য!
ধন্য তুই মেনারাণী! একি নব ভাব!
আপনারে ক্ষুদ্র বলে মনে হয় যত
ঈর্ষা তত হয় যেন মেনকার পরে!
ইহাই কি প্রেম! আকুল বেদনাভরা
আকাঙ্ক্ষা অসীম, আত্মদান তার অন্তে!
নূতন এ অনুভাব নব উত্তেজনা!
ব্যাকুল তিয়াষা মাঝে আনন্দ গভীর!
ধন্য তুমি দেব! এত দিন এত যত্নে
শতজনে পারে নাই যে কার্য্য সাধিতে,
অবজ্ঞাকটাক্ষ ক্ষেপি তুমি তা সাধিলে!
ফুটালে হৃদয় মোর বুঝাইলে আর
রমণীর শ্রেষ্ঠধন নহে রূপরাশি ;
মঙ্গল সুন্দর সত্য অপূর্ব্ব মহান,
একমাত্র প্রেমপূর্ণ হৃদয় তাহার।
নমি তোমা হৃদি প্রাণ ভরে, এ চেতনা—
ব্যথা দান তরে।

(অশ্বের পদধ্বনি)

মে। (সচকিতে)

অশ্ব পদধ্বনি শুনি !

প। বিমুক্ত তুরঙ্গ মম আহ্বানিছে মোরে
দেখিয়া নির্ব্বিঘ্ন পথ বৃষ্টি অবসানে।

বিদায় প্রার্থনা করি ; নমস্কার দেবি,
মানিব সৌভাগ্য চির এই শুভ দিন,
দেবীরূপে আজীবন স্মরিব কল্যাণি। (প্রস্থান।)

মে। ফুটিল না একটিও কথা হায় মোর !
জানাতে মঙ্গল ইচ্ছা বিদায়ের কালে !

উ। (অন্য গৃহে)
শূন্য মনে ফিরে যাই গৃহেতে এখন,
শুধাবনা মেনকারে পথিকের কথা,
কি জানি বেদনা তাহে প্রকাশিয়া পড়ে।
থাকুক মনের কথা রুদ্ধ চির মনে ;
ব্রত হোক উদ্যাপিত নিভৃত মরমে।

(ঊর্ব্বশীর মেনকার নিকটে আগমন ও মন্দির সম্মুখের পটক্ষেপ। দিগ্‌বালা ও তারকাবালাদিগের প্রবেশ ও গান।)

সারঙ্গ।

সখি ভুলোনা ভুলোনা,
এ শুধু মায়া আর ছলনা।
এই অশ্রু জলে ভরা হৃদয় বেদনা,
এই ত্রাস আশ পুলক হাস,
প্রাণ কম্পনে মালিকা রচনা,
সকলি মায়া আর ছলনা।
কণ্ঠে দিতে যদি স্বপন টুটে,
মিলায় দলগুলি নয়ন পুটে,
হাসিও কুতূহলে, এ খেলা কৌশলে ;
শুধু মনের কথা ভুলে কাহারে বলোনা।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

আমাদের উচ্চশিক্ষা।

আমরা বিগত বর্দ্ধমান কন্‌ফারেন্সের সভাপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়কে ভারতীয় উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি পাঠাইয়া ছিলাম। তাঁহার উত্তর প্রকাশিত হইল। আজ কাল উচ্চশিক্ষা একটা গুরুতর সমস্যা। এসম্বন্ধে আশু বাবু তাঁহার মন্তব্য অতি সংক্ষেপে জানাইয়াছেন। বিষয়টি বিস্তারিতভাবে অনুধাবনাযোগ্য, দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমাদের এখন কোন্ পথ অবলম্বিত হওয়া উচিত তাহা নির্ণীত হইতে পারে। আশা করি এই প্রশ্নগুলি দেশহিতৈষী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে।

প্রশ্ন।

১। য়ুনিভর্সিটি বিল পাস হওয়াতে এদেশবাসীর পক্ষে উচ্চশিক্ষার পথ অনেক পরিমাণে রুদ্ধ হইবার আশঙ্কা দাঁড়াইয়াছে। প্রথমতঃ যে দেশের লোক বিনা অর্থব্যয়ে গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়নাদি করিতেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্যয়সঙ্কুল বিদ্যাচর্চ্চা কথনই উপযোগী নহে। নূতন নিয়মানুসারে উচ্চশিক্ষা যেরূপ বহুব্যয়সাধ্য হইতে চলিল, তাহাতে পাঠার্থীর সংখ্যা নিতান্তই হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ যে দেশের শিক্ষাদীক্ষা রাজনৈতিক বা অপর কোন উদ্দেশ্যের আওতায় উৎপন্ন হয় তাহা কখন সম্পূর্ণ বিকাশ পাইয়া ফলবান হইতে পারে না। বর্ত্তমানে আর রাজকীয় উচ্চশিক্ষার আগারে প্রকৃত উচ্চশিক্ষা লাভের আশা নাই। এরূপ অবস্থায় শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থাদি আমরা যাহাই করি না, উচ্চশিক্ষা বলিতে যাহা বুঝা

যায় তাহার পথ মুক্ত করিবার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা করিতে পারি? এবং তাহাতে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কতদূর?

২। পূর্ব্বে এদেশে উচ্চশিক্ষা ছিল—নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় জগতে অদ্বিতীয়, বহুদেশ হইতে নবদ্বীপে ছাত্র সমাগত হইয়া তাঁহাদের এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন—শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ গৌরবজনক ধারণা মনে থাকিলেই বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ গ্রহণ করা যায়—আমাদের পক্ষে তদ্রূপ গৌরব লাভের উপায় কি? কেহ কেহ মনে করেন পূর্ব্বের ন্যায়, রাজকীয় প্রভাব হইতে সুদূরে অবস্থিত টোলের ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমরা উচ্চশিক্ষার অনুশীলন করিতে পারি। কিন্তু ইহার কতকগুলি অন্তরায় লক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ পূর্ব্বে যে সকল ব্যাপার উপলক্ষ্যে টোলের পণ্ডিতগণ সম্মান ও উৎসাহ পাইতেন, এখন সে সকল ব্যাপারের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে পণ্ডিতগণের সেরূপ সম্মান ও বিদায়লাভের প্রত্যাশা নাই এবং যদিই বা থাকিত, তথাপি নবপ্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষালয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের সেইরূপ সম্মান বা বিদায়লাভের আশা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং দেশীয় লোকসাধারণের কাছে তাঁহারা জীবিকা অর্জ্জনের বা সম্মানলাভের সুবিধা পাইবেন কিরূপে?

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে টোলে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বালকেরা শিক্ষা পাইত, সুতরাং একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক উচ্চশিক্ষা পাইতেন এবং তাঁহাদের জীবিকাদির সংস্থানেও কোন বিঘ্ন ঘটিত না। এখন পূর্ব্বেকার আদর্শে বিদ্যালয় গঠিত হইলে উচ্চশিক্ষার দ্বার আর ব্রাহ্মণেতর জাতির বিরুদ্ধে রুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে না—ইউনিভার্সিটির অবরুদ্ধ গৃহে স্থান না পাইয়া সর্ব্ববর্ণের অসংখ্য

মণ্ডলী উপস্থিত হইয়া নবপ্রবর্ত্তিত দেশীয় বিদ্যালয়ে স্থান পাইলে হাদের জীবন-সমস্যা অধিকতর জটিল হইবে—ইহাদের জীবিকা র্ব্বাহের উপায় কি ?

৩। রাজকীয় বিদ্যালয়ে নানা প্রকার উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, চশিক্ষা কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবেনা, তাহা পূর্ব্বে বলা য়াছে ; দেশীয় টোলের আদর্শে রাজকীয় প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন ও তন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে জীবিকানির্ব্বাহ ও সম্মানার্জ্জনের র্বসুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা এখানে অল্প, এরূপ অবস্থায় দেশীয় চশিক্ষা কিরূপে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ?

৪। পূর্ব্বে দেশে অনেক গৌরবের বিষয় ছিল ; কৃষ্ণনগরের ল্পী, ঢাকার তাঁতি, নবদ্বীপের পণ্ডিত—ইহাঁরা মনে করিতেন নিজ জ বিষয়ে ইহাঁরা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন— শের লোকেরও সেই প্রকার ধারণা ছিল। এখন শিল্প ধূলিসাৎ ইয়া পড়িতেছে—কিন্তু ভারতবর্ষের চিরকালের পাণ্ডিত্যগর্ব্বও নষ্ট ইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষ সমস্ত দৈন্য দুঃখ সহ্য করিয়া য বিদ্যার শ্রীতে উজ্জ্বল ও গর্ব্বিত ছিল তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার পায় কি ?

শ্রীমতী সরলা দেবী।

যায় তাহার পথ মুক্ত করিবার জন্য আমরা কি ব্যবস্থা করিতে পারি? এবং তাহাতে ফলপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কতদূর?

২। পূর্ব্বে এদেশে উচ্চশিক্ষা ছিল—নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁহারা ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় জগতে অদ্বিতীয়, বহুদেশ হইতে নবদ্বীপে ছাত্র সমাগত হইয়া তাঁহাদের এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন—শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ গৌরবজনক ধারণা মনে থাকিলেই বিদ্যার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ গ্রহণ করা যায়—আমাদের পক্ষে তদ্রূপ গৌরব লাভের উপায় কি? কেহ কেহ মনে করেন পূর্ব্বের ন্যায়, রাজকীয় প্রভাব হইতে সুদূরে অবস্থিত টোলের ন্যায় বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া আমরা উচ্চশিক্ষার অনুশীলন করিতে পারি। কিন্তু ইহার কতকগুলি অন্তরায় লক্ষিত হয়।

প্রথমতঃ পূর্ব্বে যে সকল ব্যাপার উপলক্ষ্যে টোলের পণ্ডিতগণ সম্মান ও উৎসাহ পাইতেন, এখন সে সকল ব্যাপারের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। এখন শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দেবার্চ্চনা প্রভৃতি উপলক্ষ্যে পণ্ডিতগণের সেরূপ সম্মান ও বিদায়লাভের প্রত্যাশা নাই এবং যদিই বা থাকিত, তথাপি নবপ্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষালয়ে উত্তীর্ণ ছাত্রবৃন্দের সেইরূপ সম্মান বা বিদায়লাভের আশা কল্পনা করা যায় না। সুতরাং দেশীয় লোকসাধারণের কাছে তাঁহারা জীবিকা অর্জ্জনের বা সম্মানলাভের সুবিধা পাইবেন কিরূপে?

দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে টোলে শুধু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বালকেরা শিক্ষা পাইত, সুতরাং একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক লোক উচ্চশিক্ষা পাইতেন এবং তাঁহাদের জীবিকাদির সংস্থানেও কোন বিঘ্ন ঘটিত না। এখন পূর্ব্বেকার আদর্শে বিদ্যালয় গঠিত হইলে উচ্চশিক্ষার দ্বার আর ব্রাহ্মণেতর জাতির বিরুদ্ধে রুদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে না— ইউনিভার্সিটির অবরুদ্ধ গৃহে স্থান না পাইয়া সর্ব্ববর্ণের অসংখ্য

ছাত্রমণ্ডলী উপস্থিত হইয়া নবপ্রবর্ত্তিত দেশীয় বিদ্যালয়ে স্থান পাইলে তাহাদের জীবন-সমস্যা অধিকতর জটিল হইবে—ইহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় কি ?

৩। রাজকীয় বিদ্যালয়ে নানা প্রকার উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া, উচ্চশিক্ষা কখনই সফলতা লাভ করিতে পারিবেনা, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ; দেশীয় টোলের আদর্শে রাজকীয় প্রভাব হইতে বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে জীবিকানির্ব্বাহ ও সম্মানার্জ্জনের পূর্ব্বসুবিধা প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা এখানে অল্প, এরূপ অবস্থায় দেশীয় উচ্চশিক্ষা কিরূপে অক্ষুণ্ণ রাখা যায় ?

৪। পূর্ব্বে দেশে অনেক গৌরবের বিষয় ছিল ; কৃষ্ণনগরের শিল্পী, ঢাকার তাঁতি, নবদ্বীপের পণ্ডিত—ইহাঁরা মনে করিতেন নিজ নিজ বিষয়ে ইহাঁরা সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আছেন—দেশের লোকেরও সেই প্রকার ধারণা ছিল। এখন শিল্প ধূলিসাৎ হইয়া পড়িতেছে—কিন্তু ভারতবর্ষের চিরকালের পাণ্ডিত্যগর্ব্বও নষ্ট হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে। ভারতবর্ষ সমস্ত দৈন্য দুঃখ সহ্য করিয়া যে বিদ্যার শ্রীতে উজ্জ্বল ও গর্ব্বিত ছিল তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিবার উপায় কি ?

শ্রীমতী সরলা দেবী।

প্রাচীন ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা ও আজকালকার উচ্চশিক্ষার অর্থে অনেক প্রভেদ। আজকাল শিক্ষা বিশ্বব্যাপী। এমন জিনিষটি নাই, এমন মনের ভাবটি পর্য্যন্ত নাই যাহা লইয়া আন্দোলন না চলিতেছে। আজকাল শিক্ষিত লোকের চক্ষু চারি দিকে। শিক্ষার বিষয় যেমন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে শিক্ষালাভ করিবার উপায়ও তেমনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া আজকাল শিক্ষালাভ করা দুঃসাধ্য, একটী সহজ উদাহরণ দিলেই কতকটা বুঝা যাইবে। আগে Geometry শিখিতে হইলে Euclid অবলম্বন করিতে হইত। Modern Geometry তাহা হইতে নিতান্ত নূতন রকমের। Newton's Principia অদ্ভুত জিনিস কিন্তু Modern Mathematicsএর অংশ নহে। আজকাল অঙ্কশাস্ত্র না জানিলে বিজ্ঞান বোঝা যায় না। এমন কি রসায়নেও বিজ্ঞান শাস্ত্রের ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োজন। শরীরতত্ত্ব বল, মনস্তত্ত্ব বল সবতাতেই পৃথিবীর চারিদিকে কোথায় কি হইতেছে তাহা কতক পরিমাণে জানা চাই ও জানিবার উপায় থাকা চাই। আজকাল বহু সংখ্যক লোকের পক্ষে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। বহু অর্থেরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যথার্থ উচ্চশিক্ষা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভিন্ন চলা দুর্ঘট। এদেশ দরিদ্র— যাহারা এদেশে শিক্ষালাভ করিতে যত্নবান, তাহাদিগের কষ্টে দিনপাত হয়। যে শিক্ষা আজকাল উচ্চশিক্ষা বলিয়া খ্যাত তাহা লাভ করা আমাদিগের পক্ষে দিন দিন অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

টোলের শিক্ষায় আজকাল কিছু হয় না। বহুবর্ষ ধরিয়া দুই এক খানি পুস্তক পড়াতে বিশেষ কিছু লাভ হয় আমার বিশ্বাস

নহে। সে প্রথা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। পুনরায় তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে, গেলেও কোন ফল পাইবার আশা করা যায় না।

[illegible] ইংরাজী আমাদিগকে শিখিতে হইবে। ইংরাজীর সাহায্যে উচ্চ-[illegible] করিতে হইবে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সাহায্য না করিলে [illegible] আমরা যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিব তাহা মনে হয় না। [illegible]versity Bill আইন হইয়াছে—আমাদের কি তাহাতে কোন দোষ নাই? আমরা B. A., M. A. পড়ি উকিল, বারিষ্টার হইবার জন্য Universityতে যাই চাকুরির চেষ্টায়। শিক্ষা পথে যতটুকু হয়, তাহার পর প্রায় কিছুই করি না। গরিব আমরা আহার চেষ্টায় দিন রাত থাকি। B. A. পাশ করিলে খাইবার সংস্থান হইবে বলিয়াই ত B. A. পড়ি। চাকুরী না পাইলে আইন ব্যবসায়ী হই। তাহার সহিত যাহা কিছু পূর্ব্বে শিখিয়াছি তাহা ভুলিয়া যাই। আইন লইয়া দিন যাপন করি। লেখা পড়া একরূপ বিসর্জ্জন দেই।

এই অর্থচেষ্টার সাহায্যের জন্য কতকগুলি College হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রথাতে Metropolitan Institution স্থাপন করেন সেই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া দেশে চাবিদিকে College হইতে লাগিল। দিন দিন সেই সব Collegeএর উন্নতি না হইয়া পরস্পরকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিতে লাগিল। বলিতে লজ্জা হয় যে কোন কোন স্থলে বিদ্যালয় দোকানদারীতে পরিণত হইল। University Bill হইবে না কেন?

আমার মনে হয় আমরা নিতান্ত নিরুপায় নহি। একেবারে যে পথ নাই, তাহা নহে। যদি আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চাই আমাদের গুটিকত কার্য্য করা উচিত।

উত্তর।

প্রশ্নগুলির একটিও সহজ নহে এবং অল্প কথায় কোনটিরই উত্তর দেওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা ও আজকালকার উচ্চশিক্ষার অর্থে অনেক প্রভেদ। আজকাল শিক্ষা বিশ্বব্যাপী। এমন জিনিষটি নাই, এমন মনের ভাবটি পর্য্যন্ত নাই যাহা লইয়া আন্দোলন না চলিতেছে। আজকাল শিক্ষিত লোকের চক্ষু চারি দিকে। শিক্ষার বিষয় যেমন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে শিক্ষালাভ করিবার উপায়ও তেমনই কঠিন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া আজকাল শিক্ষালাভ করা দুঃসাধ্য, একটী সহজ উদাহরণ দিলেই কতকটা বুঝা যাইবে। আগে Geometry শিখিতে হইলে Euclid অবলম্বন করিতে হইত। Modern Geometry তাহা হইতে নিতান্ত নূতন রকমের। Newton's Principia অদ্ভুত জিনিস কিন্তু Modern Mathematicsএর অংশ নহে। আজকাল অঙ্কশাস্ত্র না জানিলে বিজ্ঞান বোঝা যায় না। এমন কি রসায়নেও বিজ্ঞান শাস্ত্রের ও অঙ্কশাস্ত্রের প্রয়োজন। শরীরতত্ত্ব বল, মনস্তত্ত্ব বল সবতাতেই পৃথিবীর চারিদিকে কোথায় কি হইতেছে তাহা কতক পরিমাণে জানা চাই ও জানিবার উপায় থাকা চাই। আজকাল বহু সংখ্যক লোকের পক্ষে উচ্চশিক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতেছে। বহু অর্থেরও প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। যথার্থ উচ্চশিক্ষা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে ভিন্ন চলা দুর্ঘট। এদেশ দরিদ্র— যাহারা এদেশে শিক্ষালাভ করিতে যত্নবান, তাহাদিগের কষ্টে দিনপাত হয়। যে শিক্ষা আজকাল উচ্চশিক্ষা বলিয়া খ্যাত তাহা লাভ করা আমাদিগের পক্ষে দিন দিন অসাধ্য হইয়া উঠিতেছে।

টোলের শিক্ষায় আজকাল কিছু হয় না। বহুবর্ষ ধরিয়া দুই এক খানি পুস্তক পড়াতে বিশেষ কিছু লাভ হয়, আমার বিশ্বাস

নহে। সে প্রথা আমরা পরিত্যাগ করিয়াছি। পুনরায় তাহাতে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব নহে, গেলেও কোন ফল পাইবার আশা করা যায় না।

ইংরাজী আমাদিগকে শিখিতে হইবে। ইংরাজীর সাহায্যে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করিতে হইবে। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সাহায্য না করিলে কিছু দিন আমরা যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিব তাহা মনে হয় না। University Bill আইন হইয়াছে—আমাদের কি তাহাতে কোন দোষ নাই? আমরা B. A., M. A. পড়ি উকিল, বারিষ্টার হইবার জন্য Universityতে যাই চাকুরির চেষ্টায়। শিক্ষা পথে যতটুকু হয়, তাহার পর প্রায় কিছুই করি না। গরিব আমরা আহার চেষ্টায় দিন রাত থাকি। B. A. পাশ করিলে খাইবার সংস্থান হইবে বলিয়াই ত B. A. পড়ি। চাকুরী না পাইলে আইন ব্যবসায়ী হই। তাহার সহিত যাহা কিছু পূর্ব্বে শিখিয়াছি তাহা ভুলিয়া যাই; আইন লইয়া দিন যাপন করি। লেখা পড়া একরূপ বিসর্জ্জন দেই।

এই অর্থচেষ্টার সাহায্যের জন্য কতকগুলি College হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে প্রথাতে Metropolitan Institution স্থাপন করেন সেই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া দেশে চারিদিকে College হইতে লাগিল। দিন দিন সেই সব Collegeএর উন্নতি না হইয়া পরস্পরকে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ করিতে লাগিল। বলিতে লজ্জা হয় যে কোন কোন স্থলে বিদ্যালয় দোকানদারীতে পরিণত হইল। University Bill হইবে না কেন?

আমার মনে হয় আমরা নিতান্ত নিরুপায় নহি। একেবারে যে পথ নাই, তাহা নহে। যদি আমরা উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে চাই আমাদের ত্বরিতকত কার্য্য করা উচিত।

দেশে ভাল School চাই। দেশের School দেশীয় লোকের দ্বারা চালান উচিত। নিম্ন শ্রেণীতে বাঙ্গলার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। School-এই মন ও চরিত্র গঠন হয়। একটি কি দুইটি ভাল School স্থাপন করা সহজ সাধ্য বলিয়া মনে হয়। তবে আমরা সে দিকে কোন চেষ্টাই করি নাই। School—এই এইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে পরে উচ্চ শিক্ষার পথ সহজ হইতে পারে। বহুসংখ্যক ছাত্রের পক্ষে উচ্চ শিক্ষা দুরাশা মাত্র। বিলাতের আদর্শ দেখ। সেখানে Universityতে অতি অল্প সংখ্যক ছাত্র অধ্যয়ন করিতে যায়। মনে রাখা উচিত যে বিলাতে ধনীলোকের অভাব নাই—ধনের অভাব নাই। Universityতে একটি একটি College প্রচুর অর্থশালী। তাঁহাতেও অধিক ছাত্র উচ্চশিক্ষার জন্য আসে না। উচ্চশিক্ষা সৌখিন শিক্ষা নহে। তাহার জন্য অনেক বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ ও শিক্ষা প্রয়োজন। তাহা সবিশেষ কষ্টসাধ্য। বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বহু অর্থও প্রয়োজন। আমাদিগের সে অর্থ নাই। সেইরূপ শিক্ষাদিবার উপকরণও নাই বলিলে চলে। কিন্তু ভাল School কেন হয় না বলিতে পারিনা। জাতীয়তার মূল জাতীয় শিক্ষা। জাতীয় শিক্ষা Schoolএ আরম্ভ হয়, উচ্চশিক্ষা বিশেষ কোন জাতি কিংবা প্রদেশের নহে। আমরা অর্থলাভের জন্য উচ্চশিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম। সে পথ দিন দিন অবরুদ্ধ হইতেছে। অর্থলাভ উচ্চশিক্ষার দ্বারা সহজে হয় না। সেইজন্য আমাদিগকে Technical Educationএর দিকে মন দিতে হইবে। Technical School গুটিকতক স্থাপন করিতে পারিলে—অনেকটা পথ পরিষ্কার হইয়া আসে আমার বিশ্বাস। উচ্চশিক্ষা কঠিন বলিয়া আমাদিগের নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকা উচিত নহে। ডাক্তার সরকারের Science Association আছে। এখানে কতকগুলা বড় বড় College আছে। সকলে

একত্র হইয়া একটি বড় বিদ্যালয় স্থাপন হয় না কি? শিক্ষা শিক্ষকের উপর অনেকটা নির্ভর করে। আজকাল এদেশে অনেক ভাল উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায়। শিক্ষার জন্য তাঁহাদিগের সাহায্য প্রয়োজন। তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া এদেশে এখন শিক্ষা সম্বন্ধে কি করা উচিত তাহা সাব্যস্থ করা প্রয়োজন। অনেক দিকেই আমরা মন দিতেছি। এদিকেও মন দিলে ভাল হয়।

দরিদ্র প্রদেশ আরও দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। আ কাল যাহারা কষ্টে দিনপাত করিতেছে তাহাদিগের সন্তানরা আরও কষ্টে পড়িবে। আজ যে অল্প কষ্ট, কাল তাহা দ্বিগুণিত হইবে। আমাদিগের ছেলেরা কোথায় কি করিয়া দিন কাটাইবে তাহা কি ভাবিয়া দেখা উচিত নহে?

অল্পের মধ্যে প্রশ্ন গুলির কতকটা উত্তর দিলাম। ঐ বিষয়ে ভাবিবার ও বলিবার অনেক আছে।

শ্রীআশুতোষ চৌধুরী।

সাময়িক কথা।

নাগর ব্রাহ্মণগণ সম্প্রতি উৎসাহের সহিত সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হই তাঁহাদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি একত্র হইয়া এক আহ্বান করিয়াছিলেন, সেখানে ডাক্তার এম, কে, দিক্ষীত এবং এস, ি

নাগর ব্রাহ্মণগণের সমুদ্রযাত্রা।

প্রভৃতি যুবককে শিল্পশিক্ষার জন্য বিলাতে বার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। নাগর ব্রাহ্মণ সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অতি স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, দেবনাগর অক্ষর তাঁহাদের দেশ হইতে ক্র সমস্ত ভারতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল, তাঁহারা যে সৎসাহসের সহিত সমাজ ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধার চেষ্টা প্রতীয়ম সমাজের বিধানগুলি মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ঘরের একটা অন্ততঃ আকাশের রৌদ্র এবং হাওয়া গমনাগমনের জন্য খুলিয়া রাখি রুদ্ধগৃহে ভাল জিনিষও নষ্ট হইয়া উঠে, বাহিরের সঙ্গে ভিতরকার এ অগ্রাহ্য করিলে টিঁকিয়া থাকা অসাধ্য হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণগণ যদি প্রকৃতই নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জটিল সূত্রগুলির আটঘাট বাঁধিয়া প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিয়া কিসে প্রভূত হিত হয় তাহা করিতে থাকুন,—নতুবা তাঁহারা শীঘ্র সমস্ত শ্রদ্ধা স্থানচ্যুত হইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহারা উপবীত তিলকমাত্র দেখাইয়া আর আদায় করিতে পারিবেন না।

বাঙ্গালা দেশে দশ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র যাত্রার সপক্ষে ও বিপক্ষে ব তর্কযুক্তি চলিতেছিল, কিন্তু যে কালের যাহা উপযোগী তাহা রোধ করিবা

বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা।

নাই। প্রাচীন সমাজের সিংহদ্বার মরিচা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন নানা দি প্রয়োজন আসিয়া দ্বারে ক্রমাগত আঘাত তাহাকে খুলিতেই হইবে। বিরুদ্ধবাদীগণ এখন ডাকিয়া খুঁজিয়াও লোক প

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের স্বদেশীয় অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সভাগুলিতে তাহ
হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু বঙ্গদেশের জেলায় জেলায় সভা
বিদেশে যুবকগণকে শিল্পশিক্ষার্থ পাঠাইবার জন্য সর্ব্বত্রই ব্যবস্থা
কৃষ্ণনগরের রাজা, দিনাজপুরের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা—ইহাঁ
সম্প্রদায়ের নেতা, ইহাঁরাই উদ্যোগী হইয়া সমুদ্রযাত্রার কল্পে অর্থ
পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন—সুতরাং যে প্রশ্ন প্রাচীনগণের জটিল
পড়িয়া এককালে বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিয়া ছিল, তাহার এখন
মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বর্দ্ধমানে অ
সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূলে শ্রীযুক্ত ইন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপ
করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আপত্তি সভায় গ্রাহ্য হয় নাই। ব
বাসী পত্রিকায় ইন্দু বন্ধু বিদেশ যাত্রার বিরুদ্ধে কতকগুলি যু
করিয়াছেন।

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন শিল্পসম্বন্ধে প্রাথমিক অনুষ্ঠান এদেশেই আরব্ধ হ
তৎসম্বন্ধে আমরা উদাসীন। এদিকে যাঁ
হইতে শিল্পশিক্ষা করিয়া এদেশে প্রত্যাগত
এখানে তাঁহারা সেই শিক্ষার সার্থকত
কোন প্রকার সুযোগ পাইতেছেন না, f
বিদেশে যুবক বৃন্দকে পাঠাইয়া নামে মাত্র দেশহিতৈষণা অনুষ্ঠিত হইতে

প্রাথমিক শিল্পশিক্ষা এই দেশেই আরব্ধ হওয়া উচিত, তাহাতে
শ্রীযুক্ত ওয়াম্নে প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিয়া তোলে—
কষ্টে ও এত ব্যয় বহন করিয়া বিদেশ হইতে যাহা শিখিয়া আসিে
প্রয়োগের ক্ষেত্র ও সুযোগ পাইতেছেন না,—সুতরাং তাহা ত নষ্ট হ
জাপান কিম্বা অপর কোন দেশ হইতে যদি নিপুণ শিল্পী আনি
যুবকবৃন্দকে শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করা যায়, তবে কাজের অনেকটা সু
পারে, বিদেশী শিল্পী আমাদের দেশের উপকরণাদি জানিয়া কি ভা
শিল্পানুষ্ঠান সার্থক হইতে পারিবে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

সাময়িক কথা।

নাগর ব্রাহ্মণগণ সম্প্রতি উৎসাহের সহিত সমাজসংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি একত্র হইয়া একটি সভা আহ্বান করিয়াছিলেন, সেখানে ডাক্তার এম, কে, দিক্ষীত এবং এস, বি, যুথার প্রভৃতি যুবককে শিল্পশিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে।

নাগর ব্রাহ্মণগণের সমুদ্রযাত্রা।

নাগর ব্রাহ্মণগণ এক সময়ে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, দেবনাগর অক্ষর তাঁহাদের দেশ হইতে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ভারতে প্রতিষ্ঠা পাইয়াছিল, তাঁহারা যে সৎসাহসের সহিত সমাজ সংস্কারে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরবের পুনরুদ্ধার চেষ্টা প্রতীয়মান হয়। সমাজের বিধানগুলি মাঝে মাঝে পরিবর্ত্তন করিতে হয়, ঘরের একটা জানালা অন্ততঃ আকাশের রৌদ্র এবং হাওয়া গমনাগমনের জন্য খুলিয়া রাখিতে হয়, রুদ্ধগৃহে ভাল জিনিষও নষ্ট হইয়া উঠে, বাহিরের সঙ্গে ভিতরকার এই সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করিলে টিঁকিয়া থাকা অসাধ্য হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণগণ যদি প্রকৃতই দেশের নেতার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে ইচ্ছা করেন, তবে সমাজের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রাচীন জটিল সূত্রগুলির আটঘাট বাঁধিয়া প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিয়া কিসে সমাজের প্রভূত হিত হয় তাহা করিতে থাকুন,—নতুবা তাঁহারা শীঘ্র সমস্ত শ্রদ্ধা হারাইয়া স্থানচ্যুত হইয়া পড়িবেন, তখন তাঁহারা উপবীত তিলকমাত্র দেখাইয়া আর সে ভক্তি আদায় করিতে পারিবেন না।

বাঙ্গালা দেশে দশ বৎসর পূর্ব্বে সমুদ্র যাত্রার সপক্ষে ও বিপক্ষে কতই না তর্কযুক্তি চালিতেছিল, কিন্তু যে কালের যাহা উপযোগী তাহা রোধ করিবার উপায় নাই।

বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা।

প্রাচীন সমাজের সিংহদ্বার মরিচা পড়িয়া রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু এখন নানা দিক হইতে প্রয়োজন আসিয়া দ্বারে ক্রমাগত আঘাত দিতেছে, তাহাকে খুলিতেই হইবে। বিরুদ্ধবাদীগণ এখন ডাকিয়া খুঁজিয়াও লোক পান না;

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষের স্বদেশীয় অনুষ্ঠান সংক্রান্ত সভাগুলিতে তাহাই প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু বঙ্গদেশের জেলায় জেলায় সভা করিয়াছেন, বিদেশে যুবকগণকে শিল্পশিক্ষার্থ পাঠাইবার জন্য সর্ব্বত্রই ব্যবস্থা হইতেছে। কৃষ্ণনগরের রাজা, দিনাজপুরের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা—ইহাঁরা রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা, ইহাঁরাই উদ্যোগী হইয়া সমুদ্রযাত্রার কল্পে অর্থ সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন—সুতরাং যে প্রশ্ন প্রাচীনগণের জটিল বুদ্ধির চক্রে পড়িয়া এককালে বড়ই দুরূহ হইয়া উঠিয়া ছিল, তাহার এখন অতি সহজে মীমাংসা হইয়া যাইতেছে। এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বর্দ্ধমানে আহুত সভায় সমুদ্রযাত্রার প্রতিকূলে শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আপত্তি সভায় গ্রাহ্য হয় নাই। সম্প্রতি পল্লীবাসী পত্রিকায় ইন্দু বাবু বিদেশ যাত্রার বিরুদ্ধে কতকগুলি যুক্তি উত্থাপিত করিয়াছেন।

সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি বলেন শিল্পসম্বন্ধে প্রাথমিক অনুষ্ঠান এদেশেই আরব্ধ হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আমরা উদাসীন। এদিকে যাঁহারা বিদেশ হইতে শিল্পশিক্ষা করিয়া এদেশে প্রত্যাগত হইতেছেন, এখানে তাঁহারা সেই শিক্ষার সার্থকতা দেখাইতে কোন প্রকার সুযোগ পাইতেছেন না, শিল্পের নামে বিদেশে যুবক বৃন্দকে পাঠাইয়া নামে মাত্র দেশহিতৈষণা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

প্রাথমিক শিল্পশিক্ষা এই দেশেই আরব্ধ হওয়া উচিত, তাহাতে ভুল নাই, শ্রীযুক্ত ওয়াগ্লে প্রভৃতির দৃষ্টান্ত আমাদিগকে নিরুৎসাহ করিয়া তোলে—ইহাঁরা এত কষ্টে ও এত ব্যয় বহন করিয়া বিদেশ হইতে যাহা শিখিয়া আসিলেন, তাহার প্রয়োগের ক্ষেত্র ও সুযোগ পাইতেছেন না,—সুতরাং তাহা ত নষ্ট হইবার মধ্যে। জাপান কিম্বা অপর কোন দেশ হইতে যদি নিপুণ শিল্পী আনিয়া এদেশীয় যুবকবৃন্দকে শিক্ষার জন্য নিযুক্ত করা যায়, তবে কাজের অনেকটা সুবিধা হইতে পারে, বিদেশী শিল্পী আমাদের দেশের উপকরণাদি জানিয়া কি ভাবে এদেশের শিল্পানুষ্ঠান সার্থক হইতে পারিবে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

এই একটা দিক্ আছে, কিন্তু এতদ্দেশীয় যোগ্য ছাত্র পাঠাইয়া তাহাদিগকে বিদেশে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করাও আমাদের অন্যতম কর্ত্তব্য,—বিদেশে নানা প্রকার শিল্পানুষ্ঠানের মধ্যে ভারতীয় যুবক অবশ্যই দেশের এবং স্বপ্রকৃতির উপযোগিতা অনুসারে কোন না কোন বিষয়ে কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন,—যোগেন্দ্র বাবুর চেষ্টা শুধু ভারতীয় যুবককে বিদেশে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া নিরস্ত হইবে না, তাঁহারা এদেশে আসিয়া যাহাতে স্বীয় শিক্ষা কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন—তজ্জন্য সমস্ত অনুষ্ঠানের আয়োজনেও তিনি উদ্যত হইয়াছেন। ইন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন শিল্প শিখাইতে বিদেশে লোক পাঠাইবার প্রয়োজন হইলে খ্রীষ্টান, মুসলমান বা ব্রাহ্মসমাজের যুবকদিগকে পাঠাইলেই হইতে পারে, হিন্দুগণের এ বিষয়ে আপত্তি থাকিলে তাঁহাদিগকে লইয়া এ বিষয়ে টানা হেঁচড়া করিবার প্রয়োজন কি? অপর সমাজের লোকেরা শিল্প শিখিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষিত করিবার ভার অনায়াসে লইতে পারেন।

প্রাচীন সমাজের লোকেরা সমুদ্রযাত্রার প্রতি একটা আশঙ্কার ভাব অনেক দিন যাবৎ বহন করিয়া আসিতেছেন,—ইহাকে পরিহাস পূর্ব্বক একবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না, যদিও হিন্দুসমাজ বিলাতযাত্রীকে এখন আর গৃহতাড়িত করিতে সমর্থ হইবেন না—এ সম্বন্ধে নিতান্ত সংস্কারাবদ্ধ অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত অধিকাংশ ব্যক্তিই উদারতা অবলম্বন করিয়াছেন—তথাপি বিলাত যাত্রার যে কিছু কুফল না দেখা গিয়াছে এমন নহে।

বিলাত একটা প্রবল চুম্বকের ন্যায় নানা দিক হইতে সকলকে আকর্ষণ করে,—মহত্বের উচ্চতম শিখর হইতে অবনতির নিম্নতম গহ্বর পর্য্যন্ত যোগ্যতাভেদে প্রত্যেককে টানিয়া লইয়া উঠায় বা নামায়। চরিত্রবলশূন্য যুবককে মোহাচ্ছন্ন, ভ্রষ্ট ও জাতীয়তাচ্যুত করিতে য়ুরোপের একদিনের বেশী আবশ্যক হয় না, নানারূপ দৃষ্টান্তে তাহা দেখা গিয়াছে—যাঁহারা বিদেশে জ্ঞান লাভার্থে গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও দেশে থাকিলে সমাজ এবং স্বপরিবারবর্গের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল হইত।

কিন্তু পৃথিবীতে যাহা কিছু ভাল তাহারই একটা খারাপ দিক আছে,—ইংরেজী শিক্ষা, স্ত্রী-শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কল্যাণকর বিষয়গুলির বিরুদ্ধেই এইরূপ নানা যুক্তি শ্রুত হইয়া থাকে,—যাহা সমাজের পক্ষে প্রধানতঃ মঙ্গলকর আমাদের

তাহারই জন্য অগ্রসর হওয়া উচিত। তীর্থভ্রমণ কুলীনরূপে প্রতিষ্ঠা পাইবার অন্যতম সোপান বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, সেই তীর্থযাত্রী বহুব্যক্তি কি প্রলোভন বা মোহে আচ্ছন্ন হইয়া কুপথে পরিচালিত হন নাই, তীর্থগুলি কি এইভাবে আবর্জ্জনা-ময় হইয়া উঠে নাই ?. কিন্তু তীর্থযাত্রা তজ্জন্য নিষিদ্ধ হয় নাই। বিলাত এখন প্রধান তীর্থে পরিণত হইয়াছে, যাহা কিছু চিন্তা ও চেষ্টাকে উন্নতির পথে প্রবৃদ্ধ করে, বিলাত দর্পণের ন্যায় তাহা আমাদের চক্ষে প্রতিভাত করিয়া দেখাইতেছে। যিনি যে বিষয়ে উন্নতির জন্য চেষ্টিত,—তাঁহাকেই সেই চেষ্টার চরম সার্থকতা দেওয়ার জন্য বিদেশগমন প্রধান সোপান স্বরূপ—সুতরাং কোন কোন ব্যক্তি পদস্খলিত হইবে, এই আশঙ্কায় বিরাট হিতের দ্বাররোধ করিয়া রাখা যায় না,—আমাদের এই বক্তব্য যাঁহারা বিদেশে প্রেরিত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হইবেন তাঁহাদের যোগ্যতার যেন ভালরূপ পরিচয় লওয়া হয়।

বাণিজ্য বিস্তারের জন্যও স্বদেশের সঙ্গে বিদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনের অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে বাণিজ্যতরণী পিপীলিকার ন্যায় ভারতের ভাণ্ডারকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, ভারতলক্ষ্মী একখানি তরণী বিদেশে পাঠাইয়া বাণিজ্য সম্বন্ধে যথোচিত প্রত্যুত্তর দিবেন না কি ? দীর্ঘকাল কূপে মণ্ডূকের ন্যায় এক গহ্বরে পড়িয়া রহিলাম, বাহির পাছে কোনরূপে স্পর্শ করে এই আতঙ্কে চোখের পাতা নিমীলিত করিয়া রাখিয়াছি, বাহিরের সংস্পর্শ এই উপায়েও রোধ করিতে পারি নাই,—এখন কে কি ভাবে কোন্ পথে আক্রমণ করিয়া আমাদিগকে হৃতসর্ব্বস্ব করিবার চেষ্টায় আছে—একবার বাহির হইতে ঘুরিয়া তাহা দেখিয়া লওয়া কর্ত্তব্য, তবেই আমারা আট ঘাট বাঁধিয়া আত্মরক্ষা করিয়া থাকিতে পারিব। বাহির যখন প্রবলবেগে আসিতেছে—তখন বাহিরের খবরটা একবার লওয়ার দরকার পড়িয়াছে। আর পৃথিবীতে জন্ম ধারণ করিয়া হিন্দু হিমালয়ের উত্তরে ও ভারত সাগরের অপর পারের কোন জিনিস দেখিতে পারিবে না—তাহার চক্ষে এরূপে ঠুলি বাঁধিয়া রাখাই কি তাহাদিগকে বাঁচাইবার পথ ?

পূজনীয় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণী এই পত্রিকার অন্যত্র প্রদত্ত হইয়াছে, বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে

প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত সমাজপতি নিয়োগ সম্বন্ধে নানা পত্রিকায় নানারূপে অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে, নিউ ইণ্ডিয়া এবং মহারাট্টা বলিতেছেন,—"সমাজপতি কেহ কাহারও গড়াপেটায় হইতে পারেন না, জাতীয় শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিয়া সমাজ পতি আপনা আপনি আবির্ভূত হইয়া থাকেন, কৃত্রিম উপায়ে সভা সমিতি করিয়া সমাজপতি নির্ব্বাচন করা স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী নহে।"

আজ্ঞানুবর্ত্তিতা ও ভক্তি

আমাদের মতে একজন সমাজপতির অভিষেক করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে যে দেশের কল্যাণ হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই; যেখানে যে কার্য্য হইতেছে, তাহাই কাহারও আদেশ পালন করিয়া হইতেছে; কুলিদিগের সর্দ্দার, পাঠশালার গুরুমহাশয়, আফিসের বড় সাহেব হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সম্রাট অবধি সর্ব্বত্রই দেখা যায় কোন এক স্থলে শক্তি কেন্দ্রীভূত না হইলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। কিন্তু ইহাঁদের প্রত্যেকের হস্তেই দণ্ড দেওয়ার ক্ষমতা রহিয়াছে, রাজসিক শক্তির সশস্ত্র পাহাড়ায় সাত্বিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি যথাযথ কার্য্য করিতেছে, বিগড়াইয়া যাইতেছে না, এমন কি নিরীহ পল্লী পাঠশালার গুরুমহাশয়ের বেত্র একটা দৃষ্টান্ত স্থলীয় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে। যেখানে সেই রাজসিক শক্তি নাই সেখানে উদ্দাম স্বেচ্ছাচারিতাকে কে সংযত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী রাখিবে?

সাময়িক প্রয়োজন অনুসারে যোদ্ধাদের মধ্যে একজন অধিনায়ক প্রতিষ্ঠিত হয়, দস্যুদের মধ্যে একজন দলপতি সাব্যস্ত হয়, কিন্তু দণ্ড দেওয়ার সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সেইরূপ দলপতি অভিষিক্ত হইয়া থাকে। আজ জাপানে লোকেরা দেশের জন্য পতঙ্গের ন্যায় যুদ্ধানলে স্বেচ্ছায় স্বদেশানুরাগে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতেছে, কিন্তু এই জাপানী সেনাদিগের মধ্যেও যদি কেহ সেনাপতির আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করে, তবে তাহাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়—সুতরাং আদর্শ স্বদেশানুরাগকেও কার্য্যক্ষেত্রে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য একটা পাশব শক্তিকে পশ্চাতে রাখিতে হয়। মিকাডোর প্রতি জাপানীর ভক্তি আদর্শভক্তি, কিন্তু জাপানী মিকাডোর শক্তিকেও একটু ভয় ও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া থাকে।

হিন্দু সমাজে এতকাল ব্রাহ্মণগণ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন—ইহা কি শুধু শ্রদ্ধা

ভক্তিতে ? তাহা হইলে হিন্দুস্থান এত দিন ভক্তির চর্চ্চায় স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইত। হিন্দুরাজগণ, প্রতি পল্লী-জমীদারগণ ব্রাহ্মণ্য শক্তিকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, এই জন্য সমাজ তাঁহাদিগকে মানিয়া চলিয়াছে—কর্ণ ধারণ করিবার শক্তি না থাকিলে কর্ণ ধারিত্ব সুসিদ্ধ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। রাজা ও জমিদারগণের শক্তি ছাড়া বহু প্রাচীন কাল হইতে শাস্ত্রনিবদ্ধ ধর্ম্মভয় সমাজকে ব্রাহ্মণের শাসনের অধীন রাখিয়া ছিল, ব্রাহ্মণের অঙ্গুলিসঙ্কেতে যে কোন ব্যক্তি জাতিচ্যুত হইতেন, সুতরাং ঐহিক ও পারত্রিক দণ্ডভয়ে সমাজ ব্রাহ্মণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, যে অবধি রাজার আশ্রয় হইতে ব্রাহ্মণ স্খলিত হইয়াছেন তদবধি তাঁহার সামাজিক প্রাধান্য লোপ পাইয়াছে।

হিন্দু স্ত্রী স্বীয় স্বামীকে পূজা করিয়া থাকেন, স্বামী ভাল মন্দ যাহা হউন—তিনি স্ত্রীর ভক্তি ও পূজা পাইয়া থাকেন,—কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের পবিত্রতা ও পরিবারে সুব্যবস্থা বিধানের জন্য এই উপায়টি অবলম্বন করিতে সমাজকে কত চেষ্টা করিতে হইয়াছে; সীতা, সাবিত্রী ও বেহুলার কাহিনী প্রভৃতির দ্বারা হিন্দুললনাকে আবহমান কালাগত একটা সংস্কারের অধীন করিয়া রাখা হইয়াছে—তারপর শাস্ত্রকারগণ স্বামীসেবা ফলের একটা সুদীর্ঘ তালিকা করিয়া রাখিয়াছেন, স্বামীভক্তির ত্রুটি হইলে কোন্ নরকে যাইতে হইবে তাহার একটা বিভীষিকাময় চিত্র দিতেও তাঁহারা ছাড়েন নাই—ইহা ছাড়া কোনরূপে স্বামীর অপ্রিয় হইলে রমণীকে পথে দাঁড়াইতে হয়, তাঁহার পিতামাতাও তাঁহাকে গ্রহণ করেন না। সুতরাং এই অন্ধভক্তিমূলক উদাহরণ দ্বারাও সমতুল্য অবস্থার অভাবে সমাজ-পতির শক্তি পরিচালনার সুযোগ প্রতিপন্ন করা যায় না। যেখানেই কোন অধিনায়কত্ব দেখা যায় সেইখানেই সহস্র প্রকারে ভক্তি ও শ্রদ্ধা উৎপাদনের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল দণ্ড শক্তিকে দাঁড় করাইয়া রাখিতে হয়, তাহা হইলেই যন্ত্রটি ঠিক মত চলিতে পারে।

যদি বলেন একবার সমাজপতি মানিয়া লওয়ার পর তাঁহার অবাধ্য হইলে বিদ্রোহীকে নিন্দা ও গালির দ্বারা শাসিত করা হইবে, তবে ভাবিয়া দেখা উচিত যে এইরূপ নিন্দা ও গালিতে যাঁহারা বিচলিত হইবেন, তাঁহারা সংখ্যায় অতিনগণ্য, অধিকাংশের জন্য উৎকটতর শাসনের প্রয়োজন। গোবর ভক্ষণ, মস্তক মুণ্ডন, গর্দ্দভ-পৃষ্ঠারোহণ, জাতি-নাশ প্রভৃতি শাসনের সুযোগ এখন কোথায়?

রাজশক্তির আশ্রয় না পাইয়া প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপর ব্রাহ্মণগই আর সেরূপ শাসন পরিচালনা করিতে পারিতেছেন না। নব্য সম্প্রদায় একেবারে নিরঙ্কুশ, তাঁহাদিগকে সুসংযত রাখিতে আধুনিক কোন শাসনই শক্তিশালী হইবে, কিন্তু সেইরূপ শাসন-শক্তি সমাজপতি কিরূপে পাইবেন? সেই শক্তি না হইলে এই হইবে যে সমাজপতি মহাশয় যাহা বলিবেন, পাঁচ জন তাহা ভাল বোধ করিবেন, পনের জনের তাহাতে দ্বিধা থাকিয়া যাইবে, এবং ত্রিশ জনের তাহা ভাল লাগিবে না। কৃতকার্য্য পঞ্চজনের বিজয় উল্লাসে প্রতিপক্ষের অমত বিদ্বিষ্ট হইয়া ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে, এবং যাহা দেশের হিতার্থে পরিষ্কার মুকুরের ন্যায় বোধ হইতেছে, সেই আদর্শটি শতধা চূর্ণ হইয়া যাইবে।

ভক্তির দ্বারা সামাজিক কার্য্যের সফলতা মাত্র এক স্থানে সুসিদ্ধ হইতে পারে,—সে মহাপুরুষের আবির্ভাবে। বুদ্ধ চৈতন্য প্রভৃতির ন্যায় ব্যক্তির অভ্যুদয়ে ভক্তের প্রবল দল তাঁহাদের ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইতে পারেন; শাস্ত্রের বচন, রাজদণ্ড, সমাজনিগ্রহ একত্র হইয়া যাহা করিতে না পারে, মহাপুরুষ কোনওরূপ পাশব শক্তি বা ঐহিক পুরস্কারের লোভ না দেখাইয়া অতি সহজে তাহা সম্পন্ন করেন। কিন্তু তাহা ছাড়া অন্যত্র যেখানেই আজ্ঞানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন, সেই খানেই শত শ্রদ্ধাভক্তি সত্ত্বেও শাসনের একটা বজ্র উদ্যত করিয়া রাখিতে হয়। নতুবা দল গঠিত হইতে পারে না।

কিন্তু এখন আমাদের উচ্ছৃখল স্বস্বপ্রধান সমাজে শৃঙ্খলা আনিবার জন্য একজন সমাজপতি চাই সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ সমবেত কার্য্য দলপতি ভিন্ন অসম্ভব। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ সমাজপতি ছিলেন, এখন ব্রাহ্মণ স্বাধিকারবিচ্যুত ও একান্ত অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন—ইংরেজ সেই স্থানটি লইয়াছে, তাহার দণ্ড পুরস্কার দেওয়ার ক্ষমতা আছে বলিয়াই সে স্বাভাবিক নিয়মে নায়কত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু ইংরেজের স্বার্থ আমাদের স্বার্থ এক নহে, ইংরেজকে আমাদের সামাজিক প্রাধান্য দেওয়াতে নিজেদের স্বার্থ আমরা হারাইতে বসিয়াছি, অথচ প্রবল দণ্ডের ভারপ্রাপ্ত নায়ক না হইলে তিনি যে সমাজহিতকল্পে কার্য্য করিতে পারিবেন এরূপ বোধ হয় না।

দলপতির নিয়োগ এবং তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি ও সুযোগ সম্বন্ধে আমাদের যে মনে সকল আশঙ্কার উদয় হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করিলাম। কিন্তু পূর্ব্বেই

উল্লেখ করিয়াছি যে সমাজপতিকে মানিয়া লইয়া সংখ্যায় অত্যল্প কয়েকটি লোক মাত্র কার্য্য করিতে প্রস্তুত থাকিতে পারেন। দলপতির প্রশংসা বা নিন্দাই তাঁহাদের কার্য্যে প্ররোচক হইবে।

যদি এই অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তিও ঐকান্তিকতার সহিত কার্য্য করিতে পারেন —তবে এই অশ্রদ্ধা ও স্ব স্ব প্রাধান্যের দিনে বহুবাক্‌বিতণ্ডা হইতে সেই পন্থা শ্রেয়ঃ হইবে। দেশের প্রকৃত হিতসংকল্পে যে কয়েকখানি ইষ্টক ভিত্তিস্বরূপ স্থাপিত হইবে তাহা সুদৃঢ় হইলে কালে হয় ত তাহা প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধারণের উপযোগী হইবে। যতই কেন সামান্য হউক না তাঁহাদের কার্য্যের সফলতা চতুর্দ্দিক হইতে লোক আকর্ষণ করিবে এবং দলটি ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইবে। এই দল কালে প্রবল হইয়া এমন একটী সমাজ গঠন করিতে পারে যাহার আশ্রয় ও নিগ্রহ উভয়ই কার্য্যকরী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া উহাকে প্রবলতর করিয়া তুলিবে। আজই যে সমাজ-পতির ধ্বজার নিম্নে সহস্র সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়া আত্মসমর্পণ করিবে তাহার সম্ভব নাই, এবং বহু লোককে আহ্বান করিয়া অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে মতভেদের দৌরাত্ম্যে দলটি ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে ;—যাঁহারা অনুষ্ঠাতা—তাঁহাদেরই জীবনে ভক্তি ও কর্ম্মনিষ্ঠার আদর্শ দেখাইয়া -ঐক্যরূপ মহামন্ত্রের প্রভাব দৃষ্টান্তস্থলীয় করা উচিত। জাপানের ক্ষত্রিয় সামুরাই দল এক সময়ে এইরূপ ভক্তি ও একনিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সমস্ত জাপান সমাজকে উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ওকাকুরা তাঁহার "Ideals of the East" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন— "ভারতবর্ষে গুরুর প্রতি যে ভক্তি, সামুরাইগণ তাঁহাদের দলপতির প্রতি তদ্রূপ ভক্তি বহন করিতেন—প্রত্যেক সামুরাইকে এই প্রবল ভক্তির উচ্ছ্বাস কার্য্যের প্রেরণা প্রদান করিত। হিন্দু রমণী যেরূপ স্বামীর জন্য এবং ভক্ত যেরূপ দেবতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিয়া থাকেন, দলপতির হত্যার প্রতিশোধার্থ তাঁহারা সেইরূপ ভাবে আত্মোৎসর্গ করিতেন।"

সুতরাং দেখা যাইতেছে জাপানের মিকাডোর প্রতি বর্ত্তমান ভক্তি, দলবিশেষের দলপতির প্রতি ভক্তি হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া, ধীরে ধীরে সমস্ত জাতিতে সংক্রামিত হইয়া, জাতীয় অধিনায়কের প্রতি প্রবাহিত হইয়াছে। এই ভাবে ভক্তির চর্চ্চার দ্বারা যদি আমরা কার্য্যের সূত্রপাত করি তবে এখন তাহা যতই নগণ্য হউক না কেন,—চিরদিন তাহা নগণ্য থাকিবে না, তাহা ক্রমে সংস্কাররূপে

আমাদের উত্তরবংশে সঞ্চারিত হইবে। একটুও যদি অগ্রসর হই, তথাপিও মনে করিব, শ্রম পণ্ড হয় নাই।

এইখানে আর একটা কথা মনে উদয় হয়। এখন যে সকল ব্যক্তি এক একটি দলের অধিনায়ক স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গে দলটি পাওয়া যাইবে। দলকে দলপতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমরা যেন আত্মদ্রোহের শিক্ষাদাতা না করি, ভক্তির বিকাশের জন্ত অনুষ্ঠান যেন মুখবন্ধে ভক্তিকে আঘাত করিয়া কার্য্য আরম্ভ না করে, তাহা হইলে ইহা স্বীয় উদ্দেশ্যকে পরাস্ত করিবে। কংগ্রেসের দল সুরেন্দ্র বাবুকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন, সেইরূপ শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ শ্রেণী-বিশেষের দলপতি হইয়া আছেন,—এইরূপে যে স্থানে কোন এক শ্রেণী কোন মহোদয়কে স্বীয় অধিনায়কত্বে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সকল নেতাগণকে লইয়া রবীন্দ্রবাবু যদি প্রাথমিক অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন, তবে বোধ হয় পন্থা অনেক সুগম হইতে পারে। এইরূপে শ্রদ্ধা ও ভক্তি এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করিয়া কার্য্য করিতে পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে। আর যাঁহারা দেশের হিতকামনা করিয়া কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগকে প্রবন্ধকার সবহমানে দেশের নামে আহ্বান করিলে, কেনই বা তাঁহারা আসিবেন না? আন্তরিক স্বদেশ প্রীতির প্রেরণায় উদ্বোধিত হইয়া সুযুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া বলিলে কেনই বা তাঁহারা মানিবেন না?

আরও একটি বিষয় ভাবিবার আছে। পূজনীয় রবীন্দ্রবাবু কন্‌গ্রেসকে একেবারে হিসাবের বার করিয়াছেন। কন্‌গ্রেস বলিতে কেবলই নিষ্ফল ভিক্ষার ঝুলি চোখের সম্মুখে দেখিয়াছেন! কিন্তু কন্‌গ্রেসের সফলতা যেখানে, প্রকৃত হিসাবী হইয়া তাহারও প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কাজ আদায় করিয়া লইতে হইবে। কন্‌গ্রেস আমাদের একটি অনেক দিনের অনেক আয়োজনে তৈরি রথ—চলিতেছে বিপথে। ইহার উপর চড়িয়া সারথি হইয়া ইহাকে ঠিক পথে চালানর চেষ্টা হউক—রথখানা একেবারে বিসর্জ্জন করা পাকা গৃহস্থের কাজ হইবে না।

শ্রীমতী সরলা দেবী।

হাফিজের স্বপ্ন।

অমাযামিনীর গহন আঁধারে চুপি চুপি এল প্রিয়া
দ্বিগুণ আঁধার খর্জুর বীথি তাহারি আড়াল দিয়া।
আঙুরের মত অলকগুচ্ছে গোলাবের মালা পরি,
মৃদু উষিরের মদির গন্ধে নিশীথ আকাশ ভরি ;
কাজল উজল কাল কটাক্ষে হানিয়া বিজলী হাসি,
ফেরোজা রঙের বসনটি পরি শিথানে দাঁড়াল আসি।
বীণানিন্দিত মধুর কণ্ঠে কহিলা অনুরাগি
"শূন্য শয়নে আমারে মাগিয়া জাগিয়া কিসের লাগি ?
হে আমার চিরভক্ত কিশোর প্রিয়তম কবি মোর,
হৃদয় আমার মুগ্ধ করেছে মধুর বাঁশিটী তোর।
কোন্ নবতানে কোন্ সুরে গানে শিখাইব তোরে আজি,
কবিতার কোন্ অমর কুসুমে ভরিব চিত্ত সাজি ?"
করুণা তাহার হৃদয়ে হানিল সুখের মতন ব্যথা,
যুড়ি যোড়পাণি স্তম্ভিতবাণী কণ্ঠে কহিনু কথা।
হে মোর মোহিণী কল্পনা-দূতি হে মোর তরুণী সাকী
হে মোর যুগল নয়নের আলো আজ কোথা তোরে রাখি ?
চির ভিখারীর স্বপনের মণি ঐ তব মুখখানি,
কলিজার মাঝে লুকায়ে রাখিয়া তৃপ্তি তবু না মানি।
বহু বাঞ্ছিত চিতসঞ্চিত হে মোর প্রেয়সী হুরি
কি যাদু করিয়া পরাণ আমার করিছিস্ তুই চুরি,
জানিনা কোরাণ কাবা মুরসীদ মানি না আল্লাপীর
জরিমণ্ডিত ঐ পদতলে বিকায়েছি মোর শির।
চির বাসনায় চিরকামনায় চির সাধনার ধন
সার্থক আজি দীর্ঘ বিরহ সার্থক এ জীবন।
তব অঞ্চল বসন্ত বায়ে হৃদয়ে যে ফুল ফুটে
তব মঞ্জীর সঙ্গীত রবে হৃদয়ে যে ধ্বনি উঠে,

তাহারি গন্ধে তাহারি ছন্দে রচিয়া গজল গীতি
কুঞ্জ দুয়ারে গাহিয়া গাহিয়া শুনাইব নিতি নিতি।
নাহি চাই খ্যাতি, যশে কাজ নাই, চাহিনাক ধনমান
তোমার স্তবের যোগ্য করিয়া শিখাইয়া দাও গান।
না কহিয়া কথা না বলিয়া কিছু, লীলায়িত হেলাভরে
সেতারটি শুধু লইল টানিয়া কোমল বুকের পরে
অঙ্গুরি পরা অঙ্গুলি তলে পরশে কম্পমান
রণিয়া রণিয়া ধ্বনিয়া উঠিল কত যে গজল গান।
বাজিল ইমন, বাজিল সাহানা বাজিল সিন্ধু কাফ
বক্ষের দুটি শুভ্র আপেল উঠিতে লাগিল কাঁপি।
কাঁপিয়া কাঁদিয়া দুলিয়া ফুলিয়া শতবার ফিরে ফিরে,
মোহন মধুর স্বর তরঙ্গ নামিয়া আসিল ধীরে।
মনে হ'ল পিক, মনে হ'ল সারি মনে হ'ল বুলবুল
চারিদিকে যেন উঠিল ফুটিয়া রাঙা বসোরার ফুল।
সুখের দুখের লাজের ভয়ের—ভাবের মিলিত স্রোতে
মনোতরী মোর ভেসে চলি গেল কোন সে অজানা পথে;
প্রবাল অধরে বিজলীর মত ঈষৎ হাসিয়া বঁধু,
স্ফটিক পাত্রে পূর্ণ করিয়া সিরাজের রাঙা মধু,
বাহুটি বাড়ায়ে ধরিল আমার তৃষিত অধর পরে;—
নিঃশেষে তাহা করিলাম পান পরম তৃপ্তভরে।
গোলাবের কুঁড়ি তখনো ভাবেনি ফুটিতে হইবে কিনা,
ডানার মাঝারে মাথাটি গুঁজিয়া চাতকী চেতনাহীনা,
অমাযামিনীর গভীর আঁধারে মিলাইয়া গেল প্রিয়া—
শিশির শীতল খর্জুর বীথি, তাহারি ভিতর দিয়া।
বহুদিন হ'ল, কতদিন সে যে স্মরণে নাহিক ফুটে—
তবু সেই গান হিয়ার মাঝারে ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া উঠে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

পদ্মিনী।

বাপ্পাদিত্যের সময় মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পন করেন, তার পর থেকে সূর্য্যবংশের অনেক রাজা অনেকবার চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন, রাজসিংহাসন নিয়ে কত ভায়ে ভায়ে বিচ্ছেদ, কত কত মহা মহা যুদ্ধ, কত রক্তপাত কত অশ্রুপাতই হয়েগেছে, কিন্তু এত রাজা এত যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে কেবল জন কতক রাজার নাম আর গুটীকতক যুদ্ধের কথা সমস্ত রাজপুতের প্রাণে এখনও সোনার অক্ষরে লেখা রয়েছে। তার মধ্যে একজন হচ্ছেন মহারাজ খোমান যিনি চব্বিশবার মুসলমানের হাত থেকে চিতোরকে রক্ষা করেছিলেন, যিনি আরব্য উপন্যাসের সেই বোগ্‌দাদের খলিফ হারুণ আলরসীদের ছেলে আলমামুনকে চিতোরের রাজপ্রাসাদে অনেক দিন বন্দী রেখেছিলেন; আশীর্ব্বাদ করতে হলে এখনো যাঁর নাম করে রাজপুতেরা বলে—খোমান তোমায় রক্ষা করুণ—আর একজন রাজা, মহারাজ সমরসিং যেমন বীর তেমনি ধার্ম্মিক! তিনি যখন নাগা সন্ন্যাসীর মত মাথার উপর ঝুঁটি বেঁধে পদ্মবীজের মালা-গলায় ভবাণীর খাঁড়া হাতে নিয়ে রাজসিংহাসনে বসতেন, তখন বোধ হত যেন সত্যই ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান কৈলাস থেকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে এসেছেন। তখনকার দিল্লীশ্বর চৌহান পৃথ্বীরাজের হাত থেকে শাহাবুদ্দীন ঘোরি যখন দিল্লীর সিংহাসনের সঙ্গে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ কেড়ে নিতে এসেছিলেন সেই সময় এই মহারাজ সমরসিংহ তেরোহাজার রাজপুত আর নিজের ছেলে কল্যাণকে নিয়ে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষের রাজা পৃথ্বীরাজের পাশে পাশে কাগার নদীর তীরে মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন—সেই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ।

পৃথ্বিরাজ সমরসিংহের প্রাণের বন্ধু, তাঁর আদরের মহিষি মহারাণী পৃথার ছোট ভাই, দুজনে বড় ভালবাসা ছিল! তাই বুঝি এই শেষ যুদ্ধে সমরসিং জন্মের মত বন্ধুত্বের সমস্ত ধার শুধে দিয়ে চলে গেলেন! যখন যুদ্ধের দিন প্রলয়ের ঝড় বৃষ্টির মাঝে পৃথ্বীরাজের লক্ষ লক্ষ হাতী ঘোড়া সৈন্য সামন্ত ছিন্ন ভিন্ন ছারখার হয়ে গেল, যখন জয়ের আর কোন আশা নেই, প্রাণের মায়া কাটাতে না পেরে যখন প্রায় সমস্ত রাজাই পৃথ্বীরাজকে বিপদের মাঝে রেখে একে একে নিজের নিজের রাজত্বের মুখে পালিয়ে চল্লেন, তখন একমাত্র সমরসিং স্ত্রীপুত্র পরিবার রাজমুকুট রাজসিংহাসন তুচ্ছ করে প্রাণের বন্ধু পৃথ্বীরাজের জন্য মুসলমানের সঙ্গে ঘোর যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আগে সেই ধর্ম্মাত্মা মহাবীর সমরসিংহ তাঁর ষোল বছরের ছেলে কল্যাণ আর সেই তেরো হাজার রাজপুতের বুকের রক্তে কাগার নদীর বালুচর রাঙ্গা হয়ে গেল তবে পৃথ্বীরাজ বন্দি হলেন, তবে দিল্লীর হিন্দু সিংহাসন মুসলমান বাদশা শাহাবুদ্দিনের হস্তগত হল। এখন সে শাহাবুদ্দিন কোথায়, কোথায় বা সে দিল্লীর রাজতক্ত, কিন্তু যে ধর্ম্মাত্মা বন্ধুর জন্যে নিজের প্রাণকে তুচ্ছ কল্লেন সেই মহাবীর সমরসিংহের নাম রাজপুত কবিদের সুন্দর গানের মধ্যে চিরকাল অমর হয়ে আছে, এখনও রাজপুতনায় সেই গান গেয়ে কত লোক রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে!

সমরসিংহের পর থেকে প্রায় একশ বৎসর কেটে গেছে, চিতোরের রাজসিংহাসনে তখন রাণা লক্ষণ সিংহ আর দিল্লীতে পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দিন; সেই সময় একদিন রাণা লক্ষণ সিংহের কাকা ভীমসিং সিংহল দ্বীপের রাজকুমারী পদ্মিনীকে বিয়ে করে সমুদ্রপার থেকে চিতোরে ফিরে এলেন। পদ্মের সৌরভ যেমন সমস্ত সরোবর প্রফুল্ল ক'রে ক্রমে দিগ্‌দিগন্তে ছড়িয়ে যায় তেমনি কমলালয়া লক্ষীর সমান সুন্দরী সেই পদ্মমুখী রাজপুত রাণী পদ্মিণীর রূপের মহিমা গুণের গরিমা

দিনে দিনে সমস্ত ভারতবর্ষ আমোদ কল্লে! কি দীন দুঃখীর সামান্য কুটীর, কি রাজাধিরাজের রাজপ্রাসাদ এমন সুন্দরী এহেন গুণবতী কোথাও নাই! এই আশ্চর্য্য সুন্দরী পদ্মিণীকে নিয়ে ভীমসিংহ যখন চিতোরের একধারে সাদাপাথরে বাঁধানো সরোবরের মধ্যস্থলে রাজ অন্তঃপুরে শীতল কোঠায় সুখে দিন কাটাচ্ছিলেন সেই সময়ে একদিন দিল্লীতে তখনকার পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দীন খাসমহলের ছাতে গজদন্তের খাটিয়ায় বসে বসন্তের হাওয়া খাচ্ছিলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছিল, পাশে সরবতের পেয়ালা হাতে পীয়ারী বেগম বসেছিলেন, পায়ের কাছে বেগমের এক নতুন বাঁদী সারিঙ্গার সুরে গজল গাইছিল, বাদশা হঠাৎ বলে উঠলেন "কি ছাই আরবা গজল! হিন্দুস্থানের গান গাও!" তখন পিয়ারী বেগমের নতুন বাঁদী নতুন করে সারঙ্গী বেঁধে নতুন সুরে গাইতে লাগল—"হিন্দুস্থানে এক ফুল ফুটেছিল তার দোসর নাই তার জুড়ি নাই; সে কি ফুল? সে কি ফুল? আহা সে যে পদ্ম ফুল, সে যে পদ্ম ফুল। চারিদিকে নীল জল মাঝে সেই পদ্ম ফুল! দেবতারা সে ফুলের দিকে চেয়ে ছিল, মানুষে সে ফুলের দিকে চেয়ে ছিল, চারিদিকে অপার সিন্ধু তরঙ্গ ভঙ্গে গর্জ্জন করছিল! কার সাধ্য সে সমুদ্র পার হয়, কার সাধ্য সে রাজার বাগিচায় সে ফুল তোলে, সে রাজার ভয়ে দেবতারাও কম্পমান!" আল্লাউদ্দীন বলে উঠলেন "আমি হিন্দু-স্থানের বাদশা আমি কোন রাজারও তোয়াক্কা রাখিনা কোন দেবতাকেও ভয় করি না, পিয়ারী! আমি কালই সেই পদ্মফুল তুলতে যাব!" বাঁদী আবার গাইতে লাগল "কে সে ভাগ্যবান সিন্ধু হল পার? কে সে গুণবাণ তুলিল সে ফুল? মেবারের রাজপুত বীরের সন্তান! রাণা ভীমসিং! নির্ভয় সুন্দর!" আল্লাউদ্দীন কিংখাবের মছলন্দে সোজা হয়ে বসলেন, আনন্দের সুরে গান শেষ হল "আজ চিতোরের অন্তঃপুরে সে ফুল বিরাজে, কবি যার নাম গায় ভারতে তার দোসর কোথা জগতে!

তার জুড়ি কই! ধন্য রাণা ভীমসিং! জয় রাজরাণী চিতোরের রাজ-উদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিণী!” আল্লাউদ্দীনের কানে অনেকক্ষণ ধরে বাজতে লাগল—“চিতোরের রাজউদ্যানে প্রফুল্ল পদ্মিণী!” তিনি আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন “বাঁদী তুই কি সচক্ষে পদ্মিণীকে দেখেছিস্? সে কি সত্যই সুন্দরী?” বাঁদী উত্তর কল্লে “জাঁহাপনা? দিল্লী আসবার আগে আমি চিতোরে নাচ গান করে জীবন কাটাতেম; পদ্মিণীর বিয়ের রাত্রে আমি রাণীর মহলে নেচে এসেচি”—আল্লাউদ্দীন গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন, কিছুক্ষণ পরে বলে উঠলেন “পিয়ারী আমার ইচ্ছে করে পদ্মিনীকে এই খাসমহলে নিয়ে আসি?” পিয়ারি বেগম বলে উঠলেন “শাহেনসা আমার সাধ যায় আকাশের চাঁদটাকে সোণার কৌটায় পুরে রাখি!” কথাটা আল্লাউদ্দীনের ভাল লাগল না, দিল্লীর বাদশা যাঁর মুঠোর ভিতর অর্দ্ধেক ভারতবর্ষ তিনিকি একজন রাজপুত রাণীকে ধরে আনতে পারেন না? শাহেনশা মুখ গম্ভীর করে উঠে গেলেন—মনে মনে বলে গেলেন “থাক পিয়ারী, যদি পদ্মিণীকে আনতে পারি তবে তোমাকে তার বাঁদি হয়ে থাকতে হবে!” তার পর দিন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে আল্লাউদ্দীন চিতোরের মুখে চলে গেলেন। পাঠান সৈন্য যে দিক দিয়ে গেল সে দিকে পথের দুই ধারে ধানের ক্ষেত লোকের বসতি ছারখার করে যেতে লাগল।

তখন বসন্তকাল! সমস্ত চিতোর জুড়ে আনন্দের রোল উঠেছে,—দিকে দিকে “হোরি হ্যায় হোরি হ্যায়,” ঘরে ঘরে আবিরের ছড়াছড়ি, হাসির হো হো, আর বাসন্তি রঙ্গের বাহার—সেই ফাল্গুনে ভরা আনন্দ আর হাসি খেলার মাঝখানে একদিন চিতোরে খবর পৌঁছল আল্লা-উদ্দীন আসছেন—ঝড়ের মুখে প্রদীপের মত চিতোরের সমস্ত আনন্দ এক নিমিষে নিবে গেল। তখন কোথায় রইল রাণার রাজসভায় ধ্রুপদ খেয়ালে হোরি বর্ণনা, কোথা রইল রাণীদের অন্দরে “ফাগুণমে

হোরি মজাও” বলে মিষ্টি সুরে মধুর গান, কোথায় লালে লাল রাস্তায় দলে দলে হাসি তামাসা আর কোথায় বা গোপালজীর মন্দির থেকে রাগ বসন্তে নওবতের সুর! আবীরে গোলাপে লাল লাল চিতোরের ঘরে ঘরে অস্ত্র শস্ত্রের ঝন্‌ঝণার সঙ্গে আর এক ভয়ঙ্কর খেলার আয়োজন চলতে লাগল; সে খেলা লোকের প্রাণ নিয়ে খেলা, তাতে বুকের রক্ত ছুরির ঘা কামানের গর্জ্জন আর যুদ্ধের খোলা মাঠ! শেষে একদিন পাঠান বাদশার কালো নিশেন শকুনির মত মেবারের মরুভূমির উপরে দেখা দিলে ভীমসিং হুকুম দিলেন—কেল্লার দরজা বন্ধ কর—ঝন্ ঝন্ শব্দে চিতোরের সাতটা ফটক তৎক্ষণাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

আল্লাউদ্দীন ভেবে ছিলেন—যাব আর পদ্মিনীকে কেড়ে আনব—কিন্তু এসে দেখলেন বুকের পাঁজর প্রাণের চারিদিক যেমন ঢেকে রাখে তেমনি রাজপুতের তলোয়ার পদ্মিনীর চারি দিকে দিবা রাত্রি ঘিরে রয়েছে, সমুদ্র পার হওয়া সহজ কিন্তু এই সাতটা ফটক পার হয়ে চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে কেড়ে আনা অসম্ভব। পাঠান বাদশা পাহাড়ের নাচে তাম্বুগাড়বার হুকুম দিলেন। সেই দিন গভীর রাত্রে যুদ্ধের সমস্ত আয়োজন শেষ করে রাণা ভীমসিং পদ্মিনীর কাছে এসে বল্লেন “পদ্মিনী তুমি কি সমুদ্র দেখতে চাও? যেমন অনন্ত নীল সমুদ্রের ধারে তোমাদের রাজপ্রাসাদ ছিল তেমনি সমুদ্র?” পদ্মিনী বল্লেন “তামাশা রাখ তোমাদের এ মরুভূমির রাজত্বে আবার সমুদ্র পেলে কোথা থেকে?” ভীমসিংহ পদ্মিনীর হাত ধরে কেল্লার ছাতে উঠলেন, আকাশ অন্ধকার, চন্দ্র নাই তারা নাই—পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নীচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপার পর্য্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন “রাণা এখানে সমুদ্র ছিল আমিতো জানি না, মাগো সাদা সাদা ঢেউ উঠ্‌ছে দেখ”? ভীমসিং হেসে বল্লেন “পদ্মিনী এ যে সে সমুদ্র

নয় ও পাঠান বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্য বল, ঐ দেখ তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত শিবির শ্রেণী, জলের কল্লোলের মত ঐ শোন সৈন্যের কোলাহল! আজ আমার মনে হচ্ছে সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোণার পদ্ম ফুলের মত তোমায় ছিঁড়ে এনেছি সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদ সাগর পার হব ভাবছি"—ভীমসিং আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ একটা কাল পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস সে অন্ধকার ছাতে রাণা রাণীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মত বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রাণার হাত ধরে নেবে গেলেন, সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল একি অলক্ষণ একি অলক্ষণ! তারপর দিন পূবের আকাশে ভোরের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার রাজপুত পাঠানশিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দীন তখন রূপার কুসিতে বসে তশবী দানা জপ করছিলেন, খবর হল—"রাণা লক্ষণ সিংহের দূত হাজির"—বাদশা হুকুম দিলেন—"হাজির হনেকো কহো"—রাণার দূত তিনবার কুর্নিশ করে বাদসাহের সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—"রাণা জানতে চান বাদসাহের সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোরে উপস্থিত হলেন?" আল্লাউদ্দীন উত্তর কল্লেন "রাণার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নাই, আমি রাণার খুড়ো ভীম সিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাঁকে পেলেই দেশে ফিরব।" দূত উত্তর কল্লে "শাহেনসা আপনি রাজপুত জাতকে চেনেন না সেই জন্য এমন কথা বলছেন। রাণার কথা ছেড়ে দিন আমরা দুঃখী রাজপুত আমরাও প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না, আপনি রাণীর আশা পরিত্যাগ করুণ বরং শাহেনসার যদি অন্য কিছু

বার ইচ্ছে থাকে তবে—" আল্লাউদ্দীন দূতের কথায় বাধা দিয়ে লেন, "হিন্দুস্থানের বাদসার এক কথা,—হয় পদ্মিনী নয় যুদ্ধ"—রাণার পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল। সেই দিন সন্ধ্যা বেলা তোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত সর্দ্দার একত্র হলেন—কি করে তোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়—রাজস্থানের রাজ কুটের সমান চিতোর, রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর! সলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড় ড় হিন্দু রাজার রাজত্ব ছারখার হয়ে একবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মত এখনও অটল এখনো স্বাধীন আছে! কি করে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরকে উদ্ধার করা যায়। অনেকক্ষণ ধরে অনেক পরামর্শ তর্ক বিতর্ক চল্লো; শেষে রাণা ভীমসিংহ উঠে বল্লেন "পদ্মিনীর জন্যে যখন চিতোরের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তখন না হয় পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোন দুঃখ নেই, চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে?" কথাটা বলে ভীমসিংহ একবার রাজ সভার একপারে যেখানে শ্বেত পাথরের জালির পিছনে চিতোরের রাণীরা বসেছিলেন সেই দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বল্লেন "মহারাণা কি বলেন?" লক্ষণ সিংহ বল্লেন "যদি সমস্ত সর্দ্দারের তাই মত হয় তবে তাই করা কর্ত্তব্য।" তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত সর্দ্দারদের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন "রাণার বিপদে আমাদের বিপদ, রাণার অপমানে আমাদের অপমান! পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নয় তিনি আমাদের রাণী বটে, কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবী শুদ্ধ লোকে বলবে রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তার রাণীর হয়ে লড়ে। মহারাণা আমরা প্রস্তুত, হুকুম হলেই যুদ্ধে যাই।" মহারাণা হুকুম দিলেন—"আপাততঃ যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, সাবধানে কেল্লার

নয় ও পাঠান বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্য বল, ঐ দেখ তরঙ্গের পর তরঙ্গের মত শিবির শ্রেণী, জলের কল্লোলের মত ঐ শোন সৈন্যের কোলাহল! আজ আমার মনে হচ্ছে সেই নীল সমুদ্র যার বুকের মাঝ থেকে আমি একটি সোণার পদ্ম ফুলের মত তোমায় ছিঁড়ে এনেছি সেই সমুদ্র যেন আজ এই চতুরঙ্গিনী মূর্ত্তি ধরে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে এসেছে। কেমন করে যে এই বিপদ সাগর পার হব ভাবছি”—ভীমসিং আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন হঠাৎ একটা কাল পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস সে অন্ধকার ছাতে রাণা রাণীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মত বুলিয়ে গেল। পদ্মিনী চমকে উঠে রাণার হাত ধরে নেবে গেলেন, সমস্ত রাত ধরে তাঁর মন বলতে লাগল একি অলক্ষণ একি অলক্ষণ! তারপর দিন পূবের আকাশে ভোরের আলো সবে মাত্র দেখা দিয়েছে এমন সময় একজন ঘোড়সওয়ার রাজপুত পাঠানশিবিরে উপস্থিত হল। বাদশা আল্লাউদ্দীন তখন রূপোর কুর্সিতে বসে তশবী দানা জপ করছিলেন, খবর হল—“রাণা লক্ষণ সিংহের দূত হাজির”—বাদশা হুকুম দিলেন—“হাজির হনেকো কহো”—রাণার দূত তিনবার কুর্নিশ করে বাদসাহের সামনে দাঁড়িয়ে বল্লে—“রাণা জানতে চান বাদসাহের সঙ্গে তাঁর কিসের বিবাদ যে আজ এত সৈন্য নিয়ে তিনি চিতোরে উপস্থিত হলেন?” আল্লাউদ্দীন উত্তর কল্লেন “রাণার সঙ্গে আমার কোন শত্রুতা নাই, আমি রাণার খুড়ো ভীম সিংহের কাছে পদ্মিনীকে ভিক্ষা চাইতে এসেছি, তাঁকে পেলেই দেশে ফিরব।” দূত উত্তর কল্লে “শাহেনসা আপনি রাজপুত জাতকে চেনেন না সেই জন্য এমন কথা বলছেন; রাণার কথা ছেড়ে দিন আমরা দুঃখী রাজপুত আমরাও প্রাণ দিতে পারি তবু মান খোয়াতে পারি না, আপনি রাণীর আশা পরিত্যাগ করুণ বরং শাহেনসার যদি অন্য কিছু

নেবার ইচ্ছে থাকে তবে—” আল্লাউদ্দীন দূতের কথায় বাধা দিয়ে বল্লেন, “হিন্দু স্থানের বাদসার এক কথা—হয় পদ্মিনী নয় যুদ্ধ”—রাণার দূত পিছু হটে তিনবার কুর্নিশ করে বিদায় হল। সেই দিন সন্ধ্যা বেলা চিতোরের রাজসভায় সমস্ত রাজপুত সর্দ্দার একত্র হলেন—কি করে চিতোরকে মুসলমানের হাত থেকে রক্ষা করা যায়—রাজস্থানের রাজ মুকুটের সমান চিতোর, রাজপুতের প্রাণের চেয়ে প্রিয় চিতোর! মুসলমানেরা প্রায় ভারতবর্ষ গ্রাস করেছে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধে কত বড় বড় হিন্দু রাজার রাজত্ব ছারখার হয়ে একবারে লোপ পেয়ে গেছে, কিন্তু চিতোরের সিংহাসন সেই পুরাকালের মত এখনও অটল এখনো স্বাধীন আছে! কি করে আজ এই ঘোর বিপদে চিতোরকে উদ্ধার করা যায়। অনেকক্ষণ ধরে অনেক পরামর্শ তর্ক বিতর্ক চল্লো; শেষে রাণা ভীমসিংহ উঠে বল্লেন “পদ্মিনীর জন্যে যখন চিতোরের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত, তখন না হয় পদ্মিনীকেই পাঠানের হাতে দেওয়া যাক, আমার তাতে কোন দুঃখ নেই, চিতোর আগে না পদ্মিনী আগে?” কথাটা বলে ভীমসিংহ একবার রাজ সভার একপারে যেখানে শ্বেত পাথরের জালির পিছনে চিতোরের রাণীরা বসেছিলেন সেই দিকে চেয়ে দেখলেন, তারপর সিংহাসনের দিকে ফিরে বল্লেন “মহারাণা কি বলেন?” লক্ষণ সিংহ বল্লেন “যদি সমস্ত সর্দ্দারের তাই মত হয় তবে তাই করা কর্ত্তব্য।” তখন সেই রাজভক্ত রাজপুত সর্দ্দারদের প্রধান রাজসভায় উঠে দাঁড়িয়ে বল্লেন “রাণার বিপদে আমাদের বিপদ, রাণার অপমানে আমাদের অপমান! পদ্মিনী শুধু ভীমসিংহের নয় তিনি আমাদের রাণী বটে, কেমন করে আমরা তাঁকে পাঠানের বেগম হতে পাঠিয়ে দেব? পৃথিবী শুদ্ধ লোকে বলবে, রাজস্থানে এমন পুরুষ ছিল না যে তার রাণীর হয়ে লড়ে। মহারাণা আমরা প্রস্তুত, হুকুম হলেই যুদ্ধে যাই।” মহারাণা হুকুম দিলেন—“আপাততঃ যুদ্ধের প্রয়োজন নাই, সাবধানে কেল্লায়

দরজা বন্ধ রাখ, আল্লাউদ্দীন যতদিন পারে চিতোর ঘিরে বসে থাকুক!” সভাস্থলে ধন্য ধন্য পড়ে গেল, চারিদিকে চিতোরের সমস্ত সামন্ত সর্দ্দার তলোয়ার খুলে দাঁড়ালেন, সমস্ত রাজসভা এক সঙ্গে বলে উঠল “জয় মহারাণার জয়, জয় ভীমসিংহের জয়, জয় পাদ্মনীর জয়,” রাজসভা ভঙ্গ হল; সেই সময় রাজসভার এক পারে সেই শ্বেত পাথরের জালির আড়াল থেকে সোণার পদ্মফুল লেখা একখানি লাল রুমাল সেই রাজ ভক্ত সর্দ্দারদের মাঝে এসে পড়ল, সর্দ্দারেরা পাদ্মনীর হাতের সেই লাল রুমাল বল্লমের আগায় বেঁধে রাণীর জয় বলে রাজ সভা থেকে বিদায় হলেন। তারপর দিন কাটতে লাগল, আল্লাউদ্দীন লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়ে চিতোরের কেল্লা ঘিরে বসে রইলেন। বাদসার আশা ছিল যে কেল্লার ভিতর বন্ধ থেকে রাজপুতদের সমস্ত খাবার ফুরিয়ে যাবে, তখন তারা প্রাণের দায়ে পদ্মিনীকে পাঠিয়ে দিয়ে সন্ধি করবে, কিন্তু দিনের পর দিন মাসের পর মাস ক্রমে সম্বৎসর কেটে গেল তবু সন্ধির নাম গন্ধ নেই! বর্ষা শীত কেটে গিয়ে গরমি কাল এসে পড়েছে, পাঠান সৈন্যেরা দিল্লীতে ফেরবার জন্যে অস্থির হতে লাগল, এমন গরমের দিনে দিল্লীতে চাঁদনী চৌকে কত মজা! সেখানে কাফিখানায় কত আমোদ চলেছে, আর তারা কিনা কি বর্ষা কি হিম এই হিন্দুর মুল্লুকে এসে খোলা মাঠে পড়ে রয়েছে? এখানে না পাওয়া যায় ভাল পান তামাক, না আছে ফুলের বাগিচা, না আছে একটা লোকের মিষ্টি গলা যার গান শুনলেও ভুলে থাকা যায়।

এখানকার লোক গুলোও যেমন কাটখোট্টা তাদের গান গুলোও তেমনি বেসুরো, পান গুলোও তেমনি পুরু, তামাকটাও তেমনি কড়ুয়া এ হিঁদুর মুল্লুকে আর মন টেঁকে না। আল্লাউদ্দীন দেখলেন নিষ্কর্ম্মা বসে থেকে তাঁর সৈন্যেরা ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠছে, তাঁর ইচ্ছে আরো কিছু দিন চিতোর ঘিরে বসে থাকেন, যে কোন উপায়ে হোক্

সৈন্যদের স্থির রাখতে হবে। বাদসা তখন এক এক দিন এক এক দল সৈন্য নিয়ে শিকার করে বেড়াতে লাগলেন। সেই সময় এক দিন শিকার শেষে আল্লাউদ্দীন শিবিরে ফিরে আসছেন। একদিকে সবুজ জনারের ক্ষেত সন্ধ্যার অন্ধকারে কাজলের মত নীল হয়ে এসেছে, আর এক দিকে পাহাড়ের উপর চিতোরের কেল্লা মেঘের মত দেখা যাচ্ছে, মাঝে সুঁড়ি পথ, সেই পথে প্রথমে শিকারী পাঠানের দল বড় বড় হরিণ ঘাড়ে গাইতে গাইতে চলেছে, তার পর বড় বড় আমির ওমরা কেউ হাতীর পিঠে কেউ ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সব শেষে বাদশা আল্লাউদ্দীন এক হাতে ঘোড়ার লাগাম আর হাতে সোণার জিঞ্জীর বাঁধা প্রকাণ্ড একটা শিকরে পাখি। বাদশা ভাবতে ভাবতে চলেছেন এতদিন হয়ে গেল তবু তো চিতোর দখল হল না। সৈন্যেরা দিল্লী ফেরবার জন্যে ব্যস্ত, আর কত দিন তাদের ভুলিয়ে রাখা যায়? যে পদ্মিনীর জন্যে এত সৈন্য নিয়ে এত কষ্ট সয়ে বিদেশে এলেম সে পদ্মিনীকে তো একবার চক্ষেও দেখতে পেলেম না। বাদসা একবার বাঁ হাতের উপর প্রকাণ্ড শিকরে পাখিটার দিকে চেয়ে দেখলেন, হয়তো তাঁর মনে হচ্ছিল—কোন রকমে দুখানা ডানা পাই তবে এই বাজটার মত চিতোরের মাঝখান থেকে পদ্মিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে আসি। হঠাৎ সন্ধ্যার অন্ধকারে দুখানি ডানার একটুখানি ঝটাপট্ সেই ঘুমন্ত শিকরে পাখির কাণে পৌঁছল, সে ডানা ঝেড়ে ঘাড় ফুলিয়ে বাদশার হাতে সোজা হয়ে বসল, আল্লাউদ্দীন বুঝলেন তাঁর শিকারী বাজ নিশ্চয়ই কোন শিকারের সন্ধান পেয়েছে। তিনি আকাশে চেয়ে দেখলেন মাথার উপর দিয়ে দুখানি পান্নার টুকরোর মত এক জোড়া শুক সারি উড়ে চলেছে, বাদশা ঘোড়া নামিয়ে বাজের পা থেকে সোনার জিঞ্জীর খুলে নিলেন, তখন সেই প্রকাণ্ড পাখি বাদশার হাত ছেড়ে নিঃশব্দে অন্ধকার

আকাশে উঠে কালো তুখানা ডানা ছড়িয়ে দিয়ে শিকারীদের মাথার উপরে একবার স্থির হয়ে দাঁড়াল, তারপর একবারে তিন শ গজ আকাশের উপর থেকে একটুকরো পাথরের মত সেই তুটী শুক শারীর মাঝে এসে পড়ল; বাদসা দেখলেন একটি পাখী ভয়ে চিৎকার করতে করতে সন্ধ্যার আকাশে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে; আর একটি পাখি প্রকাণ্ড সেই থাবার ভিতর ঝটপট করছে; তিনি শিশ্ দিয়ে বাজ পাখীকে ফিরে ডাকলেন, পোষা বাজ শিকার ছেড়ে বাদশার হাতে উড়ে এল, আর ভয়ে মৃতপ্রায় সেই সবুজ শুক ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ল। বাদশা আনন্দে সেই তোতা পাখি তুলে নিতে হুকুম দিয়ে শিবিরের দিকে ঘোড়া ছোটালেন, আর সেই তোতা পাখীর জোড়া পাখিটি প্রথমে করুণ সুরে ডাকতে ডাকতে সেই শিকারিদের সঙ্গে সঙ্গে সন্ধ্যার আকাশ দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে উড়ে চল্লো, শেষে ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে ভয়ে ভয়ে যে ওমরাহের হাতে একটি ছোট খাঁচায় ডানা-ভাঙ্গা তার সঙ্গী তোতা ছট্‌ফট্ কচ্ছিল সেই খাঁচার উপর নির্ভয়ে এসে বস্‌ল। ওমরাহ আশ্চর্য্য হয়ে বলে উঠলেন—"কি আশ্চর্য্য সাহস! তোতার বিপদ দেখে তুতি এসে আপনিই ধরা দিয়েছে।" আল্লাউদ্দীন তখন পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে চলেছিলেন, হঠাৎ ওমরাহের মুখে এই কথা শুনে তাঁর মনে হল—যদি ভীমসিংহকে ধরা যায় তবে হয়তো সেই সঙ্গে রাণী পদ্মিণীও ধরা দিতে পারেন?—বাদশা শিবিরে এসে সমস্ত রাত্রি ভীমসিংহকে বন্দী করবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন। তু এক দিন পরেই রাণার সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হল যে আল্লাউদ্দীন সমস্ত পাঠান সৈন্য নিয়ে বিনা যুদ্ধে দিল্লীতে ফিরে যাবেন, তার বদলে একা মাত্র তিনি একখান আয়নার ভিতরে রাজপুত রাণী পদ্মিনীকে একবার দেখতে পাবেন, আর চিতোরের কেল্লার ভিতর বাদশা যতক্ষণ একা থাকবেন ততক্ষণ

তাঁর কোন বিপদ না ঘটে সে জন্য স্বয়ং মহারাণা দায়ী রইলেন—বাদশা চিতোরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। শিকার যে এত শীঘ্র ফাঁদে পা দেবে আল্লাউদ্দীন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, তিনি মহা আনন্দে পাঠান ওমরাহদের নিয়ে সমস্ত পরামর্শ স্থির কল্লেন, তার পর বৈকালে গোলাপ জলে স্নান করে কিংখাবের জামা জোড়া, মোতীর কণ্ঠমালা হারে পান্নার শিরপেঁচ পরে, শাহেনসা সাদা ঘোড়ার উপর সোণার রেকাবে পা দিয়ে বসলেন,—সঙ্গে প্রায় দুশোজন পাঠান বীর্ যারা প্রাণের ভয় রাখে না, যুদ্ধই যাদের ব্যবসা! বাদশা ঘোড়ায় চড়ে একা পাহাড় ভেঙ্গে কেল্লার দিকে উঠে গেলেন আর সেই পাঠান সওয়ারেরা পাহাড়ের নীচে থেকে প্রথমে নিজের শিবিরে ফিরে গেল তার পর আবার একে একে সন্ধ্যার অন্ধকারে কেল্লার কাছে ফিরে এসে পথের ধারে প্রকাণ্ড একটা আমবাগানের তলায় লুকিয়ে রইল।

সূর্য্যদেব যখন চিতোরের পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড একখানা মেঘের আড়ালে অস্ত গেলেন সেই সময় পাঠান বাদশা আল্লাউদ্দিন রাণা ভীম-সিংহের হাত ধরে পদ্মিনীর মহলে শ্বেত পাথরের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে আর জনমানব ছিল না, কেবল হাজার হাজার মোম বাতির আলো সেই শ্বেত পাথরের রাজমন্দিরে যেন আর একটা নূতন দিনের সৃষ্টি করে ছিল। রাণা ভীম সেই ঘরে সোনার মছ্‌নদে বাদশাকে বসিয়ে তাঁর হাতে এক পেয়ালা সরবৎ দিয়ে বল্লেন "শাহেনসা একটু আমিল ইচ্ছা করুন" আল্লাউদ্দীন সেই আমিলের পেয়ালা হাতে ভাবতে লাগলেন—যদি এতে বিষ থাকে তবে তো সর্ব্বনাশ? রাজপুতের মেয়েরা শুনেছি শত্রুর হাতে অপমান হবার ভয়ে অনেক সময় এই রকম আমিল খেয়ে প্রাণ দিয়েছে;—বাদশা পেয়ালা হাতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। রাণা ভীম আল্লাউদ্দীনের মনের ভাব বুঝে একটু হেসে বল্লেন "শাহেনসা বিষের ভয় করবেন না? মহারাণা স্বয়ং যখন

আপনার কোন বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী তথন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে আসেন তবু একজনও রাজপুত আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অতিথিকে আমরা দেবতার মত মনে করি।" আল্লাউদ্দীন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন "রাণা আমি সে কথা ভাবছিনে, আমি ভাবছিলেম আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি তেমনি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার কি না ?" আল্লাউদ্দীন মুখে এই কথা বল্লেন বটে কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল, তিনি অল্পে অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃশেষ করে অনেকক্ষণ চুপ্ করে বসে রইলেন, শেষে যখন দেখলেন বিষের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল তখন বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বল্লেন "তবে আর বিলম্ব কেন ? এখন একবার সেই আশ্চর্য্য সুন্দরী পদ্মিনী রাণীকে দেখতে পেলেই খুসী হয়ে বিদায় হই!" তখন রাণা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটা পর্দ্দা সরিয়ে নিলেন, কাকচক্ষু জলের মত নির্ম্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা হাজার হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ হল! বাদশা দেখতে লাগলেন—সেকি কালো চোখ! সেকি সুটানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মত কেমন কোমল দুখানি হাত! বাঁকা মল পরা কি সুন্দর ছোট্ট দুখানি রাঙ্গা পা ? ধানি রংএর পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপি ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ী, নীলার আংটি হীরের চিক্! বাদশা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন একি মানুষ না পরী ? আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পাল্লেন না, তিনি মছ্‌নদ্ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া পদ্মিনীকে ধরবার জন্য দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে চল্লেন—গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায়—ভীম সিংহ বলে উঠলেন "শাহেনসা পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না।" রাণার

মনে হল রাজদরবারে একদিকে বসে সত্যই তাঁর পুণ্যবতী রাণী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছেন—রাগে রাণার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা সেই আয়না খানার ঠিক মাঝখানে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন, ঝন্ ঝন্ শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। আল্লাউদ্দীন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন, তিনি মনে মনে বুঝলেন পাগলের মত রাণীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়ই অভদ্রতা হয়েছে, এজন্য রাণার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার। বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বল্লেন "রাণা আমার অন্যায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিতুম, আমায় ক্ষমা করুন" তারপর অনেক তোষামোদ অনেক অনুনয় বিনয়ে রাণাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন। পেয়ালার পর পেয়ালা আমিল খেয়ে একেই রানার প্রাণ খুলে গিয়েছিল তার উপর দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল, রাণা আদর করে নূতন বন্ধু দিল্লীর বাদশাকে কেল্লার বাইরে পৌছে দিতে চল্লেন। অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার, ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে, চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই। আল্লাউদ্দীন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রাণা ভীম আর কুড়ি জন রাজপুত সেপাই। আজ রাণার মনে বড় আনন্দ—চিতোরের প্রধান শত্রু আল্লাউদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর কখন চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না—রাণা যখন ভাবলেন কাল সকালে পাঠান সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন চিতোরের সমস্ত প্রজা কাল থেকে নির্ভয় হয়ে রাণা

রাণীর জয় জয়কার দিয়ে যে যার কাজে লাগবে তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরো অন্ধকার হয়েছে, পাহাড়ের গায়ে বড় বড় নিম গাছ কালো কালো দৈত্যের মত রাস্তার দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, আর কোথাও কোন শব্দ নেই কেবল কেল্লার উপর থেকে এক একবার প্রহরীদের হৈ হৈ, পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট্। আল্লাউদ্দীন ভীমসিংকে নিয়ে কথায় কথায় ক্রমে পাহাড়ের নীচে এলেন। সেখানে একদিকে জনারের ক্ষেত আর এক দিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা; এই রাস্তার দুই ধারে প্রায় দুশো পাঠান আল্লাউদ্দীনের হুকুম মত লুকিয়ে ছিল, ভীমসিংহ যেমন এইখানে এলেন অমনি হঠাৎ চারিদিক থেকে পাঠান সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেল্লে, তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত শত শত্রুর মাঝে কুড়ি জন মাত্র রাজপুত তাদের রাণাকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে যুঝ্তে লাগল, কিন্তু বৃথা! বাজপাখি যেমন ছোঁ মেরে শিকার নিয়ে যায় তেমনি পাঠান আলাউদ্দীন রাজপুতদের মাঝখান থেকে রাণা ভীমকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কুড়ি জনের মধ্যে পাঁচজন মাত্র রাজপুত চিতোর ফিরল! প্রতিপদের সকাল বেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল—ভীমসিংহ বন্দি হয়েছেন, পদ্মিনীকে না দিলে তাঁর মুক্তি নাই!

আল্লাউদ্দীন যখন শিবিরে পৌঁছলেন তখন রাত্রি আড়াই প্রহর, তিনি ভীমসিংহকে সাবধানে বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন, আজ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে রাণা যখন ধরা পড়েছেন তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়? হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারে বাদশার বেগম হতে কি রাজি হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রাণাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না! আল্লাউদ্দীন মনে মনে এই

প্রতিজ্ঞা করে সোনার খাটিয়ায় দুধের ফেনার মত ধপ্‌ধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরাণী পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন এইবার পদ্মিনী আসছেন; সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল পদ্মিনী এলেন না! দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলে গেল তবু পদ্মিনীর দেখা নাই, বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন; তাঁর মনে হতে লাগল—এ ভীমসিং কি আসল ভীমসিং নয়? আমি কি ভুল করে সামান্য কোন সর্দ্দারকে বন্দী করে এনেছি? আল্লাউদ্দীন বন্দী রাণাকে হুজুরে হাজির করতে হুকুম দিলেন। লোহার শিকলে বাঁধা রাণা ভীম বাঁধা সিংহের মত বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন। শাহেনসা জিজ্ঞাসা করলেন "তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ?" রাণা উত্তর কল্লেন "পাঠান এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?" আল্লাউদ্দীন বল্লেন, "যদি তুমি সত্যই ভীমসিংহ তবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে রাজপুতদের কোনই চেষ্টা দেখছি না যে?" রানা বল্লেন "যে মূর্খ নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দি হয়েছে তার সঙ্গে চিতোরের মহারাণা বোধ হয় আর কোন সম্বন্ধ রাখতে চান না!" কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগল—যদি সত্যই ভীমসিংহকে পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে মহারাণা নিশ্চিন্ত থাকেন? আল্লাউদ্দীন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন। সেই দিন শেষ রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাতে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন; নীল পদ্মের মত তাঁর দুটি সুন্দর চোখ পাঠান শিবিরের দিকে—যেখানে ভীমসিং বন্দী ছিলেন সেই দিকে চেয়ে ছিল। আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের আলো সোনার তারের মত দেখা দিয়েছে মাত্র এমন সময় দুজন রাজপুত সর্দ্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম কল্লেন। একজনের নাম গোরা আর একজনের নাম

আপনার কোন বিপদ না ঘটে সে জন্য দায়ী তথন আজ যদি আপনি সমস্ত চিতোর একা ঘুরে আসেন তবু একজনও রাজপুত আপনার গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অতিথিকে আমরা দেবতার মত মনে করি।" আল্লাউদ্দীন তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন "রাণা আমি সে কথা ভাবছিনে, আমি ভাবছিলেম আজ যেমন নির্ভয়ে আমি তোমার উপর বিশ্বাস করছি তেমনি তুমিও আমাকে বিশ্বাস করতে পার কি না?" আল্লাউদ্দীন মুখে এই কথা বল্লেন বটে কিন্তু সেই আমিলের পেয়ালায় চুমুক দিতে তাঁর প্রাণ কাঁপতে লাগল, তিনি অল্পে অল্পে সমস্ত আমিলটুকু নিঃশেষ করে অনেকক্ষণ চুপ্ করে বসে রইলেন, শেষে যখন দেখলেন বিষের জ্বালার বদলে তাঁর শরীর মন বরং আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে উঠল তখন বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বল্লেন "তবে আর বিলম্ব কেন? এখন একবার সেই আশ্চর্য্য সুন্দরী পদ্মিনী রাণীকে দেখতে পেলেই খুসী হয়ে বিদায় হই!" তখন রাণা ভীম আলিপো দেশের প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটা পর্দ্দা সরিয়ে নিলেন, কাকচক্ষু জলের মত নির্ম্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা হাজার হাজার বাতির আলো যেন আলোময় করে প্রকাশ হল! বাদশা দেখতে লাগলেন—সেকি কালো চোখ! সেকি সুটানা ভুরু! পদ্মের মৃণালের মত কেমন কোমল দুখানি হাত! বাঁকা মল পরা কি সুন্দর ছোট্ট দুখানি রাঙ্গা পা? ধানি রংএর পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপি ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ী, নীলার আংটি হীরের চিক্! বাদশা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন একি মানুষ না পরী? আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পাল্লেন না, তিনি মছ্‌নদ্ ছেড়ে সেই প্রকাণ্ড আয়নার ভিতর ছায়া পদ্মিনীকে ধরবার জন্য দুই হাত বাড়িয়ে ছুটে চল্লেন—গ্রহণের রাত্রে রাহু যেমন চাঁদকে গ্রাস করতে যায়—ভীম সিংহ বলে উঠলেন "শাহেনসা পদ্মিনীকে স্পর্শ করবেন না।" রাণার

মনে হল রাজদরবারে একদিকে বসে সত্যই তাঁর পুণ্যবতী রাণী পদ্মিনী যেন পাঠানের হাতে অপমান হবার ভয়ে কাঁপছেন—রাগে রাণার দুই চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল, তিনি সেই ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে উঠে সোনার একটা পেয়ালা সেই আয়না খানার ঠিক মাঝখানে সজোরে ছুঁড়ে মারলেন, ঝন্ ঝন্ শব্দে সাত হাত উঁচু চমৎকার সেই আয়না চুরমার হয়ে ভেঙ্গে পড়ল। আল্লাউদ্দীন চমকে উঠে তিন পা পিছিয়ে দাঁড়ালেন, তিনি মনে মনে বুঝলেন পাগলের মত রাণীর দিকে ছুটে যাওয়াটা বড়ই অভদ্রতা হয়েছে, এজন্য রাণার কাছে ক্ষমা চাওয়া দরকার। বাদশা ভীমসিংহের দিকে ফিরে বল্লেন "রাণা আমার অন্যায় হয়েছে, আমার মহলে এসে যদি কেউ এমন অভদ্রতা করত তাহলে হয়তো আমি তার মাথা কেটে ফেলতে হুকুম দিতুম, আমায় ক্ষমা করুন" তারপর অনেক তোষামোদ অনেক অনুনয় বিনয়ে রাণাকে সন্তুষ্ট করে গভীর রাত্রে আল্লাউদ্দীন ভীমসিংহের কাছে বিদায় চাইলেন। পেয়ালার পর পেয়ালা আমিল খেয়ে একেই রানার প্রাণ খুলে গিয়েছিল তার উপর দিল্লীর বাদশা তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন, তখন তাঁর মন একেবারে গলে গেল, রাণা আদর করে নূতন বন্ধু দিল্লীর বাদশাকে কেল্লার বাইরে পৌঁছে দিতে চল্লেন। অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার, ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ, সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর নগরের লোক ঘুমিয়ে আছে, চিতোরের রাজপথে জনমানব নেই। আল্লাউদ্দীন সেই জনশূন্য রাজপথ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চলেছেন, সঙ্গে রাণা ভীম আর কুড়ি জন রাজপুত সেপাই। আজ রাণার মনে বড় আনন্দ—চিতোরের প্রধান শত্রু আল্লাউদ্দীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল, আর কখন চিতোরকে পাঠানের অত্যাচার সহ্য করতে হবে না—রাণা যখন ভাবলেন কাল সকালে পাঠান সৈন্য চিতোর ছেড়ে চলে যাবে, যখন ভাবলেন চিতোরের সমস্ত প্রজা কাল থেকে নির্ভয় হয়ে রাণা

রাণীর জয় জয়কার দিয়ে যে যার কাজে লাগবে তখন তাঁর মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল। তিনি মহা উল্লাসে বাদশার পাশে পাশে ঘোড়ায় চড়ে কেল্লার ফটক পার হলেন। তখন রাত্রি আরো অন্ধকার হয়েছে, পাহাড়ের গায়ে বড় বড় নিম গাছ কালো কালো দৈত্যের মত রাস্তার দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে, আর কোথাও কোন শব্দ নেই কেবল কেল্লার উপর থেকে এক একবার প্রহরীদের হৈ হৈ, পাথরের রাস্তায় সেই বাইশটা ঘোড়ার খুরের খটাখট্। আল্লাউদ্দীন ভীমসিংকে নিয়ে কথায় কথায় ক্রমে পাহাড়ের নীচে এলেন। সেখানে একদিকে জনারের ক্ষেত আর এক দিকে আমবাগান, মাঝে মেঠো রাস্তা; এই রাস্তার দুই ধারে প্রায় দুশো পাঠান আল্লাউদ্দীনের হুকুম মত লুকিয়ে ছিল, ভীমসিংহ যেমন এইখানে এলেন অমনি হঠাৎ চারদিক থেকে পাঠান সৈন্য তাঁকে ঘিরে ফেল্লে, তারপর সেই অন্ধকার রাত্রে শত শত শত্রুর মাঝে কুড়ি জন মাত্র রাজপুত তাদের রাণাকে উদ্ধার করবার জন্য প্রাণপণে যুঝতে লাগল, কিন্তু বৃথা! বাজপাখি যেমন ছোঁ মেরে শিকার নিয়ে যায় তেমনি পাঠান আলাউদ্দীন রাজপুতদের মাঝখান থেকে রাণা ভীমকে বন্দী করে নিয়ে গেলেন। কুড়ি জনের মধ্যে পাঁচজন মাত্র রাজপুত চিতোর ফিরল! প্রতিপদের সকাল বেলায় সমস্ত চিতোরে রাষ্ট্র হল—ভীমসিংহ বন্দি হয়েছেন, পদ্মিনীকে না দিলে তাঁর মুক্তি নাই!

আল্লাউদ্দীন যখন শিবিরে পৌঁছলেন তখন রাত্রি আড়াই প্রহর, তিনি ভীমসিংহকে সাবধানে বন্ধ রাখতে হুকুম দিয়ে নিজের কানাতে বিশ্রাম করতে গেলেন, আজ তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হল যে রাণা যখন ধরা পড়েছেন তখন পদ্মিনী আর কোথায় যায়? হিন্দুর মেয়ে স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে পারে বাদশার বেগম হতে কি রাজি হবে না? পদ্মিনীকে না পেলে রাণাকে কিছুতেই ছাড়া হবে না! আল্লাউদ্দীন মনে মনে এই

প্রতিজ্ঞা করে সোনার খাটিয়ায় দুধের ফেনার মত ধপ্‌ধপে বিছানায় শুয়ে হিন্দুরাণী পদ্মিনীর কথা ভাবতে ভাবতে শেষ রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকাল হলে বাদশা মনে ভাবলেন এইবার পদ্মিনী আসছেন; সকাল গিয়ে দুপুর কেটে সন্ধ্যা হল পদ্মিনী এলেন না! দিনের পর দিন রাতের পর রাত চলে গেল তবু পদ্মিনীর দেখা নাই, বাদশা অস্থির হয়ে উঠলেন; তাঁর মনে হতে লাগল—এ ভীমসিং কি আসল ভীমসিং নয়? আমি কি ভুল করে সামান্য কোন সর্দ্দারকে বন্দী করে এনেছি? আল্লাউদ্দীন বন্দী রাণাকে হুজুরে হাজির করতে হুকুম দিলেন। লোহার শিকলে বাঁধা রাণা ভীম বাঁধা সিংহের মত বাদশার দরবারে উপস্থিত হলেন। শাহেনসা জিজ্ঞাসা করলেন "তুমিই কি পদ্মিনীর ভীমসিংহ?" রাণা উত্তর কল্লেন "পাঠান এতে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কেন?" আল্লাউদ্দীন বল্লেন, "যদি তুমি সত্যই ভীমসিংহ তবে তোমাকে উদ্ধার করবার জন্যে রাজপুতদের কোনই চেষ্টা দেখছি না যে?" রানা বল্লেন "যে মূর্খ নিজের বুদ্ধির দোষে মিথ্যাবাদী পাঠানের হাতে বন্দি হয়েছে তার সঙ্গে চিতোরের মহারাণা বোধ হয় আর কোন সম্বন্ধ রাখতে চান না!" কথাটা শুনে বাদশার মনে খটকা লাগল—যদি সত্যই ভীমসিংহকে পাঠানের হাতে ছেড়ে দিয়ে মহারাণা নিশ্চিন্ত থাকেন? আল্লাউদ্দীন মহা ভাবিত হয়ে দরবার ছেড়ে উঠে গেলেন। সেই দিন শেষ রাত্রে চিতোরের উপরে কেল্লার খোলা ছাতে পদ্মিনী গালে হাত দিয়ে একা দাঁড়িয়ে ছিলেন; নীল পদ্মের মত তাঁর দুটি সুন্দর চোখ পাঠান শিবিরের দিকে—যেখানে ভীমসিং বন্দী ছিলেন সেই দিকে চেয়ে ছিল। আকাশ তখনও পরিষ্কার হয়নি, পূর্ব্বদিকে সূর্য্যের আলো সোনার তারের মত দেখা দিয়েছে মাত্র এমন সময় দুজন রাজপুত সর্দ্দার পদ্মিনীর পায়ে এসে প্রণাম কল্লেন। একজনের নাম গোরা আর একজনের নাম

বাদল; গোরার বয়স পঞ্চাশের উপর আর তার বড় ভায়ের ছেলে বাদলের বয়স বছর বারো। গোরা বাদল দুজনেই পদ্মিনীর বাপের বাড়ির লোক, রাজকুমারী পদ্মিনী যখন ভীমসিংহের রাণী হয়ে সিংহল ছেড়ে চলে আসেন তখন তাঁর সঙ্গে এই গোরা এক হাতে তলোয়ার, আর হাতে মা বাপ হারা কচি বাদলকে নিয়ে দেশ ছেড়ে চিতোরে এসেছিলেন। পদ্মিনী জিজ্ঞাসা কল্লেন "মহারাণা কি আমার কথা মত কাজ করতে রাজি হয়েছেন?" গোরা বল্লেন "তাঁরি হুকুমে রাণীজীকে পাঠান-শিবিরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করতে এখনি বাদশার সঙ্গে দেখা করতে চলেছি।" পদ্মিনী একটুখানি হেসে বল্লেন "যাও বাদশাকে বোলো আমার জন্য দিল্লিতে একটা নূতন মহল বানিয়ে রাখেন।" গোরা বাদল বিদায় নিলেন। দেখতে দেখতে সমস্ত পৃথিবী প্রকাশ করে সূর্য্যদেব উদয় হলেন। পদ্মিনী দেখলেন আল্লাউদ্দীনের লাল রেশমের প্রকাণ্ড শিবির সকাল বেলার সূর্য্যের আলোয় ক্রমে ক্রমে রক্তময় হয়ে উঠল! তিনি সেই বাদশাহের কানাতের দিকে চেয়ে চেয়ে বলে উঠলেন "ধূর্ত্ত পাঠান তোতে আমাতে আজ যুদ্ধ আরম্ভ হল দেখি!"

সেদিন শুক্রবার মুসলমানদের জুম্মা, আল্লাউদ্দীন ফজরের নমাজ শেষ করে দরবারে বসেছেন এমন সময় মহারাণার চিঠি নিয়ে গোরা বাদল উপস্থিত হলেন। বাদশা মহা আনন্দে মহারাণার মোহর করা চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন, তাতে লেখা রয়েচে—পদ্মিণীকে বাদশার হাতে দেওয়াই স্থির হল তার বদলে রাণা ভীমসিংহের মুক্তি চাই! আরও,—রাজরাণী পদ্মিণী সামান্য স্ত্রীলোকের মত দিল্লীতে যেতে পারেন না, তাঁর প্রিয় সখীরাও যাতে পদ্মিণীর সঙ্গে থেকে চিরদিন তাঁর সেবা করতে পারে বাদশাহ সে বন্দোবস্ত করবেন; তাছাড়া চিতোরের রাণা পদ্মিনীকে শাহেন্সার শিবিরে পৌঁছে দেবার জন্য যে সব বড় বড় ঘরের রাজপুতনী সঙ্গে যাবেন তাঁদের যাতে কোন অসম্মান

না হয় সেজন্য বাদশা তাঁর সমস্ত সৈন্য কেল্লার সামনে থেকে কিছুদূরে সরিয়ে রাখবেন, শেষে মহারাণার এই ইচ্ছে যে এর পর থেকে আল্লাউদ্দীন আর যেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা না করেন।—চিঠিখানা পড়ে বাদশার মন আনন্দে নৃত্য করতে লাগল, তিনি হাসিমুখে গোরা বাদলের দিকে ফিরে বল্লেন "বেশ কথা! আমি আজ রাত্রের মধ্যেই সমস্ত ফৌজ কেল্লার সামনে থেকে উঠিয়ে নেব, রাণার আসবার কোনই বাধা হবেনা, তোমরা মহারাণাকে জানাওগে তাঁর সকল কথাতেই আমি রাজি হলেম," গোরা বাদল বিদায় হলেন। বাদশা কেল্লার সামনে থেকে সমস্ত সৈন্য উঠিয়ে নিতে হুকুম দিলেন। একদিনের মধ্যে এত সৈন্য অন্য জায়গায় উঠিয়ে নেওয়া সহজ নয়। বাদশা বল্লেন তাম্বু কানাত গোলাগুলি অস্ত্র শস্ত্র আসবাব পত্র যেখানকার সেইখানেই থাক কেবল সেপাইরা নিজের ঘোড়া নিয়ে এক দিনের মত অন্য কোথাও আশ্রয় নিক্ তাতেও প্রায় সমস্ত রাত রাত্ কেটে গেল। পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের প্রধান ফটক রামপোলের উপর কড় কড়শব্দে নাকরা বাজতে লাগল; বাদশা দেখলেন চিতোরের সাতটা ফটক একে একে পার হয়ে চার চার বেহারার কাঁধে প্রায় সাতশ ডুলি তাঁর শিবিরের দিকে আসছে, মাঝে রাণী পদ্মিণীর চিনাপোত মোড়া সোনার চতুর্দ্দোল, তার এক পাশে পঞ্চাশ বৎসরের সর্দ্দার গোরা আর এক পাশে বারো বৎসরের বালক বাদল, দুজনেই ঘোড়ায় চড়ে। বাদশা পদ্মিণী আর তাঁর সহচরীদের থাকবার জন্যে প্রায় আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত ফেলেছিলেন, একে একে যখন সেই সাতশ পাল্কি কানাতের ভিতর পৌঁছল তখন গোরা বাদশার হুজুরে খবর জানালেন—"শাহেনসা রাণীজী উপস্থিত, এখন তিনি একবার রাণার সঙ্গে দেখা করতে চান, বাদশাহের বেগম হলে আরতো দুজনে দেখা হবেনা?" বাদশা বল্লেন "পদ্মিণী যখন রাণাকে দেখতে

চেয়েছেন তখন আর কথা কি ? আমি আধ ঘণ্টা সময় দিলেম তার বেশি রাণা যেন পদ্মিণীর কাছে না থাকেন।” গোরা তথাস্তু বলে বিদায় হলেন।

আল্লাউদ্দীন একলা বসে দেখতে লাগলেন—এক দুই করে প্রায় সাতশ পাল্কি কানাতের ভিতর থেকে বেরিয়ে চিতোরের মুখে চলে গেল, সঙ্গে ঘোড়ায় চরে বার বৎসরের বাদল। বাদশা একজন ওমরাহকে জিজ্ঞাসা কল্লেন “এসব পাল্কিতে কারা যায় ?” শুনলেন চিতোর থেকে যে সকল বড় ঘরের রাজপুতণী রাণীকে বিদায় দিতে এসেছিলেন তাঁরা ফিরে গেলেন। বাদশা জিজ্ঞাসা কল্লেন “ভীমসিং কোথায় ?” উত্তর হল—অন্দরে আছেন—আল্লাউদ্দীন শিবিরের এক কোনে বালির ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলেন আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে, এইবার পদ্মিণীর সঙ্গে দেখা হবে। বাদশা সাজগোজ করবার জন্যে অন্য এক শিবিরে উঠে গেলেন। সেখানে আতর গোলাপ হীরে জহরতের ছড়াছড়ি! কোথাও সোনার আতর-দানে ১০০০৲ টাকা ভরি গোলাপী আতর, কোথাও মুক্তোর তাজ, পান্নার শিরপেঁচ, কৌটো ভরা মাণিকের আংটী, আলনায় সাজান কিংখাবের জামাজোড়া রেশমি রুমাল, জরীর লপেটা! বাদশা যতক্ষণ কিংখাবের জামাজোড়া জরীর লপেট পোরে আয়নার সম্মুখে বসে পাকা দাড়িতে গোলাপী আতর লাগাচ্ছিলেন ততক্ষণ সেই সাতশ পাল্কির একখানিতে রাণা ভীমসিংহকে লুকিয়ে মেবারের বাছা রাজপুত সর্দারেরা পাঠান শিবিরের মাঝখান দিয়ে চিতোরের মুখে এগিয়ে চলেছিলেন। ক্রমে আল্লাউদ্দীনের সাজগোজ সাঙ্গ হল। আধ ঘণ্টা শেষ হয়ে এক ঘণ্টা পূর্ণ হতে চল্লো, এখনও পদ্মিণীর শিবির থেকে ভীমসিং ফিরে এলেন না! বাদশা গোরাকে ডাকতে হুকুম দিলেন, গোরার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না! আল্লাউদ্দীন আর স্থির থাকতে পাল্লেন না, ব্যস্ত সমস্ত হয়ে যেখানে

আধ ক্রোশ জুড়ে কানাত খাটান হয়েছিল সেইখানে উপস্থিত হলেন, দেখলেন—পদ্মিণীর সোনার চতুর্দ্দোল শূন্য পড়ে আছে। যে লাল মখমলের প্রকাণ্ড শিবিরে তিনি চিতোরের রাণী পদ্মিণীকে মাণিকের খাঁচায় সোনার পাখীটির মত পুষে রাখবেন ভেবেছিলেন সে শিবির অন্ধকার! কোথায় পদ্মিণী কোথায় তাঁর একশ সখী আর কোথায় বা বন্দী রাণা ভীমসিংহ! পাঠান শিবিরে হুলুস্থূল পড়ে গেল, সকলেই শুন্‌লে—পাল্কি বেহারা সেজে রাজপুতেরা বন্দী রাণাকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে গেল—বাদশা তখনি সমস্ত সৈন্য জড় করতে হুকুম দিয়ে দুহাজার ঘোড় সওয়ার সঙ্গে চিতোরের মুখে বেরিয়ে গেলেন। সবেমাত্র রাণার পাল্কি চিতোরের ফটক পার হয়েছে এমন সময় পাঠান বাদশার ঘোড় সওয়ার কালবৈশাখের ঝড়ের মতন ধূলিধ্বজায় চারিদিক অন্ধকার করে দিন্ দিন্ শব্দে রাজপুত সৈন্যের উপরি এসে পড়ল। তখন বেলা দুই প্রহর, আগুনের সমান তপ্ত রৌদ্রে বারো বৎসরের বালক বাদল আর পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ গোরা একদল রাজপুতকে নিয়ে প্রাণপণে চিতোরের সিংহদ্বার রক্ষা করতে লাগলেন, সন্ধ্যা হয়ে এল তবু যুদ্ধ শেষ হলনা, চিতোর থেকে দলের পর দল এসে সেই যুদ্ধে যোগ দিতে লাগল, বাদশা হাজারের পর হাজার পাঠান এনেও চিতোরের একখানা পাথর পর্য্যন্ত দখল করতে পাল্লেন না! শেষে যে ভীমসিংহকে তিনি কাল রাত্রে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধ রেখেছিলেন সেই ভীমসিংহ যখন হাতীর পিঠে যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন তখন পাঠান বাদশার আশা ভরসা নির্ম্মূল হল। সন্ধ্যার অন্ধকারে অর্দ্ধেক ভারতবর্ষের সম্রাট আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখ থেকে ঘোড়া ফিরিয়ে শিবিরে গেলেন! জয় জয় রবে চিতোর নগর পরিপূর্ণ হল। সেইদিন গভীর রাত্রে যুদ্ধ শেষে রাণা ভীমসিংহ যখন পদ্মিণীর শয়ন কক্ষে বিশ্রাম করতে এলেন তখন রাণার দুই চক্ষে জল দেখে পদ্মিণী জিজ্ঞাসা কল্লেন "এ সুখের

দিনে চক্ষের জল কেন ?” রাণা নিশ্বাস ফেলে বল্লেন “পদ্মিনী আজ আমার পরম উপকারী চিরবিশ্বাসী গোরা চিরদিনের মত যুদ্ধের খেলা সাঙ্গ করে দেবলোকে চলে গেছে”—দুজনে আর একটিও কথা হলনা। রাণী পদ্মিনী শয়ন ঘরের প্রদীপ অন্ধকার করে দিলেন, দক্ষিণের হাওয়ায় সারারাত্রি চিতোরের মহাশ্মশানের দিক থেকে একটা যেন হায় হায় হায় হায় শব্দ সেই ঘরের ভিতর ভেসে আসতে লাগল। আল্লাউদ্দীন যখন পদ্মিনীর আশায় চিতোর ঘিরে বসেছিলেন সেই সময় কাবুল থেকে মোগলের দল একটু একটু করে ক্রমেই ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছিল। রাজপুতের কাছে হার মেনে বাদশা নিজের শিবিরে এসে শুনলেন—মোগল বাদশা তৈমুর লং দিল্লী আক্রমণ করতে আসছেন, সেই সঙ্গে দিল্লী থেকে পিয়ারী বেগমের এক পত্র পেলেন, তার এক জায়গায় বেগম লিখছেন—“শাহেনসা আর কেন ? পদ্মিণীর আশা পরিত্যাগ করুন ! হে মধুকর তুমি পদ্মের সন্ধানে মরুভূমির মাঝে ফিরতে লাগলে আর বনের ভাল্লুক এসে তোমার সাধের মৌচাক্ লুটে গেল ! সকলি আল্লার ইচ্ছা ! আজ অর্দ্ধেক ভারতবর্ষের রাজা কাল হয়তো পথের ভিখারী ! হায়রে হায় দিল্লীর পিয়ারী বেগমকে এতদিনে বুঝি মোগল দস্যুর বাঁদী হতে হল ?” বাদশা পিয়ারীর চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হলেন, বিপদ যে এত গুরুতর তা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। আল্লাউদ্দীন তৎক্ষণাৎ শিবির উঠাতে হুকুম দিলেন, সেই রাত্রে পাঠান ফৌজ রাজস্থান ছেড়ে কাশ্মীরের মুখে চলে গেল। * * *

তের বৎসর পরে চিতোরের সম্মুখে পাঠান বাদশার রণডঙ্কা আর একবার বেজে উঠল। তখন চিতোরের বড় দুরবস্থা। সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে মহামারিতে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, দেশ প্রায় বীরশূন্য, নূতন নূতন লোকের হাতে যুদ্ধের ভার। রাণা ভীমসিংহ সেই সব নূতন সৈন্য নূতন সেনাপতি নিয়ে গ্রামে গ্রামে পথে পথে পাঠান সৈন্যকে

বাধা দিতে লাগলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল! যুদ্ধের পর যুদ্ধে রাজপুতদের হটিয়ে দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম কেল্লার পর কেল্লা দখল করতে করতে একদিন আল্লাউদ্দীন চিতোরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। বাদশাহি ফৌজ চিতোরের দক্ষিণে পাহাড়ের উপর গড়বন্দি তাম্বু সাজিয়ে রাজপুতের সঙ্গে শেষ যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। এবার প্রতিজ্ঞা চিতোরের কেল্লা ভূমিসাৎ না করে দিল্লী ফেরা নয়।

মলিনমুখে রাণা ভীমসিংহ চিতোর গড়ে ফিরে এলেন। মহারাণা লক্ষ্মণসিংহ রাজসভায় ভীমসিংহকে ডেকে বল্লেন "কাকাজী, এত দিনে বুঝি চিতোর গড় পাঠানের হস্তগত হয়, আর উপায় নাই! প্রজা লোক হাহাকার করছে, সমস্ত দেশ দুর্ভিক্ষে উজাড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর এই বিপদ উপস্থিত, এখন কি নিয়ে কাকে নিয়েই বা লড়াই করি?" ভীমসিংহ বল্লেন "চিতোর এখনও বীরশূন্য হয়নি এখনও আমরা এক বৎসর পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধ চালাতে পারি এমন ক্ষমতা রাখি।" লক্ষ্মণসিংহ ঘাড় নাড়লেন—"কাকাজী আর যুদ্ধ বৃথা, আমি বেশ বুঝতে পারছি পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না করলে আর রক্ষা নাই, তবে কেন এই দুর্ভিক্ষের দিনে সমস্ত দেশ জুড়ে যুদ্ধের আগুন জ্বালাই? সমস্ত প্রজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে, আমার ক্ষতিতে রাজ্যে যদি শান্তি আসে যদি আগুন নিভে যায় তবে পাঠানের সঙ্গে সন্ধি করায় ক্ষতি কি? না হয় কিছুকাল পাঠান বাদসার একজন তালুকদার হয়েই কাটালেম?" ভীমসিংহের দুই চক্ষে জল পড়তে লাগল, তিনি মহারাণার দুটি হাত ধরে বল্লেন "হায় লছমন্ মনে বেশ বুঝছি আর উপায় নাই তবু আমার একটি অনুরোধ আছে! দুই বৎসর বয়সে যখন তোর মা গেলেন, বাপ গেলেন, তখন আমিই তোকে ছেলের মত বুকে টেনে নিয়েছিলেম; সমস্ত বিপদ আপদ রাজ্যের সমস্ত ভাবনা চিন্তা তোরি হয়ে অকাতরে সহ্য করেছিলেম আজ

আমার একটি অনুরোধ রক্ষা কর বৎস! সাত দিন সময় দে! আমি এই শেষবার চিতোর উদ্ধারের চেষ্টা দেখি। এই সাত দিন যেন পাঠানের সঙ্গে সন্ধি না হয়, এই সাত দিনে যেন আমার হুকুম মহারাণার হুকুম জেনে সকলে মান্য করে।" লক্ষণসিংহ বল্লেন "তথাস্তু।" সেই দিন থেকে ভীমসিংহের হুকুম মত এক এক জন রাজপুত সর্দ্দার পাঠানের সঙ্গে যুদ্ধে যেতে লাগলেন। প্রতিদিন খবর আসতে লাগল— আজ অমুক রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন, আজ অমুক সামন্ত বন্দী হলেন, চিতোরের ঘরে ঘরে হাহাকার উঠল; সেই হাহাকার সেই হাজার হাজার অনাথ শিশু আর বিধবার ক্রন্দন পদ্ম সরোবরের মাঝখানে যেখানে রাজরাণী পদ্মিনী শ্বেত পাথরের দেব মন্দিরে পূজোয় বসেছিলেন সেইখানে পৌঁছল। পদ্মিনী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পূজো সাঙ্গ কল্লেন, তাঁর কোমল প্রাণ সেই সব দুঃখী পরিবার অনাথ শিশুর জন্যে সারাদিন সারা সন্ধ্যা কেবলি কাঁদতে লাগল। ভীমসিংহ যখন মহলে এলেন তখন পদ্মিনী দুই হাত জোড় করে বল্লেন "প্রভু আর কত দিন যুদ্ধ চলবে? ভীমসিংহ বল্লেন "তিন দিন মাত্র, কিন্তু যুদ্ধে আর কোন ফল নাই, রাজপুতের প্রাণে সে উৎসাহ আর নাই এখন উপায় কি? সূর্য্যবংশের মহারাণাকে এইবার বুঝি পাঠান বাদসার তালুকদার হতে হল!" পদ্মিনী জিজ্ঞাসা কল্লেন "প্রভু চিতোর রক্ষার কি কোনই উপায় নাই?" ভীমসিংহ বল্লেন "উবর দেবী যদি কৃপা করেন তবেই রক্ষে হয়! পদ্মিনী কার পাপে চিতোরের এ দুর্দ্দশা হল?" তারপর দু একটি কথার পর ভীমসিংহ অন্য কাজে চলে গেলেন। একা ঘরে পদ্মিনীর কানে কেবলি বাজতে লাগল—হায় পদ্মিনী কার পাপে আজ চিতোরের এ দুর্দ্দশা—অন্ধকারে পদ্মিনী কপালে করাঘাত করে বলে উঠলেন "হায় হতভাগিনী পদ্মিনী তোরি এ পোড়া রূপের জন্যে এ সর্ব্বনাশ, তোরি জন্যে এ সর্ব্বনাশ!" নিঃশব্দ ঘরে প্রতিধ্বনি

হল—তোরি জন্যে এ সর্ব্বনাশ—ঠিক্ সেই সময় চৈতমাসের পরিষ্কার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নাবল। পদ্মিনী একটা মোটা চাদরে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে নিজের মহল থেকে চিতোরেশ্বরী উবর দেবীর মন্দিরে একা চলে গেলেন। রাত্রি দুই প্রহর, উবর দেবীর মন্দিরে সমস্ত আলো নিভে গেছে, কেবল একটি মাত্র প্রদীপের আলো! সেই আলোয় বসে দেবীর ভৈরবী রাজরাণী পদ্মিনীকে বল্লেন "মহারাণী আমি আবার বলি তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ তার শেষ হচ্ছে মৃত্যু! দেবীর রত্ন অলঙ্কার একবার অঙ্গে পরলে আর নিস্তার নাই! ছয় মাসের মধ্যে জীবন্ত অবস্থায় জ্বলন্ত আগুনে দগ্ধ হতে হবে!" পদ্মিনী বল্লেন "হে মাতাজী আশীর্ব্বাদ করুন যে রূপসীর জন্য রাজস্থানে আজ এ আগুন জ্বলেছে তার সেই পোড়া রূপ জ্বলন্ত আগুনেই ভস্ম হোক!" ভৈরবী বল্লেন "তবে তাই হোক। বৎস আমি এই আশীর্ব্বাদ করি যে চিতোরের জন্য তুমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করলে সেই চিতোরে তোমার নাম চিরদিন যেন অমর থাকে, যে মহাসতীর রত্ন অলঙ্কার আজ তুমি পরতে চল্লে সেই মহাসতী মরণান্তে তোমায় যেন চরণে রাখেন।" রাণী পদ্মিনী ভৈরবীর হাত থেকে একটি চন্দন কাঠের কৌটায় উপর দেবীর সমস্ত রত্ন অলঙ্কার নিয়ে বিদায় হলেন। সেই দিন রাত্রি আড়াই প্রহরে চিতোরের রাজপ্রাসাদে একটুখানি সাড়াশব্দ ছিল না, মহারাণা নির্জ্জন ঘরে একা ছিলেন। যখন তাঁর সমস্ত প্রজা—পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হবে দেশে শান্তি আসবে মনে করে—নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়েছিল সেই সময় সমস্ত মেবারের রাজা ভগবান এক লিঙ্গের দেওয়ান মহারাণা লক্ষ্মণ-সিংহের চোখে ঘুম ছিল না! হায় অদৃষ্ট! কাল সন্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিতোর ছেড়ে যেতে হবে এ জীবনে আর হয়তো ফেরা হবে না! রাজ্য সম্পদ মান মর্য্যাদা আত্মীয় স্বজন সব ছেড়ে কোন্ দূরদেশে

সামান্য বেশে নির্ব্বাসনে যেতে হবে? মহারাণা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘরের এক কোণে সোণার দীপদানে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে—একটি মাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরও যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল! মহারাণা অন্তঃপুরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠলো, তারপর মহারাণা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নূপুরের ঝিনি ঝিনি শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে! মহারাণা বলে উঠলেন "কে তোরা কি চাস্?" চারিদিকে দেওয়ালের ভিতর থেকে ছাতের উপর থেকে পায়ের নীচে থেকে শব্দ উঠল—ময় ভূখা হুঁ—লক্ষণসিংহ বল্লেন "আঃ এত রাত্রে চিতোরের রাজপ্রাসাদে উপবাসে কে জাগে?" আবার শব্দ উঠল "ময়্ ভুখা হুঁ।" তার পর গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে উঠে তেমনই সেই শয়ন ঘরের অন্ধকারে এক অপরূপ দেবীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল! মহারাণা বলে উঠলেন কে তুমি দেবতা না দানব আমায় ছলনা করছ? লক্ষণসিংহ দীপদান থেকে সোণার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীট কুণ্ডলে রত্ন অলঙ্কারে অসংখ্য অসংখ্য মণি মাণিক্যে হাজার হাজার আগুনের শিখার মত দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগল! লক্ষণসিংহ দেখলেন—চিতোরেশ্বরী উবর দেবী!—ভয় ভক্তি বিস্ময়ে মহারাণার সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে এল, পরমানন্দে দুর্ব্বল তাঁর হাত থেকে সোণার প্রদীপ খসে পড়ল; তারপর সব অন্ধকার! সেই অন্ধকারে মহারাণা স্বপ্ন দেখছেন কি জেগে আছেন বুঝতে পাল্লেন না! তিনি যেন শুনতে লাগলেন দেবী বলছেন—"ময়্ ভুখা হুঁ! বড় ক্ষুধা বড় পিপাসা!

আমি রাজবলি চাই রাজরক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নাই, মহারাণা ওঠো, জাগো, দেশের জন্য বুকের রক্তপাত কর; আমার খর্পর রাজরক্তের শত ধারায় পরিপূর্ণ কর। রাজা প্রজা বালক বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে তবেই কল্যাণ, না হলে সূর্য্য-বংশের রাজপরিবার আর কখন চিতোরের রাজসিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না!" পর্ব্বতের গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুরতে থাকে তেমনি সেই প্রকাণ্ড ঘরে দেবীর শেষ কথা অনেকক্ষণ ধরে গম্ গম্ করতে লাগল। রাত্রি শেষ হয়ে গেল, উষাকালে সোণার আলো আর শীতল বাতাসের মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অন্তর্দ্ধান হলেন, অনেক দূরের পার্ব্বতী মন্দিরে নহবতের সুরে ভৈরবী রাগিণীতে মহাদেবীর স্তুতি গান বাজতে লাগল।

প্রত্যূষে রাজদরবারে মহারাণা লক্ষণসিং যখন রাত্রের ঘটনা আর দেবীর আদেশ সকলের সম্মুখে প্রকাশ কল্লেন তখন সকলে বিস্মিত হল বটে কিন্তু অনেকেই সে কথা বিশ্বাস করলে না। যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত তারা উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল, আর যাদের প্রাণ নিরুৎসাহ মন দুর্ব্বল যারা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হলে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ভেবেছিল তারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল; কিন্তু সেই মহারাণার আদেশে মেবারের ছোট বড় সামন্ত সর্দ্দারেরা যখন দেবীর নিজের মুখের আদেশ শোনবার জন্যে অন্তঃপুরের সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরে স্তব্ধ রাজপুরে হাজার হাজার রাজপুত বীরেরচোখের সম্মুখে আবার সেই দেবী মূর্ত্তি ময়্ ভূখা হুঁ—বলে প্রকাশ হল। তখন আর কারো মনে কোন সন্দেহ রইল না, সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস সকল দুর্ব্বলতা নিমিষের মধ্যে দূর হল—আগুণের তেজে অন্ধকার যেমন দূরে যায়! সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল, কেবল রাণা ভীমসিংহ যেন সেই

সামান্য বেশে নির্ব্বাসনে যেতে হবে? মহারাণা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘরের এক কোণে সোণার দীপদানে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। থিলানের পর থিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে—একটি মাত্র প্রদীপের আলোয় নিঃশব্দ সেই প্রকাণ্ড ঘর আরও যেন অন্ধকার বোধ হতে লাগল! মহারাণা অন্তঃপুরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, হঠাৎ পায়ের তলায় মেঝের পাথরগুলো একবার যেন কেঁপে উঠলো, তারপর মহারাণা অনেকখানি ফুলের গন্ধ আর অনেক নূপুরের ঝিনি ঝিনি শব্দ পেলেন। কারা যেন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছে! মহারাণা বলে উঠলেন, "কে তোরা কি চাস্?" চারিদিকে দেওয়ালের ভিতর থেকে ছাতের উপর থেকে পায়ের নীচে থেকে শব্দ উঠল—ময় ভুখা হুঁ—লক্ষণসিংহ বল্লেন "আঃ এত রাত্রে চিতোরের রাজপ্রাসাদে উপবাসে কে জাগে?" আবার শব্দ উঠল "ময়্ ভুখা হুঁ।" তার পর গাঢ় ঘুমের মাঝখানে স্বপ্ন যেমন ফুটে উঠে তেমনই সেই শয়ন ঘরের অন্ধকারে এক অপরূপ দেবীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে ফুটে উঠল! মহারাণা বলে উঠলেন কে তুমি দেবতা না দানব আমায় ছলনা করছ? লক্ষণসিংহ দীপদান থেকে সোণার প্রদীপ উঠিয়ে ধরলেন। প্রদীপের আলো দেবীর কিরীট কুণ্ডলে রত্ন অলঙ্কারে অসংখ্য অসংখ্য মণি মাণিক্যে হাজার হাজার আগুনের শিখার মত দপ্ দপ্ করে জ্বলতে লাগল! লক্ষণসিংহ দেখলেন—চিতোরেশ্বরী উবর দেবী!—ভয় ভক্তি বিস্ময়ে মহারাণার সর্ব্বশরীর অবশ হয়ে এল, পরমানন্দে দুর্ব্বল তাঁর হাত থেকে সোণার প্রদীপ খসে পড়ল; তারপর সব অন্ধকার! সেই অন্ধকারে মহারাণা স্বপ্ন দেখছেন কি জেগে আছেন বুঝতে পাল্লেন না! তিনি যেন শুনতে লাগলেন দেবী বলছেন—"ময়্ ভুখা হুঁ! বড় ক্ষুধা বড় পিপাসা!

আমি রাজবলি চাই রাজরক্ত না হলে এ পিপাসার শান্তি নাই; মহারাণা ওঠো, জাগো, দেশের জন্য বুকের রক্তপাত কর; আমার খর্পর রাজরক্তের শত ধারায় পরিপূর্ণ কর। রাজা প্রজা বালক বৃদ্ধ যদি চিতোরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করে তবেই কল্যাণ, না হলে সূর্য্যবংশের রাজপরিবার আর কখন চিতোরের রাজসিংহাসন পাঠানের হাত থেকে ফিরে পাবে না!" পর্ব্বতের গুহায় প্রতিধ্বনি যেমন ঘুরতে থাকে তেমনি সেই প্রকাণ্ড ঘরে দেবীর শেষ কথা অনেকক্ষণ ধরে গম্ গম্ করতে লাগল। রাত্রি শেষ হয়ে গেল, ঊষাকালে সোণার আলো আর শীতল বাতাসের মাঝখানে চিতোরেশ্বরী কোথায় অন্তর্দ্ধান হলেন, অনেক দূরে পার্ব্বতী মন্দিরে নহবতের সুরে ভৈরবী রাগিণীতে মহাদেবীর স্তুতি গান বাজতে লাগল।

প্রত্যূষে রাজদরবারে মহারাণা লক্ষণসিং যখন রাত্রের ঘটনা আর দেবীর আদেশ সকলের সম্মুখে প্রকাশ কল্লেন তখন সকলে বিস্মিত হল বটে কিন্তু অনেকেই সে কথা বিশ্বাস করলে না। যাদের হৃদয়ে বিশ্বাস অটল ভক্তি অচলা ছিল, যারা চিতোরের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত তারা উৎসাহে উন্মত্ত হয়ে উঠল, আর যাদের প্রাণ নিরুৎসাহ মন দুর্ব্বল যারা পাঠানের সঙ্গে সন্ধি হলে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে ভেবেছিল তারা ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল; কিন্তু সেই মহারাণার আদেশে মেবারের ছোট বড় সামন্ত সর্দ্দারেরা যখন দেবীর নিজের মুখের আদেশ শোনবার জন্যে অন্তঃপুরের সেই ঘরে একত্র হলেন, যখন দ্বিপ্রহরে স্তব্ধ রাজপুরে হাজার হাজার রাজপুত বীরেরচোখের সম্মুখে আবার সেই দেবী মূর্ত্তি ময়্ভূখা হুঁ—বলে প্রকাশ হল। তখন আর কারো মনে কোন সন্দেহ রইল না, সকলের মন থেকে সমস্ত অবিশ্বাস সকল দুর্ব্বলতা নিমিষের মধ্যে দূর হল—আগুণের তেজে অন্ধকার যেমন দূরে যায়! সকলেই বীরত্বের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠল, কেবল রাণা ভীমসিংহ যেন সেই

দেবী মূর্ত্তির ভিতরে পদ্মিনীকে দেখে মনে মনে তোলাপাড়া করতে লাগলেন—একি দেবী না পদ্মিনী, পদ্মিনী না দেবী!—তারপর, রাজবলির উত্তোগ হল। মহারাণা লক্ষণসিংহ তাঁর বারোটি রাজপুত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সব চেয়ে বড় রাজকুমার যুবরাজ অরিসিংহের মাথায় চিতোরের রাজমুকুট দিয়ে বল্লেন "হে ভাগ্যবান্ দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য কর! পাঠানযুদ্ধে অগ্রসর হও! আজ তুমি সমস্ত মেবারের মহারাণা, এই সমস্ত সামন্ত সর্দার তোমারি প্রজা বলে জানবে। আজ থেকে তোমারি হাতে যুদ্ধের ভার, জয় হলে তোমার পুরস্কার ইহলোকে চিতোরের রাজসিংহাসন আর যুদ্ধে প্রাণ গেলে তার ফল পরলোকে মহাদেবীর অভয় চরণ।" বৃদ্ধ রাণা লক্ষণসিংহ অরিসিংহকে সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে নীচে দাঁড়ালেন. নতুন রাণার মাথায় চিতোরের কিরীট। চারিদিকে রব উঠল—জয় মহাদেবীর জয়, জয় অরিসিংহের জয়—লক্ষণসিংহ বলতে লাগলেন "সর্দারগণ আমার আর একটি শেষ কর্ত্তব্য আছে, সে কর্ত্তব্য দেবীর কাছে নয় দেশের কাছে নয়, আমার পিতা পিতামহ স্বর্গীয় মহারাণাদের কাছে। এই মহা সমরে মেবারের রাজবংশ একেবারে নির্ম্মূল না হয়, পরলোকে পিতৃপুরুষেরা যাতে জল গণ্ডুষ পান, রাজস্থানে বাপ্পারাওর বংশ যুগে যুগে যাতে অমর থাকে সেই জন্য আমার ইচ্ছা অজয়সিংহ নিজের স্ত্রী পুত্র নিয়ে কৈলবারার নির্জ্জন দুর্গে চলে যান।", লক্ষণসিংহের বারো জন রাজপুত্রের মধ্যে কেবল অজয়সিংহেরই দুটি শিশু সন্তান ছিল। অজয়সিংহ মহারাণার সম্মুখে জোড় হাত করে বল্লেন "পিতা আমার এগারো ভাই দেশের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ দেবে আর আমি কিনা স্ত্রীলোকের মত শিশু সন্তান মানুষ করবার জন্যে বসে থাকব? আমি কি এতই দুর্ব্বল এমনি অক্ষম?" লক্ষণসিংহ বল্লেন "বৎস হতাশ হয়োনা, যে মহৎ কাযের ভার তোমায় দিলেম চিতোরের যে কোন রাজপুত সে ভার পেলে নিজেকে

ধন্য বোধ করত! হয়তো আমাদের রক্তপাতে চিতোর উদ্ধার হবে না হয়তো তোমাকেও চিতোরের জন্য প্রাণপণ করতে হবে। আমরা হয়তো চিতোরকে পরাধীন রেখে চলে যাব আর হয়তো তুমি সূর্য্য-বংশের উপযুক্ত কোন বীরপুরুষের হাতে রাজ্যভার দিয়ে পরম সুখে পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে! মনে রেখ দেশের জন্য প্রাণ দেবার যে সুখ দেশকে স্বাধীন দেখবার সুখ তার শতগুণ।" লক্ষণ-সিংহ নীরব হলেন, জয় জয় শব্দে রাজসভা ভঙ্গ হল।

রাজসভা থেকে বিদায় নেবার সময় অরিসিংহ অজয়সিংহকে বলে গেলেন "চিতোর ছেড়ে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যেও।" যাত্রার সমস্ত আয়োজন শেষ করে অজয়সিংহ যখন বড় ভায়ের ঘরে গেলেন তখন অরিসিংহ একখানি চিঠি শেষ করে ছোট ভাইয়ের দিকে ফিরে বল্লেন "ভাই আজ আমাদের শেষ দেখা কাল তুমি একদিকে আমি একদিকে! এই শেষ দিনে তোমায় একটি কাযের ভার দিচ্ছি—" অরিসিংহ চামড়ায় মোড়া একটি ছোট থলি আর সেই চিঠিখানি অজয়সিংহের হাতে দিয়ে বল্লেন "অজয় এদুটি যত্ন করে রেখ, যদি আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি তবে আবার চেয়ে নেব, নয়তো তুমি খুলে দেখো আমার শেষ ইচ্ছা কি?" তারপর অজয়সিংহকে আলিঙ্গন করে অরিসিংহ বল্লেন "চল ভাই মায়ের কাছে বিদায় হই!"

সেইদিন শেষ রাত্রে যন রাজ অন্তঃপুরে থেকে দুই রাজপুত্র দুই দিকে বিদায় হয়ে গেলেন তখন বারো ছেলের মা জননী চিতোরের মহারাণী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মাটির উপর লুটিয়ে পড়লেন, তাঁর সমস্ত শরীর পাষাণের মত স্থির হয়ে গেল, কেবল সজল দুটি কাতর চোখ সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল যেদিক দিয়ে দুটি রাজকুমার চলে গেলেন। মহারাণা বলতে লাগলেন "প্রিয়ে স্থির হও, ধৈর্য্য ধর, বুক বাঁধ, মহাকালের কঠোর বিধান নত শিরে শান্ত মনে বহন কর।"

তারপর রণরণ শব্দে রাজপুতের রণডঙ্কা দিক্‌দিগন্ত কাঁপিয়ে বাজতে লাগল, যুবরাজ অরিসিংহ যুদ্ধযাত্রা কল্লেন।

সেইদিন থেকে একমাস কেটে গেল। পাঠানের বিরুদ্ধে রাজপুতের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হল! একের পর এক এগারো জন রাজকুমার যুদ্ধে প্রাণ দিলেন। আর আশা নাই আর উপায় নাই। কিন্তু তবু রাজপুতের বীর হৃদয় এখনও অটল রইল। চিতোরের শেষ দুই বীর লক্ষণসিংহ আর ভীমসিংহ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। রাণার হুকুমে মেবারের লক্ষ লক্ষ সৈন্য সামন্তের অবশেষ ভীষণ মূর্ত্তি ভগবান এক লিঙ্গের দশ হাজার দেয়ানি ফৌজ একত্র হতে লাগল! তাদের এক হাতে শূল এক হাতে কুঠার, দুই কানে শাঁখের কুণ্ডল, মাথায় কালো ঝুঁটি, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে বাঘছালের আঙ্গরখা, পিঠে একটা করে প্রকাণ্ড ঢাল! তাদের আসবাবের মধ্যে এক ঘোড়া, এক কম্বল, এক লোটা, পৃথিবীতে আপনার বলবার আর কিছুই ছিলনা; তারা দেবতার মধ্যে একমাত্র মহাদেবের উপাসনা করত, মানুষের মধ্যে কেবল মাত্র মহারাণার হুকুম মানত। সমরসিংহ এই ফৌজের সৃষ্টিকর্ত্তা। ছোটখাট যুদ্ধে এদের কেউ দেখতে পেতনা, কেবল মাঝে মাঝে ঘোর দুর্দ্দিনে যখন চারিদিকে শত্রু চারিদিকে বিপদ ঘনিয়ে আসত, যখন বিধর্ম্মীর হাতে অপমান হবার ভয়ে দেশের যত সুন্দরী কি কুমারী কি বিধবা, কি দশ বছরেরর কচি মেয়ে কি ষোল বছরের পূর্ণ যুবতী চিতার আগুনে রূপ যৌবন ছাই করে দিয়ে চিতোরেশ্বরীর সম্মুখে জীবনের শেষ ব্রত জহর ব্রত উদ্‌যাপন করত, যখন আর কোন আশা কোন উপায় নাই, সেই সময় হতাশ রাজপুতের শেষ উৎসাহের মত দুর্দ্ধর্ষ দুর্দ্দান্ত এই দেওয়ানি ফৌজ চিতোরের কেল্লায় দেখা দিত! ৭০ বৎসর পূর্ব্বে সমরসিংহের বিধবা রাণী কর্ম্ম দেবী একদিন কুতুবুদ্দিনের হাত থেকে ছেলের রাজসিংহাসন রক্ষা করবার জন্য

মেবারের সমস্ত সৈন্য একত্র করেছিলেন, সেইদিন একবার দেওয়ানি ফৌজের ডাক পড়েছিল, আর আজ কয় পুরুষ পরে মহারাণা লক্ষণসিংহের হুকুমে দেওয়ানি ফৌজ আর একবার চিতোরের কেল্লায় উপস্থিত হল।

কাল রাত্রি, তিথি অমাবস্যা যখন জগৎ সংসার গ্রাস করেছিল, মাথার উপর থেকে চন্দ্র সূর্য্য যখন লুপ্ত হয়েছিল সেই সময় চিতোরের মহাশ্মশানের মধ্যস্থলে চিতোরেশ্বরীর মন্দিরে বারো হাজার রাজপুত সুন্দরীর জহর ব্রত আরম্ভ হল! মন্দিরের ঠিক সম্মুখে অন্ধকার একটা সুড়ঙ্গের উপরে দাঁড়িয়ে রাজস্থানের প্রথম সুন্দরী রাণী পদ্মিনী অগ্নিদেবের স্তব আরম্ভ কল্লেন—"হে অগ্নি হে পবিত্র উজ্জ্বল স্বর্ণকান্তি এসো! পৃথিবীর অন্ধকার তোমার আলোয় দূরে যাক; হে অগ্নি হে মহাতেজ এসো! তুমি দুর্ব্বলের বল সবলের সহায়; হে দেবতা হে ভয়ঙ্কর আমাদের ভয় দূর কর সন্তাপ নাশ কর আশ্রয় দাও! লজ্জানিবারণ দুঃখবিনাশন বহ্নিশিখা তুমি জীবনের শেষ গতি বন্ধনের মহামুক্তি।" পদ্মিনী নীরব হলেন, বারো হাজার রাজপুতের মেয়ে সেই অগ্নিকুণ্ডের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে গাইতে লাগল—"লাজহরণ তাপবারণ"—হঠাৎ এক সময় মহা কল্লোলে চারিদিক পরিপূর্ণ করে হাজার হাজার আগুনের শিখা যেন মহা আনন্দে সেই সুড়ঙ্গের মুখে ছুটে এল! প্রচণ্ড আলোয় রাত্রির অন্ধকার টল্‌মল্ করে উঠল! বারো হাজার রাজপুতণীর সঙ্গে রাণী পদ্মিনী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলেন, চিতোরের সমস্ত ঘরের সমস্ত সোনামুখ মিষ্টি কথা আর মধুর হাসি নিয়ে এক নিমেষে চিতার আগুনে ছাই হয়ে গেল, সমস্ত রাজপুতের বুকের ভিতর থেকে চিৎকার উঠল—জয় মহাসতীর জয়—! আল্লাউদ্দীন নিজের শিবিরে শুয়ে সে চীৎকার শুনতে পেলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সমস্ত সৈন্য প্রস্তুত রাখতে হুকুম পাঠালেন।

পরদিন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে, চিতোরের পাহাড় বেয়ে বর্ষাকালের স্রোতের মত রাজপুত সেনা হর হর শব্দে দিক দিগন্ত কাঁপিয়ে ভয়ঙ্কর তেজে পাঠান সৈন্যের উপর এসে পড়ল! আল্লাউদ্দীনের তাতার সৈন্য দেওয়ানি ফৌজের কুঠারের মুখে নিমেষের মধ্যে ছিন্ন ভিন্ন ছারখার হয়ে পলায়ন কল্লে। আল্লাউদ্দীন নতুন নতুন সৈন্য এনে বারম্বার রাজপুতদের বাধা দিতে লাগলেন, স্রোতের মুখে বালির বাঁধের মত তাঁর সমস্ত চেষ্টা প্রতিবার বিফল হল। আল্লাউদ্দীন নিজে একজন সামান্য বীর পুরুষ ছিলেন না, এর চেয়ে ঢের কম সৈন্য নিয়ে তিনি মেবারের চেয়ে অনেক বড় বড় হিন্দু রাজত্ব অনায়াসে জয় করেছেন, কিন্তু আজ যুদ্ধে রাজপুতের বীরত্ব দেখে তাঁকে ভয় পেতে হল। বারো বার তিনি সৈন্য সাজিয়ে রাজপুতদের বাধা দিলেন, বারো বার তাঁকে হটে আসতে হল। আল্লাউদ্দীন বেশ বুঝলেন আজ যুদ্ধের সহজে শেষ নাই, একদিকে দিল্লীর বাদশাহি তক্ত আর একদিকে চিতোরের রাজসিংহাসন—কোনটা থাকে কোনটা যায়?—তখন বেলা তৃতীয় প্রহর, আল্লাউদ্দীন নিজের সমস্ত ফৌজ একবারে এক সময়ে সেই বারো হাজার রাজপুতদের দিকে চালাতে হুকুম দিলেন। নিমেষের মধ্যে পাঠান বাদশার লক্ষ লক্ষ হাতী ঘোড়া সেপাই শান্ত্রী প্রলয় ঝড়ের মত ধূলায় ধূলায় চারিদিক অন্ধকার করে—দিন্ দিন্ শব্দে—রাজপুতের দিকে ছুটে আসতে লাগল, তারপর হঠাৎ এক সময় সমুদ্রের তরঙ্গে নদীর জল যেমন, তেমনই সেই অগণিত পাঠান সৈন্যের মাঝে কয়েক হাজার রাজপুত কোন্‌খানে লুপ্ত হল কিছু আর দেখা গেলনা। কেবল সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে সেই যুধ্যমান অসংখ্য সৈন্যের মাথার উপরে সূর্য্যমূর্ত্তি লেখা চিতোরের রাজপতাকা একবার মাত্র সন্ধ্যার আলোয় বিদ্যুতের মত চমকে উঠল, তার পরেই শব্দ উঠল—"আল্লা হো আখবর শাহনসা কি ফতে"—পাঠানের পায়ের তলায়

মহারাণার রাজছত্র চূর্ণ হয়ে গেল, সূর্য্যদেব সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার করে অস্ত গেলেন, রক্তমাংসের লোভে রণস্থলের উপরে দলে দলে নিশাচর পাখি কালো ডানা মেলে উড়ে বেড়াতে লাগল। চিতোর হস্তগত হল, পাঠানের তলোয়ার চিতোরের পথ ঘাট রক্তের স্রোতে রাঙ্গা করে তুল্লে, ধন ধান্যে মণি মুক্তায় লক্ষ লক্ষ তাতার ফৌজের বড় বড় সিন্দুক পরিপূর্ণ হল, কিন্তু যে রত্নের লোভে আল্লাউদ্দীন আজ অমরাবতীর সমান চিতোর নগর শ্মশান করে দিলেন, যার জন্যে দিল্লীর সুখের সিংহাসন ছেড়ে বিদেশে এলেন সেই পদ্মিনীর সন্ধান পেলেন কি? বাদশা চিতোরে এসে প্রথমেই শুনলেন—পদ্মিনী আর নাই চিতার আগুনে সুন্দর ফুল ছাই হয়েছে। সেইদিন রাত্রে বাদশার হুকুমে চিতোরের ঘর, দ্বার, মন্দির, মঠ, ছাই ভস্ম চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল, কেবল প্রকাণ্ড সরোবরের মাঝখানে রাণী পদ্মিনীর রাজ-মন্দির তেমনি নতুন তেমনি অটুট রইল। আল্লাউদ্দীন সেই রাজমন্দিরে পদ্মসরোবরের ধারে শ্বেত পাথরের বারাণ্ডায় ঘেরা পদ্মিনীর শয়নমন্দিরে তিনদিন বিশ্রাম কল্লেন। তারপর মালদেব নামে একজন রাজপুতের হাতে চিতোরের শাসনভার দিয়ে ধীরে ধীরে দিল্লীর মুখে চলে গেলেন। পাঠান বাদশার প্রবল প্রতাপ হিন্দুস্থানের একদিক থেকে আর এক দিকে বিস্তৃত হল, আর সেই বারো হাজার সতী লক্ষ্মীর পবিত্র নাম বারো হাজার রাজপুত বীরের কীর্ত্তি চিরদিনের জন্য জগৎ সংসারে ধন্য হয়ে রইল। আজও চিতোরে মহাসতীর শ্মশানে পদ্মিনীর সেই চিতাকুণ্ড দেখা যায়, তার ভিতর মানুষে প্রবেশ করতে পারে না, একটা অজগর সর্প দিবারাত্রি সেই গহ্বরের মুখে পাহারা দিচ্ছে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

উর্ব্বশী ও তুকারাম।

তৃতীয় সর্গ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সমুদ্রতীরে রাজা।

রা। তরুণ অরুণ দীপ্ত সুবর্ণ প্রভাতে
চমকিত উথলিত শতধাচ্ছুরিত
তরঙ্গে তরঙ্গে, আঘাতিয়া সমভাবে
শুভ্রকৃষ্ণ উপকূল বালু শৈলময়
জলধি বহিছে কিবা জলদ কল্লোলে!

(তুকারামের প্রবেশ)

তু। নমস্কার দেব।

রা। কোথা ছিলে সারা রাতি?

তু। অন্ধকার বনমাঝে আর্দ্র পথহারা
ভ্রমিলাম একই পথে কত শত বার
খুঁজিয়া ধিরাজে; শেষে লইনু আশ্রয়
ভৈরবী মন্দিরে গিয়ে। উঃ কি দুর্য্যোগ!

রা। এখনো নিশানা হেরি সাগর দৈত্যের
ঝটিকা বিলাসময় সে ভীম নৃত্যের!
উত্তাল উর্ম্মিল বক্ষে হের যায় ভাসি
ভগ্নতরী কাষ্ঠরাশি ক্ষুদ্র সুবিশাল
নাচি নাচি দুলি দুলি যেন সুখে হাসি।

তু। গোপনে হৃদয়ে কিন্তু কত ধরে হায়!

দারুণ ঝটিকাময় ঢুঃখের কাহিনী—
কেবা তা জানিতে পারে চির অপ্রকাশ !

রা। হোথা ঐ তটমূলে বৃহৎ মাস্তুল
শৈলাহত তরীভ্রষ্ট পরিত্যক্ত একা !
মৃত্তিকা-প্রোথিত অর্দ্ধ, অর্দ্ধ উর্দ্ধে স্থির
দাঁড়ায়ে কবন্ধসম, শিরহীন দেহে
আপন মৃত্যুর কথা কহিছে নীরবে—
জাগায়ে মানব মনে শোকময় স্মৃতি !
অন্যদিকে স্তূপাকার গিরি অঙ্গচ্যুত
তরঙ্গবিক্ষিপ্ত ভগ্ন, মার্জ্জিত মসৃণ
ক্ষুদ্র শিলারাশি,—আর পাদ পরি তার
অদ্ভুত ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি প্রকাণ্ড প্রস্তর
যেন সাধনায় রত !

তু। এ নহে নূতন !

রা। সকলি কৌতুকময় সকলি নূতন
লাগিছে নয়নে আজি কেন নাহি জানি !
ঝটিকা তাড়নে যত ক্ষুদ্রসিন্ধু জীব
শম্বুক শুকতি শঙ্খ পলা পুরুভুজ
নানা জাতি নানাবর্ণ নানান আকৃতি
শোভে দীর্ঘ তটপ্রান্তে যেন কণ্ঠহার
কোথা সুবিশাল কোথা ভাস্কর আকার !
একটি অভাব শুধু ! আজি এ মন্থনে—
না উঠিলা মনোমোহিনী কোন সিন্ধু বালা।
কি আশ্চর্য্য ! হের সখা বলিতে বলিতে
দুইটি কিন্নরী বালা নয়নে প্রকাশ !

তু। ঐ মহারাজা ঐ উর্ব্বশী সুন্দরী!
অঞ্চল দোদুল্যমান এলায়িত কেশ!
চকিত চরণ স্পর্শে ছুঁইয়া ধরণী
না থাকিয়া পদবিনা-রূপে আলো করি
পরীর মতন ফিরে সাগরের তীরে।

রা। উর্ব্বশী সুন্দরী ঐ! কে উহার পাশে?

তু। মেনকা সুন্দরী তাঁর কনিষ্ঠা ভগিনী।

রা। ফুলহেন সুকোমলা শান্ত মূর্ত্তিমতী!

তু। উর্ব্বশীর পাশে তবু মলিন শ্রীহান।

রা। হেরিলে ও সুধাময়ী প্রতিমার রূপ
চাঁদের আলোক স্নিগ্ধ ঝরে আঁখি পরে।
উঠিলেন পদ্মাসনা সমুদ্র মন্থনে
যে মোহিনীরূপে আজি তাহাই নেহারি।

তু। ক্ষমুন রাজন! সবে কহে আপনারে—
অন্ধ নারীরূপে, প্রমাণ হতেছে তাহা!
জীবন্ত প্রতিমা ইনি বিদ্যুৎ লতার
কি গর্ব্ব খেলিছে মরি হাসি মাধুরীতে
কটাক্ষেতে দশদিশে হানিছে প্রলয়।
স্বরগের শচী রতি হেন রূপবতী
তাহা নাহি লয় মনে; ইহার তুলনা
মেনকার সাথে সাজে! অথবা রাজন্
রুচির পরীক্ষা বুঝি করেন আমার!

রা। তোমার উর্ব্বশী তুকা হোন তিলোত্তমা,
মলিনা মেনকা যদি লভিবারে পারি
মানিব সৌভাগ্য।

(নেপথ্যে ভেপুর শব্দ)

শুনি সঙ্কেত আহ্বান।
আর দাঁড়াবার হেথা নাহি অবসর।
[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

[সমুদ্র তীরে পাহাড়ের উপর উর্ব্বশী আসীন।]

উ। সব মিথ্যা হায়! মিথ্যা রূপ মিথ্যা গর্ব্ব—
মিথ্যা এ জীবন, সত্য শুধু রমণীর
প্রাণভরা প্রেম! সমস্ত অস্তিত্ব তার
ইহাতে নিঃশেষ! যথা মিলায় সাগরে,
বিপুল বিম্বিকা তার। আজি মনে হয়
বিশাল সমুদ্র এই, উত্তাল তরঙ্গ
ক্ষুদ্র যেন অতি ক্ষুদ্র এ প্রেমের কাছে;
উথলে হৃদয়ে হেন অনন্ত স্ফীতিতে।

(একদল সৈনিকের পাহাড় তলে কুচ করিয়া গমন)

প্র-সে। মোগল এসেছে কোলাবায়, উঠে রক্ত
চন্‌চনি বাহুর শিরায়, খোল খোল
দ্বি-সে। খোল তরবারি—
তৃ-সে। উঠারে সশিক্ত বর্ষা
সকলে। চল সবে মুণ্ডপাত রক্তপাত করি
প্র। একটা বাঁচিয়া যদি ফিরে যায় দেশে
দ্বি। মিথ্যা এই হস্তে সবে অসি ধরি মোরা।
সকলে। জয় জয় মহারাজা সাহাজির জয়।
[নিষ্ক্রমণ।

(অশ্বারোহী সাহাজি ও তুকারামের প্রবেশ)

সা। তাড়াইয়া আনি মোরা এ বন্দরে আজি—
অসতর্ক মোগলেরে, ফেলিব ঘেরিয়া
চারিদিক হতে সবে অভিমন্যু সম।
জলে স্থলে কোন দিকে না পাবে পলাতে।
নাহি জানে তারা হায়! এ পর্ব্বত দেশে—
প্রাণ দিতে অগ্রসর! আসুক আসুক!

[প্রস্থান।

(পশ্চাদ্বর্ত্তী তুকা উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া)

তু। সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ যতবার দেখি
অভিনব অনুপম মাধুরীচ্ছটায়
বিমুগ্ধ নয়ন মন। রতি দেবী যেন
সাগর ললনা বেশে বিরাজেন হেথা—
দশদিক করি পূর্ণ রূপের জ্যোতিতে।
কাছে গিয়া জয় ভিক্ষা মাগি তাঁর ঠাই
নিশ্চয় সফল হবে দেবী আশীর্ব্বাদ!

[নিষ্ক্রমণ।

উ। (স্বগত)
কেবা ঐ অশ্বারোহী বন্ধু? সেই—সেই—
বীরমূর্ত্তি মহারাজা সাহাজি অধিরাজ!
আমারি পানেতে কেন আঁখি অনিমেষ!
সুধাকর যেন ঝরে কটাক্ষ তারায়.
অমৃতে বিষের জ্বালা কেন ঢালে প্রাণে!
(অশ্বারোহীর নিকট আগমন)

অ। নমস্কার দেবি, চলিয়াছি শত্রু নাশে
আশিষ বর্ষিত হোক এই ভিক্ষা মাগি।

উ। জয় যোদ্ধৃবর! সাহাজি রাজের জয়ে
আছে সংশয়! হীন দুষ্ট মোগলের
কিবা শক্তি সহ্য করে সে মহাপ্রতাপ!
সমূলে হইবে নষ্ট নিশ্চয় নিশ্চয়!

অ। অরুণার আশীর্ব্বাদ হইছে ধ্বনিত
দেবার বচনে, শুভদৈববাণী সম;
কভু না হইবে ব্যর্থ।

উ। ক্ষুদ্র এজনার
প্রাণমনে প্রার্থনার যদি থাকে ফল
নিঃসংশয় পরাইব বিজয়ী বীরেরে
জয় মাল্য রণশেষে!

(নেপথ্যে কোলাহল)

তু। বিদায় কল্যাণি
তাহা হ'তে উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর কিবা ধরি!
বিজয় সংবাদ লয়ে ফিরিব আবার!
তোমারি প্রসাদে দেবি, তোমারি আশিষে।

[প্রস্থান।

উ। গেলেন চলিয়া! মধুর ভাবের তাঁর
সরস পরশে এখনো সর্ব্বাঙ্গে বহে
পুলক কম্পন,—যেন বসন্ত হিল্লোলে।
হায়! ক্ষণিকের আলো ইহা! মিথ্যা এত সুখ!
মিথ্যা সেই সুধা হাসি মিথ্যা সুধাভাষ!
বাসনার মোহময় আপনা ছলনা!

প্রেমহীন রাজকীয় ভদ্রতা তাঁহার!
তাহা হতে ইহা আর বেশী কিছু নয়!
মেনকা তুমিই ধন্য! লভিয়াছ প্রেম!
মোর ভাগ্যে শুধু তাঁর নীরস সম্মান!
এই যে মেনকা! কিসে সম্বরি' আপনা!

(মেনকার আগমন)

উ। হেথা তুই বোন! লজ্জাবতী লতিকাটি!
বায়ুর পরশে মরি ভীত সঙ্কুচিত,—
তুই এবে হেথা এলি; কেমন করিয়া!
চৌদিকে সেনার স্রোত বিপদ ঘেরিয়া!

মে। বিপদই করেছে মোরে অভয় প্রদান!
কেমনে থাকিব ঘরে, রণক্ষেত্রে যবে—
প্রাণ আছে পড়ি। কোন্ দুরবল নারী
নাহি লভে মহাবল অসম সাহস
এ সময়ে? এসেছি বিজন শৈলপথে।

(পাহাড় তল দিয়া আবার একদল সৈনিকের গমন)

সেনাদল। মোগল মোগল! তরী হতে নামে কূলে—
মার্, কাট্, বাঁধ, ধর, দক্ষিণে, সম্মুখে
বামে, একটিও বেঁচে যেন নাহি ফিরে।

[প্রস্থান।

উ। একি এত তরী! ছুটিতেছে তীর মুখে
তীর বেগে যেন! মোগলের রণতরী!

মে। তাহাইত! শত শত সসজ্জ সৈনিক!
উত্তোলিত তাহাদের কৃপাণ ফলক
ঝক্ ঝকে রবি করে।

উ। 　　　　উপকূল ভাগে
জলের তরঙ্গ সম মহারাষ্ট্রী সেনা—
রণবাদ্য খুরধ্বনি বজ্র হুহুঙ্কার !
মে। উত্তরিছে দলে দলে যবন, যবন !
উ। আক্রমিছে দেখ তারে কি মহাবিক্রমে
আমাদের সেনা ?
মে। 　　　　একি দৃশ্য কি সংগ্রাম !
উ। কি উন্মত্ত আস্ফালন ! কি ভীষণ গর্ব্ব !
মে। বাদ্যধ্বনি গেল ডুবে অস্ত্র ঝন্‌ঝনে !
উ। বধির হইছে কর্ণ কামান গর্জ্জনে !
মে। ধূমে ধূমে গেল দিক আচ্ছন্ন হইয়া !
উ। ঐ পুনঃ ঝলসিছে অস্ত্রের ফলক
বিদ্যুতের মত !
মে। 　　　　বর্ষা সঙ্গীণ কৃপাণ
লুটে অবিশ্রাম বেগে ?
উ। 　　　　ছুটে ছিন্ন শির
মে। ছিন্ন দেহ হতে ছুটে শোণিত তুফাণ
জয় দেহ জয় দেহ মা তুমি অরুণা !
উ। কোথা কোথা মহারাজ ! ঐ ভেদকরি
পদাতিক অশ্বি ব্যূহ ছুটেন তুরঙ্গে।
ঐ ঐ রক্ষা কর তুমি মা অরুণা।
মে। ঐ পান্থ বীরবর যেন পুরন্দর—
দুজনে। (দুজনকে লক্ষ্য করিয়া)
এক হস্তে অসি ছুটে শত অসি যেন—
আসিতে পারেনা কেহ কাছে, শত শত্রু

বিলুণ্ঠিত ধরাতলে চক্ষুর নিমেষে
কি বীরত্ব! কি সাহস! এক-দুই-তিন
নাহি শুনা যায়!

উ। যদি হতেম পুরুষ!
উত্তেজিত হইতেছে সর্ব্বাঙ্গে শোণিত!

মে। পলাতক শত্রুদল!

উ। বন্দী মেষ সম!

মে। আমাদের কত বীর ধূলায় লুণ্ঠিত?
রক্তে রক্ত উপকূল! শিহরিছে তনু।
দেখিতে না পারি আর! কতক্ষণে হায়!
শেষ হবে এ ভীম সমর! হা বিধাতা!
(আকাশের দিকে চাহিয়া)
অগ্নিময় মেঘরাশি স্তূপে স্তূপে আজি
ছেয়েছে প্রদোষকান্তি রোষ মহিমায়!
ভাসিছে রক্তিম স্রোতে ধরণী গগণ॥

উ। সুলক্ষণ সুলক্ষণ! ঐ শুন শুন!
উঠিতেছে জয়ধ্বনি শাহাজি রাজার!

মে। সেনাদল পাশতেছে ঘূর্ণ্য বাঁকে তটে
ভাল নাহি দেখা যায় হেথা হতে আর!

উ। আমি হেরিতেছি তবু মানস নয়নে
অশ্বপৃষ্ঠে সমুন্নত জয়ী মহাবীর!
রক্তময় অসিধারী শোণিতাক্ত বেশ!
জয়ধ্বনি মাঝে ফিরে বঙ্কিমময় তেজে
লভিতে আমার হাতে বিজয় মালিকা

শত নৈরাশ্যের মাঝে এ আনন্দ সুখ
বারম্বার হৃদে মোর হইছে জাগ্রত।

মে। ঐ পুনঃ দেখা যায় মোগল পশ্চাতে
ছুটে মহারাষ্ট্রী সেনা!

উ। ঐ মহারাজ!
আবার মিলাল সব! পড়িল আড়ালে!
উঠি উচ্চ চূড়ে যেথা উন্মুক্ত ভূতল;

[উর্ব্বশীর প্রস্থান।

মে। দাঁড়াও একটু খানি সাথে লও মোরে!
লুকায়ে পড়িলে কোথা চক্ষের পলকে?
রাঙ্গা মেঘ মিলাইছে শ্যামল সন্ধ্যায়!
ঢাকিছে চৌদিক ক্রমে আঁধার বরণে
না চিনি এ গিরি পথ উর্ব্বশীর মত!
কেমনে তাহার কাছে যাইব এখন!

[মেনকার প্রস্থান।

(শৈলচূড়ায় উর্ব্বশী দণ্ডায়মান হইয়া)
একি একি পড়িলেন! ভূতলে লুটিয়া!
রক্ষা কর রক্ষা কর তুমি গো অরুণা!
যাই আমি কোথা যাই! বাঁচাই কেমনে?

।উর্ব্বশীর দ্রুতবেগে অবতরণ ও প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ত্রিকাল।—বিজন সিন্ধুতীরে উন্মাদিনীর মত উর্ব্বশীর প্রবেশ।

উ। তেজস্বী কুমার যেন! চমকিছে ঐ
এক হস্তে শত অসি। পড়িয়া গেলেন!

দেবতার আছে মৃত্যু ! হায় ! কখনো না !
কখনোনা ! কে আসিছে অশ্বপৃষ্ঠে ঐ ?
কেহ না কেহ না হায় ! রণক্ষেত্রে মরি
শোণিত শয্যায়, দেখেছি শয়ান তাঁরে !
যাই যাই কোথা যাই, কে বলিয়া দিবে
কোথা পাব তাঁরে ! বাঁচাইয়া তুলিব যে,
মৃতদেহ কোলে তুলি সাবিত্রীর মত !
বুঝিয়াছি আজি কেন লভেছি জীবন !
ইহারি লাগিয়া বিধি পাঠালেন ভবে !

(একখানি শিবিকা বহন করিয়া কয়েকজন সৈনিকের প্রবেশ)

উ। কাহারে বহিয়া যাস্ দেখা দেখা মোরে !
দয়া করি তোরা।

(শিবিকাবাহীগণ সহসা থামিয়া)

প্রথম শিবিকাবাহী। কে আহা এ ক্ষিপ্তানারী !

দ্বি। হারাইয়া প্রিয়জনে বুঝি এই দশা !

উ। দেখা দেখা সেনা তোরা করুণা করিয়া !
কাহারে বহিয়া যাস শিবিকা করিয়া !

প্র। এই দেখ মৃতে মোরা যেতেছি বহিয়া !
কেহ কি তোমার ইনি !

(দেখিয়া)

উ। কেহ না কেহ না
কোথা তিনি কোথা তিনি !

[উর্ব্বশীর দ্রুত প্রস্থান।

সকলে। পাগল পাগল !

[শিবিকাবাহীগণের প্রস্থান।

সিন্ধুতীরে অন্যস্থলে বালুকার উপর একটি শবদেহ, কতকগুলি সেনা
শবদেহের নিকট বসিয়া আছে, কতকগুলি সৈনিক চিতা
প্রজ্বলিত করিতেছে—সেই স্থলে উর্ব্বশীর আগমন

উ। কে তোমরা সেনাদল! কাহারে ঘেরিয়া
বসিয়া আছ সবে, সর একটুকু
দেখাও আমারে হোথা কে আছে শয়ান॥

১ সৈ। হায়! আমাদের নেতা ইনি যুদ্ধে প্রাণ হারা!

উ। দেখি দেখি! সরে যারে তোরা! সত্য এবে!
সেই বীর যোদ্ধৃবর মহারাজা মম!
ভাবিস ইহাঁরে মৃত! পাগল পাগল!
মূর্চ্ছা শুধু নিদ্রা শুধু! মুহূর্ত্তে এখনি
উঠিবেন জাগি হীন পাইবে দেখিতে।
(মৃতদেহ পরীক্ষা করিতে করিতে)

উ। রহিয়াছে বক্ষ পার্শ্বে ক্ষুদ্র বর্ষা খণ্ড
বিঁধিয়া এখনো, দেখিসনি এতক্ষণ?
তুলি দিই ধীরে, তুমি নিয়ে এস সেনা
উষ্ণীষ ভরিয়া সিন্ধুজল, ধৌত করি
দিব ক্ষত। তুমি যাও শৈলমূলে ঐ
সুশীতল মিষ্টজল পড়িছে চুঁইয়া
যাও, আন ত্বরা করি সিঞ্চিব আননে।

(সৈনিকদিগের গমন ও জল লইয়া পুনঃ প্রবেশ।)

উ। তুলিয়াছি বর্ষা খণ্ড, ঢাল ঢাল জল;
একজন ত্বরা আন সঞ্জীবনী মূল
গুচ্ছে গুচ্ছে পাবে ঐ করঞ্জার ঝোপে।

চর্ব্বিত প্রলেপে তায় বাঁধি দিব ক্ষতে।
অন্যজন পাড় ভাও উঠি তাল গাছে
পিয়াইয়া মধু ধীরে করিব সজ্ঞান।

(সৈনিকগণের তথাকরণ ও উর্ব্বশীর সেবায়
মুমূর্ষুর জ্ঞান লাভ)।

প্র-সৈ। একি একি বিস্ময়! সত্য! খোলেন যে আঁখি?
২। পাংশু মুখে শোণিতের চিহ্ন দেখি পুনঃ!
৩। সত্যই যে মৃতে বালা দিলা প্রাণ দান!
সকলে। কে তুমি গো দেবি পদে করি নমস্কার!
১ম। কি বিস্ময়ে হেরিছেন রমণীরে দেখ!
২। শিশু যথা নবজন্মে হেরি দীপালোক!
৩। অলৌকিক সংঘটনা এ দেখি ঘটিত!
৪। হৃদয়ের দৈববাণী সফল করিয়া
সত্যই কি শবদেহে প্রাণ সঞ্চারিত!
অথবা ইহাও মায়া আশার ছলনা!
১। ছলনা এ মায়া! কভু তা নহে তা নহে!
২। কম্পিত হৃদয় দেখ স্ফুরিত অধর!
শোন শোন কি কহেন।
যু। এ কোথায় আমি
মোগল যবন কোথা!
উ। চুপ কর দেব?
অধিক ক'রোনা কথা
যু। কে তুমি ললনা?
বিরাজিছ আঁখি পরে একি স্বপ্ন দেখি!

১ম। স্বপ্ন নহে এ বিস্ময়।

২য়। দেবীর প্রসাদ!

যু। কে তুমি কহ গো দেবি কি বিস্তার বলে
মৃতে দিলে প্রাণ দান হস্তের পরশে!

উ। শান্ত হও হে রাজন্ রাখ এ মিনতি
ক্ষতে যদি বহে রক্ত, এই ভয় করি।
সেনাগণ এইবার শিবিকা বহিয়া
শিবিরে লইয়া গিয়া শোয়ায়ে শয্যায়
পিয়াও এ মধুরস একটুকু করি
সুনিদ্রায় যতক্ষণ না হন মগন।

যু। তোমার পরশে পুণ্য, দেবি সুমঙ্গলে
দ্রবীভূত আনন্দের শত ঝরনায়
শ্রান্তি অবসাদ।

উ। কি আনন্দ কি আনন্দ!

[শিবিকা বহন করিয়া সৈনিকগণের গমন।

(মেনকার প্রবেশ।)

মে। উর্ব্বশী এখানে! আমি সারা গিরি গুহা।
খুঁজি খুঁজি এনু শেষে এ বিজন তীরে!

উ। (স্বগত) মেনকার কাছে হায় সুনীরব এবে
হৃদয় রসনা মোর।
(প্রকাশ্যে) দেখিতেছিলাম
যদি কোন পরিত্যক্ত মুমূর্ষু রোগিকে
বাঁচায়ে তুলিতে পারি শুশ্রূষার বলে।

মে। চল এবে ঘরে কত ভাবেন না জানি
পিতা মাতা দুইজনে মোদের!

[পটক্ষেপ]।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

আজিকার ভারতের ব্যবসা বাণিজ্য।*

বোম্বাই কিম্বা কলিকাতায় জাহাজ হইতে নামিবামাত্র কল-কারখানার ধূম-নালী ও তদুত্থিত ধূম-রাশি প্রথমেই নেত্র-সম্মুখে উপস্থিত হয়। ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া যাত্রা করিলে দেখা যায়, কতকগুলি বড় বড় সহরে, কাগজের কল-কারখানা, চাউল কিংবা তুলা ঝাড়াই করিবার কল-কারখানা, ময়দার কল-কারখানা, মদ চুঁয়াইবার কল-কারখানা—এইরূপ বিবিধ বাষ্পীয়কলের কারখানা প্রস্তুত হইয়াছে ও হইতেছে।

এই কল-কারখানার ব্যবসায়ের মধ্যে তৈল নিষ্কর্ষণ ও বস্ত্রয়নই সর্ব্বপ্রধান। তান্তব সামগ্রীর মধ্যে, পাট ও তুলার পরিমাণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

ঘন পরিধান-বস্ত্রের জন্য অথবা আস্‌বাব প্রভৃতির জন্য পাট ব্যবহৃত হইয়া থাকে; তাই ইহা নিছক্‌ রপ্তানির মাল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিলাতে ইহার চাহিদা অধিক। ইহা ভারতের একচেটিয়া সামগ্রী। কিয়ৎ বৎসর পূর্ব্বে ভারত হইতে কেবল কাঁচা মালই রপ্তানি হইত। কিন্তু আজকাল, তৈয়ারি মালও প্রতিবৎসর ক্রমশঃ বেশি বেশি করিয়া করিয়া প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। হয়তো, এক সময়ে ভারত স্বকীয় উৎপন্ন সমস্ত পাটই তৈয়ারি-মালের আকারে বিলাতে পাঠাইতে থাকিবে, বোধ হয় তাহারই এই পূর্ব্ব সূচনা।

রপ্তানি সামগ্রীর মধ্যে চাউলই প্রধান; তাহার নীচে পাট ও তুলা শেষ দুয়ের মধ্যে কে বড় তাহা লইয়া এখনো ঝুঝাঝুঝি চলিতেছে। কিন্তু স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তুলার রপ্তানি ক্রমশঃ কমিয়া

---

* Albert Metin লিখিত।

যাইতেছে ;—তাহার কারণ বোধ হয়, সুতা ও কাপড়ের কল-কারখানা ভারতে ক্রমশই বৃদ্ধি হইতেছে। তুলার তৈয়ারি মালেরও রপ্তানি কম না হউক অন্ততঃ সমানভাবেই রহিয়াছে। পক্ষান্তরে বিদেশী (সমস্তই ইংরাজী) মালের আমদানি বৃদ্ধি হইতেছে। তাহার কতকটা কারণ—লোক সংখ্যার বৃদ্ধি। কিন্তু সে যাহাই হউক, ইহা হইতে জানা যাইতেছে, ভারতের নিজস্ব তৈয়ারি মাল এখনো স্থানীয় বাজার দখল করিতে পারে নাই, বস্তুতঃ এই সকল ব্যাপারের বিবরণে বিলক্ষণ জটিলতা দৃষ্ট হয়। ভারতের তথ্য-বিবরণীতে তুলা-জাত সামগ্রীর যে বিবরণ পাওয়া যায়, হাতের তৈয়ারি মাল ও কল-কারখানার মাল—এ উভয়ই তাহার অন্তর্ভুক্ত। তন্মধ্যে হাতের তৈয়ারি মালের কাট্‌তি কমিয়াছে ও কারখানা-উৎপন্ন মালের পরিমাণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ভারতের প্রধান শিল্প-সামগ্রী যে তুলা, তৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে হইলে, তাহার ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক।

তুলা উৎপাদন ও তুলা হইতে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিবার কাজ এক সময়ে ভারতে একচেটিয়া ছিল। পুরাকালে ভারত "তুলার দেশ" বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। হিরোডোটাস্ হইতে আরম্ভ করিয়া মার্কো-পোলোর সময় পর্য্যন্ত এতদ্দেশীয় লোকেরা "তুলার কাপড় পরা ভারত-বাসী" বলিয়া কতবার বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণ পরিধান-বস্ত্র এবং মল্‌মল আদি সুদুর্লভ সূক্ষ্ম বস্ত্র, সমান বুনানি কাপড় ও ফুল কাটা কাপড়—যাহাকে আমরা চিরকাল ভারতবর্ষীয় কাপড় বলিয়া জানি উহা এতকাল হাতেই তৈয়ারি হইতেছিল। এখনো ভারতের বাজারে দেখিতে পাওয়া যায়, কতকগুলা ছোট ছোট চাঁচা-ছোলা কাষ্ঠপিণ্ডের সাহায্যে,—তুলা-জাত কাপড়ের উপর খুব উজ্জ্বল রঙের ফুল, সোনালি রঙের ফুল ছাপানো হইতেছে। কিন্তু গত শতাব্দি হইতে এই সমস্ত শ্রমশিল্পের গৌরব অনেকটা নষ্ট হইয়াছে। যখনি বিলাতে বাষ্পীয়

যন্ত্রের সাহায্যে বস্ত্রবয়ন আরম্ভ হইল, তখন হইতেই ভারত বিলাতের সরবরাহকার না হইয়া উল্টা তাহার খরিদ্দার হইয়া দাঁড়াইল। অধুনা, ম্যাঞ্চেষ্টরের দ্রব্যজাতে ভারত পরিপ্লাবিত। ভারতবাসীগণ কার্পাস বস্ত্রেই আপাদমস্তক আচ্ছাদন করে বটে; কিন্তু সেই সকল কাপড়ে ইংরাজি কারখানার ছাপ্ দেখিতে পাওয়া যায়। আবার কুলী মজুরেরা সেই সব বস্ত্র পরিধান করিবার সময়, যাহাতে সকলের নজরে পড়ে এইরূপ ভাবে এই মার্কা ছাপের অংশটা সম্মুখভাগে স্থাপন করে। তাহারা এই ছাপ্‌টিকে কাপড়ের অলঙ্কার বলিয়া মনে করে। ভারতে কার্পাস-বস্ত্রের শিল্প অল্প অল্প করিয়া ক্রমশঃ কমিয়া আসিয়াছে এবং উনবিংশ শতাব্দির শেষভাগ হইতে, বিলাতী বণিক্‌দিগকে শুদ্ধ তুলা সরবরাহ করাই ভারতের একমাত্র কাজ হইয়া পড়িয়াছে।

তথাপি, মার্কিন্ দেশে কার্পাস বৃক্ষের চাষে যত শীঘ্র উন্নতি হইয়াছে, ভারতে তাহা হয় নাই; কেননা, ভারতীয় কার্পাসের সূত্রগুলি অত্যন্ত খাটো এবং বুনিতে সুবিধা হয় বলিয়া বিলাতের বস্ত্রশিল্পিগণ ভারতীয় কার্পাস অপেক্ষা মার্কিন দেশীয় কার্পাস অধিক পছন্দ করে। কেবল, যে সময়ে মার্কিন দেশে গৃহ-যুদ্ধ বাঁধিয়াছিল সেই সময়ে মার্কিনের দক্ষিণরাজ্য হইতে ম্যাঞ্চাষ্টারে তুলার আমদানি বন্ধ হওয়ায় ভারতীয় তুলার খুব চাহিদা হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতীয় তুলার জন্য বিশেষ প্রকারের তাঁতের প্রয়োজন হয়। ম্যাঞ্চেষ্টারে মার্কিনের তুলা আবার যেই আমদানি হইতে লাগিল অমনি ভারতীয় কার্পাস-চাষের ক্ষণিক উন্নতির অবসান হইল। ইংলণ্ডের বাজারে মার্কিনের তুলা আবার স্বকীয় স্থানলাভ করিল; ইংরাজের কারখানায় যাহা প্রয়োজন তাহার ¾ অপেক্ষা অধিক পরিমাণ তুলা মার্কিন আবার সরবরাহ করিতে লাগিল। ভারতীয় কার্পাসের রপ্তানি যাহা তিন কোটী টাকা হইতে ৩৭ কোটী পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, যুদ্ধের পরে আবার

৮ কোটিতে নামিয়া আসিল। আবার ১৬ কোটি টাকায় উঠিয়া তাহার পর হইতে ক্রমশই কমিতে লাগিল। কিন্তু এই যে রপ্তানি কমিয়া গেল, উৎপত্তির হ্রাস তাহার কারণ নহে।

এক্ষণে এই ব্যবসায়টি আর এক মূর্ত্তি ধারণ করিল। শিল্পকর্ম্মের বিলাতি পদ্ধতি অনুসারে ভারতোৎপন্ন কার্পাসের বস্ত্রাদি ভারতেই তৈয়ারি হইতে লাগিল। দেশের কাজে যতটা প্রয়োজন তদপেক্ষা অধিক তুলা উৎপন্ন হওয়ায়, ভারতীয় মূল ধনীগণ তাহার কিয়দংশ লইয়া, আধুনিক যন্ত্রাদির দ্বারা সূতা তৈয়ারি ও কাপড় বুনানি করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তান্তব শিল্পের কারখানা খুলিতে হইলে, বিলাত হইতে উপকরণাদি ও কাজ দেখাইয়া দিবার জন্য বিলাতী মিস্ত্রী আনাইতে হয়; কাজেই একটা থোক্ টাকা প্রথমেই খরচ করা আবশ্যক। কারখানা একবার স্থাপিত হইলে, তাহার নিকটবর্ত্তী কোন ভারতীয় কয়লার খনি হইতে দাহ্য পদার্থ সুলভ মূল্যে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। কয়লার খনি সমূহে এখন যে পরিমাণ কয়লা পাওয়া যায়, ভালো বন্দোবস্ত হইলে, তদপেক্ষা অধিক কয়লা পাওয়া যাইতে পারে এরূপ আশা করা যায়। ইংলণ্ড হইতে কয়লা ভারতের বন্দর-সমূহে সুলভ মূল্যে পৌঁছিয়া থাকে। ভারতের কোন কোন প্রদেশে প্রচুর কাষ্ঠও পাওয়া যায়, ও তাহার খরচও খুব কম। সেই কাষ্ঠে এঞ্জিনের আগুন জ্বালাইবার কাজ বেশ চলিতে পারে। মিস্ত্রী মজুরের অভাব নাই—মজুরিও মহার্ঘ্য নহে। তবে এ কথা সত্য, কারখানা চালাইবার জন্য একজন পরিচালক—একজন সর্দ্দার মিস্ত্রী আবশ্যক, কখন কখন ইংরাজ কর্ম্ম-কর্ত্তার প্রয়োজন। কিন্তু এই সকল কাজের লোক ক্রমে দেশীয়দিগের মধ্য হইতেই সংগ্রহ করা যাইতে পারিবে এরূপ আশা করা যায়।

কয়লা ও যন্ত্রাদি গ্রহণের সুবিধার জন্য বোম্বাই ও গুজরাটের

উপকূলে সমুদ্রের ধারে কাপড়ের কল কারখানা প্রথম স্থাপিত হয়, এবং যে প্রদেশটি কার্পাস উপযোগী ভূমির জন্য প্রসিদ্ধ সেই মালোয়ার নিকটবর্ত্তী প্রদেশেও ঐ কল কারখানার প্রথম সূত্রপাত হয়। সর্ব্বপ্রথমে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বরোচে কাপড়ের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমে বোম্বাইকে মুখ্য কেন্দ্রস্থল করিয়া তৎসংলগ্ন প্রদেশেই এই ব্যবসায়টি পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। মাদ্রাজের কল কারখানা স্থাপনের ইতিহাসও প্রায় একই রকমের। পঞ্জাব ও গাঙ্গেয় উপত্যকা প্রদেশের কল কারখানার ইতিহাস আরো আধুনিক। বঙ্গদেশে যে কয়লা খানির কাজ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার উপরেই উহাদের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। ভারতে যদি দাহ্য দ্রব্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং যদি রেলপথ ও খালের দ্বারা গতিবিধির বড় বড় রাস্তা গুলির সহিত কল কারখানার যোগ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে উত্তর-ভারতের নদীনালা দিয়া দেশীয় কয়লা সেখানে নীত হইতে পারে। মোগল-দিগের পূর্ব্বতন রাজধানী দিল্লি—যাহা এক্ষণে রেল-পথ ও খাল-পথের কেন্দ্রস্থল—সেই দিল্লির উপকণ্ঠে কল কারখানার সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া, ঐ নগরটী বোধ হয় কালক্রমে সমস্ত প্রাচ্য ভূমণ্ডলের শিল্পপ্রধান নগরগুলির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিবে।

কল কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, কারখানাওয়ালাদিগের আশা ভরসাও বৃদ্ধি হইল। যে সকল মূলধনী ভারতে সর্ব্বপ্রথমে কল কারখানার স্থাপন করেন, এদেশের খরিদ্দার লইয়াই ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত তাহাদের বিবাদ ছিল। তাহার অনেক পরে, যখন ভারতীয় টাকার মূল্য ঘাটিয়া যায়, তখনই রপ্তানির জন্য মাল প্রস্তুত করিবার কল্পনা, মৎলবী ব্যবসাদারদিগের মনে প্রথম উদয় হইল। বস্তুতঃ, বিদেশীয়কে সোনার মূল্যে মালাদি দিয়া, এই মুদ্রা বিনিময়ের প্রায় সমস্ত লাভটাই ঘরে আসিবার কথা; কেননা, টাকার ঘাট্‌তি হইবার পর

হইতে বেতনাদি ও উপকরণের খরচ বৃদ্ধি হইলেও উহা এই মুদ্রা-মূল্যগত পার্থক্যের অনুপাতে হয় নাই।

কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত, ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের রপ্তানি খুব কম এবং উহার বৃদ্ধিও হইতেছে না। এমন কি, ইংলণ্ডের বণিক প্রতিনিধিগণ ভারতের নিজস্ব বাজারও অনেকটা দখল করিয়া লইয়াছে। বিদেশীয় আমদানি-মালের ফর্দ্দেও উহারাই এখন প্রথম স্থান অধিকার করে। যদি হিন্দু-কারখানা-ওয়ালারা নিজ ভবিষ্য স্বপ্নকে সফল করিয়া তুলিতে চাহেন, তাহা হইলে, কারখানাদির প্রতিষ্ঠায় যে মূলধন তাঁহারা আজ পর্য্যন্ত নিয়োগ করিয়াছেন তদপেক্ষা আরো অধিক টাকা এই কার্য্যে নিয়োগ করুন।

বিলাতের মূলধন, ভারতকে রূপান্তরিত করিয়া তুলিবার উপক্রম করিয়াছে। এই কার্য্য সাধন করিতে হইলে,—যে মূলধন ভারতীয় বণিকদিগের ধনাগারে সঞ্চিত আছে তাহার সহকারিতা গ্রহণ করা আবশ্যক। কিন্তু ভারতীয় বণিকেরা, যে চিরপরিচিত পন্থা অবলম্বনে ধনশালী হইয়াছে তাহাতেই উহারা অভ্যস্ত। বিলাতী কার্য্য পদ্ধতি অনুসরণ করিতে তাহারা ভয় পায়! এইহেতু, কল কারখানা স্থাপনের জন্য কতক বৎসর ধরিয়া মূলধন নিয়োগ করিতে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিলে তাহা কতদূর সফল হইবে সে বিষয়ে বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। এ সম্বন্ধে তাহাদের মনস্থির করিতেই বহুদিন চলিয়া গেল। বোম্বায়ের পার্শিরা অগ্রসর হইয়া এই ব্যবসায়ে প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইল। এই পার্শিরা বণিক জাতি। লণ্ডন ও ম্যাঞ্চেষ্টারের সহিত আড়ৎদারি কাজ করা ইহাদের অভ্যাস ছিল। ইহারা ইংরাজিতে কথা কহে; আজকাল ইহারাই, বোম্বাই ও পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশস্থ অধিকাংশ কল কারখানার মালিক। ইহাদের দৃষ্টান্তই হিন্দু বণিকদিগকে চাগাইয়া তুলিল;—কিন্তু সহজে নহে। একজন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু

বণিক ও মহাজন—যাঁহার বংশে বহুকাল হইতে এই কাজ চলিয়া আসিতেছে এবং যিনি দিল্লি লাহোরের কল কারখানার অনেকগুলি "অংশ" ক্রয় করিয়াছেন—তিনি এই ব্যবসায় উদ্যমের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আমার নিকট বিবৃত করিলেন। তিনি যখন অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন, তখন তাঁহার পিতার গৃহে এই ব্যবসায়-সম্বন্ধে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিত। এই পরামর্শ সভায় অন্যান্য বণিকেরাও আমন্ত্রিত হইতেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্কবিতর্ক হইত, সকলেই ইতস্ততঃ করিত, কিন্তু কাজে কেহই কিছুই করিত না। তাঁহাদের সময়ে কোন ফল হইল না বটে কিন্তু তাঁহাদের পরবর্ত্তী উত্তরবংশীয়েরাই এই ব্যাপারে মূলধন নিয়োগ করিতে আরম্ভ করিল। এখন এই ব্যবসায় উদ্যমের ক্রমশই প্রসার হইতেছে। এখন দেখা যায়, সমস্ত পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নব্য বণিকবংশীয়েরা স্বীয় পিতৃপিতামহ-দিগের অপেক্ষা সাহসী হইয়াছে, একজন বাষ্পীয় যাঁতা-কল স্থাপন করিয়াছেন ; আর একজন, ইক্ষু-পেষণের জন্য সেকেলে ধরণের যে কাঠের চেঙ্গা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল তাহার বদলে ছাঁচে ঢালা পেষণ-যন্ত্র নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছেন। তাঁহার কারখানাটি এখনও তৈয়ারি হইতেছে—শেষ হয় নাই। তাঁহার কথা যদি বিশ্বাস করা যায়, তিনি বলেন, ইহারি মধ্যে তাঁহার নিকট প্রায় ৯০০০ যন্ত্রের ফরমাইশ আসিয়াছে। আজকাল সুতা ও কাপড়ের কলে দেশীয় মূলধন নিয়োজিত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে শীঘ্রই যে উন্নতি হইবে তাহার লক্ষণ এখন হইতেই দেখা যাইতেছে।

বড় বড় ব্যবসায়ে প্রথম প্রবৃত্ত হইতে ভয় হইবারই কথা। এই সকল কাজে চিরপ্রথাই সাধারণতঃ অনুসৃত হইয়া থাকে। পরে যখন নব্যবংশীয় দেশীয় মূলধনীদিগের মন বৈদেশিক প্রভাবের বশবর্ত্তী হয়, তখন তাহারা আপনা হইতেই সাহস করিয়া নূতন ব্যবসায়ে

হস্তার্পণ করে। অবশ্য এখনো হিন্দু ব্যবসাদারেরা তাহাদের চিরপ্রচলিত আচার ব্যবহারই অনুসরণ করিয়া থাকে, পৃথক আসনে বসিয়া আহার করে, আপনার জাতি ছাড়া আর কোথাও বিবাহের আদানপ্রদান করে না, নিজ মহিলাবর্গকে অন্তঃপুরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন রাখে এবং নিজের শাস্ত্র মানিয়া অনুষ্ঠানাদি করে। উহারা আপনাদিগের চিরপ্রচলিত পরিচ্ছদ বজায় রাখিয়াছে। একদিন সায়ংকালে, উহাদের মধ্যে একজন আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া স্বগৃহে লইয়া যায়। তাহার গায়ে পশু লোমের আস্তরওয়ালা একটা মখমলের জোব্বা, মাথায় জরির কাজ করা একটা টুপি—সেণ্টলুই ধরণের পরিচ্ছদ। লোকটি ইংরাজীতে কথাকহে এবং ইংলণ্ড ও বিলাত দেখিতে তাহার বড়ই ইচ্ছা। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের প্রদর্শনীর সময় সবান্ধবে প্যারিস নগরে যাইবার তাহার ইচ্ছা ছিল, সেখানে গিয়া কাজকর্ম্মের বন্দোবস্ত করিয়া আসিবে মনে করিয়াছিল। সে বলিল, তাহারা নিজের পাচক ও ভৃত্যবর্গকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, আর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, প্যারিসে কোন পৃথক বাসা পাওয়া যায় কি না যেখানে তাহারা নিজ ধর্ম্ম বিশ্বাস অনুসারে আহারাদি করিতে পারে। যদিও তাহারা অতীতের বাহ্য আবরণ রক্ষা করিতে যত্নবান, কিন্তু ভাবে তাহারা ক্রমশই আধুনিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের বাহ্য আচার ব্যবহার যাই হোক্ না কেন, ইহারা কতকটা উন্নতিশীল। যে সকল সুশিক্ষিত ব্যক্তি আধুনিক জাতীয় আন্দোলনের পরিচালক, তাঁহাদিগকে ইহারাই সাহায্য করে। সর্ব্বত্রই যেরূপ হইয়া থাকে—ভারতের প্রজা-পক্ষীয় দল রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর নির্ভর না করিয়া, ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপরেই অধিক নির্ভর করে।

ইংলণ্ডের আইন-কানুনে ভারতীয় শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায়, ভারতীয় কারখানা ওয়ালারাও রাজনৈতিক প্রতিবাদ-আন্দোলনে যোগ দিতে

বাধ্য হইয়াছে। ইংরাজ সরকার, ভারতে এক প্রকার উল্টা-ধরণের সংরক্ষণ-নীতি (protection) প্রবর্ত্তিত করায়, কাপড়ের কল-কারখানাওয়ালাদের বিশেষ ক্ষতির কারণ হইয়াছে। কিরূপ অবস্থায় এই নীতি প্রথম প্রবর্ত্তিত হয় তাহা নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—

পররাজ্য অধিকার নীতির ফলে ভারতীয় রাজকোষে অর্থাভাব হওয়ায়, সেই অভাব পূরণ করিবার জন্য কলিকাতার রাজ-সরকার বিলাতি আমদানি দ্রব্যের উপর জাতিনির্ব্বিশেষে এক সমান হারে শুল্ক স্থাপন করেন। পঁচিশ বৎসর কাল ধরিয়া ভারত যাহাদের প্রধান খরিদ্দার, সেই ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানা-ওয়ালারা ইহার প্রতিবাদ করিল। তাহারা বলিল—এই শুল্ক স্থাপিত হওয়ায়, ভারতীয় নগরগুলির সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত হীন হইয়া পড়িয়াছে। এই কথা বলায়, ইংলণ্ডের রাজ সরকার ম্যাঞ্চেষ্টারের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। বিলাতি আমদানির উপর যে শুল্ক স্থাপিত হইয়াছিল তাহা কমাইয়া দেওয়া হইল, এবং ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর তাহারই তুল্য পরিমাণে একটা শুল্ক স্থাপিত হইল। যাহার দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখা যায় না এরূপ একটা নূতন পদ্ধতি ভারতে প্রবর্ত্তিত হওয়ায়,ভারতীয় কারখানা-ওয়ালাদের বিশেষ অভিযোগের কারণ হইল। কিন্তু এরূপ করিয়াও ইংরাজেরা এ দেশের কারখানা-ব্যবসায়ের উন্নতি একেবারে রুদ্ধ করিতে পারিল না। কার্য্য গতিকে একটা ভাগাভাগি হইয়া পড়িল, এই মাত্র। ম্যাঞ্চেষ্টার বেশির ভাগ সূক্ষ্ম কাপড়াদির আমদানি করিতে লাগিল এবং ভারত সুলভমূল্যে মোটা কাপড় প্রস্তুত করিয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব-উপকূলস্থ প্রদেশে রপ্তানি করিতে প্রবৃত্ত হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

আমাদের ঐতিহাসিক ভাণ্ডার।

[আমরা এপর্য্যন্ত বঙ্গদেশের পল্লী ইতিহাসের অনেক উপকরণ পাইয়াছে, তাহার কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। এই সকল উপকরণ যতই কেন সামান্য হউক না, ইহাদের কোন ক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না, বঙ্গদেশের ভাবী ইতিহাস সঙ্কলন কালে কোন্ কথা কোন্ কাজে লাগিবে—তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। হয়ত একটা নগণ্য তথ্য হইতে বৃহৎ ঐতিহাসিক কোন জটিল প্রসঙ্গ গ্রন্থি-মুক্ত ও সরল হইয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাস বঙ্গীয় পল্লীতে খুঁজিতে হইবে, রাষ্ট্রবিপ্লব কিম্বা রাজনৈতিক ঘটনায় বঙ্গের পল্লীর শিক্ষা, ধর্ম্ম, ও মহত্বের অনেক সময় কোনই বিঘ্ন করে নাই। সেই জাতীয় ইতিহাস লিখিতে হইলে নানারূপ আপাততঃ ক্ষুদ্র ও নগণ্য উপকরণ গুলিকেও আমাদের সমাদরে সঞ্চয় করিতে হইবে। আমরা নিম্নে যে সকল বিবরণ দিয়েছি, বহু সংখ্যক ব্যক্তিই এইরূপ কিছু না কিছু উপকরণ প্রদান করিয়া বঙ্গীয় ইতিহাসের হিতসাধন করিতে পারেন; এই সকল তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদিগকে সংবাদ-দাতাদিগের উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, সুতরাং তাঁহারা যেন শ্রম স্বীকার পূর্ব্ব ঐতিহাসিক তথ্যগুলি সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়া আমাদিগকে সংবাদ প্রেরণ করেন—এই অনুরোধ। ভা, সং]

খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীউলা গ্রাম হইতে মহম্মদ আফ্‌তাবুদ্দীন আহমদ নিম্নলিখিত সংবাদগুলি দিয়াছেন—

১। খুলনা জেলার সাতক্ষীরার অন্তর্গত ঘুগুড়ি গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে একটী ইষ্টকনির্ম্মিত সোপান শ্রেণী বাহির হইয়াছিল, পুষ্করিণীর মাটীতে তাহা পুনরায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান পুষ্করিণীটি পুরাতন পুষ্করিণীর প্রায় ১/২ অংশ, সাবেক পুষ্করিণীটি ২৫০ হাত দীর্ঘ ও ২২৫ হাত বিস্তৃত ছিল। ইহা "চাঁদখাঁর দীঘি" নামে প্রসিদ্ধ। এই পুষ্করিণীর ১৬ হাত মাটীর নীচে শেষ ধাপ পাওয়া

গিয়াছে, এই ধাপ ৮।৯ হাতের অধিক বিস্তৃত নহে। ঘুগুড়ির সান্নিধ্যে চাঁদখালি গ্রাম এবং ঘুগুড়ির বাজারের অপর পারে উজিরপুর গ্রাম। লেখক অনুমান করেন চাঁদখার দীঘি, চাঁদখালি গ্রাম এসমস্তই বার ভুঞার অন্যতম চাঁদ খাঁ মসন্দবীর স্মারক কীর্ত্তি।

২। উজিরপুর গ্রামে "উজিরের বাড়ী" নামধেয় একটী অতি প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়।

৩। উজিরপুরের সংলগ্ন সাঁইহাটি গ্রামে দুইটি সুপ্রাচীন মঠ আছে। একটী মঠের প্রস্তর ফলকে ৯:৮ শক উৎকীর্ণ আছে।

৪। কালীগঞ্জের নিম্নবাহিনী নদী হইতে মহারাজ বসন্তরায়ের "রায়গড়ের" ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। প্রাচীন [illegible]শাগর ও [illegible]-ঘাট প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু আছে, হাবসীখানার ভগ্ন বাড়ী এখনও পরিদৃষ্ট হয়, ঈশ্বরপুরের মন্দিরাদি ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাস-পূর্ণ।

৫। সুন্দর বনের মধ্যে কাশী (বেদকাশী) নামক স্থানে "খালিস খাঁর দীঘি" নামে একটী জলাশয় এবং তৎপার্শ্বে বড় বড় প্রস্তর খণ্ড ও একটী সুবৃহৎ বাড়ীর ভগ্নাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়।

৬। বঙ্গোপসাগরের নিকটে "নীলকমল" নামক নদীর তীরে "তীর কাটি" নামধেয় জঙ্গলে একটী অতি প্রাচীন ইষ্টকালয় পরিদৃষ্ট হয়।

৭। কোমরপুরস্থ গড়ের হাটে একটী জাঙ্গাল আছে, কেহ কেহ তাহাকে "কমলপুর" আখ্যা দিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বহির্দ্বার রক্ষক "কমল খোজা"'র বাটীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

বরিশাল কীর্ত্তিপাশা হইতে শ্রীযুক্ত রায় রোহিণী

কুমার সেন চৌধুরী মহাশয় নিম্নলিখিত তথ্যগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন—

১। ঝালকাঠী (বাকরগঞ্জ) থানার অধীন "সুতালড়ি" নামক স্থানে একটী শিব মন্দির দৃষ্ট হয়, ইহা অতিশয় প্রাচীন, ভাগ্যমন্ত সাহা নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বহু পূর্ব্বে এই মঠ—তাঁহার মাতৃ-সমাধিস্থলে নির্ম্মাণ করেন, প্রায় ১০০ বৎসর হইল ইহার চূড়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট যাহা আছে, তাহাই ১৩৩ হাত উচ্চ, ইট গুলি রক্তাভ ও এক এক খানি ১।১½ ইঞ্চি উঁচু ও ৬½ ইঞ্চি লম্বা। এই মঠের কথা রেনল্ সাহেবকৃত মানচিত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই স্থানে আরও কতকগুলি প্রাচীন ইষ্টকালয় পড়িয়া আছে।

২। নিম্নলিখিত মস্‌জিদ গুলির বিবরণ রোহিনী বাবুর পত্রে পাওয়া গিয়াছে—

(ক) পাটুয়াখালির অধীন মস্‌জিদ্‌বাড়ী গ্রামে অতি বৃহৎ একটী মস্‌জিদ্ আছে। উহাতে একটী প্রস্তর লিপি সংলগ্ন ছিল, তাহা এসিয়াটিক সোসাইটি লইয়া গিয়াছেন। এই মস্‌জিদ্ নানা প্রকার কারুকার্য্য খচিত, বহির্ভাগে কৃত্রিম লতাপাতার চিহ্ন আছে।

(খ) বাকরগঞ্জ থানার অধীন "শিয়ালঘুণি" গ্রামের অতি প্রাচীন "মসরত গাজির মস্‌জিদ্।"

(গ) ঝামতি থানার অধীন বিবিচিনি গ্রামের প্রাচীন মস্‌জিদ্, এবং গৌরনদা থানার অধীন রামসিদ্ধি গ্রামের মস্‌জিদ্, শেষোক্ত মসজিদটি স্বনাম খ্যাত মহম্মদ সফি খাঁ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত, ইহার উচ্চতা ৭০।৮০ ফিটের কম নহে।

(ঘ) "সুতালড়ি" গ্রামের নিকট "ডাইল বাজারে" একটী জীর্ণ প্রাচীন মসজিদ আছে, তৎসংলগ্ন প্রস্তরলিপির এখনও পাঠোদ্ধার হয় নাই।

৩। পোনাবালিয়া গ্রামের নিকটে "সামরাইল" গ্রামে "ত্র্যম্বকেশ্বর শিবলিঙ্গ" প্রতিষ্ঠিত। প্রবাদ এই লিঙ্গ অনাদি। এই গ্রাম তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। শিব চতুর্দ্দশীর দিনে এই স্থানে বহু সংখ্যক সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।

৪। চন্দ্র দ্বীপের রাজধানী 'মাধব পাশায়' একটী প্রকাণ্ড দীঘি বিদ্যমান, ইহা "দুর্গাসাগর" নামে পরিচিত।

৫। লক্ষ্মণকাটি গ্রামে পুষ্করিণী খননকালে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত একটী "মহাবিষ্ণু" মূর্ত্তি সম্প্রতি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তি এইক্ষণ বরিশাল সহরে স্বনামখ্যাত বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে আছে।

৬

ইদিলপুর পরগণায় জমী চাষের সময় একখানি তাম্রশাসন, অল্প দিন হইল পাওয়া গিয়াছে। রোহিণী বাবু তাহার অনেকটা পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, এই তাম্রশাসন রাজা কেশব-সেনের প্রদত্ত।

বীরভূমের অন্তর্গত "বসোয়া" হইতে বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম এই ঃ—

বীরভূম জেলার অধীন রামপুরহাট মহকুমার অধীন কলেশ্বর গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দির আছে, তথায় "কলেশ্বর" নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরটি ৬০।৭০ হাত উচ্চ এবং ৩০।৪০ হাত দীর্ঘ। ইটের আকৃতি ১১ ইঞ্চি দীর্ঘ, ৫½ ইঞ্চি প্রশস্ত ও ৩¼ ইঞ্চি বেধ। তথাকার লোকেরা বলেন, মন্দিরের সম্মুখস্থ কার্ণিসের মধ্যস্থলে মন্দির প্রতিষ্ঠিতা নাটোরের রাজা রামজীবনের নাম প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ ছিল, সে ফলকটি এখন নাই, মন্দির নির্ম্মাণ করিতে লক্ষাধিক টাকা ব্যয়িত হইয়াছিল। পাণ্ডাদিগকে ১৪৪ বিঘা, যে লোকটি মন্দির

পরিষ্কার করে তাহাকে তিন বিঘা ও যে ঢাক বাজায় তাহাকে তিন বিঘা নিষ্কর জমি প্রদত্ত হইয়াছে। পাণ্ডাদের দেবোত্তর দানপত্রখানি অতি জীর্ণ ও তাহাতে নাটোরাধিপতি রামজীবনের নাম লিখিত আছে। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি চমৎকার।

ফরিদপুরের ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নপ্রদত্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে ঃ—

১। বেলগাছি ষ্টেসনের নিকট হারোয়া গ্রামের মদনমোহনের মন্দির। বেলগাছি পরগণা পূর্ব্বে নাটোর রাজষ্টেটের অন্তর্গত ছিল। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন উক্ত মন্দির এবং বিগ্রহ নাটোর রাজবংশেরই একটি কীর্ত্তি। এই মন্দিরাধিষ্ঠিত "মদনমোহন" অতি সুন্দর দ্বিভুজ মূর্ত্তি—প্রস্তর নির্ম্মিত, ১½ হাত উচ্চ। মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রচুর দেবোত্তর ভূমি প্রদত্ত আছে।

২। বেলগাছিতে প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যদেবের মন্দির। অতি প্রাচীন মন্দির, কেহ কেহ বলেন ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের সম সাময়িক। মহাপ্রভুর মূর্ত্তি নিম্বকাষ্ঠ নির্ম্মিত। মন্দিরের গায়ে নানাবিধ প্রতিমূর্ত্তি খোদিত আছে।

৩। পাংশা ষ্টেসনের অধীন সদাপুর গ্রাম অতি প্রাচীন; এই গ্রামে দুইটি বটবৃক্ষের নীচে লোকেরা বহুকাল যাবৎ পূজা দিয়া আসিতেছে, বৃক্ষের তলদেশে একটি ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়।

৪। পাংশা মাধবপুরে সাজি নামে এক দরবেশ ফকিরের কবর আছে, এখানে বহুকাল যাবৎ হিন্দু ও মুসলমানগণ সিন্নি দিয়া থাকে।

যশোহরের অন্তর্গত কলোরাগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত সংবাদগুলি পাওয়া গিয়াছে ঃ—

যশোহরজেলার বঙ্গেশ্বরদির পূর্ব্বদিকে জঙ্গলে সীতারাম রায়ের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। বাড়ীর দক্ষিণে সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে, তাহার বাঁধা ঘাটের দুই দিকে দুইটি অশ্বারূঢ় মনুষ্যমূর্ত্তি ইষ্টক স্তম্ভের উপর সংলগ্ন, একটির মস্তক ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তৎপরে রাজার বৈঠকখানা বাড়ীর ভগ্নাবশেষ, তৎপরে ঠাকুর দালানের তিনটি উচ্চ ও বৃহদায়তন স্তম্ভ বিদ্যমান। বামদিকে পুষ্পোদ্যান ছিল, এখন সে স্থান হরিতকীবৃক্ষ পূর্ণ, ঐ স্থান নিবিড় জঙ্গল পূর্ণ, সেখানে কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তি আছে বলিয়া শুনা গিয়াছে।

যশোহর বিভাগদিতে একটা অতি প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ এবং একটা সুরঙ্গ আছে, লোকের বিশ্বাস সেই সুরঙ্গের নিম্নে ইষ্টকালয় আছে

যশোহরান্তর্গত উজিরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় জানাইতেছেন ঃ—

উজিরপুর গ্রামের পশ্চিমভাগে একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন বাড়ীর চিহ্নাদি দৃষ্ট হয়, মৃত্তিকা খনন করিলে বাড়ীর ভিত্তি পাওয়া যায়। এই বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে গড় ছিল, দক্ষিণ ও পশ্চিমে এখনও তাহার চিহ্ন আছে,—বাহিরে এবং ভিতর বাড়ীতে দুইটি দীঘি ছিল, এখন তাহা অনেকাংশে ভরাট হইয়া গিয়াছে। এইখানে রাজা কেশবের বাড়ী ছিল বলিয়া প্রবাদ।

ঢাকাজেলার সুয়াপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবীচরণ দাস মহাশয় লিখিতেছেন ঃ—

পূর্ব্ব বঙ্গে ঢাকা জেলা অতি প্রাচীন সহর। উক্ত জেলার পশ্চিম

বিভাগ স্বর্ণাপুর, নান্নার, রঘুনাথপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহ নিম্ন ভূমিতে অবস্থিত বহুকালের প্রাচীন উপনিবেশ। ঐ সমস্ত গ্রাম পরিদর্শন কারলে পূর্ব্বকালের কীর্ত্তি সকল এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। স্বর্ণাপুর গ্রামের বসতি স্থানের মধ্যে মৃত্তিকা খনন করিলে স্থানে স্থানে প্রাচীন কালের ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীর সকল বাহির হইয়া থাকে। তথায় যে শ্রীশ্রী৺রাধাকান্ত বিগ্রহ স্থাপিত আছেন, উক্ত বিগ্রহের প্রাচীন মন্দির দোচালা ঘরের আকৃতি ও ইষ্টক নির্ম্মিত ছিল। তাহা ভগ্ন করিয়া সেবক গুরু প্রসাদ দাসগুপ্ত অপর সেবকগণের অনুমতি গ্রহণে তাঁহাদিগকে এক লিখন প্রদান দ্বারা যে মন্দির স্থাপন করিয়াছেন তাহা ১৭২৩ শকাব্দায়, প্রস্তুত হইয়াছিল। ঐ মন্দির এখন ভগ্নাবস্থায় আছে।

উক্ত গ্রামের পূর্ব্বে, নান্নার গ্রামের পশ্চিমে বাজাসন* নামক মৌজায় কৈকুড়ি নামক বিলের তীরে বহুকালের পতিত ভিটা ভূমি দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ষাকালে উল্লেখিত গ্রাম সমূহের চতুঃস্পার্শ্ব জলাকীর্ণ হওয়ায় তৎকালীয় মৃতদেহ তথায় দাহন করা হয় বলিয়া সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঐ স্থানে ভূত প্রেতগণের আবাস সুতরাং

* "বাজাসনের ভিটা" এই সংজ্ঞায় স্পষ্ট প্রতীতি হয়, স্থানটি বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংস্পৃষ্ট ছিল। বাজাসন, বজ্রাসন শব্দের অপভ্রংশ, এই বজ্রাসন বৌদ্ধতন্ত্রে বিশেষরূপে উল্লিখিত, এদেশে "বজ্রাসন," "বজ্রযোগিনী" প্রভৃতি স্থানের নাম দেখিলেই অনুমান করা স্বাভাবিক, যে তথায় বৌদ্ধগণের কোন না কোন প্রকার প্রভাব ছিল। "বাজাসনের ভিটা" যদি এখনও পতিত অবস্থায় থাকে, তবে সেই মৃত্তিকা খনন করিলে কোন প্রকার বৌদ্ধনিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা মনে হইতেছে, এদেশে নানা স্থানে গ্রামের নাম "পাঁচথুপী" দৃষ্ট হয়, এই শব্দ "পঞ্চস্তূপ" কথার অপভ্রংশ। "থুপ" বা "থুপী" শব্দ পাইলেই উহা বৌদ্ধস্তূপের স্মারক অনুমান করা যায়, এইরূপ সংজ্ঞাবিশিষ্ট স্থানগুলি অন্ততঃ সহস্র বৎসরের প্রাচীন হইবার কথা, কারণ বৌদ্ধগণের প্রভাব সহস্র বৎসর পূর্ব্বেই এদেশে বিশেষভাবে বিস্তৃত ছিল। ভাঃ সং।

তথায় কেহ বাস করিতে ইচ্ছা করে না। পূর্ব্বকালে তথায় কতকগুলি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী লোক বাস করিত। উহারা নান্নার গ্রামবাসী গোস্বামিগণের শিষ্য ছিল। একটি কিম্বদন্তি আছে, শক্তি সম্প্রদায়ী সুঁয়াজপুর গ্রামবাসি লোকদিগের পূজিত পুষ্পাঞ্জলী জবা আদি পুষ্প জলে ভাসিতে দেখিয়া, ঐ রাজাসনবাসী লোকদের উক্ত পুষ্প দ্বারা দেবার্চ্চন করিতে ইচ্ছা হয়। তৎপর তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া শাক্ত গুরুর শিষ্য হয়। রাজাসনবাসি লোকদিগের গুরু নান্নার গ্রামবাসী গোস্বামিগণের উত্তরাধিকারী হরিমোহন কুঞ্জমোহন গোস্বামীদের বাড়ীতে ইষ্টক নির্ম্মিত একটি দোচালা প্রাচীন মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে।—

রঘুনাথপুর গ্রামে বহুকালের একটি ইষ্টক নির্ম্মিত দোচালা প্রাচীন ভগ্ন মন্দিরে ৩টি শিবলিঙ্গ স্থাপিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার সেবাইত কেহ বর্ত্তমান নাই। কে সেবাইত ছিল, কেহ নিশ্চয়রূপে বলিতে পারে না। উক্ত স্থান যে তালুকের অন্তর্গত ও তাহা খরিদ ক্রমে যে মালিকের অধিকারে আছে, তাহারা উক্ত শিবলিঙ্গের সেবা না দেওয়ায় ঐ মন্দির অশ্বত্থ বৃক্ষের দ্বারা আকৃষ্ট ও জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে।

কুরুক্ষেত্র ।*

কোন্ দগ্ধ সাহারার কেন্দ্র হ'তে করি আকর্ষণ
ভারতের অঙ্কস্থলে, হে বিধাতঃ, করেছ স্থাপন
কুরুক্ষেত্রে ? অন্তরের অন্তস্তলে না জানি তাহার
কি বহ্নি জ্বলিছে সদা-মর্ম্ম ভেদি' উঠে হাহাকার !
রৌদ্রে ক্লান্ত প্রান্তরের শুষ্ককণ্ঠ প্রতি বালুকণা
তৃপ্তিহীন পিপাসার বিস্তারিছে সহস্র রসনা ।
ভীষ্মদ্রোণ ভীমার্জ্জুন, হৃদয়ের অজস্র শোণিতে
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী পারে নাই সে তৃষা মিটাতে ।
সে দিনো ত পৃথিরাজ স্নিগ্ধরক্তে সিক্ত করি' দিলা
উত্তপ্ত সর্ব্বাঙ্গ তার ;—তবু হায় নিভে নাকি জ্বালা ?
রাজরক্ত, বীররক্ত নিঃশেষিয়া করিয়াছে পান—
শেষরক্তবিন্দু বিনা বুঝি শান্ত হ'বেনা পরাণ !
দিল্লীর মরুতে তাই শতাব্দীর মহা আয়োজন
ত্রিশ কোটি দরিদ্রের সর্ব্বশেষ শোণিত-তর্পণ !

শ্রীযোগেশচন্দ্র চৌধুরী ।

* দিল্লীর দরবার উপলক্ষ্যে রচিত ।

শিবাজী-উৎসব।*

কোন্ দূর শতাব্দের কোন্ এক অখ্যাত দিবসে

নাহি জানি আজি,

মারাঠার কোন্ শৈলে অরণ্যের অন্ধকারে বসে'—

হে রাজা শিবাজি,

তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎপ্রভাবৎ

এসেছিল নামি'—

"একধর্ম্মরাজ্যপাশে খণ্ড-ছিন্নবিক্ষিপ্ত ভারত

বেঁধে দিব আমি।"

২

সেদিন এ বঙ্গদেশ উচ্চকিত জাগে নি স্বপনে,

পায় নি সংবাদ,

বাহিরে আসে নি ছুটে, উঠে নাই তাহার প্রাঙ্গণে

শুভ শঙ্খনাদ!

শান্তমুখে বিছাইয়া আপনার কোমল-নির্ম্মল

শ্যামল উত্তরী'

তন্দ্রাতুর সন্ধ্যাকালে শত পল্লীসন্তানের দল

ছিল বক্ষে করি'।

৩

তার পরে একদিন মারাঠার প্রান্তর হইতে

তব বজ্রশিখা

আঁকি দিল দিগ্ দিগন্তে যুগযুগান্তের বিদ্যুদ্‌বহ্নিতে

মহামন্ত্রশিখা।

---

* ১৩১১ সালের শিবাজী উৎসব উপলক্ষে লিখিত।

মোগল-উষ্ণীষশীর্ষ প্রস্ফুরিল প্রলয়প্রদোষে
পক্কপত্র যথা,—
সেদিনো শোনে নি বঙ্গ মারাঠার সে বজ্রনির্ঘোষে
কি ছিল বারতা!

৪

তার পরে শূন্য হ'ল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লীরাজশালা,—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা!
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্দ্ধস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা,—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হ'ল তার সীমা।

৫

সেদিন এ বঙ্গপ্রান্তে পণ্যবিপণীর এক ধারে
নিঃশব্দ চরণ
আনিল বণিকলক্ষ্মী সুরঙ্গপথের অন্ধকারে
রাজসিংহাসন!
বঙ্গ তারে আপনার গঙ্গোদকে অভিষিক্ত করি
নিল চুপে চুপে;
বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল, পোহালে শর্ব্বরী
রাজদণ্ডরূপে!

৬

সেদিন কোথায় তুমি, হে ভাবুক, হে বীর মারাঠি
কোথা তব নাম!

গৈরিক পতাকা তব কোথায় ধূলায় হ'ল মাটি—
তুচ্ছ পরিণাম !
বিদেশীর ইতিবৃত্ত দস্যু বলি' করে পরিহাস
অট্টহাস্যরবে,—
তব পুণ্যচেষ্টা যত তস্করের নিষ্ফল প্রয়াস—
এই জানে সবে !

৭

অয়ি ইতিবৃত্তকথা, ক্ষান্ত কর মুখর ভাষণ।
ওগো মিথ্যাময়ি,
তোমার লিখন'পরে বিধাতার অব্যর্থ লিখন
হবে আজি জয়ী !
যাহা মরিবার নহে তাহারে কেমনে চাপা দিবে
তব ব্যঙ্গবাণী ?
যে তপস্যা সত্য তারে কেহ বাধা দিবে না ত্রিদিবে
নিশ্চয় সে জান !

৮

হে রঞ্জিতপস্বি বীর, তোমার সে উদার ভাবনা
বিধির ভাণ্ডারে
সঞ্চিত হইয়া গেছে, কাল কভু তার এক কণা
পারে হরিবারে ?
তোমার সে প্রাণোৎসর্গ স্বদেশলক্ষ্মীর পূজাঘরে
সে সত্যসাধন।
কে জানিত হ'য়ে গেছে চির-যুগযুগান্তর-তরে
ভারতের ধন !

৯

অখ্যাত অজ্ঞাত রহি' দীর্ঘকাল, হে রাজবৈরাগি,
গিরিদরীতলে,
বর্ষার নির্ঝর যথা শৈল বিদরিয়া উঠে জাগি
পরিপূর্ণ বলে—
সেইমতে বাহিরিলে,—বিশ্বলোক ভাবিল বিস্ময়ে
যাহার পতাকা
অম্বর আচ্ছন্ন করে, এতকাল এত ক্ষুদ্র হ'য়ে
কোথা ছিল ঢাকা!

১০

সেইমত ভাবিতেছি আমি কবি এ পূর্ব্বভারতে—
কি অপূর্ব্ব হেরি!
বঙ্গের অঙ্গনদ্বারে কেমনে ধ্বনিল কোথা হ'তে
তব জয়ভেরি?
তিনশত বৎসরের গাঢ়তম তমিস্র বিদারি
প্রতাপ তোমার
এ প্রাচীদিগন্তে আজি নবতর কি রশ্মি প্রসারি
উদিল আবার?

১১

মরে না মরে না কভু সত্য যাহা, শত শতাব্দীর
বিস্মৃতির তলে,
নাহি মরে উপেক্ষায়, অপমানে না হয় অস্থির,
আঘাতে না টলে!
যারে ভেবেছিল সবে কোন্‌কালে হয়েছে নিঃশেষ
কর্ম্মপরপারে,

এল সেই সত্য তব পূজ্য অতিথির ধরি' বেশ
ভারতের দ্বারে!

১৫

আজো তার সেই মন্ত্র, সেই তার উদার নয়ান
ভবিষ্যের পানে
একদৃষ্টে চেয়ে আছে, সেথায় সে কি দৃশ্য মহান্
হেরিছে কে জানে!
অশরীর হে তাপস, শুধু তব তপোমূর্ত্তি ল'য়ে
আসিয়াছ আজ,
তবু তব পুরাতন সেই শক্তি আনিয়াছ ব'য়ে,
সেই তব কাজ!

১৩

আজি তব নাহি ধ্বজা, নাই সৈন্য, রণ-অশ্বদল,
অস্ত্র খরতর,—
আজি আর নাহি বাজে আকাশেরে করিয়া পাগল
হর হর হর!
শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি',
করিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল, হে স্বামি
বাঙালীর প্রাণ!

১৪

এ কথা ভাবে নি কেহ এ তিন শতাব্দকাল ধরি'—
জানে নি স্বপনে—
তোমার মহৎ নাম বঙ্গ-মারাঠারে এক করি'
দিবে বিনা রণে!

তোমার তপস্যাতেজ দীর্ঘকাল করি অন্তর্দ্ধান
আজি অকস্মাৎ
মৃত্যুহীন-বাণীরূপে আনি দিবে নূতন পরাণ,
নূতন প্রভাত!

১৫

মারাঠার প্রান্ত হ'তে একদিন তুমি ধর্ম্মরাজ,
ডেকেছিলে যবে,
রাজা বলে' জানি নাই, মানি নাই, পাই নাই লাজ
সে ভৈরব রবে!
তোমার কৃপাণদীপ্তি একদিন যবে চমকিলা
বঙ্গের আকাশে
সে ঘোর দুর্যোগদিনে না বুঝিনু রুদ্র সেই লীলা,
লুকানু তরাসে!

১৬

মৃত্যু সিংহাসনে আজি বসিয়াছ অমরমূরতি—
সমুন্নত ভালে
যে রাজকিরীট শোভে লুকাবে না তার দিব্যজ্যোতি
কভু কোনোকালে!
তোমারে চিনেছি আজি, চিনেছি চিনেছি, হে রাজন্,
তুমি মহারাজ!
তব রাজকর ল'য়ে আটকোটি বঙ্গের নন্দন
দাঁড়াইবে আজ!

১৭

সেদিন শুনি নি কথা—আজ মোরা তোমার আদেশ
শির পাতি' লব!

কণ্ঠে কণ্ঠে বক্ষে বক্ষে ভারতে মিলিবে সর্ব্বদেশ
ধ্যানমন্ত্রে তব!
ধ্বজা করি' উড়াইব বৈরাগীর উত্তরী' বসন
দরিদ্রের বল!
"একধর্ম্মরাজ্য হবে এ ভারতে" এ মহাবচন
করিব সম্বল!

১৮

মারাঠীর সাথে আজি, হে বাঙালি, এককণ্ঠে বল
"জয়তু শিবাজি!"
মারাঠীর সাথে আজ, হে বাঙালি, একসঙ্গে চল
মহোৎসবে আজি!
আজি এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব
দক্ষিণে ও বামে
একত্রে করুক ভোগ এক সাথে একটি গৌরব
এক পুণ্যনামে!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আবেদন,—না, আত্মচেষ্টা ?

স্বদেশের উন্নতি-কল্পে কোন্ পন্থা প্রশস্ত এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, ইহা একটী শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, আমাদের অসাড় সমাজ-দেহে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের ন্যায় অন্ন-মৎস্যাহার-ক্ষুদ্রকায় একটী আসিয়িক জাতির অভিনব অসাধারণ অভ্যুদয় ও উন্নতির যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাই আমাদিগকে একটু উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। কোন্ পথে গেলে, উহাদের ন্যায় আমরাও আবার উন্নতিশিখরে আরোহণ করিতে পারিব সেই বিষয় আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুখের বিষয়, ইহাতে নীচ দলাদলীর গন্ধ মাত্র নাই, কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা।

একদল বলিতেছেন, রাজদ্বারে আমাদের দুঃখ নিবেদন করা, রাজপুরুষদিগের কার্য্যের প্রতিবাদ করা, তাঁহাদের কর্ত্তব্য-বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করা, বর্ত্তমান অবস্থায় ইহাই আমাদের মুখ্য কার্য্য; উন্নতি সাধনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা আমাদের গৌণ কর্ত্তব্য। স্পষ্ট এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ব্যক্ত না করিলেও, তাঁহাদের কার্য্যে তাঁহাদের অনুষ্ঠান উদ্যোগে, এই কথারই আভাস পাওয়া যায়।

আর একদল বলেন, শুধু আবেদন নিবেদনে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদি আমরা নিজের চেষ্টায় নিজের অভাব স্বল্পমাত্রও পূরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের আত্মনির্ভরের শিক্ষা হয়, আমরা আত্মসম্মান ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি, নিজস্ব

বলে বলীয়ান হইতে পারি, জাতীয় গৌরবের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে পারি, প্রকৃত উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারি। "যাঁহারা সাধনার দ্বারা, ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের চিত্তকে স্বদেশের কার্য্যে চালিত করিয়াছেন, স্বদেশের কার্য্যে একাগ্র করিবার আয়োজন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাঁহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে যাত্রা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ আমি কখনই বলিব না।

তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় নিজের মধ্যে সেই উপায়ে একটা বিপুল ঐক্যের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহা বিচ্ছিন্ন ছিল তাহা ঐক্যের অমৃত কথার আস্বাদে যখন আপনার মধ্যে আপনার যথার্থ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুরদ্বারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এখন যে চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছি—এখন সে আত্মশক্তি—আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতা লাভের দিকে অনিবার্য্য বেগে চলিবে—কোন একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসাদ লাভের দিকে নহে।"

অপর দলের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশ চন্দ্র রায় মহাশয় আবেদন-নিবেদনের পক্ষ সমর্থন করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন;—"আমাদের সকলেরই আত্মোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের নৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।"

তবেই, প্রকারান্তরে উনিও স্বীকার করিতেছেন শুধু আবেদন-নিবেদনের কার্য্যে আমাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করিলে চলিবে না,—আত্মচেষ্টা আবশ্যক।

আসল কথা, এই দুই দলের মধ্যে বাস্তবিক-পক্ষে কোন মত-পার্থক্য নাই, যাহা কিছু প্রভেদ মুখ্য গৌণ লইয়া।

তবে "আবেদন-নিবেদনের" কাজকে ভিক্ষাবৃত্তি বলায়, "ব্যাধি ও চিকিৎসার" লেখক মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে, আমাদের বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থায়, ইহা ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কি? যখনি ইংরাজেরা আমাদের দেশ জয় করিলেন এবং যখনি আমরা পরাজয় স্বীকার করিয়া তাঁহাদের পদানতত হইলাম, তখন হইতেই আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন আমরা যাহা কিছু তাঁহাদিগের নিকট পাইতেছি সে কেবল তাঁহাদের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখন অধিকার সমর্থনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে বলের অকাট্য যোগ। যেখানে বল নাই সেখানে অধিকার কোথায়? অবশ্য বিধাতা প্রত্যেক মনুষ্যকে, প্রত্যেক জাতিকে কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকারে অধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু সে অধিকার রক্ষা করা না করা আমাদের নিজের হস্তে। একটা সংস্কৃত বচন আছে "দেবা দুর্ব্বল-ঘাতকাঃ।" দুর্ব্বলের প্রতি দেবতারাও বিমুখ।

ইংলণ্ডের ইতিহাস-পাঠে জানা যায়, কেবল বলের দ্বারাই এবং বহুকাল যুঝাযুঝি করিয়াই রাজাপ্রজা পরস্পরের অধিকার নির্দ্ধারিত হইয়া অবশেষে তাঁহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। এখন ইংলণ্ডের রাজা প্রায় সাক্ষীগোপাল, প্রজারাই সর্ব্বেসর্ব্বা। এখন রাজার সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রজার কোন বিবাদ নাই। প্রজাদের মধ্যেই দুই তিনটা দল আছে, তাহাদেরই মতামত লইয়া যাহা কিছু বাদ বিসম্বাদ চলিয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে যে সময়ে যে পক্ষ প্রবল হয় সেই রাজ্যের কর্ত্তৃত্ব লাভ করে; কিন্তু পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট রাজার নিজস্ব অধিকার বজায় রাখিয়া, সর্ব্বসাধারণ প্রজাদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় ইংলণ্ডে যে আন্দোলন চলিয়া

থাকে তাহাকেই Constitutional agitation অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্র-সম্মত আন্দোলন বলে। আমরাও এক্ষণে তাঁহাদের দেখাদেখি এই রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র ও আমাদের রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ইংলণ্ড স্বাধীন, আমরা পরাধীন, ইংলণ্ড বিজয়ী আমরা বিজিত। তাঁহাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ, আমাদের মধ্যে সে রাজনৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ নহে।

আমরা ক্রন্দন করিব কাহার নিকট? ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র-অনুসারে শাসন-বিষয়ে আমাদের রাজার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নাই। তাঁহার দয়া উদ্রেক করিয়া কোন ফল নাই। পার্লামেণ্টই আমাদের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা। ইংলণ্ডের জনসাধারণ হইতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়াই ঐ মহাসভা গঠিত। অতএব জনসাধারণের মধ্যে যে ভাব ও মতামত প্রবল থাকে তাহার দ্বারাই সমস্ত পার্লমেণ্টের রাষ্ট্র-নীতি অনুরঞ্জিত হয়। এক্ষণে ইংরাজ-জাতির যেরূপ ভাব ও মতামত তাহাতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট হইতে আমরা কি কিছু বিশেষ অধিকার লাভের প্রত্যাশা করিতে পারি?

হিন্দু রাজত্বের সময় প্রজার উপর হিন্দুরাজারও অসীম প্রভুত্ব ছিল বটে; কিন্তু, পুত্রের উপর পিতার যেরূপ অসীম প্রভুত্ব, উহা সেইরূপ প্রভুত্ব। তখন রাজা প্রজার মধ্যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ—একটী স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। পুত্রবৎ প্রজা পালন করা কর্ত্তব্য—এই সনাতন রাজধর্ম্মের উপরেই তখনকার রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, বলার্জ্জিত অধিকারের উপরে নহে। আমাদের দেশে, প্রজার রঞ্জনার্থেই রাজা নামের সার্থকতা। রাজা রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য কিনা করিয়াছিলেন? তখন রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থ এক ছিল। সুসময়ে প্রজার নিকট রাজা যে কর

চাহিতেন, তাহা তাঁহাকে অকাতরে দান করিত। কেন না, তাহারা বেশ জানিত, অসময়ে তাহাদিগকে রাজাই আবার রক্ষা করিবেন। তাহারা জানিত, তাহাদের প্রদত্ত ধন তাহাদের দেশেই ব্যয় হইবে; অথবা সেই ধনে রাজা যে কোন অনুষ্ঠানই করুন না কেন, তাহারাও কতকটা তাহার ফলভাগী হইবে। কোন অভাব বোধ করিলে, কিম্বা বিপদে পড়িলে, পুত্র যেরূপ পিতার নিকট আবদার করিয়া কিছু চাহে কিংবা সাহায্য প্রার্থনা করে, প্রজারাও রাজার নিকটে ঠিক সেই ভাবেই প্রার্থনাদি করিত। তাহাতে ভিক্ষার ভাব কিছুই ছিল না, হীনতার ভাব কিছুই ছিল না। মোগল রাজত্বের অভ্যুদয় কালেও রাজা প্রজার মধ্যে এইরূপ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কতকটা বজায় ছিল। তাহার কারণ, মোগল রাজারা এই দেশেই বাস করিতেন, তাঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য এই দেশেই ব্যয় হইত। প্রজা বলিয়াই প্রজার উপর তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল। আকবর বাদশা হিন্দু প্রজার মনোরঞ্জনার্থ হিন্দু পরিচ্ছদাদি ধারণ করিতেন; এমন কি, রাজ্যমধ্যে গোহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা আইন-যন্ত্র পরিচালিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না; তাঁহাদের শাসনকালে তাঁহাদের ব্যক্তিগত দয়া ও ন্যায়পরতা আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিতাম। পাছে কোন সামান্য প্রজা সুবিচার হইতে বঞ্চিত হয়, এই জন্য জাহাঙ্গির বাদশা তাঁহার প্রাসাদ কক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ একটী ঘণ্টা রাখিয়াছিলেন, বাহিরের শৃঙ্খলটি ধরিয়া কেহ নাড়িলেই বুঝিতে পারিতেন তাঁহার নিকট কোন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে।

ইংরাজ-রাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ উহা পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নহে, উহা বিজয়ী-বিজিতের সম্বন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ; এক কথায় নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থের সম্বন্ধ; উহাতে হৃদয়ের তিলমাত্র সংশ্রব নাই। লর্ড কর্জ্জন সেদিন ইংলণ্ডে কোন সভায় বলিয়াছিলেন, ভারত রাজ্য শাসনে

ভারতের হৃদয় স্পর্শ করা আবশ্যক। একথা খুবই ঠিক। কিন্তু তিনি যদি বুঝিয়া থাকেন, দিল্লি-দরবারের ন্যায় বিপুল আড়ম্বরেই ভারতের হৃদয় স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। প্রথমতঃ, মোগলের অনুকরণ করিয়া, দিল্লির দরবারে তিনি যে আড়ম্বর ঘটার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মোগল রাজত্বের সময়ে, একটা সামান্য উৎসবে যে ঘটা হইত, তাহার তুলনায় উহা কিছুই নয় বলিলেও হয়। তাছাড়া, সে সকল উৎসবের বাহ্য আড়ম্বরের ভিতরেও একটা প্রাণ ছিল— সহৃদয়তা ছিল। তাহাতে লোকের যে শুধু চক্ষু কর্ণ তৃপ্ত হইত তাহা নহে, তাহাতে তাহাদের হৃদয়ও মুগ্ধ হইত। গরিব দুঃখী কাঙ্গাল-দিগকে মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া, সরকারের হিতৈষী যোগ্য ব্যক্তিদিগকে উচ্চপদে উন্নীত করিয়া, সারবান প্রসাদ বিতরণ করিয়া মোগল সম্রাট, প্রজাদিগের অকৃত্রিম আশীর্ব্বাদ অর্জ্জন করিতেন।

পক্ষান্তরে, প্রথম হইতেই ইংরাজ এদেশে বণিকভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বণিক ভাবেই রাজ্য চালাইতেছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-কার্য্য বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহাদের বণিক-নীতি এখনও কার্য্যতঃ অক্ষত রহিয়াছে। ইংরাজের রাজত্ব বণিক-নীতি অনুসারেই চলিতেছে। ইংরাজ ভারতের তেত্রিশ কোটি অধিবাসীকে প্রজাভাবে যতটা না দেখেন তদপেক্ষা তাঁহাদের রপ্তানি মালের ক্রেতার হিসাবে দেখিয়া থাকেন। তাঁহাদের চক্ষে, ভারত অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের নিবাস ভূমি একটি বিপুল রাজ্য নহে—উহা তাঁহাদের মাল কাটাইবার একটি মহা বিপণি। এই ভাবে দেখেন বলিয়াই, ভারতীয় প্রজার স্বার্থের অপেক্ষা, ল্যাঙ্কেষ্টারের স্বার্থ তাঁহাদের নিকট গুরুতর বলিয়া বোধ হয়; এই ভাবে দেখেন বলিয়াই, সেদিন লর্ড কর্জ্জন, ইংরাজ প্ল্যাণ্টারের খাতিরে, দেশীয় কুলী প্রজার দুঃখ দুর্দ্দশায় কিঞ্চিৎ উপশম করিতেও সাহসী হইলেন না। এই বণিক-নীতি অবলম্বন

করিয়াই, নিজ স্বার্থ সাধনার্থ, ইংরাজ এদেশের কত শিল্প বিদলিত করিয়াছেন, এখনও দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি পক্ষে কত বাধা দিতেছেন। যতটুকু শিক্ষা দিলে, স্বল্প বেতনের কেরাণী পাওয়া যায় ততটুকু শিক্ষা দেওয়াই এখন তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায়; এইরূপ উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে নানাপ্রকার কণ্টক রোপণ করিতেছেন। আমরা মনে করি, ইংলণ্ডে যখন Constitutional agitation করিয়া ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ এত অধিকার লাভ করিয়াছে, তখন সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে আমরাও কেন না সফল হইব। কি বিষম ভুল! ইসপ-কথামালার সেই রজকের ভারবাহী হেয় পশু ও তাঁহার আদরের ও সখের গৃহ-প্রহরী জীব এই জীব—এই উভয়ের প্রতি তাঁহার কিরূপ বিভিন্ন ব্যবহার এই প্রসঙ্গে কি তাহা স্মরণ হয় না? চিরঅনাথ মাতৃহীন অবোধ শিশু নিজ জননী মনে করিয়া বিমাতার ক্রোড়ে, স্নেহাকাঙ্খায় বারবার ঝাঁপাইয়া পড়ে, ও বারবার প্রত্যাখাত হইয়াও সে যেমন প্রকৃত অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারে না, আমাদেরও এক্ষণে সেই দশা হইয়াছে।

তাছাড়া, ইংলণ্ডে এখন "সাম্রাজ্যিকতার" ধুয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ডের স্বার্থপরতা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছিয়াছে। যে ইংলণ্ড এক সময়ে স্বাধীনতার লীলাভূমি ছিল, পৃথিবীর দাসত্ব মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল সেই ইংলণ্ড সেদিন নিজ স্বার্থের জন্য বলপূর্ব্বক চীনদেশে অহিফেন প্রবেশ করাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইংলণ্ডের দার্শনিক পণ্ডিত হর্বর্ট স্পেনসার সেদিন তাঁহার Facts and Comments নামক গ্রন্থে, ইংলণ্ডের কতদূর নৈতিক অবনতি হইয়াছে তাহা জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন। এখনকার প্যার্লেমেণ্টে, সেদিন কার ব্রাইট, গ্ল্যাডষ্টোনের মত লোকই বা কোথায়? আর তাঁহারা থাকিতেই বা ভারতের হিতের জন্য কতটুকু করিতে পারিয়া

ছিলেন ? প্রাতঃস্মরণীয় ভারতহিতৈষী মহাত্মা লর্ড রিপণ ভারতের জন্য যে হিতকর ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাহা কি শেষে রক্ষিত হইল ?

আসল কথা, যতটুকু স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল, ততটুকুই ইংরাজ আমাদের জন্য করিয়াছেন ও এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার অধিক নহে। আমরা যদি তাঁহাদের ধর্ম্মবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার দোহাই না দিয়া, তাঁহাদের স্বার্থের দিক দিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি, বরং তাহাতে কিছু কাজ হইতে পারে। কিন্তু এসময়ে তাহা বুঝানও বড় সহজ নহে। যখন তাঁহারা আপনারা বুঝিবেন, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে প্রভূত লোকক্ষয় হইতেছে, করভারে প্রপীড়িত হইয়া ভারতবাসী দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং এই কারণেই তাঁহাদের রপ্তানি মালের তেমন কাট্‌তি হইতেছে না, তখন তাঁহাদের একটু চেতনা হইবে, তখন তাঁহারা আপনা হইতেই আমাদের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন—আমাদের দুঃখদুর্দ্দশা প্রতীকারের উপায় চিন্তা করিবেন। এখন আমরা তাঁহাদের নিকট যতই ক্রন্দন করি তাহাতে কোন ফল হইবে না।

কি কন্‌সর্ভেটিভ কি লিবর‍্যাল ইংলণ্ডের যে কোন পক্ষই কর্ত্তৃত্ব লাভ করুক, ইহাঁদের কাহারও আমলে, 'অস্ত্র-আইন' রহিত হইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে ?—ভারতের আয়ব্যয়ের উপর আমাদের বাস্তবিক কর্ত্তৃত্ব লাভের কি কোন আশা আছে ? ভারতের স্বার্থের উদ্দেশে ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবে এরূপ কখন কি আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি ? পার্লেমেণ্টে দুই একটা প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে পারিলেই কি আমরা কৃতার্থ হইব ?—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় আর দুই একজন সদস্য বাড়িলেই কি আমাদের চতুর্বর্গ ফল লাভ হইবে ? তবে সুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরেই আমাদের

কেন এত আস্থা ? আবেদন নিবেদন কি প্রতিবাদ যে আমরা একেবারেই করিব না আমি একথা বলি না—উহাতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অর্থ ব্যয় না করি, আমার বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য।

এখন তবে আমরা করিব কি ?—এ সময়ে আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য কি ? আমাদের সমস্ত অর্থ ও উদ্যম কেবল আবেদন নিবেদনে নিঃশেষিত না করিয়া, রাজসরকারের একান্ত মুখাপেক্ষী না হইয়া, যাহাতে নিজের চেষ্টায় আত্মবলসঞ্চয় করিতে পারি তাহাই কি এখন আমাদের মুখ্য কর্ত্তব্য নহে ? রাজসরকার নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতেছেন না বলিয়া আমরা কি একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব ? "ব্যাধি ও চিকিৎসার" লেখক মহাশয় ঐ মর্ম্মে বলেন,—"আমরা রাজসরকারকে এত কর দিতেছি, তাঁহাদের নিকট হইতে তদনুরূপ কাজ আদায় না করিয়া, যদি তাঁহাদের কর্ত্তব্য কাজগুলি আমরা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের দোকর খরচ হইবে। এই দরিদ্র দেশে অত টাকা কোথায় ?" কিন্তু রাজসরকার তাঁহাদের কর্ত্তব্য করিতেছেন না বলিয়া, তাঁহাদিগের নিকট সেই বিষয় আবেদন করিবার জন্য, তাঁহাদের কর্ত্তব্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, প্রতি বৎসরে আমরা যে সার্দ্ধলক্ষেরও অধিক টাকা খরচ করিয়া থাকি, উহাও কি দোকর খরচ নহে ? সুধু আবেদনের কার্য্যে ঐ টাকা নিঃশেষিত না করিয়া, দেশের বাস্তবিক কোন হিতকর অনুষ্ঠানে উহার কিয়দংশ নিয়োগ করিলে কি ভাল হয় না ?

আমি কংগ্রেসের বিরোধী নহি। আমি কংগ্রেসের একজন ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবের বিষয় মনে করি। কংগ্রেসের দ্বারা দেশের বাস্তবিকই একটা মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। ইংরাজের নিকট হইতে দুই একটা প্রসাদ অর্জ্জন করা অপেক্ষা তাহার

মূল্য আমি অধিক বিবেচনা করি। কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ ও একতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এই কংগ্রেসকে ধ্বংস না করিয়া যাহাতে ইহার চেষ্টা উদ্যম বাঞ্ছিত পথে চালিত হয়, তৎপ্রতি স্বদেশবৎসল ব্যক্তিমাত্রেরই যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য।

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর নির্ভর না করিয়া, কিসে এদেশে ব্যবসায় শিল্পের উন্নতি হয়, সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার হয়, অন্নকষ্ট দূর হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, নৈতিক ও দৈহিক বল সঞ্চিত হয়, ইতর-সাধারণের সহিত শিক্ষিত মণ্ডলীর যোগ নিবদ্ধ হয়, এই সকল বিষয় লইয়া কংগ্রেস যদি আলোচনা করেন, উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই জাতীয় মহাসভার যে সম্পূর্ণ সার্থকতা ও গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অধীন জাতি যতই চেষ্টা করুক না কেন, স্বীয় আকাঙ্খানুরূপ উন্নতি কখনই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে না সত্য। তবে একথাও ঠিক্, আবেদন নিবেদনের উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া, আত্মচেষ্টায় আমরা আপনাদের যতটুকু উন্নতি সাধন করিতে পারি, ততটুকুই আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গল—তাহাতে আমাদের আত্মবল সঞ্চয় হয়—আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

যদিও স্বাধীন জাপানের সহিত, পরাধীন ভারতের তুলনা হয় না, তথাপি যে পথ অনুসরণ করিয়া এই আসিয়িক জাতি এত অল্প কালের মধ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে সেই পথটী কি তাহা আমাদের সকলেরই একবার আলোচনা ও চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সে পথটী শিক্ষার পথ—সর্ব্বাঙ্গীন শিক্ষার পথ।

জাপান-সম্রাট মিকাডো, টোকিও নগরে পাঠশালা ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, রাজ্যের পূর্ব্বতন অভিজাতবর্গের নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল হস্তগত করিবার নিমিত্ত আর কিছুই করিবার আবশ্যক নাই, কেবল জ্ঞানকে পরিস্ফুট ও হৃদয়ের বৃত্তি-সকলকে পরিমার্জ্জিত করা আবশ্যক। আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার অবস্থার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে; শিক্ষার উদ্দেশে বিদেশে গমন করিতে হইবে এবং সমস্তই হাতে কলমে শিখিতে হইবে। গৃহে শিক্ষা করিবার বয়স যাহার অতীত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণই যথেষ্ট; দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু প্রসারিত হইবে এবং তাহাদের বুদ্ধি উন্নত হইবে। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোন পদ্ধতি নাই। সে কারণেও তাহাদের অনেকেরই মধ্যে বুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত, শিশুদিগের শিক্ষার সহিত তাহাদিগের মাতাদিগের শিক্ষার একটী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর বিষয়। সেইজন্য যাহারা আপন আপন স্ত্রী কন্যা ভগিনীগণকে সঙ্গে করিয়া বিদেশে গমন করে, তাহাদিগের আচরণে তিলমাত্র আপত্তি, হইতে পারে না। তাহা হইলে, বিদেশে স্ত্রীশিক্ষার উৎকৃষ্ট পত্তনভূমি কিরূপ, এবং শিশু-দিগকে শিক্ষা দিবার প্রকৃত পদ্ধতি কি, এই সমস্ত তাহারা অবগত হইতে পারে। তোমরা সকলেই যদি এই বিষয়ে মনোযোগী হও, তাহা হইলে সভ্যতা-পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। আমরা সহজেই অর্থ ও বলের মূল পত্তন করিতে সমর্থ হইব এবং অনায়াসেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সমকক্ষ-ভাবে টক্কর দিতে পারিব। অতএব, তোমরা আমাদের এই সকল বাসনাকে তোমাদের হৃদয় মধ্যে ভাল করিয়া স্থান দেও। যাহাতে আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে তোমরা প্রত্যেকে যথাসাধ্য চেষ্টা কর।”

এই নীতি অনুসরণ করিয়া জাপান আজ কিরূপ উন্নতিলাভ

করিয়াছে আমরা সকলেই তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। পুনর্ব্বার বলিতেছি, যদিও স্বাধীন জাপানের সহিত আমাদের তুলনা হয় না, যদিও জাপানীদিগের ন্যায় আমাদের কার্য্যদক্ষতা নাই, দৃঢ়তা নাই, অর্থবল নাই, নৈতিক বল নাই, স্বদেশবাৎসল্য নাই, তথাপি এই পরীক্ষিত মার্গটি অনুসরণ করিলে শুধু আবেদন নিবেদন অপেক্ষা আমাদিগের যে অধিক ফললাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় এই মার্গ অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের আত্মচেষ্টার একটা পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। ভরসা করি ইহা কালে সুফল প্রসব করিয়া আমাদের চিরআশা পূর্ণ করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সাম্রাজ্যের আয় ব্যয়ের তুলনা। ২১৭০০০০০০ ইয়েন। (এক ইয়েন=১॥০ টাকা।)

জাপানের জন্য রাজস্বের আয় মাত্র ৩৭০০০০০০ ইয়েন, কিন্তু ভারতবর্ষে জমিসংক্রান্ত রাজস্বই প্রধান আশ্রয়। জাপানে সৈন্য রক্ষার ব্যয় মাত্র ৩৬০০০০০০ ইয়েন, কিন্তু ভারতে শান্তির সময়ও সৈন্যব্যয় বহু কোটী মুদ্রা। জাপানের সমগ্র আয়ের শতকরা ২॥০ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়, ভারত গভর্ণমেণ্ট সেই স্থলে সমগ্র আয়ের শতকরা ১৲ টাকাও শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন না। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিষয়ে মুক্ত হস্তে ব্যয়ের যতই কেন ভান করুন না, এ তথ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে যেস্থলে জাপান গভর্ণমেণ্ট লোক পিছু প্রতি ব্যক্তির শিক্ষার্থ পাঁচ আনা এক পয়সা ব্যয় করেন, সেই স্থলে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট লোক পিছু আড়াই পয়সা মাত্র ব্যয় করেন।

তারপর জাপান বাণিজ্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য যেস্থলে ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, সেই স্থলে ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত ব্যাপারে মাত্র ১০ লক্ষ টাকার বেশী প্রদান করেন না। এই আয় ব্যয়ের তুলনায় স্পষ্ট অনুভব হয় জাপান ও হিন্দুস্থান—স্বাধীন ও পরাধীন এই দুই সাম্রাজ্য শাসনের পদ্ধতির মূলেই কিরূপ প্রভেদ।

রাখিবন্ধন। পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সম্বাদপত্রে জালান্ধারের "কন্যা-মহাবিদ্যালয়ের" বালিকাগণের নিম্নলিখিত পত্র খানি প্রকাশিত হইয়াছে।

"মহাশয়,

এবার ২৫শে আগষ্ট রাখিবন্ধন উৎসব সোহিত হইবে। ব্রাহ্মণগণ এই উৎসব উপলক্ষ্যে আশীষ মন্ত্র পাঠ করিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তিগণের প্রকোষ্ঠে রঞ্জিত রেশমের সূত্রে বাঁধিয়া প্রচুর পরিমাণে দক্ষিণা পাইয়া থাকেন।

কিন্তু আমরা শাস্ত্র ও ইতিহাস আলোচনায় জানিতে পারিয়াছি, বিপন্ন রমণীগণকে উদ্ধার করিবার সঙ্কল্প করিয়াই এই রাখিবন্ধন প্রথা প্রথম প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রাজস্থানের ইতিহাসে নারীজাতির সম্মানরক্ষার জন্য উদ্যোগী বীরগণের বহু কীর্ত্তি কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। নারী-রক্ষাব্রত এখনও রাজপুত বীরমণ্ডলীকে অপূর্ব্ব-ভাবে উৎসাহিত করে। এই রাখিবন্ধন প্রথা হিন্দুললনার নিকট এমনই পবিত্র যে রাজপুত রাণীরা এই উপলক্ষে ভিন্ন জাতীয় বীরগণের সাহায্য প্রার্থনা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

মেওয়ারের কবি অপূর্ব্ব উদ্বোধন ও করুণাপূর্ণ ভাষায় চিতোরের রাণা সঙ্গের বিধবা রাণী কর্ণাবতীর কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কর্ণাবতী তাঁহার শিশু সন্তানের অভিভাবিকা স্বরূপ চিতোর রাজ্য দক্ষতার সহিত শাসন করিতেছিলেন, কিন্তু গুজরাটের রাজা চিতোররাজ্য নিরাশ্রয় দেখিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য সহকারে উহা আক্রমণ করেন। এই অপ্রত্যাশিত বিপৎপাতে কর্ণাবতী তাঁহার বলয় দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের নিকট পাঠাইয়া দেন, এই বলয় সম্রাটের হস্তে রাখিবন্ধনার্থ, ইহা দ্বারা কর্ণাবতী দিল্লীশ্বরকে ভ্রাতৃপদে বরিত করেন;—সম্রাট সবহুমানে এই বলয় গ্রহণ করেন এবং যদিও তিনি তৎকালে বঙ্গবিজয়ের অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন—উক্ত বলয় প্রাপ্তিমাত্র কালবিলম্ব না করিয়া চিতোর রক্ষা করিয়া রাখিবন্ধনের প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য ধাবিত হন। এই সময়ে বহুসংখ্যক রাজপুত চিতোর রক্ষার জন্য প্রাণ দিয়াছিলেন।

হুমায়ুন যখন উপস্থিত হইলেন, তখন শৌর্য্যশালিনী রাণী কর্ণাবতীর ভবলীলা ফুরাইয়াছিল। সন্তপ্ত চিত্তে দিল্লীশ্বর প্রবল শত্রু হইতে চিতোর রক্ষা করিয়া কর্ণাবতীর শিশু সন্তানটির অভিভাবক স্বরূপ চিতোরের রাজ্যভার গ্রহণ করেন।

এই রাখিবন্ধন উপলক্ষে স্ত্রী জাতির সম্মানরক্ষার্থ অপরাপর ভিন্ন জাতীয় বীরগণও নানা প্রকারে আত্মত্যাগ করিয়াছেন;—স্ত্রীজাতির সম্বর্দ্ধনার ভাব আমাদের এদেশ হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা

আশা করি আমাদের হিন্দু ভ্রাতাগণ "কন্যা মহাবিদ্যালয়ের" উন্নতি কল্পে অগ্রসর হইয়া প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিবেন, এবং অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার সহায়তা করিবেন।

আমরা আপনাদের

কৃতজ্ঞতাময়ী ভগিনী

কন্যা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীবর্গ।

পুঃ— কন্যা মহাবিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ অর্থ ঝালান্ধর, কন্যা মহাবিদ্যালয়ের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট প্রেরিতব্য।"

চণ্ডীদাসের সমাধি-প্রস্তর।

জ্ঞাত হইলাম বৈষ্ণব-পদ সংগ্রাহক মেহেরপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় নান্নুর গ্রামে চণ্ডীদাসের ভিটার উপর একখানি স্মারক প্রস্তর ফলক প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হইয়া সাহিত্য পরিষদে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্য আমরা অতি সাধু ও সময়োচিত মনে করি। প্রসঙ্গটি আলোচনা যোগ্য এজন্য এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতভাবে লিখিত হইতেছে।

কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়া গ্রামে কবির স্মারক কতকগুলি অনুষ্ঠানের প্রস্তাবনা করিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে কতক অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল, কিন্তু সেই প্রস্তাব বায়ুতে বিলীন হইয়া গিয়াছে এবং কৃত্তিবাসের বাস্তুভিটার নীরব অভিশাপ জাতীয় ললাটে কলঙ্কের ছায়া লিপ্ত করিতেছে। কবিকঙ্কণের জন্মভূমি রত্নাহিনদতীরবর্ত্তী দামুণ্যা গ্রাম, বিদ্যাপতির বিসফী, গোবিন্দদাসের বুধরী, প্রভৃতি বহুবিধ পল্লীর মহিমা দেশীয় মানচিত্রে কোন নিদর্শন প্রদর্শন করে না। রামমোহন, কেশবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দেশের প্রকৃত মহাজনগণের প্রতি উপেক্ষা দেখাইয়া আমরা রাজ-কর্ম্মচারী সাহেবগণের স্মৃতিসংরক্ষণের জন্য চাঁদার খাতায় দস্তখত করিয়া খেতাব পাইতেছি। মধুসূদনের সামান্য একটি সমাধি-প্রস্তর, ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিকৃত একটি প্রতিমূর্ত্তি—দেশীয় লোকের ব্যয়ে সমুত্থিত সাহেবগণের বড় বড় স্মারক স্তম্ভ ও প্রতিমূর্ত্তির পার্শ্বে স্বীয় অপার দৈন্য প্রকটিত করিয়া যেন কুণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।

করিয়াছে আমরা সকলেই তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। পুনর্ব্বার বলিতেছি, যদিও স্বাধীন জাপানের সহিত আমাদের তুলনা হয় না, যদিও জাপানীদিগের ন্যায় আমাদের কার্য্যদক্ষতা নাই, দৃঢ়তা নাই, অর্থবল নাই, নৈতিক বল নাই, স্বদেশবাৎসল্য নাই, তথাপি এই পরীক্ষিত মার্গটি অনুসরণ করিলে শুধু আবেদন নিবেদন অপেক্ষা আমাদিগের যে অধিক ফললাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় এই মার্গ অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের আত্মচেষ্টার একটা পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। ভরসা করি ইহা কালে সুফল প্রসব করিয়া আমাদের চিরআশা পূর্ণ করিবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর।

সাময়িক কথা।

জাপান ও ভারত সাম্রাজ্যের আয় ব্যয়ের তুলনা।

জাপান সাম্রাজ্যের আয়ব্যয় সম্বন্ধে চতুর্থ রিপোর্ট সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বোম্বাইয়ের জনৈক বণিক কতকগুলি প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন জাপান সাম্রাজ্যের মোট আয় ২১৭০০০০০০ ইয়েন। (এক ইয়েন=১॥০ টাকা।) জমির জন্য রাজস্বের আয় মাত্র ৩৭০০০০০০ ইয়েন, কিন্তু ভারতবর্ষে জমিসংক্রান্ত রাজস্বই প্রধান আশ্রয়। জাপানে সৈন্য রক্ষার ব্যয় মাত্র ৩৬০০০০০০ ইয়েন, কিন্তু ভারতে শান্তির সময়ও সৈন্যব্যয় বহু কোটী মুদ্রা। জাপানের সমগ্র আয়ের শতকরা ২॥০ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়, ভারত গভর্ণমেণ্ট সেই স্থলে সমগ্র আয়ের শতকরা ১৲ টাকাও শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন না। ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে মুক্ত হস্ত ব্যয়ের যতই কেন ভান করুন না, এ তথ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে যেস্থলে জাপান গভর্ণমেণ্ট লোক পিছু প্রতি ব্যক্তির শিক্ষার্থ পাঁচ আনা এক পয়সা ব্যয় করেন, সেই স্থলে ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট লোক পিছু আড়াই পয়সা মাত্র ব্যয় করেন।

তারপর জাপান বাণিজ্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য যেস্থলে ৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, সেই স্থলে ভারত গভর্ণমেণ্ট উক্ত ব্যাপারে মাত্র ১০ লক্ষ টাকার বেশী প্রদান করেন না। এই আয় ব্যয়ের তুলনায় স্পষ্ট অনুভব হয় জাপানে ও হিন্দুস্থানে—স্বাধীন ও পরাধীন এই দুই সাম্রাজ্য শাসনের পদ্ধতির মূলেই কিরূপ প্রভেদ।

রাখিবন্ধন।

পঞ্জাব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সম্বাদপত্রে ঝালান্ধারের "কন্যা-মহাবিদ্যালয়ের" বালিকাগণের নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন—"স্মারকলিপি, সমাধিস্তম্ভ বা প্রতিমূর্ত্তি এদেশের সামগ্রী নহে, আমরা বিদেশীয় প্রণালীর অনুকরণ কেনই বা করিতে যাইব? কবির রচনাই তাঁহার অমর কীর্ত্তি, সেই কীর্ত্তির পার্শ্বে স্বল্পস্থায়ী ইষ্টকমন্দির বা প্রস্তর স্থাপন যেন সূর্য্যের নিকট দীপ ধরিতে যাওয়া, আমরা সেরূপ বাতুলতা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করি না; কবির কাব্যকে হৃদয়ের মধ্যে ও কর্ম্মবীরগণের লোক হিতকর সংস্কারগুলিকে আমরা সমাজের মধ্যে পোষণ করিব, সেই স্থলই তাহাদের প্রকৃত অধিষ্ঠানভূমি।"

কবি বা কর্ম্মবীর নিজেরা যে কীর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন, তাহাই তাঁহাদের স্মৃতি রক্ষা করে এ কথা সত্য, কিন্তু ভক্তেরও একটা কাজ আছে, তাহা অঞ্জলি স্বরূপ আরাধ্যের সম্মুখে কিছু রাখিতে চায়। ভগবানের কোন বাসস্থানের প্রয়োজন নাই, তথাপি ভক্ত মন্দির, মসজিদ ও গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতে যে যত্ন অধ্যবসায় ও শিল্পশোভা নিয়োগ করে, তাহাতে তাহার ভক্তি সপ্রমাণ হয়। যে যাঁহাকে ভালবাসে সে তাঁহাকে চিত্রে আঁকিয়া প্রস্তরে নির্ম্মাণ করিয়া, তাঁহার উদ্দেশ্যে স্তুতি রচনা করিয়া—নানা প্রকারে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক এবং যেখানে সেই সকল অনুষ্ঠানের অভাব সেখানে ভক্তির আবেগ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে।

সমাধি স্তম্ভ বা মন্দির নির্ম্মাণের প্রণালী অবজ্ঞার্হ নহে, কারণ ইহাতে ভক্তির চরিতার্থতার সঙ্গে সঙ্গে শিল্পোন্নতির একটা পথ হয়, শিল্পীর হস্ত ভক্তিভরে কার্য্য করিলে তাহা অনেক সময়ে অসামান্য কৌশলের পরিচয় দিয়া থাকে।

সেপ্টিক ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের স্বাক্ষ্য।

সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক সম্বন্ধে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণের জন্য মি ব্রাউন, হর্ণ, মেজর ক্লার্কসন, এবং মি শিরিজকে লইয়া যে কমিটি গঠিত হইয়াছে, তাহাতে এই বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য এতদ্দেশীয় কয়েকজন পণ্ডিতের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত রজনীকান্ত বিদ্যারত্ন, মহামহোপাধ্যায় রাজকৃষ্ণ তর্কপঞ্চানন, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন, এম, এ, এবং পণ্ডিত সতীশচন্দ্র

বিদ্যাভূষণ এম, এ মহাশয়দিগের স্বাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছিল ;—প্রশ্নোত্তরগুলি একটু কৌতূহলোদ্দীপক বিধায় নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কমিটি—মলবিশোধনী পুষ্করিণীর জল গঙ্গায় নিক্ষেপ করা যায় কি না ?

পণ্ডিতগণ—না।

কমিটি—কি দোষ হয় ?

পণ্ডিতগণ—অমেধ্যসংস্পৃষ্ট জল দ্বারা স্নান, পান, রন্ধন, সন্ধ্যা ইত্যাদি করা যায় না।

কমিটি—গঙ্গা কি কখনও অপবিত্রা হইতে পারেন ?

পণ্ডিতগণ—গঙ্গা দ্বিবিধা—দেবতারূপিণী ও জলরূপিণী। দেবতাত্মিকা গঙ্গা কখনই অপবিত্রা হন না, কিন্তু গঙ্গার জল অপবিত্র হইতে পারে।

কমিটি—দেবতাত্মিকা গঙ্গা অপবিত্রা না হইলেই ত ধর্ম্ম রক্ষা পাইল জল যাহাতে আমশুদ্ধ ও অব্যবহার্য্য না হয় তাহা অবশ্য আমরা দেখিব।

কমিটি—গঙ্গায় শবদাহ ও অস্থি বিসর্জ্জন করা হয় কি না ?

পণ্ডিতগণ—হয়।

কমিটি—যদি উহাতে গঙ্গার জল নষ্ট না হয় তাহা হইলে মল বিশোধনী-পুষ্করিণীর জলের সহ সংযোগেই বা উহা কিরূপে নষ্ট হইবে ?

পণ্ডিতগণ—পূর্ব্বোক্তটীতে শাস্ত্রের বিধি আছে কিন্তু শেষোক্তটীতে শাস্ত্রের বিধি নাই।

কমিটি—অমেধ্য জলে সন্ধ্যা করিলে কি তাহা নিষ্ফল হয় ?

পণ্ডিতগণ—হাঁ।

কমিটি—গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা করিবার সময়ে আপনারা কি গঙ্গার জল পরীক্ষা করিয়া থাকেন ?

পণ্ডিতগণ—অজ্ঞান পূর্ব্বক অর্থাৎ না জানিয়া অমেধ্যজলে সন্ধ্যা করিলে উহা নিষ্ফল হয় না।

কমিটি—আপনাদের শাস্ত্রে আছে "নদীবেগেন শুধ্যতি।" গঙ্গায় বেশ স্রোত আছে। সুতরাং গঙ্গার জল ত স্বয়ংই শুদ্ধ হয়।

পণ্ডিতগণ—কঠিন অমেধ্য বস্তু স্রোতস্বতী নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে উহার জল নষ্ট হয় না, কিন্তু তরল অমেধ্য বস্তু নদীতে নিক্ষিপ্ত হইলে উহা জলকে দূষিত করে।

এইরূপ কতিপয় প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার পর কমিটি পণ্ডিত মহাশয়গণকে পাথেয় প্রদান করতঃ উহাঁদিগকে বিদায় দিলেন। বিদায় কালে কমিটি পণ্ডিত মহাশয়গণকে বলেন "যদি মল বিশোধনী পুষ্করিণী সম্বন্ধে আপনাদের অপর কোনও মন্তব্য থাকে প্রকাশ করুন।" তদনুসারে পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় মল বিশোধনী পুষ্করিণী সম্বন্ধে স্বরচিত একটা ইংরেজী প্রবন্ধ কমিটির হস্তে অর্পন করেন; শুনা যাইতেছে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এই পুস্তিকা কমিটির শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাঁহারা পুস্তক খানির লিখিত বিষয় সম্বন্ধে বিশেষরূপ বিবেচনা করিতেছেন।

যবদ্বীপে হিন্দু উপনিবেশ।

ভাদ্রমাসের সাহিত্য পরিষদের মাসিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় যবদ্বীপের হিন্দু-উপনিবেশ ও তাঁহাদের কীর্ত্তি সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেন, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের কতকগুলি চিত্র প্রদর্শন করেন, তৎসম্বন্ধে আমরা যে বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

চিত্রগুলি প্রধানতঃ এলা নদীর তীরবর্ত্তী "বড়বোদর" মন্দিরের। 'বড়বোদর' শব্দ বীরভদ্র, বীরবুদ্ধ প্রভৃতি রূপ নানা শব্দের কোনটির অপভ্রংশ বলিয়া অনেক পণ্ডিত অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু উহা "বলভদ্র" শব্দের রূপান্তর এই মতই এখন সাধারণতঃ সুধীমণ্ডলীর নিকট গৃহীত হইয়াছে।

"বলভদ্র" মন্দির ৬২০ বর্গফিট একটি চতুষ্কোণ ভিত্তির উপর স্থাপিত, এই ভিত্তি সমুদ্র তল হইতে ৮০০ ফিট উচ্চ, মন্দিরটি সপ্ততল ও একশত ছ চল্লিশ ফিট উচ্চ, এই বিশাল মন্দিরের উর্দ্ধস্তরগুলি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হইয়া সপ্তমতলের উপরে কতকগুলি সুদৃশ্য গুম্বজে পর্য্যবসিত হইয়াছে, ইহার উপরে ৭২টা গুম্বজ বিদ্যমান, সর্ব্বোচ্চ চূড়াটি প্রাকৃতিক উপদ্রবে কতকটা ধসিয়া গিয়াছে। বলভদ্র মন্দিরে

যতগুলি দেবতার প্রতিমূর্ত্তি আছে, আর কোন হিন্দুমন্দিরে তাহার সামান্য অংশও নাই, সমস্ত প্রস্তরমূর্ত্তিগুলি পাশাপাশি রাখিলে ৩ মাইলের অধিক স্থান ব্যাপক হয়, গান্ধার হইতে অমরাবতী পর্য্যন্ত যত বৌদ্ধ মূর্ত্তি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, মন্দিরের দ্বিতীয় মঞ্চে তদপেক্ষা শতগুণে বেশি বুদ্ধমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয়, ডচ্ গভর্ণমেণ্ট প্রায় ৪০০ শত অতিকায় ফোলিওতে যে সকল প্রতিমূর্ত্তির ছবি প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা সমস্ত মূর্ত্তির অতি নগণ্য অংশ। মন্দিরের তৃতীয় মঞ্চে নানা প্রকার হিন্দু দেবতার মূর্ত্তি, মূর্ত্তিগুলির বহু সংখ্যক প্রাচীর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ভাবে আসীন, আর অনেকগুলি প্রাচীরের গাত্রে উৎকীর্ণ, হিন্দু দেবতাদের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত ললাটে শিব ও তৎপার্শ্বে সৌম্যমূর্ত্তি পার্ব্বতী, বিষ্ণুর দশ অবতার, সূর্য্য ও অশ্বারূঢ় কল্কী অতি দক্ষতার সহিত গঠিত। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মূর্ত্তি গুলির অধিকাংশের মুখ বাঙ্গালীর মুখের ন্যায়। অধ্যাপক কারল সাহেব অনুমান করেন মন্দিরের শিলালিপি খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর। কিন্তু নগেন্দ্র বাবু তাহা আরও বহু পূর্ব্বের বলিয়া প্রতিপন্ন করেন। বলভদ্রমন্দিরের পরে "ব্রহ্মবনের" ছবি প্রদর্শিত হয়, ব্রহ্মবনে অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, সেই লিপির কতকগুলি দাক্ষিণাত্য ও অপরগুলি আর্য্যাবর্ত্তের প্রাচীন লিপির অনুরূপ। ব্রহ্মবনের গণেশমূর্ত্তি কতকগুলি নরমুণ্ডের উপর আসীন, এবং ব্রহ্মার মূর্ত্তি নর ও নারীর উপরে দুই পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান। অষ্টভুজা দুর্গামূর্ত্তি, মহিষাসুর বধ করিতেছেন, এই মূর্ত্তির ভাব অনেকটা বাঙ্গালাদেশের দুর্গার ন্যায়। ব্রহ্মবনের কতকগুলি মূর্ত্তিতে স্পষ্ট তান্ত্রিক প্রভাব লক্ষিত হয়। এখানে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোন কোনটি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর। সুতরাং যাঁহারা মনে করেন, তন্ত্রিক পূজা পদ্ধতি আধুনিক, তাঁহাদের মত কি ভাবে সমর্থিত হইবে?

যে সকল চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহা অতীব বিস্ময়কর, সেই সকল চিত্রে প্রতিভাত হিন্দুর মূর্ত্তিগুলি যেরূপ বিক্রান্ত, তেমনই প্রফুল্ল ও ক্রীড়শীল! হায়, যেদিন হিন্দুগণ সমরতরণী বাহিয়া সমুদ্র ভ্রমণ করিতেন, নানা দিগ্‌দেশ অধিকার ও নব নব রাজ্যে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, সেদিন গিয়াছে। প্রদর্শিত চিত্রে হিন্দুর সমরতরণী হিন্দুর নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও যানবাহনাদি উৎকৃষ্টভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।

এই অধিবেশনের মনোনীত সভাপতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়

বলিলেন অশোক ৪০০ খৃঃ পূর্ব্বে পৃথিবীর নানাস্থানে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন বিনয় পিটকে ও মহাবংশে যাবা দ্বীপে প্রচারক প্রেরণের তথ্য লিপিবদ্ধ আছে সম্ভবতঃ চীনের লোকেরা বৌদ্ধধর্ম্মগ্রহণ করিয়া খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে যাবায় সর্ব্বপ্রথম গমন করিয়াছিলেন। ফাহিয়ান, হিউনসাঙ প্রভৃতি বহুসংখ্যক চীন পরিব্রাজক বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবান্বিত নানাস্থানে গমন করিয়াছিলেন। চিন ত্রিপটিক পাঠ করিলে জানা যায় প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত চীনবাসীগণ যাবায় যাতায়াত করিতেন, সম্ভবতঃ ৭ম শতাব্দী হইতে ১০ শতাব্দী পর্য্যন্ত হিন্দুরা তথায় বিশেষ প্রতিপত্তিলাভ করেন। ভারতবর্ষের কোলিঙ রাজবংশ যাবা দ্বীপ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন, টলেমির ইতিহাস পাঠে এই তথ্য অবগত হওয়া যায়। এখন যাবা দ্বীপের সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে হিন্দু বা বৌদ্ধ ইহাঁদের কোন শ্রেণী দৃষ্ট হয় না, সেখানে মুসলমানগণেরই বিশেষ প্রভাব,—বৌদ্ধ ও হিন্দুগণ আরণ্যক, তাঁহারা যাবার অভ্যন্তরে মুসলমানগণ হইতে সুদূরে বাস করিতেছেন।

আমাদের সাময়িক কথায় সাহিত্যপরিষদের বিবরণী প্রকাশিত হইবে শুনিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় আমাদিগকে যাবাদ্বীপে হিন্দু প্রভাবের সময় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন।

বিদ্যাভূষণ মহাশয় ও বিশ্বকোষ সম্পাদক-মহাশয়ের মতদ্বৈধ।

ইহাতে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাল নির্দ্ধারণের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় সেদিন সভাপতি ছিলেন, সুতরাং সভাপতির বক্তৃতার পর নগেন্দ্র বাবুর প্রতিবাদ করিবার অবসর ছিলনা।

"যবদ্বীপে বৌদ্ধসংস্রব ঘটিবার বহু পূর্ব্বে যে হিন্দু সভ্যতা বিস্তৃত ও নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বুর্ণেলের মতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে এবং অধ্যাপক রামভূষণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে যবদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। অবশ্য মেনাঙ্কাবুর আদিত্যবর্ম্মার শিলালিপি অনুসারে খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে বুদ্ধ প্রসঙ্গ পাওয়া গেলেও তৎপূর্ব্বতন কোন শিলালিপি বা সাময়িক

বিবরণ হইতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের নিদর্শন পাওয়া যায় না। চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে বৌদ্ধকীর্ত্তি দর্শনার্থ ভারত পর্য্যটন করিয়া সমুদ্রপথে যবদ্বীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি এখানে কোন বৌদ্ধচিহ্ন বা বৌদ্ধসম্প্রদায়ের দর্শন পান নাই। তিনি এখানে ব্রাহ্মণ প্রভাব দেখিয়া গিয়াছিলেন। ফা-হিয়ানের বর্ণনা হইতে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে চীন হইতে যবদ্বীপে হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই, তাঁহার সময়ে এখানে কোন বৌদ্ধের বাস ছিল না। সুতরাং যবদ্বীপে যে সকল বুদ্ধমূর্ত্তি বা বৌদ্ধ নিদর্শন পাওয়া যায় তাহা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী। ব্রহ্মবন হইতে দৃষ্ট ১ম শতাব্দের কএকখানি শিলালিপি বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে হিন্দুসভ্যতাই এখানকার প্রথম আর্য্য সভ্যতা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।"

শ্রীমতী সরলা দেবী।

বাঙ্গালা সাহিত্যের মাসিক বিবরণী।

সাহিত্য—দর্শন শাখা (১) জিজ্ঞাসা—শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত।

"জিজ্ঞাসা" সব সময়ে নিজের নামটি ঠিক রাখিতে পারে নাই, প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে অনেক স্থলেই মনে হইবে গ্রন্থকার অনায়াসে ইহার নাম "মীমাংসা" রাখিতে পারিতেন। প্রশ্নগুলি জটিল করিয়া তুলিয়া তিনি তাহাদের সহজ উত্তর দিতে ভুলিয়া যান নাই, গ্রন্থি যতই জটিল ও কঠিন হউক না কেন, তিনি তাহা মুক্ত করিয়া স্বীয় বুদ্ধির কৌশল দেখাইয়াছেন।

বস্তুত পুস্তকখানি পাঠ করিলে নানাদিক হইতে আলোচনার স্পৃহা জাগিয়া উঠে, নানা গুরুতর বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা জন্মে। পাঠক হয়ত তাঁহার সবগুলি উত্তর স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিবেন না, কিন্তু তাহার মন যে সকল কথার পাশ কাটিয়া যাইত, সেই সকল কথা সম্বন্ধে একটা জিজ্ঞাসার ভাব প্রবল হইয়া উঠিবে, এই হিসাবে পুস্তকের নামটি সার্থক হইয়াছে।

পুস্তকখানি ত্রিবেদী মহাশয়ের ন্যায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের লেখা, কিন্তু লেখক তাঁহার পাণ্ডিত্য এরূপ সরলভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন যে উহা পাঠ কালে পাঠককে কোনওরূপই বেগ পাইতে হয় না। তিনি ভূরি ভূরি সংস্কৃত ও ইংরেজী পুস্তকের মত উচ্চারণ করিয়া লেখা ভারগ্রস্ত ও কুহেলী-আচ্ছন্ন করিয়া ফেলেন নাই। পাঠক এই পুস্তক পড়িয়া বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে নানা নূতন কথা শিখিবেন, অথচ সে সকল তত্ত্বের সমাবেশ এরূপ অবলীলা ক্রমে হইয়াছে যে পাঠক কখনই গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যচ্ছটায় অভিভূত হইয়া পড়িবেন না। বালকগণকে উৎকৃষ্ট শিক্ষক যেরূপ বড় বড় কথা সহজে বুঝাইয়া দেন, পাঠকমণ্ডলীকেও ত্রিবেদী মহাশয় সেই ভাবে মনোরঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন।

গ্রন্থকার জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আলোচনায় ক্ষুরধার বুদ্ধি প্রয়োগ করিয়াও তিনি যে হিন্দু ও বৈদান্তিক তাহা বিশেষ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন, সমস্ত জড় জগতটাকে ঠেলিয়া তিনি মনুষ্য চেতনার মধ্যে

পৌঁছাইয়া দিয়া সমুচ্চ "সোহংবাদ"কে উদ্ভাষিত করিয়া দেখাইয়াছেন। "কে বড়", "এক না দুই" প্রভৃতি প্রবন্ধের মূল রাগিনী এক, তাহা জড়বাদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ও একান্ত শুষ্ক মতামতের মধ্যে চালিয়া হিন্দুর প্রকৃত গন্তব্য অদ্বৈত-রহস্যে পরিণতি পাইয়াছে, তিনি বৈষ্ণবের ব্যাখ্যাত লীলা ও বৈদান্তিকের মায়াবাদকে এক গণ্ডীর মধ্যে আনিয়া সামঞ্জস্য বিধান করিয়াছেন।

বস্তুতঃ তাঁহার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিতেও নিরস, শুষ্ক, জড়জগতের নিয়ম ব্যাখার মধ্যে আত্মার ঐশ্বর্য্য এ উদার দার্শনিক সূত্র আয়ত্ত করিবার চেষ্টা পরিদৃষ্ট হয়। দ্রাক্ষাগুচ্ছলুব্ধ উন্মুখ শৃগালও নিউটনের বহু পূর্ব্বে আকর্ষণের কথা জানিত। ফলটি পৃথিবী টানিয়া স্বীয় ক্রোড়ে আনয়ন পূর্ব্বক সন্তানগণের মধ্যে বিলাইয়া দিবেন, ইহা নিউটন জন্মিবার বহু পূর্ব্বে পরিজ্ঞাত ছিল। আতাফলটি পৃথিবীর 'আকর্ষণে' মৃত্তিকায় পতিত হয়, এই একটা নাম দিয়াই কি নিউটন এত সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন? ত্রিবেদী মহাশয় নিউটনের আবিষ্কারের গুরুত্ব ওজস্বী ভাষায় দেখাইয়া দিয়াছেন, এই সামান্য আতাটি যে নিয়মে মাটিতে পড়িল, সেই নিয়ম দ্যুলোকে ভূলোকে গ্রহ উপগ্রহ লতাগুল্ম সমস্তকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। সেই আতার পতনে যে নিয়মটি দেখা গেল, তাহা সৌরজগতের মূলমন্ত্র, একটা মহাসত্য ক্ষুদ্র ফলের পতন উপলক্ষ করিয়া নিউটনকে দেখা দিয়া গিয়াছিল, সেই আনন্দ বিমূঢ় হইয়া নিউটন কবি ও সিদ্ধপুরুষের ন্যায় তন্ময় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। ত্রিবেদী মহাশয়ের সমস্ত প্রবন্ধই এই ভাবের কথা দ্বারা মুখবন্ধ করিয়া দার্শনিকের নিগূঢ় আনন্দের আভাষ দিতেছে। চরাচরময় দেশকাল ব্যাপক এবং দেশকালের অতীত যে বিরাট আত্মা, তাহারই অভিব্যক্তি দ্বারা তিনি বিশ্বকে সুমহান করিয়া আঁকিয়াছেন। এই সমস্ত বিষয় গুরুতর। ত্রিবেদী মহাশয় তাহা যত সহজই করুন না কেন, কতকটা ধৈর্য্যের সহিত পাঠককে অগ্রসর হইতে হইবে। নারিকেল বৃক্ষের ফল বহু দূর পর্য্যন্ত আরোহণ না করিলে আয়ত্ত হইবার নয়, তারপর ফলটি এরূপ নীরস, দৃঢ় ও শুষ্ক ত্বকের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে যে তাহা ভেদ করিয়া অভ্যন্তরের রস সম্ভোগ করিতে হইলে কতকটা ধৈর্য্যের দরকার, এই সকল অনুষ্ঠান না করিলে নারিকেল ফলের কিম্বা 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের রসাস্বাদ করা সহজ হইবে না। কিন্তু একবার ফলের আস্বাদ পাইলে কষ্ট অকিঞ্চিৎকর বোধ হইবে; উপন্যাস ও কাব্য-

মোদী বঙ্গীয় পাঠক সম্প্রদায় এই পুস্তক পড়িতে সম্মত হইবেন কি না জানি না, না হইলে তাঁহার দুর্ভাগ্য। ত্রিবেদী মহাশয় স্বয়ং তাঁহার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সমূহে যথেষ্ট কবিত্ব সঞ্চার করিয়া পাঠকের রুচিকে এই পথে প্রলুব্ধ করিবার উপযোগী কোন অনুষ্ঠান করিতে বাকী রাখেন নাই।

অনেক বিষয়ে রামেন্দ্র বাবুর সঙ্গে আমাদের মতভেদ আছে। কিন্তু সেজন্য তিনি যেন আমাদিগকে তাহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দী মনে না করেন, বিজ্ঞানালোচনায় আমাদের হাতে খড়ি হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, এদিকে তিনি লব্ধ প্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানবিৎ। ফলিত জ্যোতির্ষকে তিনি অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষের পক্ষ কথনই আত্মমত সমর্থন করিবার জন্য কোন যুক্তিবল উপস্থিত করেন নাই। কোন গ্রহ অদ্য মকর রাশিতে গমন করিলে তাহার ফলে আমি ত্রিবেদী মহাশয়ের বাড়ীতে একটা নিমন্ত্রণ পাইব এরূপ কথা আমার কোষ্ঠীতে লেখা থাকিলেও তিনি তাহা কেনই বা মান্য করিবেন, এবং এ সম্বন্ধে আমারই বা যুক্তিবল কি থাকিতে পারে? প্রত্যক্ষ ফল হাতে হাতে পাবে, গণক ঠাকুর এই পর্য্যন্ত বলিতে পারেন, ইহা হইতে বড় যুক্তি জ্যোতির্ব্বিদের নাই। কিন্তু যদি প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায়, তবে হয়ত আমার মত ত্রিবেদী মহাশয়ের ভক্তও তাঁহার ক্ষুরধার যুক্তি তর্ক শুনিতে প্রতীক্ষা করিবে না। বুদ্ধি যতই কেন মার্জ্জিত না হউক, তাহার ভ্রংশ কল্পনা করা কঠিন নয়, কিন্তু করস্থিত আমলকীর প্রতি সংশয় মাত্র থাকিতে পারে না।

কিন্তু প্রতিপক্ষের একটা গুরুতর আপত্তি আছে। সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তি যেরূপ তৃণকেও অবলম্বন করিয়া আশ্রয় চাহে, বিপদে পড়িয়া আমরাও সেইরূপ জ্যোতিষকে আশ্রয় করিয়া থাকি। কাল কি হইবে, জানিবার জন্য যখন ভীতিগ্রস্ত মন মাথা খুঁড়িতে থাকে, তখন গণক ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করিবার জন্য তাঁহার একটা স্বভাব দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হইতে পারে; ফলিত জ্যোতিষ কি মানবের এই দুর্ব্বলতার উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া এতটা পুষ্ট হইয়াছে?

যে ভাবেই ইহা পুষ্ট হউক না কেন, ইহা এরূপ বিচিত্র ভাবে বর্দ্ধিত ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার দ্বারা ব্যাখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের বিশ্বাসানুমোদিত হইয়াছে যে ইহাকে এখন আর অবজ্ঞা করা চলে না। এই শাস্ত্রে আমাদের যে সামান্য জ্ঞান আছে, তাহাতে এটুকু দেখিয়াছি যে কোষ্ঠীর জাতক সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিলেও কোষ্ঠী,

দেখিয়াই তাহাকে একরূপ বর্ণনা করা যায়, সেই বর্ণনা রেখায় রেখায় সত্যের সঙ্গে না মিলিলেও, মোটামুটি তাহাতে ঐরূপ মিল দেখা গিয়াছে, যে তাহাই ত্রিবেদী মহাশয়ের নিকটও আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইবে।

বস্তুতঃ ফলিত জ্যোতিষ ও হোমিওপ্যাথিকে অনেকে এক গণ্ডীর মধ্যে ফেলিতে পারেন, যে স্থানে রসায়ন বেত্তা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরীক্ষায়ও ঔষধের সত্বা আবিষ্কার করিতে অশক্ত, সেই স্থানেই হোমিওপ্যাথিক ডোজের "শক্তি" অত্যন্ত অধিক বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহার সপক্ষে অন্য কোন যুক্তি নাই, কিন্তু প্রবলতম একটি যুক্তি আছে—"ফলেন পরিচীয়তে।" ফলিত জ্যোতিষের পক্ষপাতীগণও কোন যুক্তি তর্ক শুনিতে চাহেন না, তাঁহারা ঐ শাস্ত্রে এমন কিছু পাইয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের বিশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। গণিত শাস্ত্রেও দৈর্ঘ্য বিহীন বিস্তৃতি কিম্বা বিস্তৃতিহীন দৈর্ঘ্যের ন্যায় অসম্ভব অসত্য জিনিষ অঙ্কন দ্বারা হস্ত কলঙ্কিত করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ঠিক সত্যের উপর জগতটাই দণ্ডায়মান আছে কিনা, কে জানে? যাহা হউক ফলিত জ্যোতিষের সমর্থক যুক্তি বলিয়া এগুলি অবতারণা করা হইল না, রামেন্দ্র বাবু যদি স্বয়ং স্বজীবনের কতকগুলি ঘটনা কোষ্ঠীর উক্তির সঙ্গে আশ্চর্য্য রূপে মিলিয়া যাইতে দেখেন তবে হয়ত তাঁহার প্রবল যুক্তির সশস্ত্র সান্ত্রীগুলিকে বিদায় দিয়া তিনিও অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয় লইবেন; সংসারে এরূপ মত পরিবর্ত্তন ঢের ঘটিয়াছে।

একটা যুক্তি আমার মনে হয়;—কৃষক যে তারিখে বীজ বপন করে, সেই তারিখে যদি হঠাৎ আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যায়, কিম্বা প্রবল সূর্য্য সমুদিত হয়, অথবা ঝাপটা বাতাস বহিয়া যায়, তবে সেই সকল প্রাকৃতিক লক্ষণদ্বারা সেই বীজের পরিণতি সম্বন্ধে সে অনেকটা ঠিক ভবিষদ্বাণী করিতে পারে, যে দিবস বীজ উপ্ত হয়, সেই দিবসের প্রাকৃতিক অবস্থায় তরুর ভবিষ্যত অনেকটা নির্ণিত হইয়া থাকে। মানব শিশু যে মুহূর্ত্তে জঠরের গুঢ় আবরণ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত বাহ্যশক্তি তাহাদের প্রভাব শিশুর উপর যে ভাবে মুদ্রিত করে তাহাতে সে চিরদিনের জন্য একটা গঠন পাইতে পারে, কারণ সেই মুহূর্ত্তে সে যে প্রকার বাহিরের বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হইবার উপযোগী থাকে, তৎপর আর সেরূপ থাকে না। শরীরের গঠনের সঙ্গে মানসিক গঠনও অনেকটা স্থির হইয়া যায়, এবং তত্ত্ববিৎ ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন প্রত্যেকের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি স্বীয় বাহ্য অবস্থা অলক্ষিত

ভাবে স্পষ্ট করিয়া থাকে; এই যুক্তি বোধ হয় এত সূক্ষ্ম হইল যে অনেকে ইহার অস্তিত্বই স্বীকার করিবেন না; কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু বক্তব্য নাই।

ত্রিবেদী মাহাশয় মাঝে মাঝে দুই একটি কথা এরূপ বলিয়াছেন, যাহা এ দেশ প্রচলিত কতকগুলি বিশ্বাসের মূলে আঘাত করে। তিনি এক স্থলে লিখিয়াছেন "অতীত কালের মত সমাজদ্রোহী বৈরাগ্য ও ভ্রান্ত অনাসক্তির অধর্ম্মাত্মক পন্থা" উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা তিনি বৈরাগ্য ধর্ম্মকে আক্রমণ করিয়াছেন। যাহারা সম্পূর্ণ অনাসক্ত হইয়া নির্জ্জনে তপস্যা করেন, যাঁহারা মুমুক্ষু এবং আত্মান্বেষী, বাহ্য জগতের সঙ্গে যাহারা দৃশ্যতঃ কোনরূপ সম্বন্ধ রক্ষা করেন নাই, যদি ত্রিবেদী মহাশয়ের কথা ভুল না বুঝিয়া থাকি, তবে বোধ হয় ঐ উক্তি দ্বারা তিনি সেই বিষয় নিস্পৃহ সংসারত্যাগী কঠোর বিরাগীদিগকেই আক্রমণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি সংক্ষিপ্ত হইলেও উহা সুনির্দ্দিষ্ট এবং ভারতবর্ষের একটি শ্রেষ্ঠ আদর্শের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ।

আধ্যাত্মিক উন্নতি এমন জিনিষ নহে যাহার ফল শুধু ব্যক্তিবিশেষে আবদ্ধ থাকিতে পারে, আমি একটু আম্রফল পাইয়া তাহা উদরস্থ করিলাম, তাহার যেটুকু তৃপ্তি তাহা আমার রসনাই নিঃশেষ করিয়া ফেলিল, কিন্তু মোক্ষপ্রাপ্তি ব্যাপারটি বোধ হয় সেই আম্র ভক্ষণের ন্যায় নহে, আমার যতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়াছে ততটুকু আমি নিজের সুখকে তুচ্ছ করিয়া বিশ্বের কোন কল্যান উদ্দেশ্যসাধনের যোগ্য হইয়াছি, সেই উন্নতি সাধনের জন্য যদি আমি নিজের চারিদিকে এমন একটা গণ্ডী বা বেষ্টনী সংস্থাপিত করি, যাহাতে আমার উদ্দিষ্ট বিকাশ বা আত্মোন্নতি নির্ব্বিঘ্নে ও নিশ্চিতরূপে লব্ধ হয়, তবে পরিণামে আমার পরিণতির ফল, বিশ্ব-কার্য্যেই উৎসর্গীকৃত হইবে সন্দেহ নাই। আমি নিজে ভাল হইতে পারিলে—তাহা নিজের পক্ষে যেরূপ কল্যানকর—বিশ্বের পক্ষেও তাহাই প্রকৃত কল্যান, তাহাতেই বিশ্ব এবং আমার মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত করে না। বিষয় নিস্পৃহ ধ্যান নিরত যোগীগণ কি ফল প্রার্থনা করেন, তাহারা কি তপস্যা করেন—তাহা আমরা জানিনা, আমরা তাহাদিগ হইতে বহুদূরে পড়িয়া আছি, কিন্তু তাঁহাদের সাধনা যে আমাদের লক্ষ্যগুলি হইতে মহত্তর, তাহা তাঁহাদের অসামান্য সহিষ্ণুতা ও কৃচ্ছসাধনই প্রতিপন্ন করে। গার্হস্থ্য কর্ত্তব্য গুলিকে আমি ছোট করিয়া দেখিতেছি

না,—কিন্তু সংসারত্যাগী যোগীদের সাধনার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা বোধ হয় সমীচীন নহে। ত্রিবেদী মহাশয় একটি প্রবন্ধে সুখকে দুঃখের অপরিহার্য্য সঙ্গী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, একথায় কোন দ্বিধা হইতেই পারে না,—কিন্তু সুখ দুঃখের উর্দ্ধে যে আনন্দ নামক একটা সামগ্রী আছে, তদ্বিষয়ে কি তিনি সন্দিহান? যাহা জগতে ঋষিগণই মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন, যেখানে সুখ-দুঃখ-জনিত হৃদয়ের গতি-পরায়ণতা নাই, যেখানে নিবাত দীপ শিখার ন্যায় একাগ্র আত্মনিষ্ঠ মন নির্ম্মল আধ্যাত্মিক রসে চির-পুষ্ট, তাহার অধস্তন রাজ্যে সুখ—দুঃখকে এবং দুঃখ সুখকে ইঙ্গিৎ করিয়া দেখাইতেছে, কিন্তু সেই পরিপূর্ণ আনন্দে কোন জ্বালা বা স্পন্দন নাই, যে আনন্দে জগতের প্রতি কুসুম প্রতি নক্ষত্র উদ্ভাসিত,—ভূমিকম্প দাবানলে জগত বিধ্বস্ত হইয়া গেলেও যে আনন্দে প্রকৃতির কুসুম নেত্র প্রতি প্রত্যুষে উন্মীলিত হয়, শত সহস্র অশ্রু ও শুষ্ক দীর্ঘশ্বাস পড়িয়াও যে আনন্দের নির্ম্মল ভাতিকে কণা মাত্র পরিম্লান করিতে পারে নাই; বক্ষ খড়্গে ছিন্ন হইলেও কর্ত্তিত বা দলিত পুষ্পের মত মৃত্যুতে ও যে আনন্দের বিরাম নাই, সেই সতত জাগ্রত, বিশ্বপোষক আনন্দের স্তরে যখন আত্মা অবস্থিত হয় তখন সে শূন্যে পরিণত হইয়া যায় না। সে কিছু পায় যাহা পার্থিব সুখ দুঃখ হইতে স্বতন্ত্র হইলেও একটা সুনির্দ্দিষ্ট ও লব্ধ তপঃসিদ্ধি—তাহা সুষুপ্তির অবস্থা নহে। বেদান্ত এই অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন।" রামেন্দ্র বাবুর পুস্তক খানিতে চিন্তাশীলতার বহুদিনের খোরাক সংগৃহীত আছে, উহাতে জ্ঞানকে উন্মেষিত, পুষ্ট ও সম্পূর্ণ সতর্ক ভাবে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত রাখিবার উপযুক্ত বহুবিধ সম্ভার প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার ভাষা দার্শনিকের মত সহজ কিন্তু কবির মত রসাল এবং সমগ্র পুস্তক খানিতে সত্যানুসন্ধিৎসু শিক্ষামোদী প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য প্রতিভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালায় দার্শনিক গ্রন্থ খুব অল্প, এই পুস্তক খানি দ্বারা আমাদের ভাষার গৌরব বিশেষ ভাবে সংবর্দ্ধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জটিল তর্ক মীমাংসায় আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিগণের নিঃসহায় ভাবে পাশ্চাত্য মনিষীগণের হস্তে যাইয়া পড়া স্বাভাবিক —কিন্তু রামেন্দ্র বাবু হিন্দুর উচ্চতম আদর্শ জড় বিজ্ঞানের আলোচনা কালেও এক বার বিস্মৃত হন নাই, এজন্য প্রবন্ধগুলির উপসংহারে অনেক সময় হিন্দুচিন্তার জয় সমুজ্জল হইয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে।

সাহিত্য—ইতিহাস শাখা (১) অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস—১ম ভাগ।

শ্রীযুক্ত কালী প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রণীত। এই পুস্তকখানি সাহিত্য সংসারে এখন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়াছে। বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পার্শীপুথি হইতে এই সুবৃহৎ পুস্তকের উপকরণ সংগৃহীত হইয়াছে। "তারিখ ইউসুফী" ও "তারিখ বাঙ্গলা" প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ আছে। প্রথমোক্ত পুস্তক স্কট ও দ্বিতীয় খানি গ্লাডউইন অনুবাদিত করেন। এই সকল অনুবাদ হইতে কিছু কিছু তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি বঙ্গীয় লেখকবর্গ বাঙ্গালা দেশের ইতিহাস রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মোটামুটী এই সকল ঐতিহাসিক গ্রন্থ বাঙ্গলা লেখকবর্গের অপরিচিত ছিল বলিলে কোন অসঙ্গতি হয় না। মূল পার্শী পুস্তক দেখিয়া কোন বাঙ্গালীই ইতিপূর্ব্বে গ্রন্থ-রচনা করেন নাই। "মজঃফর নামা" প্রভৃতি পুথি ও সাধারণতঃ এতদ্দেশে অজ্ঞাত ছিল, দুই একজন ঐতিহাসিক বিশেষজ্ঞ মাত্র তাঁহাদের কথা জানিতেন। কালীবাবু এই সকল অনুবাদ হইতে তত্ত্ব সঙ্কলনে আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, তিনি আদত পার্শী গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তন্ন তন্ন করিয়া সেগুলি হইতে সারোদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পুস্তকগুলি ছাড়া "ইনসা ইয়ার মহাম্মদ" ও "আকবর উনসেদক" প্রভৃতি অতি প্রাচীন হস্ত লিখিত পুথি তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন।

বহুবর্ষ ব্যাপিয়া কালীবাবু এই সকল পুস্তক হইতে তত্ত্ব সঙ্কলন করিয়া তাঁহার গ্রন্থ মৌলিক গবেষণা দ্বারা সমৃদ্ধ করিয়াছেন; গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে যে মানচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে তাহা রেনেলের ম্যাপ হইতে মূলতঃ সঙ্কলিত হইলেও, কালীবাবু অনেক পরগণা এবং ঐতিহাসিক স্থানের নাম উহাতে নিজে সংযোজনা করিয়াছেন। জাজিগ্রাম, নুতা খাজুরডিহি প্রভৃতি স্থানের সঙ্গে ঐতিহাসিক নানা কথা সংমিশ্রিত, আমরা এই মানচিত্রে উক্ত গ্রামগুলি নির্দ্দিষ্ট দেখিতে পাইতেছি।

ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক ঘটনা ব্যতীত কালীবাবু বঙ্গদেশের তৎসময়ের সামাজিক ও শাসনসম্বন্ধীয় অবস্থার অতি পরিষ্কার চিত্র প্রদান করিয়াছেন। মুসলমান শাসন পদ্ধতির কৌতুকাবহ নানা বিচিত্র বিবরণও আমরা এই পুস্তকে যথেষ্ঠ পরিমাণে প্রাপ্ত হই। কাফের কর্ত্তৃক মুসলমানের ধর্ম্ম-হানির শাস্তি ছিল—

লোষ্ট্রনিক্ষেপন পূর্ব্বক অপরাধীকে হত্যা করা, ডাকাতির শাস্তি—অপরাধীর শরীর দ্বিখণ্ডিত করিয়া বৃক্ষাগ্রে বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে তাহা লম্বিত করিয়া দেওয়া, এইরূপ নানা প্রকার দণ্ডের নিয়মাবলী তৎকাল প্রচলিত য়ুরোপীয় দণ্ড-বিধির সহিত তুলনায় সমালোচিত হইয়াছে, মুসলমানদের কর্ম্মচারী বিভাগ, এবং আইন আদালত সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব সম্বলিত চিত্র এই পুস্তকখানির উপসংহার ভাগে প্রদত্তহইয়াছে। ১৭১০ খৃঃ অব্দ হইতে ১৭৮০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশে জিনিষাদির দর কি ছিল, তাহা মুসলমান ও ইংরেজদের প্রাচীন দলীল পত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। ৮০ বৎসর পূর্ব্বে টাকায় আট সের ঘি, পনের সের তৈল বঙ্গীয় পল্লীর বাজারে পাওয়া যাইত। সেই অনতিদূরবর্ত্তী পল্লী-সৌভাগ্য এখন আমাদের নিকট স্বপ্নের কাহিনীর ন্যায় অলীক বোধ হয়।

সিরাজোদ্দৌলা, মীরজাফর প্রভৃতি মুসলমান নবাবদিগের চিত্র চিত্রণে কালী বাবু পক্ষপাতিত্ব দোষে লেখনী কলঙ্কিত করেন নাই। তিনি ব্যবহার জীবির ন্যায় কোন পক্ষ সমর্থনের জন্য দৃঢ় সংকল্প হইয়া লিখিতে আরম্ভ করেন নাই, ধীসম্পন্ন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের ন্যায় তিনি অতুল্য শ্রীসম্পন্ন মূর্ত্তির কৃষ্ণ তিলটিও যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই, আবার কুৎসিত চিত্রেরও যে স্থানে একটু শ্রীর আভাষ আছে—তাহা বর্জ্জন করিয়া যান নাই; এই গুণ না থাকিলে সহস্র মৌলিকত্ব সত্ত্বেও কালী বাবুকে আমরা সম্মান দেখাইতে স্বতঃই সঙ্কুচিত হইতাম, এবং এই গুণ আছে বলিয়াই তাঁহার ভাষার নানা প্রকার ত্রুটি আমরা গণ্য করিতে অভিলাষী নহি।

বাঙ্গালার পল্লীর ইতিহাসই প্রকৃত ইতিহাস ছিল, রাষ্ট্রবিপ্লব পল্লীজীবনকে কচিৎমাত্র বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। পার্শী গ্রন্থে সেই ইতিহাস তাদৃশ সূক্ষ্মভাবে লিপি-বদ্ধ হয় নাই। বাঙ্গালা প্রাচীন গ্রন্থ, পল্লীর প্রবাদ ও ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ প্রভৃতি হইতে সেই কর্ম্মঠ, শান্তিপ্রিয় বিচিত্রভাবে পুষ্ট সামাজিক জীবনের ইতিবৃত্ত, সঙ্কলিত হইতে পারে। আশা করি, কালী বাবু তাঁহার দ্বিতীয়ভাগে তদ্রূপ উপকরণ প্রভূত পরিমাণে সংগ্রহ করিবেন। এবারে যাহা দিয়াছেন, তাহা সাহিত ক্ষেত্রে তাঁহার যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে—বারান্তরে আমরা তাঁহার গ্রন্থে বাঙ্গালীর খাটি পল্লীজীবনের নক্সা দেখিতে প্রত্যাশী হইয়া রহিলাম। রাজা উজিরের অভ্যুদয়ে বা তিরোভাবে—বাঙ্গালার সেই প্রকৃত উন্নতি ও ক্রিয়াশীলতার ইতিহাস

একান্ত নির্ব্বিঘ্ন থাকিয়া স্বকীয় আদর্শলক্ষ্যে প্রবাহিত ছিল, সেই ইতিহাস যিনি সঙ্কলন করিবেন, তিনি শুধু ঐতিহাসিকরূপে আমাদের পূজা পাইবেন না, প্রাচীন লক্ষ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠা ও সংশোধন করিয়া জাতীয় মহোপকার সাধন করিবেন।

হজরত মোহাম্মদ, শ্রীযুক্ত রামপ্রাণ গুপ্ত প্রণীত।

এই পুস্তকে সংক্ষেপে মোহম্মদের জীবন-কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে; ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের জীবন কাহিনীর শেষাংশ যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনায় অতিরিক্ত মাত্রায় কণ্টকিত করা হইয়াছে। মোহম্মদ সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন, ইহা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা বাতুলতা; তিনি আরবদেশের ঘোর দুর্দ্দিনে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার অভ্যুদয়ে দুর্দ্দিনের মেঘ কাটিয়া গিয়া আরবের অদৃষ্টাকাশে যে রশ্মি দেখা দিয়াছিল, তাহা ক্রমসংবর্দ্ধিত তেজে জগতকে আলোকিত করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহার নির্ম্মল ঈশ্বরজ্ঞান, প্রগাঢ় জীবন্ত বিশ্বাসই প্রকৃত আলোচনার বিষয়। মক্কাবাসিগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহাদিতে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাহা বাদ দিলে কিম্বা উল্লেখ মাত্র করিলেই চলিত। গ্রন্থকার তাহা না করাতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকের মুখপত্রে মোহম্মদের ধর্ম্ম বিশ্বাসের যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল—যুদ্ধ বিগ্রহাদির সুদীর্ঘ বর্ণনায় তাহা উত্তরোত্তর ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। তিনি মোহম্মদের চরিত্রের ধর্ম্মের দিকের আলোচনা না করিয়াছেন, এমন নহে—কিন্তু তাহা পর্য্যাপ্ত নহে।

মোহম্মদ বহুদার পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিম্বা সতত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন—তিনি তাঁহার ধর্ম্ম পুত্রের পরিত্যক্ত স্ত্রীকেও দাররূপে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এই সব প্রসঙ্গ লইয়া অনেক পাশ্চত্য লেখক তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়াছেন। প্রাচ্য লেখকদের মধ্যে কেহ কেহ তাহাদের, স্বকপোলকল্পিত যুক্তিদ্বারা মোহম্মদকে সমর্থন করিতে দাঁড়াইয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় উভয়পক্ষের পরিশ্রমই পণ্ড, শত্রুদিগের হস্ত হইতে যেরূপ, ঈদৃশ বন্ধুবর্গের হস্ত হইতেও সেইভাবে মোহম্মদ স্বয়ং অব্যাহতি লাভ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। আমরা অযোগ্য ও নির্ম্মম পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের ন্যায় তুলাদণ্ড হস্তে লইয়া যেখানে সেখানে ন্যায়বিচারের অভিনয় করিতে বসি, সামান্য এরণ্ড গাছকে বিচার করিতে যাহাদের শক্তিতে কুলায় না,—হিমালয়ের পার্শ্বে তাঁহাদিগকে তুলাদণ্ড বা গজকাটি উপস্থিত করিতে দেখিলে

হাস্তি পায়; মোহম্মদের ন্যায় ভগবৎ প্রেরিত মহাপুরুষের নিকট যখন উপস্থিত হইতে হইবে তখন বিচারাসনে বসিবার ভঙ্গী না করিলেই ভাল হয়—তথায় করযোড়ে উপস্থিত হইলে লাভ আছে—তিনি পরের নিন্দাবাদ হইতে অব্যহতি পাইবার জন্য আমাদের মত ক্ষীণ প্রাণীর সহায়তার একেবারেই প্রতীক্ষা রাখেন না।

মাঝে মাঝে পুস্তকখানিতে কবিত্বপূর্ণ ভাষা ফলাইবার চেষ্টা আছে, যথা "মোহম্মদ বয়সের ব্যবধান বিস্মৃত হইয়া খাদিজার করধৃত প্রেমসুধা আকণ্ঠপূর্ণ করিয়া পান করিয়াছিলেন"—এই ভাবের ভাষায় পুস্তকের গুরু গম্ভীর স্বরটিতে হঠাৎ চাপল্য-মিশ্রিত হওয়াতে রসভঙ্গ হইয়াছে।

এ সকল সত্তেও পুস্তকখানিতে যে মোহম্মদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সুসংবদ্ধ ও সরল ভাষায় শ্রদ্ধার সহিত বর্ণিত হইয়াছে—তাহা অস্বীকার করা যায় না।

সাহিত্য—বিজ্ঞান শাখা (২) গার্হস্থ-স্বাস্থ্যরক্ষা ও সচিত্র ধাত্রী-শিক্ষা—

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়, এল, এম, এস প্রণীত।

এই পুস্তকখানিতে গুরু শিষ্যের কথোপকথনচ্ছলে গার্হস্থ্য স্বাস্থ্য রক্ষা ও শিশু চিকিৎসা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সুন্দরভাবে বিবৃত করা হইয়াছে। গুরুশিষ্যের কথোপকথনের ভাবে সন্দর্ভগুলি সন্নিবেশিত হইয়া ভালই হইয়াছে, কারণ এই প্রণালী অবলম্বন করাতে অতি সরল কথিত ভাষায় বিষয়গুলি বুঝাইয়া দেওয়ার সুবিধা হইয়াছে, এরূপ পুস্তক যাহাতে অল্প শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণেরও অনায়াসে বোধগম্য হয়, সেইভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন। বহিখানি অশিক্ষিত স্ত্রীলোক-দিগের নিকট পড়িলেও তাঁহাদের ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না—ইহাই আমাদের ধারণা। গ্রন্থকার নিজে ডাক্তার, সুতরাং তিনি যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া-ছেন কিম্বা উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—তাহাদের গুণাগুণ বিচার করিবার আমাদের কোন ক্ষমতা নাই; এইরূপ পুস্তকে যদি গ্রন্থকার ইংরাজী অনুবাদের গণ্ডী কতকটা অতিক্রম করিয়া স্বীয় স্বাধীন মন্তব্য ও সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করেন, তবেই আমাদের তাঁহার উপদেশের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা হইতে পারে।

ইংরেজ-শিশু এতদ্দেশীয় শিশু হইতে বলিষ্ঠ, এবং তাহাদের দেশে যাহা উপযোগী এরূপে তাহা উপযোগী নহে সুতরাং তাহাদের পক্ষে যাহা নিয়ম আমাদের পক্ষে অনেক সময় তাহা নিয়ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। গ্রন্থকার আঁতুড়ে ছেলের উদর পরিষ্কারের জন্য এক আউন্স অলিভ অয়েল পিচকিরি দিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, তৎপরিবর্ত্তে ৩০ ফোঁটা কাষ্টার অয়েল ৬০ ফোঁটা মধু দিলেও চলিতে পারে, এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্দেশীয় সদ্যোজাত শিশুর পক্ষে ইহা অতি গুরুতর রকমের চিকিৎসা কিনা আমরা তাহা ঠিক বলিতে পারি না,—তবে এদেশের কতকগুলি অতি সহজ চিকিৎসা বিধান আছে, তাহা পল্লীর রমণীগণ বিলক্ষণ জানেন,—সেই চিকিৎসা অনেক সময় শিশুর ক্ষীণ স্নায়ুর উপর কোনরূপ আঘাত না করিয়া ব্যাধি নিরাময় করিতে সমর্থ। ধাতৃশিক্ষার গ্রন্থকারগণ যদি দেশীয় প্রথাগুলিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া ইংরেজী হইতে অনবরত অনুবাদ করিয়া আঁতুড় ঘরের ব্যবস্থা লিপি প্রণয়ণ করেন, তবে আমরা সর্ব্বদা তাঁহাদের উপদেশ অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারিব না। আলোচিত পুস্তকে এদেশের আচরিত রীতিগুলির উপর সানুরাগ দৃষ্টি কতকাংশে আছে—কিন্তু সেই অনুরাগ আরও একটু প্রসারিত এবং বিদেশী প্রণালীর প্রতি ঐকান্তিক নির্ভর আরও কিছু সঙ্কুচিত হওয়া উচিত ছিল কিনা তাহা এবিষয়ের বিশেষজ্ঞগণ বিচার করিবেন। পুস্তকখানি অতি সুন্দরভাবে মুদ্রিত এবং নানারূপ প্রয়োজনীয় চিত্রের দ্বারা পরিশোভিত হইয়াছে, ইহা পাঠ করিলে যে অন্তঃপুরবাসিনিগণ প্রভূত উপকার পাইবেন, তৎ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন।